REGISTERED No. C.192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



নবম খণ্ড,---প্রথম সংখ্যা।

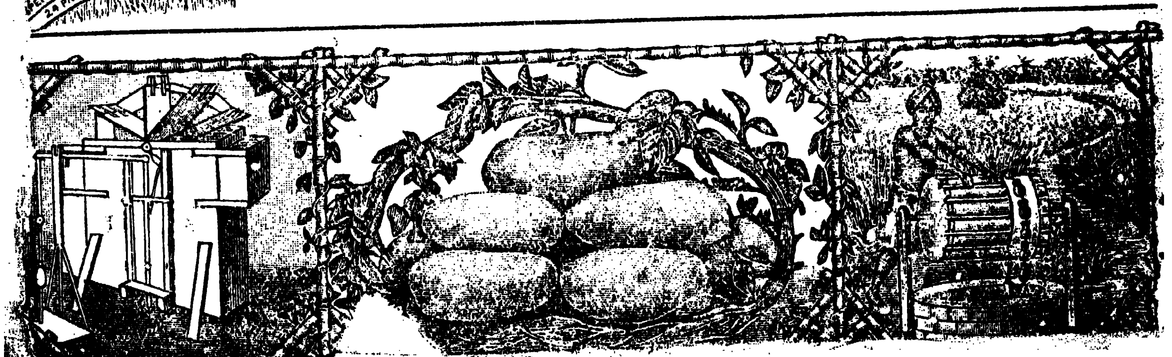
সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,

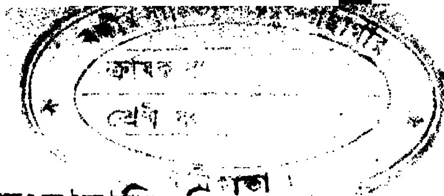
সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

বৈশাখ, ১৩১৫।

মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্;
১২৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।





কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

কৃষক।

৯ম খণ্ড। বৈশাখ, ১৩১৫ সাল। ১ম সংখ্যা।

সোডা।

ইংলণ্ডে লবণের কর তখন অত্যন্ত অধিক ছিল। প্রতি বুসেল লবণের জন্য ১৫ শিলিং কর দিতে হইত। ১৮০৫ হইতে ১৮২৩ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা থাকে। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে লেব্লাঙ্কের আবিষ্কৃত প্রথায় সোডা বাহির করা ইংলণ্ডের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। পরে লবণের কর রহিত হইলে কেল্প অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল এবং সোডার জন্য লবণই ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

লেব্লাঙ্কের প্রণালী।

লেব্লাঙ্ক সাহেবের উদ্ভাবিত প্রণালীতে সোডা উৎপাদন করিতে হইলে সাধারণ লবণ, গন্ধক দ্রাবক, কয়লা, খড়ি বা চুণের পাথর ও কাট পোড়া কয়লা—এই কয়টী উপকরণের আবশ্যক।

সাধারণ সমুদ্রজাত লবণকে বিশ্লেষণ করিলে ক্লোরিণ ও সোডিয়ম এই দুইটী জিনিস পাওয়া যায়। পূর্ব্বে লবণকে মিউরিয়েট অব সোডা বলা হইত কিন্তু পরে লবণের বৈজ্ঞানিক নাম কোরাইড অব সোডিয়মে পরিবর্ত্তিত হয়। দানা বাঁধিবার সময় ইহাতে জল থাকে না। সোডিয়ম ধাতুতে ক্লোরিণ বাষ্প প্রয়োগ করিলে ধাতু জ্বলিয়া উঠে এবং কিয়ৎক্ষণ দগ্ধ হইয়া লবণে পরিণত হয়। হাইড্রোক্লোরিক এসিড বা মিউরিয়েটিক এসিডে সোডা মিশ্রিত করিলেও লবণ বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হইতে পারে। এখানে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের উদজান সোডার অম্লজানের সহিত মিলিত হয় এবং এসিডের ক্লোরিণ অংশ সোডিয়াম ধাতুর সহিত মিশিয়া লবণে পরিণত হয়।

লবণ প্রধানতঃ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হয়। খনি হইতেও লবণ পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ কোন কোন স্থলে লবণের পাহাড় আছে। উৎপত্তি যেরূপেই হউক লবণ পৃথিবীর মধ্যে অতি সহজ প্রাপ্য ও প্রচুর লভ্য জিনিষ।

সমুদ্রের জলে শতকরা তিন অংশ লবণ। এই জল জ্বাল দিয়া বা রৌদ্রের উত্তাপের সাহায্যে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া লবণ বাহির করিয়া লওয়া হয়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সমুদ্রের ধারে বড় ছোট পুকুর কাটিয়া নালার সাহায্যে সমুদ্রের জল আনিয়া ঐ সকল পুকুর পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়। তারপর নালার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে পুকুরের জল শুকাইয়া গিয়া লবণ পড়িয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে অগ্নির সাহায্য প্রধানতঃ আবশ্যক হয়। কিন্তু এই লবণ বিশুদ্ধ নয়। এদেশেও অন্যত্র

পাহাড়ে লবণ প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থাতেই পাওয়া যায়। পাহাড়ে লবণে প্রায় মৃত্তিকা মিশ্রিত থাকে বলিয়া উহার বর্ণ অনেকটা লালচে অথবা পাঁশুটে হইয়া উঠে। কিন্তু জলে গুলিয়া ফেলিলে মাটী তলায় থিতাইয়া গিয়া বিশুদ্ধ লবণ উপরে জলের সঙ্গে দ্রব হইয়া থাকে। রাসায়নিকভাবে অবিশুদ্ধ লবণ হইতে অনায়াসে বিশুদ্ধ লবণ বাহির করিয়া লওয়া যায়। এই বিশুদ্ধ লবণ হইতে সোডা প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রথমতঃ সমপরিমাণ গন্ধকদ্রাবক ও লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সোডা সালফেট তৈয়ার করা হয়। বিলাতের কারখানায় এই কার্য্যের জন্য দুইটী কামরাযুক্ত মুচি ব্যবহৃত হয়। একটী কামরাতে অগ্নির সাহায্যে দ্রবপদার্থটিকে ঘন করিয়া দানা বা ডেলা বাঁধিয়া ফেলা হয় এবং অপর কামরায় ঐ ডেলা বা দানা গুলিকে চূর্ণ করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন ধরণের মুচি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। দ্রাবকের, শক্তির তারতম্যানুসারে পরিমাণেরও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। লবণ ও দ্রাবক একেবারে মিশান উচিত নয়—ক্রমে ক্রমে মিশাইতে হয়। যেমন মিশ্রণ আরম্ভ হয় অমনি উহা হইতে ধূম বাহির হইতে থাকে। এই ধূমটী হাইড্রোক্লোরিক এসিডের। কারখানা বিশেষে এই ধূম চিমনীর সাহায্যে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। আবার কোন কোন কারখানায় এই ধূম জলের ভিতর লইয়া গিয়া দ্রব মিউরিয়েটিক এসিড তৈয়ার করা হয়। যতক্ষণ না সলফেট অব সোডা শুষ্ক হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধূম উঠিতে থাকে। এই ধূম যাহাতে নাসিকার ভিতর প্রবেশ না করে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। উপরে মিশ্রণের যে পরিমাণ দেওয়া হইল তদনুসারে সমস্ত গন্ধক দ্রাবকটুকু খরচ হইয়া যায় এবং কিছু ক্ষণ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। সমস্ত লবণটুকু খরচ করিতে হইলে দ্রাবক আর কিছু দিতে হয় কিন্তু দ্রাবক বেশী হওয়ার অপেক্ষা লবণ বেশী হওয়া ভাল। কেন.না, লবণের মূল্য দ্রাবকের অপেক্ষা বিলক্ষণ অল্প; আর সালফেট অব সোডায় কিছু লবণ থাকিলে বিশেষ হানি নাই। কিন্তু সালফেট অব সোডায় দ্রাবকের ভাগ অধিক হইলে সকল দিকেই ক্ষতি বেশী।

সোডা।—প্রকৃতি ও পরিচয়। সোডা ক্ষার জাতীয় পদার্থ, জলে দ্রবনীয়, দ্রাবকের সহিত সহজে মিলিত হইয়া লবণে পরিণত হয়, এবং কয়েকপ্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থের বর্ণ পরিবর্ত্তন করে। এই গুলিও তজ্জাতীয় ক্ষার পদার্থের বিশেষত্ব।

আরব দেশীয় "কালী" নামক এক প্রকার উদ্ভিজ পদার্থ হইতে প্রথমে সোডা প্রস্তুত হইত। সেই "কালী" হইতে ক্ষারজাতীয় পদার্থ মাত্রেরই নাম হইয়াছে—"এলকালী"। এমোনিয়া, সোডা, পটাশ ও লিথিয়া এই "এলকালী" পর্য্যায়ভুক্ত।

সোডিয়ম্ ধাতু, কষ্টিক সোডা ও কারবনেট অব সোডা।—সোডা নিজে মূল পদার্থ নয়। সোডিয়ম নামক ধাতু হইতে সোডার উৎপত্তি। শত বর্ষ পূর্ব্বে ১৮০৭ সালে সার হাম্‌ফ্রে ডেভী সর্ব্ব প্রথম সোডিয়ম ধাতুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। প্রথমে বিদ্যুতের সাহায্যে সোডা হইতে সোডিয়ম ধাতু পৃথক করা হয়। তারপর সোডা ও কাট-পোড়া কয়লা একত্র চূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রবল উত্তাপে চুয়াইয়া লইয়া সোডা হইতে সোডিয়ম ধাতু পৃথক করিবার অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সোডিয়ম ধাতুর বর্ণ রৌপ্যের ন্যায় শ্বেত ও উজ্জ্বল। সোডিয়মের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫৯ ডিগ্রি-তাপে ·০৭২। সাধারণতঃ এই ধাতু কোমল—অঙ্গুলী-পিষ্ট হইলে চেপ্টাইয়া যায়। ২০০ ডিগ্রি তাপে

দ্রব হয়। হাওয়ায় রাখিলে বর্ণ মলিন হইয়া যায়। কারণ বায়ুর অম্লজান সহযোগে ইহার কিয়দংশ সোডায় পরিণত হয়। সোডিয়ম ধাতুকে উত্তপ্ত করিলে যখন লাল হইয়া উঠে তখন ইহা হইতে এক প্রকার উজ্জ্বল অথচ মৃদু আলোক বিকীর্ণ হয়। কিয়ৎ পরিমাণ জলে কিছু সোডিয়ম ধাতু নিক্ষেপ করিলে বুদবুদ উঠিতে আরম্ভ হয়। এই বুদবুদ উঠা হইতে বুঝা যায় জলের সহিত ধাতুর রাসায়নিক মিলন হইতেছে। জলপূর্ণ কাচের বোতল বা শিশি উল্টাইয়া এই বুদবুদ গুলি ধরিলে দেখা যাইবে শিশির ভিতর জলজান বাষ্প সঞ্চিত হইয়াছে। জলের অম্লজানাংশ সোডায় পরিণত হয় এবং জলজান বিচ্ছিন্ন হইয়া বুদবুদের আকারে পলায়ন করে। এই সোডা মিশ্রিত জল ক্ষার জাতীয় পদার্থ। অগ্নির সাহায্যে উত্তপ্ত করিয়া জলকে তাড়াইয়া দিলে তলায় সোডা বর্ত্তমান থাকে। সোডিয়ম ধাতু গরমজলে ফেলিলে তাহা হইতে আলোক-রশ্মি নির্গত হয়। কিছু সোডিয়ম ধাতুতে দুই চারি ফোঁটা শীতল জল দিলে এত উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে উহা জ্বলিয়া যাইতে পারে।

রাসায়নিক মিলনের নির্দ্দিষ্ট ভাগ আছে। সোডিময় ধাতু অম্লজানের সহিত দুই প্রকার ভাগে মিলিত হয়। এক ভাগ ধাতুর সহিত, এক ভাগ অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় উহাই সাধারণ সোডা। আর এক প্রকার যৌগিক পদার্থে ধাতু দুইভাগ ও অম্লজান তিনভাগ থাকে। ইহাকে পারঅক্সাইড বলে। ইহার প্রকৃতি ক্ষারও নয় দ্রাবকও নয়। এই পারঅক্সাইডে জল মিশ্রিত করিলে সোডা পৃথক হইয়া পড়ে এবং অতিরিক্ত অম্লজান বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়।

কষ্টিক সোডা।— বিশুদ্ধ অর্থাৎ জলশূন্য সোডা উৎপাদন করিতে হইলে সোডিয়ম ধাতুকে শুষ্ক বায়ুতে অথবা অম্লজান বাষ্পে রাখিয়া দিতে হয়। সোডিয়ম ধাতু হইতে জল সংযোগে যে সোডা উৎপন্ন হয়, তাহা উত্তপ্ত করিয়া জল বাষ্পাকারে তাড়াইলে যে সোডা তলায় পড়িয়া থাকে উহাতে সমপরিমাণ জল মিশ্রিত থাকে। এমন কি লোহিতোত্তপ্ত করিলেও সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জল করা যায় না। এই সোডার নাম কষ্টিক সোডা।

নির্জ্জল সোডার বর্ণ কিছু মলিন—সহজে দগ্ধ হয় না জলের সহিত সহজেই মিলিত হয়। সজল সোডার বর্ণ শ্বেত ; সহজে চূর্ণ হইয়া যায়। গায়ে লাগিলে গায়ের চামড়া হাজিয়া যায়। অগ্নিতে সহজে দগ্ধ হয় এবং জলে ও সুরাসারে অনায়াসে দ্রব হইয়া যায়। ইহার ক্ষার-ধর্ম্ম অত্যন্ত অধিক। অধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে সোডা বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। সোডার জলে পশম, চুল, চামড়া ও অধিকাংশ প্রাণীজ পদার্থ দ্রব হইতে পারে, সোডার জল চর্ব্বি ও তৈল সংযোগে উত্তপ্ত করিলে সাবান উৎপন্ন হয়।

উদ্ভিদ জীবনে সোডিয়মের কমই প্রয়োজন দেখা যায়। কিন্তু জন্তুগণ ইহা ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না। সোডিয়ম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ প্রত্যেক মানুষের দৈনিক চারি তোলা পরিমাণ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গাভী ও বলদদিগকে প্রতিদিন এক ছটাক লবণ খাওয়ান উচিত। সোডিয়ম নাইট্রোজেন সংযোগে সোরার ন্যায় এক পদার্থ উৎপন্ন করে ইহাতে প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে এবং এই অবস্থায় ইহা উদ্ভিদ জীবনের পরিপোষণ করে।

সার ও জীবাণু।

পশুদিগের নাদি ও চোনা বহুগুণ সম্পন্ন সার। প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া গুণে উল্লিখিত দুইটী জিনিষের গুণ বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আবর্জ্জনা বিগলিত হইলে উদ্ভিদ শরীরে সত্বরেই কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সার বড়ই উৎকৃষ্ট;—যতই মূল্যবান হউক, অগলিতাবস্থায় ক্ষেত্রে প্রদত্ত হইলে বহু পরিমাণে উহার অপচয় হইয়া থাকে। সুপ্রণালীতে প্রস্তুত করিতে পারিলে অল্প সারে অল্প সময় মধ্যে তদ্দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আবর্জ্জনা কোন স্থানে স্তূপীকৃত হইলে উত্তপ্ত হইয়া উঠে, অতঃপর তাহা হইতে বাষ্প উদ্গত হয়। উক্ত বাষ্পের কতকাংশ স্তূপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায় এবং অবশিষ্টাংশ স্তূপ মধ্যেই জলে পরিণত হয় ও ক্রমে স্তূপান্তর্গত বিগলিত সূক্ষ্ম পদার্থ সহকারে মসীবৎ তরল পদার্থরূপে চুয়াইয়া বাহির হইতে থাকে। উক্ত মসী বর্ণের তরল পদার্থই যথার্থ সার, কিন্তু উহাকে বহির্গত হইতে দিলে সারের গুণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। স্তূপে যে উত্তাপ জন্মে ভৌতিক ক্রিয়াই তাহার মূলীভূত কারণ। ভৌতিক ক্রিয়ার ফলে স্তূপান্তর্গত পদার্থ রাশি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রস, উত্তাপ ও বায়ু,—এই তিনের সমাবেশে ভৌতিক ক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। ভৌতিক ক্রিয়ার সমাবেশে সার কিরূপে রূপান্তরিত হয়, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক।

উত্তাপ সঞ্চারিত হইবার পর অল্পক্ষণ মধ্যেই স্তূপ মধ্যে জীবাণুর আবির্ভাব হয়। জীবাণুর আবির্ভাব ও ক্রিয়া না হইলে কোন পদার্থই পচিতে পারে না। অগলনীয় পদার্থে জীবাণুর সঞ্চার হয় না, তথাপি যে উহা ক্ষয় ও চূর্ণ হয় তাহার কারণ বায়ু ও শৈত্যের ক্রিয়া। এতদুভয়ের ক্রিয়া হেতু সুকঠিন প্রস্তর মণ্ডিত পর্ব্বতও প্রতিনিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে।

জীবাণু নয়নের অগোচর পদার্থ হইলেও ইহাদিগের কার্য্যশীলতা অসীম,—ব্যাপ্তি ও জগৎময়। এমন কোন অঙ্গারক পদার্থ নাই যাহাতে ইহারা স্থান পায় না কিম্বা যাহাকে ইহারা বিগলিত করিয়া ধ্বংশ করিতে পারে না। ইহারা অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থ এবং জীব জগতের সর্ব্বনিম্ন স্তরেই ইহাদিগের যথা স্থান।

কোন গলনীয় পদার্থে জীবাণু উৎপন্ন করিতে হইলে, তাহাতে রস, উত্তাপ ও বায়ুর সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত পদার্থ-ত্রয়ের সমাবেশ ফলে জীবাণু জন্ম গ্রহণ করে এবং গলনীয় পদার্থেই প্রাণ ধারণ করে। আবর্জ্জনা সোরাজান সঙ্কুল হইলে অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যেই উহাদিগের আবির্ভাব হয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী রসায়নবিদ পাস্তুর (Pasteur) সাহেব ইহার প্রথম উল্লেখ করেন। সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, কোন একটী জলপূর্ণ পাত্রকে তদবস্থায় কয়েক দিবস রাখিয়া দিলে তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের আবির্ভাব হয়। পাত্রস্থিত জলে যতদিন অঙ্গারক

পদার্থ থাকে ততদিন উহারা তাহাতে অবস্থান করিতে পারে। আবার অনেক কীট মরিয়া গিয়া পাত্রস্থিত জলে অঙ্গারক পদার্থের পরিমাণ বর্দ্ধিত করে, ফলে যাবৎ তাহাতে জল থাকে তাবৎ জলমধ্যে তাহাদিগের অভাব হয় না—এক দফা মরে আর এক দফা জন্মে। অতঃপর উক্ত পাত্রে অল্পাধিক লতাপাতা বা অন্য কোন গলনীয় পদার্থ সন্নিবেশিত করিয়া দিলে আরও শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে জীবাণু উৎপন্ন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, জীবাণু ও কীট একই পদার্থ, তবে কীটগণ জীবাণুর উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত। * যাহা হউক, পাস্তর সাহেব বহু অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তাবৎ পচনীয় পদার্থ—উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ নির্ব্বিশেষে—উক্ত জীবাণুর ক্রিয়া বশে বিগলিত হইয়া থাকে।

উক্ত জীবাণু মধ্যে দুইটী জাতি আছে এবং তদনুসারে প্রত্যেক জাতির কার্য্যেরও স্বতন্ত্রতা আছে। জাতিদ্বয়ের নাম এরোব (Aerobe) ও আনেরোব (Anaerobe)।

আনেরোব জাতীয় জীবাণু স্তূপের নিম্ন ও ভিতরাংশে উৎপন্ন হয় ও সেই স্থানেই অবস্থান করে। শ্বাস গ্রহণের জন্য ইহারা অম্লজান (Oxygen) নামক বায়ব্য পদার্থের অভাব আদৌ অনুভব করে না, অধিক কি, উক্ত পদার্থের সংযোগে আসিলে উহারা মরিয়া যায় কিন্তু এরোব জাতীয় জীবাণু অম্লজান ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। স্তূপের উপরিভাগে অম্লজান যথেষ্টই থাকে এজন্য ইহারা স্তূপের উপরিভাগে ও বায়ুপূর্ণ স্থানে জন্মে ও থাকে। স্থূল কথা এই যে, স্তূপের মধ্যে যে সকল স্থানে বায়ুর গতিবিধি থাকে, সেই সকল স্থানেই এরোব জাতি এবং বায়ুহীন নিভৃত স্থানে আনেরোব জাতি অবস্থান করে।

জঞ্জাল রাশি মধ্যে উত্তাপ উদ্ভূত হইলে উভয় জাতীয় জীবাণুই উৎপন্ন হয় এবং সেই সকল জীবাণু জঞ্জাল রাশিকে বিগলিত করিতে থাকে। আনেরোব জীবাণুগণ স্তূপের নিম্নভাগস্থিত স্থূল পদার্থ সমূহকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গুঁড়া করিয়া দিবার পরে মরিয়া যায়। স্থূল রাশি চূর্ণিত হইয়া গেলে স্তূপের মধ্যে বায়ু প্রবেশ লাভ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আনেরোব জীবাণু বায়ু সহ্য করিতে পারে না, তজ্জন্য এক্ষণে বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া অগত্যা মরিয়া যায়। এরোব জাতি উপরিভাগের পদার্থ রাশিকে দ্রবীভূত করিতে করিতে ক্রমশঃ গভীরতম ভাগে যাইতে থাকে এবং সন্নিকটে আনেরোবদিগের স্থানে গিয়া পৌঁছে। এরোবগণ এক্ষণে নিম্নভাগে গিয়া আর অম্লজানের অভাব অনুভব করে না, কারণ ইতঃপূর্ব্বেই আনেরোবগণ তথাকার স্থূলাংশকে ভাঙ্গিয়া লঘু করিয়া দেওয়ায়, তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশের পথ মুক্ত হইয়া থাকে, ফলতঃ এরোবগণ নিম্নভাগে গিয়া প্রয়োজন মত অম্লজান প্রাপ্ত হয় এবং তথায় থাকিয়া আনেরোবদিগের ধ্বংশাবশিষ্টকে আরও লঘু ও চূর্ণ করিতে থাকে। স্তূপান্তর্গত স্থূল পদার্থ সমূহ যত পরমাণুবৎ ক্ষুদ্রাংশে পরিণত হয় ততই তাহাতে পচন ক্রিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। পচন ক্রিয়া যতই অগ্রসর হয়,--যতই আবর্জ্জনা রাশি

* এ স্থলে কীটের সংজ্ঞা নিতান্তই অনির্দ্দিষ্ট। কৃঃ সঃ।

বিগলিত হইতে থাকে, ততই সেই স্তূপ হইতে জল নির্গত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গারাম্ল-বাষ্প (Carbonic Acid Gas) উৎপন্ন হয়।

স্তূপ হইতে যে জল নির্গত হয়, তাহা স্তূপান্তর্গত পদার্থ মধ্যস্থিত রস মাত্র। বিগলিত হইবার পূর্ব্বে স্থূল পদার্থ মধ্যে রস থাকে কিন্তু বিগলন ক্রিয়া বশে জঞ্জালের রসাধার সমূহ ভাঙ্গিয়া যায়। ফলতঃ তন্মধ্যস্থিত আবদ্ধ রস এক্ষণে অব্যাহতি লাভ করে এবং বহির্গত হইতে থাকে।—শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।

জাপানের কৃষি পদ্ধতি।

অবসর প্রাপ্ত সিভিলিয়ান সার্ ফ্রেডরিক্ নিকলসন্ ১৯০৬ সালে মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জাপানে মৎস্য ধৃত করণ ও তাহার ব্যবসায় প্রণালী অধ্যয়ন করার জন্য প্রেরিত হন। তিনি সেই সুযোগে কৃষিকার্য্যের প্রণালী ও তাহার বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়েও অনেকগুলি তথ্য সংগ্রহ করেন। উক্ত তথ্য গুলি মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট "Note on Agriculture in Japan" নামক একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধোল্লিখিত বিষয়গুলি ঐ পুস্তিকা হইতেই সংকলিত হইল।

জাপান প্রতি বর্গফুট জমি কাজে আনিতে জানে এবং সেইটুকুই অতি সাবধানের সহিত, অতি যত্নসহকারে এবং সম্পূর্ণরূপে কর্ষণ করে। যতটুকু জমি পাওয়া যাইতে পারে ততটুকুই উৎকৃষ্টরূপে এবং দেহ মনের সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া চাষ করে। অনুচ্চ পাহাড়গুলির গায়ে গায়ে সর্পাকারে চারিদিকের মাটি কাটিয়া সমতল করিয়া তাহার চূড়া পর্য্যন্ত এমন কি যথায় আরোহণ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, সে সকল স্থানও আবাদ করে। গৃহস্থ স্বীয় ভদ্রাসনের আশে পাশে এমন কি গৃহদ্বার পর্য্যন্ত যতটুকু জমি আদায় করিতে পারে তাহাতেই বীজ বুনিয়া থাকে, গাছপালা রোপণ করে। ফল কথা একটু কোণ পর্য্যন্ত বাতিল যায় না। পাছে বেড়া দিলে অল্প অল্প করিয়া ক্ষেত্রে কিয়দংশ ভূমি বৃথা আটক পড়ে সে জন্য বেড়ার পরিবর্ত্তে তাহারা ক্ষেত্রের ধারে ধারে বিশেষ বিশেষ ফসল উৎপন্ন করে। গবাদি পশু বা শস্যধ্বংশকারী পক্ষীর অভাবে বেড়া না দিলেও ক্ষতি হয় না। চাষ করিলে চাষ হইতে পারে এরূপ জমি এবং পতিত জমি থাকিতে পারে ইহা জাপানে অজ্ঞাত। জমির সদ্ব্যবহার জাপানি কৃষির অন্যতম বিশেষত্ব। দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে তাহাদের চাষে অপরিচ্ছন্নতা বা অসাবধানতা ঘটিবার যো নাই। প্রত্যেক ফুট অতি সুন্দররূপে আবাদ করিয়া সমগ্র ক্ষেত্র যখন সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত উদ্যানের মত দেখাইবে, একটী তিল পরিমাণ ভূমি ব্যর্থ যাইবে না, প্রত্যেক বীজটী একটী ফলবান বৃক্ষে বিকশিত হইয়া উঠিবে তবে জাপানী কৃষক নিরস্ত এবং সন্তুষ্ট হইবে। তাহাদের মতে সুন্দর ও সম্পূর্ণভাবে কর্ষিত একটুকু জমিও ভাল তথাপি যেমন-তেমন চষা ময়দানও ভাল নয়। তাই জাপানের মাটি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা। কোন ঋতুতেই ফসলের ভিতর একটাও আগাছা দেখা যায় না। এই জন্য জাপানের কৃষি বলিতেই উদ্যানকৃষি বুঝায়।

বৈজ্ঞানিক কলের অভাবে জাপানে সামান্য কতিপয় হাতের যন্ত্র লইয়া চাষ করা হয়। সাধারণতঃ জাপানের মাটি কৃষ্ণবর্ণ পাঁক ও বালি মিশ্রিত। প্রথমে শাবল বা কোদাল দিয়া মাটি খোঁড়া হয়। হাতে করিয়া খোঁড়া

হয় বলিয়া অনেক ভিতর পর্য্যন্ত মাটি আল্গা হয়। চাষী তখন সেই মাটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সূক্ষ্ম গুঁড়া করিয়া ফেলে এবং মাটি পরে পরে আলি ও নালীকাটা করিয়া একলাইন উচ্চ মাটি মধ্যে নালীকাটা, তাহার দুই এক হাত অন্তর পুনরায় আলি তুলিয়া দেয়। ফসল এমন ভাবে বুনা হয় যে আলির উপরকার ফসল (শীতের গম, যব ইত্যাদি) যখন কাটিবার সময় আসে তখন নালীকাটার মধ্যস্থ ফসল গজাইতে থাকে সুতরাং সমগ্র ক্ষেত্র এককালে খালি পড়ে না। একবার যাহা খালি থাকে ফসল কাটা হইবার পর চষিয়া তাহা নালীকাটায় পরিণত করা হয় এবং ইতিপূর্ব্বে যাহা নালীকাটা ছিল তাহা আলিতে পরিণত হয়। এইরূপ পুনঃপুনঃ হইতে থাকে। জাপানী পাঙ্গে ভূমি (dry upland) সম্বন্ধে এই নিয়ম বিশেষভাবে রক্ষিত হয়। কোদাল দিয়া ভিতরকার মাটি উপরে তুলিয়া এবং ক্রমাগত উল্টাইয়া জমির ভিতর বায়ু ও সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে দেওয়ায় গাছ গুলি সুপুষ্ট, ফলবান হয় ও শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। ফসলের সময়েই বেশি চষা হয়; মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটি পিনু করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক গাছটির উপর দৃষ্টি রাখা হয়, এবং অল্প অল্প করিয়া তরল 'সার' * ঘন ঘন গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। আগাছার নামমাত্র গজাইতে দেওয়া হয় না। পাথর, কাঁটা, আগাছা এ সকল কি উচ্চ শুষ্কক্ষেত্র কি ধান্যক্ষেত্র (Wet land) সর্ব্বত্রই অজ্ঞাত। জাপানিরা অতি সুন্দরভাবে জমির পাট করিতে জানে। জাপানে প্রায়ই প্রবলবেগে বারিপাত হয় কিন্তু তাহাদের নালীকাটা ও আলিবন্ধের পদ্ধতির জন্য এবং নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রকর্ষণ জন্য মাটি ও সার ধুইয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে না। বরং মাটি সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত করায় জল অনেকটা বসিয়া যায়। যে ক্ষেত্রের মাটি আটাল তথায় বালি ও পাঁক মাটি মিশান হয় এবং বেলে মাটির সঙ্গে উদ্ভিজ্জসার ও নরম মাটি মিশাইয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তির অভাব পূর্ণ করা হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জাপানে ক্ষেত্রকর্ষণোপযোগী এবং ভারবাহী পশু নাই বলিলেও চলে। সুতরাং পশু অভাবে কৃষকগণকে যেমন অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হয় অপর দিকে তেমনি অতি সামান্য যন্ত্রাদির দ্বারা ক্ষেত্রকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। মাটি খুঁড়িবার ক্ষুদ্র একটী শাবল অথবা খুরপী (fork), একখানি কোদাল, একখানি শস্যছেদনের কাস্তিয়া, সার বহনের জন্য একটী কেঠো ও তাহা প্রয়োগ করিবার জন্য একটী হাতা বা উখড়ী ব্যতীত জাপকৃষকের অন্য যন্ত্রের আবশ্যক নাই। প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য এই সকল দ্রব্যের প্রতি সরকারী হিসাবে খরচ পড়ে গড়ে চারি টাকা মাত্র। এই সামান্য যন্ত্র লইয়া ইহারা অসামান্য ফল উৎপাদন করে এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অতি সুন্দর ও নিখুঁৎভাবে বপন, রোপণ প্রভৃতি সকল কাজ করিয়া থাকে। জাপানি কৃষকের মত পরিশ্রম করিতে জগতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

সার দিবার গুণেই জাপানে পর্য্যায় বুননের কোন পদ্ধতি নাই এবং তাহার আবশ্যকও বড় হয় না। তথাপি 'নাইট্রোজেন' উৎপাদক শীম্বীজাতীয় ফসলের দ্বারা মৃত্তিকার শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য গম ও যবের ক্ষেত্রে পাশাপাশি শীম, মটর প্রভৃতি যে ভাবে বুনা হয় তাহা কতকটা পর্য্যায় বুননেরই

* যে যে স্থানে "সার" এই শব্দ ব্যবহৃত হইবে, তথায় মানুষের মলমূত্রের সার বুঝাইবে। অন্যান্য সারের পূর্ব্বে বিশেষণপ্রযুক্ত হইবে, যথা—মিশ্রসার (Compost) মৎস্যসার (Fishfertiliser) ইত্যাদি।

অনুরূপ। ভারতবর্ষে মাটিকেই লোকে ফসলোৎপাদনের মূল মনে করে এবং উৎপাদিকা শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার ভাবে, জাপানে তাহারা ভাবে মাটি অবলম্বন বা আশ্রয়স্বরূপ। প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌জীবন মাটিকে মধ্যস্থ (medium) মাত্র রাখিয়া পর্য্যায়ক্রমে খাদ্য ও খাদককে পোষণ করে। তাহারা প্রকৃতি হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছে। সুতরাং জাপানিরা ক্রমাগত মাটি খুঁড়ে আর সার দেয়। তাহারা সার না দিয়া কোন ফসলই বুনে না এবং যতটুকু সার শস্যে পরিণত হইতে পারে তাহার কণামাত্র নষ্ট করে না। তাহারা বলে ক্রমাগত মূলধন ভাঙ্গিয়া খাওয়াও যা, সার না দিয়া ক্রমাগত জমিতে ফসল উৎপন্ন করাও তা; উভয় ভ্রমই এক প্রকার। সার দিবার প্রথা তথায় এমনই প্রবল যে পূর্ব্ব ফসলের সময়ে সার দেওয়া জমির যদি কিছু বাঁচিয়া যায় তাহাতে জাপানিরা পুনরায় সার না দিয়া নূতন ফসল বুনে না। তাহারা মনে করে মাটি সারকে শস্যে পরিণত করিবার যন্ত্র মাত্র। ইহাই তাহাদের জমির ফসলোৎপাদিকা শক্তির এবং উষর ভূমিকে উর্ব্বর করিবার গুপ্তমন্ত্র। তাহারা বন জঙ্গল হইতে এক প্রকার উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ্, নগরের আবর্জ্জনা, সমুদ্রের ঝাঁজি শৈবালাদি, নিম্নভূমির পাঁক, নর্দ্দামা, খানা, ডোবার আবর্জ্জনা প্রভৃতি শুষ্ক ও আর্দ্রভূমির জন্য ব্যবহার করে, এবং প্রত্যেক খামারে রাশীকৃত মিশ্রসার জমা করিয়া রাখে। তা ছাড়া মৎস্য সার, খইল, সকল জন্তুর বিষ্ঠা বিশেষতঃ মানুষের মল মূত্রই জাপানে সারের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

সার প্রস্তুত করণ ও প্রয়োগের প্রথা জাপানি কৃষির আর একটি বিশেষত্ব। প্রত্যেক জৈব পদার্থ এবং সর্ব্বপ্রকার পরিত্যক্ত বস্তুই সারের কাজ করে। "সার" হয় তরল অথবা সূক্ষ্ম চূর্ণের আকারে প্রযুক্ত হয়। ঋতু এবং ফসলের প্রকৃতি অনুসারে আবশ্যক মত তরল করিয়া ব্যবহার করা হয় কিন্তু মৎস্য, খইল, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, চূণ, ঝিনুকাদির খোলা, ছাই, মাটি, অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি একত্রে পচিতে দেওয়া হয়। পচিয়া অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ায় পরিণত হইলে সার মাটির মত ব্যবহৃত হয়। বীজ বা চারা বুনিবার সময় নালীকাটার দাগে দাগে তরল "সার" ঢালিয়া মাটির সহিত বেশ করিয়া মিশাইয়া দেওয়া হয়। বপনের পূর্ব্বে, একস্তর মিশ্রসার পাতলা করিয়া বপন পংক্তির মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উপর অল্প মাটি মিশ্রিত সার দিয়া বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। গাছ যখন গজাইতে থাকে, বিশেষতঃ উচ্চ শুষ্ক ক্ষেত্রে, গাছগুলির মধ্যবর্ত্তী জমি পুনঃপুনঃ খনন করিয়া প্রত্যেক বারই অল্প মাত্রায় তরল সার গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। অল্প মাত্রায় অথচ ঘন ঘন সার প্রদান জাপানিদের পদ্ধতি। প্রথম সার প্রদানকে তাহারা বলে "অঙ্কুরোৎপাদক সার।" গাছগুলি যখন গজাইতে থাকে তখন তাহাদের আহার স্বরূপ আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে "সার" দেওয়া হয়। একটা ফসলের মধ্যে তিন হইতে সাতবার করিয়া কোদাল ও 'সার' দেওয়া হয়। শীস বা শুঁটি ধরিবার সময় শেষ 'সার' দেওয়া হয়। বেশী পরিমাণ 'সার' কখনই দেওয়া হয় না। প্রকৃত পক্ষে এতদ্দ্বারা মাটি অপেক্ষা প্রত্যক্ষভাবে গাছের আহার যোগান হয়। ডাক্তার নাগাই বলেন এই পদ্ধতির জন্যই জাপান আবহমান কাল হইতে একই ফসল একই জমি হইতে প্রতি বৎসর একই পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞগণ জাপানিদিগকে বিলক্ষণ পরিমিতব্যয়ী, হিসাবী, ও বিবেচক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বীজবপনের পূর্ব্বে যে রাশি রাশি সার খরচ হয়

সেরূপ অযথা অপব্যয় করিতে জাপানিরা জানেই না। 'সারের' উপর তাহাদের এতদূর লক্ষ্য যে তাহারা সমগ্র দেশের জন-সংখ্যার হিসাবে কত সার পাইতে পারে, তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়াছে। শতকরা ২৫ ভাগ নানা কারণে নষ্ট হইলেও তিন কোটী ষাটলক্ষ লোকের 'সার' এক কোটী বিশলক্ষ একর ভূমির সার যোগাইয়া থাকে। ইহাতে সকল বয়সের তিনজন ব্যক্তির 'সার' কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা ভূমি প্রতি পড়ে। যাহা নষ্ট হইয়া যায় তাহাও নানা কৌশলে ব্যবহারে আনিতে চেষ্টা হইতেছে। কারণ এই "সার" অধিক প্রাপ্তব্য, গুণে উৎকৃষ্ট এবং মূল্যে সকল রকম সার অপেক্ষা সস্তা। জাপানের এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'সার' ভারতে অতি অল্পই ব্যবহৃত হয় ইহা তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না। অধিকন্তু বিদ্রূপ করিতেও ছাড়ে না। তাহারা বলে ভারতের এই উপেক্ষা, অন্যায় অপচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। জাপানে যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় ক্ষেত্র হইতে পাঁচ শতমণ শস্য উৎপন্ন করে এবং সপরিবারে ২॥ শত মণ আহার করে ও ২॥ শতমণ বিক্রয় করে তাহা হইলে সে প্রত্যাশা করিয়া থাকে তাহারা সপরিবারে যে অংশ ক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছে তাহা "সারের" আকারে ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ করিবে এবং যাহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছে তাহাদিগের নিকট বক্রী অংশ "সারের" আকারে ক্রয় করিয়া আদায় করিবে।

এই "সার" এদেশে "ঘরের কড়ি" দিয়া বিদায় করে কিন্তু জাপানে ইহার সংরক্ষণ, ইহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের সার প্রস্তুত করণ ও ইহার ব্যবসায়ের প্রতি গভর্ণমেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য আছে। ইহা দেশের কৃষি পরীক্ষাসভা সমিতিতে পরীক্ষিত হয়। সারে কেহ ভেজাল দিলে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হয়। এই-চি-কেন (Ai-chi-kon) কৃষি পরীক্ষাসভার রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রকাশ 'সার' হইতে নাইট্রোজেন এ্যামোনিয়ার আকারে শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া যায় তাহাতেই চতুর্দ্দিকে দুর্গন্ধ-বিকীরণ করে, কিন্তু নাইট্রোজেন মাটির উৎপাদিকাশক্তির প্রধান উপকরণ। সুতরাং যাহাতে এ্যামোনিয়া নষ্ট হইতে না পায় তাহা করা আবশ্যক। সার কোন অভেদ্য পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে (চালার নীচে) ঢাকিয়া রাখিতে হয়। তাহাতে শতকরা দুই ভাগ চুণ দিলে আরও ভাল হয় কিন্তু খড় দিলে অনিষ্ট করে। চূণের পরিবর্ত্তে (১) খড়িমাটি (Gypsum), (২) উদ্ভিদের পচা শিকড়বিশিষ্ট জলা-ভূমির মাটির শুষ্ক গুঁড়া, (৩) গুঁড়া করা শুষ্ক আঁটাল মাটি, (৪) কয়লার গুঁড়া ও (৫) করাতের গুঁড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। জাপানের কোন পরীক্ষালয় (Experimental Station) একমাসের পরীক্ষায় দেখিয়াছেন কি উপায়ে রক্ষা করিলে সার হইতে কত পরিমাণ নাইট্রোজেন বাঁচাইতে পারা যায়।

মোটের উপর নাইট্রোজেন রক্ষার উৎকৃষ্ট ও সহজসাধ্য উপায় এই যে চালার নীচে পাত্র পুঁতিয়া তাহার মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখা। তাহাতে শতকরা তিন অংশ Superphosphate মিশাইলে ভাল হয় কিন্তু খড় বা শ্বেতসারযুক্ত অর্থাৎ মণ্ডবৎ দ্রব্য কোন মতেই মিশান উচিত নহে। ভারতের

এত নদনদীতে সমুদ্রজলে ও উপত্যকা ভূমিতে ও অন্যত্র "সার" ফেলিয়া দেওয়া হয় যে তাহাতে কৃষিক্ষেত্রের ক্ষতি ত হয়ই অধিকন্তু জল দূষিত হইয়া স্বাস্থ্যহানিও হইয়া থাকে। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের দিনে জাপানের কৃষি-পদ্ধতি ও ভারতের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

মৎস্যসারও খুব নাইট্রোজেনবহুল, কিন্তু ইহাতে অধিকাংশ ভাগ Phosphoric acid আছে ইহা দ্বারাও উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। মাছের মুড়া, ছাল, কাঁটা প্রভৃতি প্রকাণ্ড হৌজে স্নান করা গরম জলে ফেলিয়া খুব ঘুঁটিয়া খড়ের চাটাই ঢাকা দিয়া (জাপানিরা খুব গরম জলে স্নান করে) পচান হয়। কয়েক সপ্তাহে জল পচিয়া অসহনীয় দুর্গন্ধময় ও সবুজবর্ণ হইলে তুলিয়া লওয়া হয় এবং নূতন ভাটির জন্য পুনরায় তাহাতে পূর্ব্ববৎ মাছ ও গরমজল ছাড়া হয়। এই সারের গুণে গাছপালা অতি শীঘ্র গজাইয়া উঠে এবং পরিপুষ্ট হয়। ভারতে জলাশয়ের অভাব নাই, মৎস্যও প্রচুর। এখানে এই সার প্রস্তুত করণের বিস্তৃত আয়োজন করা উচিত। খৈলের সারও এক্ষণে জাপানে বিলক্ষণ ব্যবহৃত হইতেছে। গত দশ বৎসরে খৈলের আমদানী ১৪ গুণ এবং তাহার মূল্য ত্রিশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাপাসের বীজও সারস্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। খৈল গুঁড়া করিয়া কাঠের ছাই, দগ্ধমৃত্তিকা, আস্তাবলের ময়লা জল বা মূত্র মিশাইয়া স্তূপাকারে খড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। অতিরিক্ত উত্তাপ নিবারণের জন্য স্তূপটী মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। তৎপরে শুদ্ধ এই সার অথবা মিশ্র সারের (Compost) সহিত মিলাইয়া ব্যবহার করা হয়। মিশ্র সার জাপানি কৃষকের "কোন কিছুরই অপচয় করিও না" (Waste nothing) নীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। "সার" ব্যতীত যাহা কিছু লোকে ফেলিয়া দেয়,—সকল জীব জন্তুর মলমূত্র, আগাছা, পাতা-লতা, খড়কুটা, ব্যঞ্জনের খোসা, মাছের আঁইস, কাঁটা প্রভৃতি, শম্বুকাদির খোলা, হাড়ের গুঁড়া, ছাই, পাঁক, সকল স্থানের আবর্জ্জনা একস্থানে একটী চালার নীচে রাশীকৃত করা হয় এবং আস্তাবলের বা মনুষ্য মূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে কিছুদিন পরে যখন সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত হয় তখন উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। জাপানে আস্তাবলের সার, সামুদ্রিক গাছ-গাছড়ার সার, চাউলের তুঁষ প্রভৃতির সার প্রস্তুত করণ প্রথাও প্রচলিত আছে।

জাপানের প্রজা শিক্ষাগ্রহণে আইনবলে বাধ্য হইবার পর হইতে বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এখানে ১৮৭২ অব্দে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়, পরবৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ২৮ জন ছাত্র হয়। দশ বৎসরে (১৮৮৩) ৫১ জন, পরবর্ত্তী দশ বৎসরে (১৮৯৩) ৫৯ জন এবং ১৯০৪ অব্দে অর্থাৎ আর দশ বৎসরে ছাত্র সংখ্যা ৯৩·২৭ জনে পরিণত হয়। লোক-সংখ্যার অনুপাতে বালকের সংখ্যা শতকরা ৯৬·৫৭ এবং বালিকার সংখ্যা ৮৯·৫৪। জাপানে ৬১টী নর্ম্যাল স্কুল আছে, তথায় ১০৬৯ জন শিক্ষক, ১৯৪৬৬ জন শিক্ষক-ছাত্র ছিলেন। তন্মধ্যে ৪,০৪১ জন ছাত্রী ছিলেন। এখানে পুরুষদিগকে ৪ বৎসর ও স্ত্রীদিগকে ৩ বৎসর শিক্ষাগ্রহণ করিতে হয়। উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছাত্রদিগের নিয়মিত সরলবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারা এই সময় হইতে গাছপালা, জীব-জন্তু, খনিজদ্রব্য, কৃষি, জলজদ্রব্য, স্থানীয় শিল্প, দেশের মাটি, সার, জলসেচন, বপন ও রোপণ বিষয়ে শিক্ষা পায়, এখানে অন্যূন ১৫৩৩টী বিদ্যালয়ে কৃষি নিয়মিত পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং ২৮টী বিদ্যালয়ে অতিরিক্তরূপে অধীত হয়। এতদ্ব্যতীত

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কৃষি-স্কুল ও কৃষি কলেজ যথা Supplementary Schools, Regular Agricultural Schools, College of Agriculture, Farm Schools, Private Agricultural Schools, প্রভৃতিতে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। অধিকাংশ স্কুলে কৃষকপরিবারের সন্তানগণ শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। গ্রাম্য স্কুলগুলিতে প্রত্যেক তিনটি ছাত্রের মধ্যে দুইটী অথবা তিনটিই কৃষকসন্তান। এ সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া পুনরায় কৃষিকার্য্য করিতে যায় এবং এই জন্য বিদ্যালয়ের সহিত স্থানীয় কৃষিসম্প্রদায়ের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকে। আইনানুসারে স্থানীয় কৃষকগণ সকলেই গ্রাম্য কৃষিসভার সভ্য। এই সকল কৃষিসভায় শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক (শীতকালে যখন ক্ষেত্রকর্ম্ম বন্ধ থাকে), অধিবেশন ও বক্তৃতা হয়। কৃষকগণও স্ব স্ব সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ও দুরূহ বিষয় সকলের মীমাংসার জন্য প্রায়ই বিদ্যালয়ে গমন করে। নিকলসন সাহেব এই শ্রেণীর একটী স্কুল স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন যে এই স্কুলের ছাত্রগণ মাসিক ।৵০ আনা মাত্র বেতন দেয়। তাহাদের অনেকে বহু দূর হইতে পড়িতে আইসে, কেহ কেহ ৫ মাইল পথ হাঁটিয়া আইসে। এই বিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত কৃষিবিষয়ক বহুসংখ্যক উত্তম উত্তম পাঠ্য পুস্তক আছে। বালকগণ তাহা হইতে ক্ষেত্রে জলসেচন প্রণালী, জলের ব্যবহার, সার প্রস্তুতকরণ, তত্ত্বাবধান ও তাহার মূল্য এবং উপকারিতাবিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। রেশম প্রচুর প্রিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া রেশমবিজ্ঞানও শিখান হয়। সম্প্রতি মধুমক্ষিকার পালন এবং কৃষির শাখা স্বরূপ বলিয়া বনরক্ষণ বিদ্যাও শিখান হইতেছে।

জাপানে প্রাথমিক কৃষিবিদ্যার ন্যায় উচ্চকৃষিশিক্ষা এবং কৃষিবিজ্ঞান অনুশীলনের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। নিকলসন সাহেব তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে শিক্ষার প্রতি জাপানিরা অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকে এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে শিক্ষার সুবিধা হইতে পারে তাহা প্রবর্ত্তিত করিতে সহস্র বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও পশ্চাৎপদ হয় না। বালক ও যুবকদিগকেই শিক্ষা দিয়া জাপান নিরস্ত হয় নাই, তাহাদিগের জন্য বহু সরকারী ও বেসরকারী স্কুল কলেজাদি ব্যতীত বয়স্ক লোকদিগের শিক্ষার অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কৃষিবিভাগের অধীন প্রায় ৩০০ বা তাহার অধিক বক্তা ও উপদেষ্টা আছেন তাঁহারা অসংখ্য পরীক্ষা ষ্টেশনের (Experimental Stations) সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা বৎসরের মধ্যে জাপানের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া সাময়িক স্কুল খুলিয়া কৃষি শিক্ষা ও বক্তৃতা দিয়া বেড়ান। এই ষ্টেশন বা থানা গুলি কৃষকদিগের সাহায্যের অন্যতম উপায়। জাপানিদের ধারণা বালক ও যুবকদিগের মন ও চরিত্র গঠন করিবার জন্য স্কুল ও কলেজের যেমন প্রয়োজন, বয়স্কদিগের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে সাহায্যদানের বিভিন্ন উপায় ও শিক্ষার তেমনি প্রয়োজন। থানাগুলি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রধান থানায় ৪০ জন বিশেষজ্ঞ (Experts) এবং ৪৭ জন সহকারী বিশেষজ্ঞ (Assistant Experts)

ও কতকগুলি কেরাণী এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিম্ন কর্ম্মচারী শাখা থানায় নিযুক্ত আছেন। থানার কার্য্য স্থানীয় চাষ আবাদের লক্ষণ অনুসন্ধান, দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নূতন প্রণালী ও নূতন উপকরণাদির পরীক্ষা দ্বারা ফল নির্ণয় করা এবং তাহা স্থানে স্থানে বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচার ও সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করা। কৃষি-শিক্ষা-বিভাগ ও রাসায়নিক পরীক্ষাগার (Experimental Station) ব্যতীত জাপানে অনেকগুলি কৃষি সমাজ (Agricultural Association) সর্ব্বত্র স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে।

কৃষিসমাজগুলি ১৯০৫ অব্দের নূতন আইনে বদ্ধ হয়। তাহাতে কোন সভা পৃথকভাবে না থাকিয়া পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও একযোগে কার্য্য করিতে থাকে। কতকগুলি গ্রামের কৃষকগণ মিলিত হইয়া একটী গ্রাম্য কৃষি সমাজ (Village Association) গঠন করেন। কতিপয় গ্রাম্য সমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা একটী জেলা সমিতি (Taluk Association) গঠিত হয়। কতিপয় জেলা সমিতির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা একটী প্রাদেশিক সমিতি (Prefectural Association) গঠিত হয়। এই প্রাদেশিক সমিতিগুলির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা জাপানের কেন্দ্র কৃষিসভা (Central Agricultural Council) গঠিত হইয়াছে।

গ্রাম্যসমিতির কার্য্য প্রধানতঃ এই—

(১) চাষ (Cultivation) (২) প্রতিযোগী প্রদর্শনী (Competitive Exhibitions) (৩) রেশম চাষ (Sericulture) (৪) শিক্ষা (Education) যথা সাময়িক স্কুল প্রতিষ্ঠা, "স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্য বক্তৃতা দান, নৈশবিদ্যালয় ও লাইব্রেরী স্থাপন, কৃষিবিবরণী প্রকাশ ইত্যাদি।

(৫) কৃষির অন্তর্ভুক্ত গৌণবৃত্তি অবলম্বন। (Secondary occupations)—যথা মাদুর চ্যাটাই প্রভৃতির জন্য ঘাসের চাষ, চ্যাটাই বুনা, খড়ের বুনট, ফল, চা, গৃহপালিত পশুপক্ষীর চাষ ও তাহার চাষের জন্য ডিম্বের নীড় বিতরণ।

(৬) বিবিধ (Miscellaneous)—ইহার অন্তর্গত বহু বিষয়ের মধ্যে সভাসমিতির অধিবেশন, প্রধান প্রধান কৃষকদিগকে বিশেষ সম্মান ও পারিতোষিক দান, হাতের যন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক কল ভাড়া দেওয়া ও ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া অন্যতম।

গ্রাম্য সমিতিগুলিই দেশের কৃষি শিল্পের সমুন্নতির মূল ও প্রধান পরিচালক সুতরাং এগুলির ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য জাপানিরা অতীব সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করে। যাহাতে এগুলি দুর্ব্বল, অচল এবং হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য ইহার যাবতীয় বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিতে তাহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট। এজন্য তাহারা বহু অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিচার করিয়া বহু বাধাবিঘ্ন আবিষ্কার করিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেছে। নিকলসন সাহেব নিম্ন উদ্ধৃত ১৪টীর মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) কৃষিবিষয়ে শিক্ষার অভাব এবং দেশাচার বা প্রাচীন সংস্কারের প্রভাব।

(২) অধিকাংশ জমিদারের উপেক্ষা।

(৩) সভাপতির অযোগ্যতা।

(৪) গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণ যাহারা অন্য কার্য্যে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত সেই সকল সভাপতির প্রাদুর্ভাব।

(৫) অর্থের অভাব।

(৬) শ্রমিক স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কৃষিতত্ত্বে অজ্ঞানতা।

(৭) ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যে স্বার্থ লইয়া বিবাদ।

(৮) অন্যান্য অধিক লাভজনক ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁক।

(৯) সভ্যদিগের মধ্যে পরস্পরযোগে কর্ম্ম করিবার অপ্রবৃত্তি।

(১০) যুবকদিগের উচ্চাভিলাষ ও কর্ম্মান্তর গ্রহণের চেষ্টা।

(১১) সভ্যগণমধ্যে রাজনৈতিক মতান্তর।

(১২) সভাসমিতি পরিচালনে আইনকানুনে গলদ বা ত্রুটি।

(১৩) কর্ত্তৃপক্ষীয়ের উৎসাহদান বিষয়ে অবিবেচনামূলক পদ্ধতি।

(১৪) যাহা স্থানীয় অবস্থার অনুকূল নহে এরূপ উন্নতি বিধানের চেষ্টা।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন জন্য যে দেশে অনন্যসাধারণ বন্দোবস্ত আছে, তথায় যে নির্ধন কৃষকদিগকে অর্থসাহায্য করিতে বহুসংখ্যক যৌথ ঋণদান সভা—কৃষিব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিদ্যমান আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই সকল সভা ও ব্যাঙ্ক অতি অল্প সুদে এবং নিতান্ত সহজ নিয়মে টাকা ধার দেয়। মহাজন যথায় শতকরা ২০৲ হইতে ৪০৲ টাকা সুদ গ্রহণ করে, কৃষকগণ তথায় এই সকল সভা ও ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা ১০৲ টাকা সুদে টাকা পায়। মোট কথা জাপানের কি রাজা কি প্রজা দেশের জন্য চিন্তা করেন, যাহা হিতকর তাহা গ্রহণ করিতে এবং গ্রহণ করাইতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না, দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণও গভর্ণমেণ্টের মস্তকে যে ভাবের, যে বুদ্ধির এবং উদ্দেশ্যের উদয় হয় তাহা প্রত্যেক কৃষকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় এবং দেশশুদ্ধ প্রজা তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপকৃত হয়। জাপানের সতর্কতা আজি কালি প্রবাদবাক্য স্বরূপ হইয়াছে। গত রুষজাপ যুদ্ধে জাপান যে সতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা ইতিহাসে বিরল বা নাই বলিলেও চলে। প্রত্যেক ইঞ্চি জমির আটঘাট বন্ধ করিয়া, কড়া ক্রান্তিতে আয় ব্যয়ের লাভ লোকসানের হিসাব করিয়া ভবিষ্যতে কি দাঁড়াইবে তৎপ্রতি লক্ষ রাখিয়া, রাজা হইতে দরিদ্রতম প্রজার সহিত সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত হইয়া কিরূপে কাজ করিতে হয় জাপান এবং জাপানি তাহা জানে। এখানে জাপানি সতর্কতার একটী দৃষ্টান্ত না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাছে সকল স্কুল, কলেজ, সভা সমিতি, বিধিবন্দোবস্ত সত্বেও, ভেজাল দেওয়া সার ব্যবহারে কৃষিক্ষেত্রগুলির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস বা অন্য কোন অনিষ্ট হয় তজ্জন্য এরূপ আইন করা হইয়াছে যে প্রত্যেক সার প্রস্তুতকারী ও ব্যবসাদারকে লাইসেন্স লইতে হইবে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা যে কোন সময়ে ইন্‌স্‌পেক্টর পাঠাইয়া মাল পরীক্ষা করিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি সারে ভেজাল দিবে অথবা জ্ঞাতসারে ভেজাল দেওয়া সার বিক্রয় করিবে তাহার ১৫ দিন হইতে এক বৎসরের কারাদণ্ড বা ৪৫০৲ টাকা জরিমানা হইবে। তাহার সমস্ত মাল সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন। উক্ত আইন প্রতিপালিত হইতেছে কি না দেখিবার জন্য একশতজন পরিদর্শক ভিন্ন ভিন্ন জেলায় নিযুক্ত আছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পরীক্ষাখানায় রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য রসায়নতত্ত্ববিদ্ নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের বেতন বাবদ ১৯০৩ অব্দে ২২২৯০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। জাপানের বিস্ময়কর সতর্কতার ইহা অন্যতম দৃষ্টান্ত।



কৃষক। বৈশাখ, ১৩১৫।

নব বর্ষ।

লেখক, পাঠক ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদিগের অনুগ্রহে "কৃষক" বর্ত্তমান বৈশাখ মাসে নবম বর্ষে পদার্পণ করিল। "কৃষক" প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য দেশ মধ্যে কৃষি বিষয়ক জ্ঞান সঞ্চার ও কৃষির উন্নতি। "কৃষকে"র প্রতিষ্ঠাতাগণ এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছেন। এতদিনে অথবা বিগত বৎসরে তাঁহারা কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের অপেক্ষা পাঠকবর্গের মতামতই অধিক বরনীয়। ফলতঃ দেশ মধ্যে যেরূপ কৃষি বিষয়ক জ্ঞানলিপ্সার আধিক্য দেখা যাইতেছে তাহাতে "কৃষক" প্রচারে কিছু ফলোদয় হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কৃষি-জ্ঞান প্রচার 'কৃষকে'র অন্যতম উদ্দেশ্য। কৃষকের গ্রাহকবর্গ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণও প্রায়ই কৃষি বিষয়ক নানাবিধ তথ্য অবগত হইবার জন্য কৃষক কার্য্যালয়ে আবেদন করিয়া থাকেন। উপযুক্ত অভিজ্ঞদিগের সাহায্যে এই সমস্ত বিষয়ের যথাযথ উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষকের কলেবর ক্ষুদ্র। ইহাতে প্রত্যেক বিষয়ের সম্যক আলোচনা করা দুরূহ। সুতরাং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গকে যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব উত্তর দিতে হয়। যে স্থলে কেহ অধিক জ্ঞানলাভ করিতে চান সেইরূপ স্থলে তাঁহাকে বিশেষ বিশেষ পুস্তক দেখিতে বলা হয়। বলা বাহুল্য যে, যে সমস্ত পুস্তকের নাম করা হয় তৎসমুদয় অনেক সময়ে দুর্ম্মূল্য অথবা দুষ্প্রাপ্য। যে দেশে সাধারণ সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকাগারেরই একান্ত অভাব, যে দেশে ব্যবহারিক অথবা উচ্চ বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক যে সাধারণের পক্ষে একবারেই দুষ্প্রাপ্য তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এই অভাব মোচন করিবার জন্য আপাততঃ দশ হাজার টাকা ব্যয়ে ভারতীয় কৃষিসমিতি একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাগার স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজ, কুচবিহারের মহারাজ, বর্দ্ধমানের মহারাজ ও সুপ্রসিদ্ধ জজ্ শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র প্রমুখ দেশের মুখোজ্জ্বলকারী বক্তিবর্গ এই কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। এই পুস্তকাগারের সংশ্লিষ্ট একটি শ্রেণী থাকিবে। উহাতে সময় সময় সাধারণের উপকারের জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় কৃষি বিষয়ক মূলতত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করা হইবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যে এইরূপ একটি পুস্তকাগার ও শ্রেণী আবশ্যক হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সাধারণের সাহায্য ব্যতীত এই উদ্দেশ্য সফল হওয়া সুকঠিন। আমরা তজ্জন্য আমাদের সমস্ত পাঠক ও অনুগ্রহাকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারাও যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া দেশের এই গুরুতর অভাব মোচন করেন।

কৃষি বিষয়ক পুস্তকাদি প্রকাশ কৃষক কার্য্যালয়ের একটি মুখ্য কার্য্য। বিগত বৎসর সমিতি হইতে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ও একটি

যন্ত্রস্থ আছে। "কৃষক" ভারতীয় কৃষি সমিতির মুখ পত্র। সুতরাং বিগত বৎসর সমিতির প্রধান কার্য্যাবলীর উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক। দেশে যে পশু খাদ্যের একান্ত অভাব হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। কি প্রকার পশু খাদ্য উৎপাদন করিলে সুলভে গবাদি পোষণ করিতে পারা যায় তাহা নির্দ্ধারণ করার জন্য গত বৎসর জোয়ার, গিনিঘাস, বিয়ানা ও ম্যাঞ্জেলের চাষ করা হয়। এই কয়েকটির মধ্যে আপাততঃ গিনিঘাস ও ম্যাঞ্জেলই আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। মধ্য-প্রদেশের আউস ধানেরও গত বৎসর চাষ করা হইয়াছিল, ধান্যের ফলন মন্দ হয় নাই। কিন্তু গত বৎসরের জলবায়ুর অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য এ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় নাই। এই সমস্ত পরীক্ষা ভিন্ন সাধারণ ফল ফুলের চাষ ও বীজ নির্ব্বাচন কার্য্য সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল। আমাদের দেশের অধিকাংশ ফসলই উপযুক্ত বীজ নির্ব্বাচনের অভাবে ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। সমিতির উদ্দেশ্য যে প্রত্যেকবারেই উৎকৃষ্টতম ফসল হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া উহা দ্বারা পরবর্ত্তী ফসল উৎপাদন করা। এইরূপ ক্রমিক নির্ব্বাচনের ফলে অবশ্য উৎকৃষ্ট ফসল জন্মাইতে পারা যাইবে। আপাততঃ সব্জী বীজ হইতেই নির্ব্বাচন আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমশঃ এই নির্ব্বাচন প্রণালী উদ্যান-জাত ফসল হইতে কৃষিজাত ফসলেও প্রয়োগ করা যাইবে।

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিগত বৎসরও কীটাদির উপদ্রব নিবারণের যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর চেষ্টার ফলে এক্ষণে সমিতি অনেকগুলি কৃষির অনিষ্টকারী কীট সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। কীটের জাতি, নাম ও তাহাদের প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য এইরূপ একটী কীটাগারের একান্ত আবশ্যক। এতদ্দেশে কীটতত্ত্ব এখনও শৈশব অবস্থায়। কৃষকের পাঠক ও গ্রাহক-বর্গ যদি কীটের নমুনার সহ তাহাদের আক্রমণ ও জীবন বৃত্তান্ত প্রেরণ করেন তাহা হইলে সাধারণের অশেষ উপকার সাধিত হইবে। আমরা এইরূপ প্রেরিত কীট সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া প্রতীকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

সর্ব্বশেষে যাঁহারা গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া 'কৃষকে'র সাহায্য করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট কৃষকের প্রতিষ্ঠাতাগণ চিরকৃতজ্ঞ। অপরাপর বৎসরের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারিক বিজ্ঞানবিৎ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের সহকারী ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত ডি, এন, মুখার্জ্জী ও এন, এন, ব্যানার্জ্জী, পরিদর্শক শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী, যামিনীকুমার বিশ্বাস, রাজনারায়ণ বিশ্বাস, রাজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী দে ও সৈয়দ নুরুল হোসেন প্রভৃতি লেখকবর্গের প্রবন্ধাদি দ্বারা "কৃষকে"র সম্যক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। আমরা আশাকরি "কৃষক" ইহাঁদের অনুগ্রহ হইতে কখন বঞ্চিত হইবে না। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টও কৃষকের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া থাকেন। 'কৃষক' উত্তরোত্তর অধিক কার্য্যকরী হইয়া রাজা ও প্রজা উভয়েরই মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

কদলী-সূত্র।*

কদলীবৃক্ষের খোলায় ও পত্রে যে সূত্র আছে—ইহা ভারতবর্ষের অতি প্রাচীনকালের, লোকেরাও অবগত ছিলেন এবং অদ্যাপিও সেই সূত্র সমষ্টির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এমন কি পল্লী

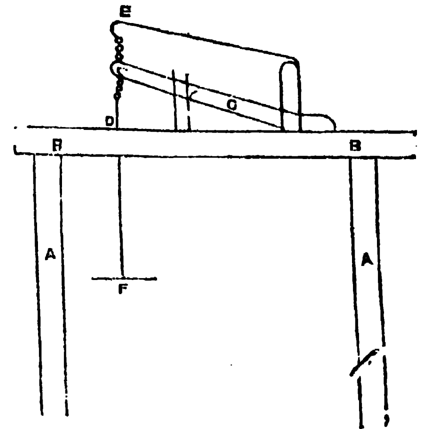
* কলিকাতা শ্রমশিল্প সভার অধিবেশনে পঠিত পুস্তিকা অবলম্বনে লিখিত।

গ্রামে এখনও মুদীরা সাধারণ দ্রব্যাদি "কলার ছোটায়" বাঁধিয়া খরিদ্দারকে দিয়া থাকে। ক্রিমীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন ইংলণ্ডে রুসিয়ার সূত্র আমদানি বন্ধ হয়, তখন ইংলণ্ড যে সকল সূত্রপ্রদ বৃক্ষাদির অনুসন্ধান করিয়াছিল তন্মধ্যে কদলীসূত্রের ন্যামোল্লেখ নাই বটে, কিন্তু তাহাতে বুঝিতে হইবে হয় তৎকালের লোকে কদলীসূত্রের উপযোগীতার কথা জানিত না কিম্বা কদলীসূত্র নিষ্কাষণ প্রণালী অবগত না থাকায় ঐ সূত্র উৎপাদন সম্বন্ধে উদাসীন ছিল।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সাধারণ একটি কদলীবৃক্ষ হইতে প্রায় ৵৫০ তিন পোয়া বা ১॥০ পাউণ্ড সূত্র পাওয়া যায়। এই সূত্র অতি সুন্দর, সুদীর্ঘ ও ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। যদি ১ জন বালকের সাহায্য পাওয়া যায়, যে কলার খোলা গুলিকে সিকি ইঞ্চি পরিমিত বিস্তার রাখিয়া চিরিয়া দিতে পারে এবং খোলা হইতে নিষ্কাসিত সূত্র রৌদ্রে রীতিমত শুখাইতে দেয় তাহা হইলে বোধ হয় ১ জন পরিশ্রমী ব্যক্তি প্রত্যহ ৮ টা গাছ হইতে সূত্র নিষ্কাষণ করিতে সমর্থ হইতে পারে। এখন যদি ।০ চারি আনা করিয়া একটা মজুরের রোজ ধরা হয় এবং বালকের যদি ৵০ আনা রোজ হয়, তাহা হইলে প্রতিদিন ।৵০ ছয় আনা খরচ পড়ে প্রতিদিন ৴৬ ছয় হিসাবে সূত্র পাওয়া যাইতে পারিলে প্রতি সেরে বা প্রতি ২ দুই পাউণ্ডে ৴০ হিসাবে খরচ পড়িবে। সুতরাং এক টন সূতায় খরচ পড়িবে ৭০৲ টাকা। এখন এই সূতাকে পাইট করিয়া জাঁত দিতে, বাঁধিতে, ইন্‌সিওর আদি করিতে সর্ব্বসমেত যদি টন করা ৪০৲ টাকাও খরচ পড়ে তাহা হইলে সর্ব্বসমেত টনে পড়তা হয় ১১০৲ মাত্র। এই সূতা যদি বৈদেশিক বাজারে বিক্রয় করা যায় তাহা হইলে খুব কম টন করা ৪০০৲ টাকা লাভের সম্ভাবনা।

বাঙ্গালার জমীতে বিঘাপ্রতি ৪০০৲ শত* কদলী বৃক্ষ জন্মিতে পারে অর্থাৎ প্রতি বিঘাতে ৭ হইতে ৭॥০ মণ সূত্রের উৎপাদন সম্ভব। এতদ্ভিন্ন থোড়, মোচা, পাতা ও কদলী বিক্রয় করিয়া যে লাভ তাহা আমরা যদি বিঘা করা ২৫৲ টাকাও ধার্য্য করি তাহা হইলে বোধ হয় তাহতে আমাদের ভুল হইবে না। তবেই প্রতি বিঘার খরচ খরচা বাদ ১০০৲ টাকা লাভ অনিবার্য্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভবিষ্যতে কদলী সূত্রের ব্যবসা একটা কতদুর লাভজনক ব্যবসা হইয়া উঠিবে।

কদলীসূত্রের নিষ্কাষণ উপযোগী একটি যন্ত্র সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে, উহার মধ্যে যে গুলি সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ তাহাদের মূল্য ১০৲ টাকা। যে



* ১৪৪০০ বর্গ ফিটে যাহায় এক বিঘা হয় তাহাতে ৪ হাত অন্তর কলা গাছ না বসাইলে আর ৪০০ শত গাছ ধরিবে না। এত ঘন গাছে তাহাতে কলা হওয়া দূরের কথা গাছই ভাল রকম জন্মিবে না এবং সেই বাগানে এক বৎসর পরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। অন্যান্য হিসাব ঠিক সঙ্গত ও যন্ত্রটী কাজের ঠিক উপযুক্ত বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কৃঃ সঃ।

সকল ব্যক্তি কদলীসূত্র ব্যবসায়ে উদ্যোগী হইবেন তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি যন্ত্র রাখিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। নিম্নে যন্ত্রের একটি প্রতিকৃতি দেওয়া গেল।

পত্রাদি।

গোলাপের কীট।

বিগত বৎসর পৌষ সংখ্যায় কৃষকে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু গোলাপ গাছের কীটের বিবরণ প্রদান করেন ও কয়েকটি নমুনা পাঠান। তৎপরে শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার সিংহ বর্ম্মা ও কয়েকটি গোলাপের পোকা পাঠান। উভয় পোকা ঠিক এক না হইলেও উহারা এক শ্রেণীর অন্তর্গত। কীটতত্ত্বে উক্ত শ্রেণীর নাম Coleoptera এবং বর্ত্তমান দুই জাতীয় পোকা যে বর্গের অন্তর্গত উহার নাম Melolonthini। কৃষ্ণ বর্ণের পোকার (জিতেন্দ্র বাবু প্রেরিত) নাম Apogonia Blanchardi এবং পাটল বর্ণের পোকার (বসন্তবাবু প্রেরিত) নাম Schizonycha fusceseins। এই জাতীয় পোকা নিশাচর এবং চৈত্র হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ইহাদের অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ইহারা দুই অবস্থায় গাছের অনিষ্টকরে (১) কীড়া অবস্থায় (২) পতঙ্গ অবস্থায়। অত্যন্ত গরমের সময় কীড়া মৃত্তিকার অতি নিম্নে প্রবেশ করে এবং বৃক্ষাদির সূক্ষ্ম শিকড় খাইয়া জীবন ধারণ করে। কোন কোন জাতীয় কোলিওপটেরার কীড়া ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্তও জীবিত থাকে। পক্ষান্তরে পতঙ্গ অধিক দিবস বাঁচে না এবং যে সময়ে প্রাদুর্ভাব হয় সেই সময়ে বিশেষ উপায় অবলম্বন করিলে অল্প সময় মধ্যেই অনেক পতঙ্গ বিনষ্ট করিতে পারা যায়।

এই জাতীয় পতঙ্গ নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় মৃত্তিকার গভীর কর্ষণ;—আক্রান্ত বৃক্ষের নিম্নস্থ ও নিকটস্থ সমস্ত জমিই উত্তমরূপ কর্ষণ আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন পার্শ্বে পতিত জমি রাখাও ঠিক নহে। সামান্য পরিমাণে ঝুল, (বিঘা প্রতি ১০।১৫ সের) চষিবার সময় মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দিলে আরও ভাল হয়। গাছে লেড্ আরসেনিয়েট প্রয়োগে পোকার মৃত্যু হয়। ৮ মণ ১০ সের জলে অর্দ্ধ সের লেড্ আরসেনিয়েট ১½ সের চুণ ও ৩ সের গুড় মিশ্রিত করিতে হইবে। এইরূপে যে কাই প্রস্তুত হইবে উহার ২½ তোলা একটি কেরোসিন টিন পূর্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া গাছে প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা বিষাক্ত, সুতরাং সাবধানের সহিত প্রয়োগ আবশ্যক। পোকা মারিবার অন্য উপায় আলোক। একটি সাধারণ কেরোসিন ল্যাম্প ঝুলাইয়া উহার নিম্নে একটি বড় পাত্রে জল ও গুড় কিম্বা জল ও কেরোসিন তৈল রাখিতে হইবে। আলোর দুই দিকে দুই খানি টিন বাঁকাইয়া রাখিয়া দিলে আলো উজ্জ্বলতর হইবে। পোকাগুলি আলো দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিম্নস্থিত পাত্রে পড়িয়া মারা যাইবে। শ্বেতবর্ণ আলোকে তেমন কার্য্য না হইলে সবুজবর্ণ আলোক দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণ প্রজাপতি ধরিবার জন্য যেরূপ কাপড়ের জাল ব্যবহৃত হয় সেইরূপ জাল দ্বারাও অনেক পোকা ধরিয়া নষ্ট করিতে পারা যায়। এই জাতীয় পোকার জীবন বৃত্তান্ত এখনও সম্পূর্ণরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই। সুতরাং এতদ্ সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত অধিক তথ্য সংগৃহীত হয় নাই। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত উপায় সমূহ অবলম্বন করিলে উপকার হওয়ার সম্ভাবনা।

কৃঃ সঃ।

কালীগঞ্জ।

শ্রীযুক্ত

কৃষক সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

খুলনা জেলার কালীগঞ্জ প্রদেশের সম্বাদ ক্রমেই শোচনীয় হইতে শোচনীয়তম অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে ধান্য পাঁচ সের পালির ছয় পালি বিক্রয় হইয়াছিল। অদ্য সেই ধান্য পৌনে চারি পালি ও চাউল সওয়া চারি টাকার পরিবর্ত্তে পাঁচ টাকা ছয় আনা পর্য্যন্ত মণ বিক্রয় হইতেছে। মটর দাইল পাঁচ টাকা, মুগ কলাই সওয়া পাঁচ টাকা, ঠিকরা কলাই পাঁচ টাকা, মাস কলাই ৪৸৴০ আনা, গোল আলু ৩।০ আনা, দোক্তা তামাক ১২॥০ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে। পটল ।০ আনা সের, পান চারিটা পয়সায়, খাদ্য শস্য মাত্রেই অগ্নি-মূল্য। বহু গরিব দুঃখীর দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্ন জুটিতেছে না। এই দুর্দ্দিনে আবার এরূপ জল কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে যে অন্যান্য বৎসর যে জলাশয়ে এসময়ে ছয় সাত হাত পরিমিত জল সঞ্চিত থাকিত বর্ত্তমান বর্ষে সেই সকল পুষ্করিণীতে দুই আড়াই হাত মাত্র জল আছে কি না সন্দেহ, তদুপরি যে জল অদ্যাপি মজুত আছে তাহাই কি স্বচ্ছ ও পরিষ্কৃত? তাহাও নহে, জলাশয় মাত্রেই পঙ্কিল ও কীট বহুল অপরিষ্কৃত জলে পূর্ণ, আবার বহু জনপদ এরূপ জল শূন্য হইয়াছে যে রন্ধন ও তৈজস পত্র ধৌত করিবার উপযোগী কলস পরিমিত জলও দুই তিন গ্রাম অন্বেষণ করিয়াও মিলিবার উপায় নাই। যে অসূর্য্যম্পশ্য কুলললনা কখনও গৃহ প্রাঙ্গনের বাহিরে গমন করেন নাই জলাভাবে বিপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকেও কক্ষে কলসী লইয়া দুই তিন মাইল দূরে পানীয় আহরণার্থে গমন করিতে হইতেছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল ভারাবনত চারা বৃক্ষ সমূহ ফল ফুল সুহ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। আম্রের যে সকল গুটীকা হইয়াছিল উহা শুষ্ক ও বৃন্তচ্যুত হইয়া প্রায় বৃক্ষ শূন্য হইয়াছে। কাঁঠাল, নারিকেল ও সুপারির অপুষ্ট ফল সমূহও শুকাইয়া ঝরিয়া যাইতেছে। পটল, উচ্ছে, বেগুন মধ্যে একটু মূল্য সুলভ হইয়াছিল, এক্ষণে পুনরায় মহার্ঘ হইয়াছে। পটলের সের চারি আনা, উচ্ছে ৴১০ দেড় আনা, বেগুন ছোট ছোট দুইটি এক পয়সা বিক্রয় হইতেছে। ক্ষেত্রে উচ্ছে, পটল, কাঁকুড় ও তরমুজের গাছ সমুদয় ম্লান ও শুষ্ক প্রায় ফলহীন হইয়া রহিয়াছে।

সন্ধ্যার পরে প্রতি দিবসেই প্রায় মেঘ দেখা যায় কিন্তু বৃষ্টির সহিত সম্বন্ধ নাই। মাঠ তৃণ শূন্য, গাভীর দুগ্ধ ক্রমেই হ্রাস হইতেছে এবং মূল্য ও বর্দ্ধিত হইতেছে। বহু পুষ্করিণীর মৎস্য জলাভাবে মরিয়া যাইতেছে। যাঁহারা দেশ কালজ্ঞ তাঁহারা পূর্ব্বেই মৎস্য বিক্রয় করিয়া পুষ্করিণী শূন্য করিয়া ফেলিতেছেন নদীর মৎস্য আদৌ আমদানী নাই বলিলেই হয়।

বৃষ্টির অভাবে কৃষক অদ্যাপি ক্ষেত্র কর্ষণ-কার্য্য আরম্ভে সক্ষম হয় নাই। সকলে হাল (লাঙ্গল) পুণ্যাহ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে ঘনঘটার আড়ম্বর দেখিয়া উৎফুল্ল ও আশ্বস্থ হইতেছে, কিন্তু শেষে সকল আশায় নিরাশ হইয়া পর দিবস বর্দ্ধিত বিক্রমে রৌদ্র তেজে ওষ্ঠাগত প্রাণ ও নিতান্ত বিমর্ষ ভাবাপন্ন হইতেছে। গত বৎসরাপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে বোধ হয় পাটের চাষ অর্দ্ধেকেরও ন্যূন হইবে। গত সন যে অপর্য্যাপ্ত ভূমিতে পাটের চাষ করিয়াছিল অদ্যাপি সে তাহার ফল ভোগ করিতেছে। এখনও কৃষক ও মহাজনের ঘরে বিস্তর পাট মজুত রহিয়াছে, একেই মূল্য হ্রাস তদুপরি ক্রেতার একেবারেই অভাব সুতরাং কৃষককে মাথায় হাত দিয়া রোদন করিতে হইতেছে।

কাঁঠাল, গোলাপজাম, কালজাম, লিচু প্রভৃতি ফল একেই ভাল জন্মে নাই তাহার উপর যাহা কিছু জন্মিয়াছিল তাহা বৃষ্টির অভাবে সুপুষ্ট হইতে পারে নাই। জামরুল, লেবু প্রভৃতির ফুল ফল ধরিবার এই শেষ সময় কিন্তু অদ্যাপি একটী বৃক্ষও পল্পীত হয় নাই, ফল এক কথায় জলাভাবে সমূলে ধ্বংশের পূর্ব্ব লক্ষণ বোধ হইতেছে।

গভর্ণমেণ্ট বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে কতকগুলি পুষ্করিণী অথবা কূপ খনন করিয়া দেওয়ার জন্য আমরা বহুবার সরকার বাহাদুরের মনযোগ আকৃষ্ট করার জন্য বিস্তর যত্ন করিয়াছি ও করিতেছি, কিন্তু কেমনই দুর্ভাগ্য যে সে দিকে কর্ত্তৃপক্ষের আদৌ দৃষ্টি নিপতিত হয় না। অতপর অন্ন মুষ্টির ন্যায় জলবিন্দু অভাবেও ঘোরতর লোকক্ষয় উপস্থিত না হইলে বোধ হয় তৃষ্ণায় জলকণা মাত্র দানেও গভর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইবেন না। আর সে দিনও বোধ হয় খুব নিকটবর্ত্তী। বর্ত্তমান বর্ষেই যে কি ঘটে তাহা অদূর ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। বোধ হয় আর দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে প্রবল বর্ষণ না হইলে এদেশে জলাভাবে হাহাকার রব উত্থিত হইবে। নিরীহ নিরক্ষর কৃষকগণও অবগত নহে যে সরকার বাহাদুরের নিকট অপর কিছু না হইলেও তৃষ্ণার জলটুকু পাইবার অধিকার প্রজার আছে সুতরাং তাহারা নির্ব্বাক। কষ্ট লাঞ্ছনা তাহাদিগের ভাগ্যেই ষোল আনা। ভদ্রলোকের বসতি গ্রামে কোন প্রকারে না কোন প্রকারে অন্ততঃ পানীয় জলের একটু সংস্থান আছেই আছে, তা সে জল দূষিতই হউক আর নির্দ্দোষই হউক কিন্তু দরিদ্র মূক কৃষক পল্লীতে পাঁচ সাত খানি গ্রাম ও তিন চারি অথবা পাঁচ মাইলের মধ্যে অন্বেষণ করিয়াও একটি পুষ্করিণী বা কূপ দর্শন পাইবার উপায় নাই। অধিক কি বিগত ফাল্গুন, চৈত্র মাসে সদর মহকুমার সাতক্ষীরাতেই উৎকৃষ্ট পানীয় জলাভাবে মহামারীতে সর্ব্বনাশ সাধন ও বহু লোকের অকালে প্রাণবায়ু আকাশে লীন হইয়াছে। অদ্যাপি জলাভাবে ডেপুটী বাবু, মুনসেফ বাবু চতুষ্টয় এবং আমলা, উকিল মোক্তারবর্গ শুষ্ক তালু, কষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। সাতক্ষীরার দীর্ঘিকায় একটি জলের কল বসাইয়াছিলেন কিন্তু সে কল এক্ষণে বেকল। আমরাও বিকল হইয়াছি, কারণ যে ডেপুটী বাবুর অনুগ্রহে আমরা জলাশয় খননের প্রত্যাশা করি সেই ডেপুটী বাবুই স্বগণে বিন্দুমাত্র বিশুদ্ধ জলের আশায় ব্যাকুল সুতরাং নিজেই যখন অকূলে ভাসমান তখন আমাদিগের আর কূল দিবেন কিরূপে স্বয়ং সিদ্ধ না হইলে অপরকে সিদ্ধ করা যায় না।

ইক্ষুর চাষ একেবারেই বন্ধ, আশু ধান্যেরও সেই দশা। বৃষ্টির অভাবে কৃষিকার্য্য একেবারেই বন্ধ।

আমন ধান্যের পাতার চাতর ফাল্গুন মাস হইতেই মাসে মাসে দুই এক চাষ দিয়া ঘাস মারিয়া রাখে কিন্তু এবৎসর মৃত্তিকা নিরস প্রস্তর কাঠিন্য হওয়ায় কৃষক পাতার চাতর অদ্যাপি ভাঙ্গিতে পারে নাই, পক্ষান্তরে ভূমি ও তৃণ শূন্য।

বিলের জমি পূর্ব্ববৎ লবণ জল প্লাবিত প্রলয় পয়োধির ন্যায় তরতর করিতেছে। কি রাজা কি জমিদার সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই সুতরাং ১৩১৬ সালের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত প্রজার অন্ন কষ্ট সমভাবেই রহিবে ইহা সুনিশ্চিত, পঞ্জিকায় বর্ষ ফল গণনা নিষ্প্রয়োজন? গভর্ণমেণ্ট কৃষকগণের ভূমির উর্ব্বরতা সাধন জন্য খুলনা জেলায় যে পঞ্চ বিংশতি সহস্র মুদ্রা ঋণ দান মঞ্জুর করিয়াছিলেন, ঐ ঘটনটা জন প্রবাদে পরিণত হইল মাত্র। ঋণ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় যে দুই চারি খানি

দরখাস্ত প্রেরিত হইয়াছিল তাহার প্রত্যুত্তর পর্য্যন্ত প্রদান করাও হইল না। আমরা পুনরায় বলিতেছি যে যাবৎ গভর্ণমেণ্ট কালীগঞ্জ, আশাশুনি, পাইকগাছা, বুধহাটা, শ্যামনগর ও দেবহাটা প্রভৃতি থানার নদীতীরস্থ ভূমি ও ধান্য ক্ষেত্রের বাঁধ প্রস্তত করিয়া না দিবেন অথবা ঐ জন্য অর্থ সাহায্য না করিবেন তাবৎকাল এদেশের প্রজার অন্ন কষ্ট কোন মতে অপসারিত হইবে না।

জমিদারগণ আপনা সামলাইতে ব্যস্ত, ব্যয় হ্রাসের মানসে সহরবাসী সুতরাং এক দিকে যেমন সুন্দরবন আবাদ হইয়া ভূমি কৃষিকার্য্যের উপযোগী হইতেছে অপরদিকে সেইরূপ হাঁশিল মহল পতিত হইয়া জঙ্গলে পরিণত হইতেছে। আরও এক সর্ব্বনাশকর প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে এই যে দেশের সমস্ত ভূম্যধিকারী পরিবারই বর্ত্তমান সময়ে এক একটি ষ্টেট্ বহু সরিকের বিবিধ অংশে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং দুই এক জনের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল থাকিলেও অন্যান্য সরিকের দৈন্যতা নিবন্ধন সমূলেই ধ্বংশ প্রাপ্ত হইতেছে। এক্ষণে যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক এক গভর্ণমেণ্টের ঋণ গ্রহণ ব্যতীত প্রজার অন্য উপায় নাই কিন্তু গভর্ণমেণ্ট দয়া প্রকাশ করিলেও মফঃস্বলের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে একবারে উদাসীন সুতরাং প্রজা যে তিমিরে সে তিমিরে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীগঞ্জ।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম।—এখানে স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে আরও বৃষ্টির আবশ্যক। ক্ষেত্রস্থিত শস্যের অবস্থা ভাল। রবিখন্দ আহরণ করা হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে জলাভাবে আশু ও আমন ফসলের বীজ বুনানি চলিতেছে না। আখমাড়া শেষ হইয়াছে। উত্তর আসামে কোথায় কোথায় কিঞ্চিৎ বাকী আছে। চা পাতা সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। দারুণ গ্রীষ্ম ও সুবৃষ্টির অভাবে পাতা ভালরূপ গজায় নাই। পাঁচটী জেলা হইতে পশুগণের রোগাক্রমণের কথা শুনা যাইতেছে। আপাততঃ অত্র প্রদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা না থাকিলেও খাদ্য শস্য অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য।

সেরিকালচার স্কুলের বিশেষ পুরস্কার লোপ।—আজ প্রায় ৮।১০ বৎসর হইল রাজসাহি জেলার রাজা, জমিদার এবং গণ্য মান্য ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে একটী রেশম বিদ্যালয় উক্ত জেলার সহরে স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত স্কুল চালাইবার ভার স্থানীয় জেলা বোর্ড গ্রহণ করেন। এই স্কুল হইতে শেষ পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিতেন তাঁহারা স্বর্ণ পদক বা রৌপ্য পদক লাভ করিতেন এবং অন্যান্য প্রশংসা পত্রাদিও লাভে বঞ্চিত হইতেন না। গত সন হইতে উক্ত স্কুল চালাইবার ভার ই, বি, এণ্ড আসাম গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক অত্র বৎসর অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করায় প্রথম বার রমণীকান্ত প্রামানিক সর্ব্ব প্রথম স্থান (শেষ পরীক্ষায়) অধিকার করেন এবং উক্ত রমণী বাবু হাপ ইয়ারলী পরীক্ষায় ও সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিশেষ রমণী বাবু সকল ছাত্র ভর্ত্তি হইবার অর্থাৎ সেসন আরম্ভের ৩ মাস পরে ভর্ত্তি হয়েন। অথচ ঐ সামান্য দিনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিয়মে রেশমতত্ত্ব শিক্ষান্তে সুযশের সহিত উত্তীর্ণ এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন, ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে রাজসাহী সেরিকালচার স্কুল হইতে যখন বরাবর উপযুক্ত উত্তীর্ণ ছাত্রকে মেডেলাদি প্রদত্ত হইত তখন গভর্ণমেণ্ট কি জন্য রমণী বাবুকে উক্ত অধিকারে বঞ্চিত করিবেন? ধরিতে গেলে জেলা বোর্ডের তুলনায় গভর্ণমেণ্ট হইতে উক্ত অধিকার আরও মূল্যবান হওয়া কি একান্ত প্রয়োজন নয়? মালদহ সমাচার।

বৰ্দ্ধমান জেলায় দুর্ভিক্ষ।—উক্ত স্থানে ২২ বর্গ মাইলের মধ্যে ৩১ খানি গ্রাম অবস্থিত। সেই গ্রাম সমূহে ৭০০০ লোকের বাস, ইহার মধ্যে ৩০০০ লোক আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চালাইতে পারে এরূপ অন্ন সংস্থান আছে এবং বক্রি ৪০০০ লোক একবারে অসহায়, অপরের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের আর অন্য উপায় নাই। উক্ত ৩১ খানি গ্রামের মধ্যে ৪টী পুষ্করিণীতে মাত্র জল আছে এবং তাহারও কোনটীতে ২। ২॥ হাতের অধিক জল নাই। কাহারও মুর্গী বা হাঁস জীবিত নাই, জলাভাবে সব মরিয়া গিয়াছে, গরুও মরিতে আরম্ভ হইয়াছে। বৰ্দ্ধমান সম্মিলনীর ব্যক্তিগণ পাছে জল দূষিত হয় এই ভয়ে পুষ্করিণী গুলিতে মাচা বাঁধিয়া জল সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

কৃষিক্ষেত্র।—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন গাছে ভাঁটি বাঁধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জী বাগ।—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদী ফসল হইতে ইতি মধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলদী ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুল কপি বীজ বপন করিয়া চারা তৈয়ার করিতে হইবে।

ফুল বাগিচা।—এই সময় জিনিয়া দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়া মূল এই সময় বসাইতে বলেন, আমরা কিন্তু বলি যে, আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূল গুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্ব কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমারান্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুলবীজ বপনেরও এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের ধাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কিন্তু ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন

জালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধা কপি ও ফুলকপি বীজ এখন বপন করা যায়।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

দেশের অবস্থা।—জলাভাবে ও অন্নাভাবে লোকের বিষম কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে আকাশে মেঘের আবির্ভাব হইলেও বৃষ্টিপাত হইতেছে না। লোকে পানীয় জলের জন্য আকাশ পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্তে এ জেলার নানা স্থানেই অনেক লোক মারা পড়িতেছে। বীরভূম।

সুবৃষ্টি।—বিগত ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার লাহোরে রীতিমত বারি বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। এ বারি বর্ষণ যেন সুধা বর্ষণে পরিণত হইয়াছে।

ভিরিঙ্গি।—দেখিতে অনেকটা মুগের মত, কিন্তু তদপেক্ষা কিছু লম্বা। ইহার চাষ কেবল গরুর খাদ্যের জন্যই করা হয়। নদীয়া জেলায় চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর এবং কুষ্টিয়া মহকুমার স্থানে স্থানে ঐ উদ্দেশ্যে অতি অল্প পরিমাণে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। ইহা আষাঢ়ের শেষে বা শ্রাবণের প্রারম্ভে বপন করিতে হয়। ইহা প্রায় অপকৃষ্ট জমিতেই বপিত হয়। আবাদ অতি সহজ, অল্প ব্যয়েই ইহা সম্পাদিত হয়। বপন করিবার পূর্ব্বে ২ বার চাষ দিয়া জমিটা উল্টাইয়া দিলেই চাষের কার্য্য শেষ হইল। জমির ঘাস ইত্যাদি পরিষ্কার করার দরকার হয় না। যখন গরুর খাদ্যের জন্যই ইহার প্রয়োজন, তখন যে জমিতে বেশী ঘাস জন্মে প্রায় সেই সকল জমিতেই চাষারা ইহা বপন করে। ভিরিঙ্গির বৃদ্ধির সহিত জমির ঘাসও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অল্প দিনেই ভিরিঙ্গ গাছ বেশী পরিমাণে লতাইয়া যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আশ্বিন মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণের প্রথম পর্য্যন্ত চাষারা এই ঘাস সংসৃষ্ট ভিরিঙ্গি গাছ চারা অবস্থাতেই তুলিয়া গরুকে খাওয়াইতে থাকে। বীজের জন্য অল্প পরিমাণ গাছ রাখিয়া দেয়। অগ্রহায়ণ মাসেই প্রায় বীজ পাকে। বীজের জন্য রাখিয়া যদি কিছু শস্য অবশিষ্ট থাকে তবে কখন কখন লোকে ইচ্ছা করিয়া ইহার দাইল খাইয়া থাকে। দাইল বেশ সুসিদ্ধ হয় এবং খাইতেও মন্দ লাগে না। মহিষ, গরু ইত্যাদি ভিরিঙ্গি ঘাস খাইতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। যে মহিষ বা গরু উহা একবার খাইয়াছে, সে আর উহা সহজে ভুলে না। এমন কি সুবিধা পাইলে অন্যান্য খাদ্য ছাড়িয়া বেড়া বা অর্গল ভাঙ্গিয়া ভিরিঙ্গির জমিতে গিয়া উপস্থিত হয়। ভিরিঙ্গি চাষে ব্যয় অতি সামান্য। এক বিঘা জমিতে /১ এক সের পরিমাণ বীজের দরকার হয়, এবং এক সের বীজের দাম আজকাল ।০ চারি আনা। ২।৩ খান লাঙ্গলের দাম এক টাকার বেশী নহে। ভিরিঙ্গি চাষে সর্ব্বশুদ্ধ ১৲ বা ১।০ পাঁচ সিকা খরচ হয়; কিন্তু ইহাতে যে খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহাতে ৩টা গরুর ১৷৷০ সের খাদ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়াইলে তাহার দুধের পরিমাণ প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি পায়। ভিরিঙ্গির পাতা দেখিতে প্রায় তরু লতা ফুলের পাতার ন্যায় তবে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়।

দোতালা—ত্রিপুরা।—গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে বটে, কিন্তু সকল পুষ্করিণীই অতি প্রাচীন. কেবল একটী মাত্র

পুষ্করিণীতে কিছু জল আছে তাহা দ্বারা গ্রামস্থ সকলেরও নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক সকলের জীবন রক্ষা করিতে হইতেছে। সুধু মানুষ নহে গরু বাছুরও এই জলই পান করে। যাহা কিছু জল আছে তাহা প্রাতে ৭টা পর্য্যন্তই পরিষ্কার থাকে তৎপরে ঘোলা ও কাদাময় হয়, অনন্য উপায় হইয়া অতিকষ্টে এই জলই পান করিতে হইতেছে। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট বা জমিদারের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। অথচ আকাশে মেঘ নাই দিবাতে প্রখর রৌদ্র রাত্রিতে বেশ শীত পড়ে। কৃষিকার্য্য একবারে বন্ধ। জনৈক সংবাদ দাতা।

দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্ট।—অন্ন কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের সর্ব্বত্র জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। অন্ন ও পানীয় অভাবে চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি পরিশ্রুত হইতেছে। এখনও বঙ্গের সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইতেছে না,—পল্লীগ্রামে জলাশয় বিশুষ্ক—শস্যের সম্ভাবনা নাই। চাউলের মূল্য ক্রমেই বাড়িতেছে। এ অবস্থায় হাহাকার পড়িবে ইহা বিচিত্র কি? গত ২০শে এপ্রেল তারিখে বড়লাট বাহাদুর ভারত-সচিবকে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে টেলিগ্রাম করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংপ্রতি সুবৃষ্টি হইয়াছে। এই বৃষ্টির ফল কিরূপ হইবে, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই, তবে সম্ভবতঃ ইহাতে উপকার হইবে। কৃষি কার্য্য আরব্ধ হওয়ায় যুক্তপ্রদেশের রিলিফ কার্য্যে লোকের সংখ্যা আরও এক লক্ষ কম হইয়াছে। সর্ব্বসমেত সমগ্র ভারতবর্ষে ১৩ লক্ষ ২৭ হাজার লোক সরকারী রিলিফের কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। লর্ড মিণ্টো যে আশা প্রকাশ করিয়াছেন. তাহা সফল হইলে আমরা সুখী হইব। কিন্তু আমরা যেরূপ ভাব দেখিতেছি, তাহাতে শীঘ্র অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে বলিয়া বোধ হয় না।

রেড়ীর খৈল।—সকলেই জানেন রেড়ীর দানা হইতে তৈল বাহির করিয়া লইয়া যে খৈল অবশিষ্ট থাকে তাহাতে বৃক্ষাদির ও ফসলের সারের কার্য্য করে। অন্যান্য ফসল অপেক্ষা আলু ও ইক্ষুতে ইহা অদ্বিতীয় গুণপ্রদ সার। কিন্তু রেড়ীর খৈল গবাদিকে খাওয়ান চলে না কারণ দেখা যায় দুইটী রেড়ীর দানাও গবাদি পশু হজম করিতে পারে না। খাওয়াইলে তাহাদের ভেদ হইতে আরম্ভ হয় অধিক মাত্রায় খাইলে তাহাদের প্রাণ সংহারক হইতে পারে। মিঃ মলিসন বলেন যে রেড়ীর খৈল সামান্য মাত্রায় খাইলে পশুগণের ভেদ হইতে আরম্ভ হয় অধিক মাত্রায় তাহাদের পাকস্থলীর নাড়ী ফুলিয়া যায় এবং বিষবৎ কার্য্য করে। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে রেড়ীর খৈলে রিসিন্ (Ricin) নামক বিষাক্ত পদার্থ বিদ্যমান থাকাতেই এই অনিষ্টপাত হয়। কিন্তু রেড়ীর খৈলের খণ্ড গুলি জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে উক্ত রিসিন্ নামক পদার্থের বিষ ক্রিয়ার প্রতিরোধ করা যায়। জলে সিদ্ধ অপেক্ষা এই খৈলের মধ্য দিয়া উষ্ণ বাষ্প খুব জোরে চালাইয়া দিলেই রিসিনের ক্রিয়া নষ্ট হয়। তখন ইহা উত্তম পশু খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। অন্য এক প্রকারেও রিসিনের বিষ গুণ নষ্ট হইতে পারে। লবণ জলে ডুবাইয়া লইলে আর রিসিনের বিষাক্ত গুণ থাকে না। উক্ত দুই প্রকারে শোধন করিয়া লইবার পর রেড়ীর খৈল নিঃসঙ্কোচে পশুগণকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু ইহাতে এমিডি ও এলবুমিনয়েড এত মাত্রায় বিদ্যমান আছে যে ইহার সহিত অন্য

খাদ্য মিশাইবার আবশ্যক হয়। নিম্নে মিঃ ডি হুপার কৃত রেড়ীর খৈল বিশ্লেষণের তালিকা দেওয়া গেল ঃ—

জল	...	...	৯·২
চর্ব্বি	...	...	২·৬
এলবুমিনয়েড	...	...	৭১·৭
কার্ব্বোহাইড্রেট	...	...	৫·০
আঁশ	...	...	৪·২
ছাঁই	...	...	৭·৩

ডিম চূর্ণ।—ডিম অধিক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে না। চুণের জলে ভিজাইয়া বা পাত্রে চুণ মাখাইয়া বা নির্ব্বাত স্থলে রাখিয়া দেখা হইয়াছে যে কিছু দিন বেশ ভাল থাকে বটে এবং শীত প্রধান দেশে কিছু অধিক কাল স্থায়ী হয় আবার গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীঘ্রই খারাপ হয়। সম্প্রতি জনৈক জার্ম্মান রসায়নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডিম শুষ্ক করিয়া গুঁড়াইয়া রাখিয়া দেখিয়াছেন যে তাহা বহুকাল বিকৃত হয় না। ডিমের খোলা ছাড়াইয়া তাহা সামান্য উত্তাপে (১৩০° ফারহিটে) উত্তপ্ত করিলে অল্প সময়ের মধ্যে আর্দ্র বাষ্প শূন্য শুষ্ক হইয়া পড়ে। তখন সেই ডিম গুলিকে গুঁড়াইয়া সাধারণ টিনের কৌটায় মুড়িয়া অনার্দ্র স্থানে রাখিয়া দিলে দীর্ঘকালেও খারাপ হইবে না। তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে একটা টাট্‌কা ডিম ভাঙ্গিয়া গুলিয়া এবং এই ডিম চূর্ণ গরম জলে গুলিয়া কোন পার্থক্য নাই। অষ্ট্রেলিয়ার ভিকটোরিয়া কৃষি বিভাগেও এই ডিম চূর্ণ লইয়া বহু পরীক্ষা হইয়াছে এবং তাহাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে এই রূপে রক্ষিত ডিম চূর্ণ কি স্বাদে কি গন্ধে সদ্যজাত ডিমেরই অনুরূপ এবং সেই প্রকার সহজ পাচ্য। ইহা একটী কম কথা নহে ইহাতে সর্ব্বত্র ডিম খাদ্য সর্ব্বদা সহজ প্রাপ্য হইবে এবং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ডিম প্রেরণের সুবিধাও বহুল।

বোরো ধান।—পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টার আগামী বোরো ফসল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বোরো ধানে সামান্য জল আবশ্যক হয়। বর্ত্তমান বৎসর ২৭৪,৭০০ একর পরিমিত জমিতে বোরো ধানের চাষ হইয়াছে। ইহা পূর্ব্ব বৎসরের আবাদী জমি অপেক্ষা ৬,৬০০ একর কম। এক মৈমনসিংহ জেলাতেই ৫০০০ একর হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। মৈমনসিংহে একর শতকরা ৯৯ ভাগ ফসল হইবার সম্ভাবনা। ডাইরেক্টার সাহেবের মত যে বাস্তবিক স্বাভাবিক উৎপাদনের মাত্রা হইতে বর্ত্তমান বৎসর কম হইবে না।

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

নবম খণ্ড,—দ্বিতীয় সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,

সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।



জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

মিলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্;
৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।



কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

কৃষক।

৯ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল। ২য় সংখ্যা।

গবাদির বিষ চিকিৎসা।

কাঠ-বিষ।

কাঠ বিষের অন্যান্য নাম।—মিঠা বিষ, শৃঙ্গি বিষ ও দরগা।

পরিচয় ও প্রকৃতি।—একোনাইট ফেরোক্স (Aconitum ferox) ও একোনাইট নেপেলাস (Aconitum napellus) নামক গাছের মূলকে কাঠ বিষ কহে। এই গাছ জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়; বাগানের শোভা বৰ্দ্ধন করে বলিয়া অনেকে এই গাছ বাগানে লাগাইয়া থাকে। ইহা দেখিতে নিসুন্দা গাছের মত; ইহার পাতাগুলি ঘোর সবুজ রং বিশিষ্ট ফুলগুলি নীলাভ; ইহার মূল হরিদ্রার ন্যায় দেখায় এবং কন্দ ভাঙ্গিলে ময়দার মত সাদা দেখায়। বেনিয়ার দোকানে এই গাছের মূল, কন্দ ইত্যাদি কিনিতে পাওয়া যায়।

বিষ লক্ষণ প্রকাশকারী মাত্রা।—২ তোলা।

কারণ তত্ত্ব।—সেকোঁ বিষের মত। গোরু সকল চরিবার সময়ে ঘাসের সহিত এই গাছ খাইয়া বিষাক্ত হয়। চামারেরা গাছের পাতা, মূল কিম্বা কন্দ খাওয়াইয়া গোরুদিগকে মারিয়া ফেলে।

লক্ষণ।—মুখ দিয়া ফেনা নিঃসৃত হয়; চোয়াল নাড়ে চাড়ে; বমন করিতে চেষ্টা করে; পেট ফাঁপা উপস্থিত হয় এবং কোন কোন পশুর উদরাময় হয়। কাঁধের ও পেটের মাংস পেশী সমূহ সঙ্কুচিত হয়; বহুল পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া থাকে; কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে; অক্ষিমণি ছোট দেখায়; ঝিল্লিবলী লাল দেখায়। সমস্ত শরীর অবশ হয়, অবশাঙ্গতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। গাত্রোত্তাপ ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত পায়; চলিতে অক্ষম হয় এবং মূৰ্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে মারা যায়। কোন কোন পশুর হিক্কা কাশি হয়।

চিকিৎসা।—দুগ্ধ, ডিম্ব, ঘি, নারিকেল, তিল কিম্বা তিসির তৈল; ভাতের কিম্বা মসিনার মাড়; ছাতুর গ্রুয়েল; ফেন ও দেশী মদ ইত্যাদি লঘু, মৃদু বিরেচক ও পুষ্টিকর দ্রব্য রোগীকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াইবে।

নিম্নলিখিত ১নং ঔষধ ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দিবসে ২।৩ বার করিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিবে। রোগী অত্যন্ত নিস্তেজী হইয়া আসিলে কিম্বা অবশাঙ্গতা বৃদ্ধি পাইলে ৵০ পোয়া ধেনো মদ সম পরিমাণ জল কিম্বা ফেনের সহিত মিশাইয়া দিবসে ৫।৬ বার রোগীকে প্রতিবারে খাওয়াইবে। দিবসে ৩।৪ বার পীড়িত পশুকে উত্তমরূপে মাৰ্জ্জন ও মৰ্দ্দন করিয়া দিবে; তার্পিন ও সর্ষের তেলের প্রত্যেকটীর সমান সমান ভাগ একত্রে মিশাইয়া অবশ স্থানে ঘসিয়া লাগাইবে।

১ নং কর্পূর	...	...	৸০ আনা
ধেনো মদ	...	...	৶০ পোয়া
এমন কার্ব্বনাস (Ammonii carbonas)	...	...	৩ ড্রাম অর্থাৎ ১ তোলা
কিম্বা			
লাইকার এমোনিয়া (Liquor ammonia)	...	...	৩ ড্রাম অর্থাৎ ১ তোলা
ভাত, ছাতু কিম্বা তিসির মাড়	...		/১¼সের

একবারের ঔষধ। ধেনো মদে কর্পূর প্রথমে দ্রব করিয়া নিবে।

৴১০ কাঁচ্চা কাল লবণ ও এক ছটাক কাঠ কয়লা খাওয়াইলে পেট ফুলা কমিয়া যাইবে, কিন্তু অধিক পরিমাণে পেট ফুলিয়া গেলে নিম্নলিখিত ঔষধের যে কোনটী শীঘ্র শীঘ্র খাওয়াইয়া দিবে।

২ নং লবণ	...	।৵০ দেড় পোয়া
শুঁঠ চূর্ণ	...	৴২০ দুই কাঁচ্চা
চিটা গুড়	...	/।০ এক পোয়া
গরম জল	...	/১ এক সের।

এক বারের ঔষধ। গরম অবস্থায় খাওয়াইবে।

৩ নং তিসির তেল	...	।৵০ দেড় পোয়া
মিঠা তেল	...	।৵০ দেড় পোয়া
গোলমরিচ চূর্ণ	...	৴৫ এক কাঁচ্চা
চিটা গুড়	...	¼ সিকি কাঁচ্চা

একবারের ঔষধ।

রসকর্পূর।

পরিচয় ও প্রকৃতি।—স্ফটিকাকারে কিম্বা গুড়াবস্থায় রসকর্পূর (Corrossive sublimate) বাজারে বেনিয়ার দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধাবস্থায় ইহা বিক্রয় হয় না। রসকর্পূর দেখিতে সাদা ও ওজনে অত্যন্ত ভারী হয়। দুষ্ট লোকেরা সেঁকো বিষের ন্যায় রসকর্পূর গোরুদিগকে খাওয়ায়। ভুলক্রমে কেলোমেলের (Calomel, Hydrargyrum Sub-chloridum) পরিবর্ত্তে রসকর্পূর খাওয়াইয়া অনেক গোরু বিষ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। দৈবক্রমে খাদ্যের সহিত রসকর্পূর খাইয়া অনেক গোরু বিষাক্ত হয়।

বিষ লক্ষণ প্রকাশকারী ঔষধের মাত্রা।—½ অৰ্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত।

লক্ষণ।—এই বিষ ২ ড্রাম অর্থাৎ প্রায় ৸০ আনা পরিমাণ গোরুর উদরস্থ হইলে তরুণ গ্যাষ্ট্রো এণ্টারাইটিসের (Gastro-enterites) লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় যথা:—বমনেচ্ছা, শূলবেদনা, উদরাময়, প্রথমে পিত্তময় মল, পরে রক্ত মিশ্রিত ও দুর্গন্ধযুক্ত মল, সংজ্ঞাহীনতা ও ভয়ানক কাশি।

অল্প মাত্রায় রসকর্পূর উদরস্থ হইলে ১ সপ্তাহ মধ্যে বিষ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। রোমন্থনকারী পশ্বাদি সচরাচর যে সকল লক্ষণ প্রকাশ করে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। মুখ দিয়া ফেনা সমেত স্বচ্ছ, চট্‌চটে ও দুর্গন্ধযুক্ত লালা নিঃসৃত হয়। মুখের কোণ, জিহ্বা, মাড়ি ইত্যাদি লাল দেখায়, মুখে ক্ষত হয়, দাঁতগুলি আল্‌গা হয়। অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে, প্রায়ই আহার করিতে পারে না, জাওর কাটে না। নাক দিয়া রক্তস্রাব বাহির হয় ও মাংস পেশী সমূহের আক্ষেপ হয়। কখন কখন গলকম্বলে ও পাগুলিতে স্ফীতি দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী অবশাঙ্গ হয় ও কাশে। দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ ক্ষরণ হ্রাস পায়। চর্ম্মে ইরাপশন অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা উঠে এবং কোন কোন গুটিকাতে পূয় জন্মে। ১৫ দিনের মধ্যে রোগী প্রায় মরিয়া যায়।

ভাবি ফল।—সন্তোষজনক নহে। তরুণ রোগে

২।৩ দিন মধ্যে রোগী মরিয়া যায়। পীড়া অধিক দিন স্থায়ী হইলে রোগী বাঁচিতে পারে।

চিকিৎসা।—ডিম্ব, তিল তিসি অথবা নারিকেল তৈল; ঘি, দুগ্ধ, ছাতু, ভাত, গোধূম, এরারুট কিম্বা ময়দার গ্রুয়েল; ফেন, তিসির মাড় ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রোগীকে খাওয়াইবে। এরারুটের গ্রুয়েলের সহিত ৮।১০টী ডিম্ব প্রত্যহ রোগীকে খাওয়াইবে। ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া প্রতিবারে নিম্নলিখিত ঔষধ রোগীকে খাওয়াইবে।

১। ম্যাগ সাল্‌ফ্ (Magnesium Sulph)	...	৵০ ছটাক
শুঁঠ চূর্ণ (Pulv Zingiberis)		৲০ কাঁচ্চা
কুসুম কুসুম গরম জল	...	/২২ সের

এক দিনের ঔষধ।

১ আউন্স অর্থাৎ ½ ছটাক পটাস ক্লোরাস (Potassi Chloras), অভাবে ২½ তোলা, সোহাগা ১¼ সের জলে দ্রব করিয়া ঘন ঘন মুখ প্রক্ষালন করাইলে লালা নিঃসরণ বন্ধ হইয়া যাইবে ও মুখের ক্ষত সারিয়া যাইবে।

রসকর্পূরের বাহ্যিক প্রয়োগে বিষাক্ত হইয়া থাকিলে, রোগীর সমস্ত শরীরটী বেশ করিয়া ধোয়াইয়া দিবে। শরীর অবশাঙ্গ হইলে তার্পিন ও সর্ষের তেলের মালিশ লাগাইবে। চর্ম্মে ইরাপশন উঠিলে নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া গরম জল দিয়া শরীর ধোয়াইবে। রোগী নিস্তেজ হইলে বারম্বার দেশী মদ খাওয়াইবে। রোগের উপসর্গানুসারে অন্যান্য চিকিৎসা করিবে।

ধুতুরা বা ধাতুরা।

পরিচয় ও প্রকৃতি।—এই গাছ সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ধুতুরা গাছ দুই জাতীয়—এক প্রকার গাছের ফুল শ্বেতবর্ণ ও অপর জাতীয় গাছের ফুল বেগুনে রং বিশিষ্ট হয়। এই গাছের ফলকে "কাঁটা অতো" কহে। গাছগুলি ১২।২ হাত লম্বা হয়। ফুল, বিচি ও পাতা খাওয়াইয়া দুষ্ট লোকেরা গোরুদিগকে মারিয়া ফেলে। ২।৩ আউন্স অর্থাৎ /০ কি /১০ ছটাক ধুতুরা বিচি কিম্বা ৵১০ কি ৶০ ছটাক পাতা খাইলে গোরুগুলি বিষ লক্ষণ সকল প্রকাশ করে।

খোরাসানি আজোয়ান (গাছ)
খোরাসানি যমানি বা বাজরুল (বিচী)

এই গাছ বাগানে ও জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়; গাছগুলি ১২ বা কিম্বা ২ হাত লম্বা হয়। লম্বা আকৃতিতে পাতাগুলি পেঁপে গাছের পাতার মত। ফুলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাণ্ডের উপর গাছের একদিকে হয়, কন্দে শুয়া আছে, বিচীগুলি ছোট ছোট, গোল ও ঈষৎ ধূসর রং বিশিষ্ট হয়। বাজরুল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। ৵০ ছটাক কি ৶০ ছটাক বাজরুল কিম্বা খোরসানি আজোয়ান খাইয়া গোরু সকল বিষাক্ত হয়।

ঔষধ প্রয়োগ প্রণালী।—দৈবক্রমে কিম্বা ঘাসের অনাটন হইলে, খোরাসানি আজোয়ানের পাতা, বাজরুল ও ধুতুরা গাছ খাইয়া গোরু সকল রোগ-গ্রস্ত হয়। ঔষধরূপে অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলেও বিষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। সচরাচর চামারেরা এই

সকল গাছ গাছড়া ও বিচী খাওয়াইয়া গোরুদিগকে মারিয়া ফেলে।

খোরাসানি আজোয়ান ও ধুতুরার লক্ষণ।—খোরাসানি আজোয়ান ও ধুতুরার লক্ষণ প্রায় একরূপ; সে কারণ ইহাদের লক্ষণ সমূহ ও চিকিৎসা একত্রে নিয়ে বিবৃত হইল।

প্রথমাবস্থায় গোরু ভয়ানক উত্তেজিত হয়, গাঁ গাঁ শব্দ করে, অক্ষিমণি বড় দেখায়। পরে পেটের অসুখ হয়, পশ্চাদঙ্গ অসাড় হয়, শুইয়া থাকে, উঠিতে পারে না, গাত্রোত্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস পায়, রোগী নিস্তেজ হয়। অবশেষে সংজ্ঞাহীন হইয়া মরিয়া যায়।

চিকিৎসা।—রোগীর শরীর উত্তমরূপে মার্জ্জন ও মর্দ্দন করিয়া দিবে; অবশ স্থানে তার্পিন ও সর্ষের তেলের প্রত্যেকটীর সমান সমান ভাগ একত্রে মিশাইয়া ঘসিয়া লাগাইবে। রোগীকে লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইবে। উত্তেজিত অবস্থায় মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিবে। যত শীঘ্র পারা যায় প্রথমে /২॥ সের গরম জলে /০ এক ছটাক চার ক্বাথ বা পাঁচন তৈয়ারি করিয়া, রোগীকে খাওয়াইবে ও ঘণ্টাখানেক পরে /১ সের তিলের, মসিনার অথবা নারিকেলের তৈল রোগীকে খাওয়াইবে। পেটের অসুখ থাকিলে ১ তোলা ট্যানিক এসিড্ (Acidum tanicum), ১ এক আউন্স খদির (Pulv Catechu) অথবা ১ আউন্স পলাশ গঁদ /॥৴০ পোয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে খাওয়াইবে ও এই সময়ে ভাতের মাড় খাওয়াইবে। নিস্তেজ হওয়া মাত্র রোগীকে একবারে ৫ এক কাঁচ্চা লাইকর এমোনিয়া (Liquor ammonia), ১০ দুই কাঁচ্চা স্পিরিট এমোন এরোমেটিকস (Spt ammon aromaticus) কিম্বা ½ অর্দ্ধ কাঁচ্চা এমোন কার্ব্বনাস (Ammonia carbonas) পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ভাতের কিম্বা তিসির মাড়ের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে। উপরে লিখিত কোন একটি উত্তেজক ঔষধের পরিবর্ত্তে ½ অর্দ্ধ তোলা কর্পূর ও ৵০ পোয়া দেশী মদ একত্রে মিশাইয়া জলের সহিত একবারে খাওয়াইবে। উত্তেজক ঔষধ বারম্বার খাওয়াইতে হইবে।

কুচিলা।

পরিচয় ও প্রকৃতি।—ইহার ইংরাজী নাম Strychnos Nux-vomical ইহা দেখিতে ছোট কমলা লেবুর মত। এই ফলের ব্যাস ১½ হইতে ২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। শাঁসের ভিতর ১ হইতে ৮ টি পর্য্যন্ত গোলাকার বীজ থাকে। বীজগুলি ঈষৎ ধূসর ও শ্বেত রং বিশিষ্ট। দুষ্ট লোকেরা গোরুদিগকে কুচিলা খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলে। ঔষধ রূপে অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে বিষ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

বিষ লক্ষণ প্রকাশক মাত্রা।—অর্দ্ধ ছটাক হইতে /০ এক ছটাক পর্য্যন্ত।

লক্ষণ।—রোগী অস্থির হয়; একদিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে। সমস্ত শরীরের আক্ষেপ হয় ও থাকিয়া থাকিয়া মাংস পেশী সমূহের আক্ষেপ হয়। উভয় আক্ষেপের মধ্যবর্ত্তী কালে রোগী অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে; চোয়াল আটকাইয়া যায়; শিরদাড়া খাড়া করিয়া দাঁড়ায়; কখন কখন মাটীতে পড়িয়া যায়। অতিকষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে। চক্ষু দুটী বড় ও স্বচ্ছ দেখায়। ধনুষ্টঙ্কারের মত সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোনরূপ উত্তেজনাতে আক্ষেপ বৃদ্ধি পায়। ঘন ঘন আক্ষেপ হয়—দুই আক্ষেপের মধ্যবর্ত্তী কালে রোগী কিছু ভাল থাকে। অবশেষে দম আটকাইয়া ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে রোগী প্রাণত্যাগ করে।

চিকিৎসা।—রোগীকে অন্ধকার গৃহে রাখিবে। কোনরূপে উত্তেজিত করিবে না। লঘু ও পুষ্টিকর

খাদ্য খাইতে দিবে। খাইতে না পারিলে পিচকারী দিয়া গুহ্য দ্বারের ভিতর দিয়া তিসির মাড়, কিম্বা ফেন ও ছাতুর গ্রুয়েল প্রবেশ করাইয়া দিবে; ১ তোলা অথবা /০ এক ছটাক ক্লোরেল হাইড্রাস (chloral hydras) ১½ সের ছাতুর গ্রুয়েলে কিম্বা জলে মিশাইয়া খাওয়াইবে। উপরোক্ত ঔষধের অভাবে ২ বোতল দেশী মদ কিম্বা /০ এক ছটাক তামাক দ্বারা ৷৷৵০ পোয়া জলে ক্বাথ তৈয়ার করিয়া রোগীকে খাওয়াইবে। আফিংএর অভাবে ১ তোলা ভাং খাওয়াইতে পারিবে। রোগী খাইতে না পারিলে পিচকারী দিয়া গুহ্যদ্বারের ভিতর দিয়া ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিবে।

কুঁচ।

প্রকৃতি ও পরিচয়।—কুঁচ বা কুঞ্চ সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার ইংরাজী নাম (Indian jequirity) ইহার বৈজ্ঞানিক নাম (Abus Precatorius)। এবাস গাছ অনেক প্রকার; ইহার ৫।৬ রংএর বিচী হয়। লাল বিচীগুলি আমাদের দেশে স্বর্ণকারেরা ওজনে ব্যবহার করে এবং ইহাদিগকে রতি কহে। প্রত্যেক রতি ওজনে প্রায় ২ গ্রেণ। লাল বীজের উপর একটী কাল দাগ থাকায় বীজটীর সৌন্দর্য্য অত্যন্ত বাড়িয়াছে। কুঁচের মূল দেখিতে যষ্টি মধুর ন্যায়।

এই গাছের পাতা, মূল ও বীজ বিষাক্ত। সচরাচর চামারেরা কুঁচ ব্যবহার করিয়া গোরুদিগকে মারিয়া ফেলে। কুঁচ খাইয়া গোরুগুলি প্রায়ই বিষাক্ত হয় না, সে কারণ চামারেরা নিম্নলিখিত উপায়ে কুঁচ ব্যবহার করে। প্রথমে কুঁচের বিচীগুলি গুঁড়া করিয়া জলের সহিত মিশায়; পাকাইয়া পাকাইয়া লোহার সুঁইএর ন্যায় করে, সুঁইএর অগ্রভাগটী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ করে। পরে কাঠের হাতলে সুঁইটী দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ করিয়া রাখে; সুযোগ মত চর্ম্মের মধ্যে সুঁই প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং সুঁইএর অগ্রভাগ চর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া বিষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। কুঁচ গাছের মূলও চামারেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। ভুলক্রমে ঔষধরূপে যষ্টি মধুর পরিবর্ত্তে কুঁচের মূল অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বিষ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন কুঁচের মূল গোরুকে খাওয়াইলে গোরু বিষাক্ত হয় না।

কুঁচের লক্ষণ গুলি "তড়কা" রোগের লক্ষণ সমূহের ন্যায়। চর্ম্মে একটী কঠিন সীমাবদ্ধ স্ফীতি দেখিতে পাওয়া যাইবে; স্ফীতিটী গোলাকার ও উহাতে অত্যন্ত বেদনা হয়। কতক সময় পরে স্ফীত স্থানটী শীতল হয়, উহাতে বেদনা থাকে না এবং উহা পচিতে আরম্ভ করে। অত্যন্ত প্রবল জ্বর হয়; সময়ে সময়ে মাংস পেশী সমূহ কাঁপিতে থাকে। পেট ফুলিয়া যায় ও রোগী কোঁৎ পাড়িতে থাকে। রক্ত মিশ্রিত মল নির্গত হয় এবং গাঢ় প্রস্রাব হয়। শ্বাসকৃচ্ছ হয়। রোগী টলমল্ করিয়া চলে এবং অবশেষে নিস্তেজ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। আমাদের দেশে "তড়কা" রোগের অন্য নাম পশ্চিমা।

চিকিৎসা।—চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। রোগের লক্ষণানুসারে চিকিৎসা করিলে ও লক্ষণ সমূহ মৃদুভাব ধারণ করিলে রোগী বাঁচিতে

পারে। স্ফীত স্থানটী কাটিয়া দিবে; দিবসে ২।৩ বার নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া গরম জল দিয়া ধৌত করিবে এবং কার্ব্বলিক তৈল (এসিড্ কার্ব্বলিক ১ ভাগ ও সরিষার তৈল ১২ ভাগ) লাগাইবে। ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দিবসে ২ বার করিয়া প্রতি বারে ১½ তোলা সোরাও ১½ তোলা নিশাদল জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে। একবারে ৵০ পোয়া করিয়া দেশী মদ বারম্বার রোগীকে খাওয়াইবে। দিবসে একবার ৲১০ দুই কাঁচ্চা ফিনাইল ১½ সের জলে মিশাইয়া কিম্বা ৲১০ কাঁচ্চা তার্পিন তৈল ৸০ পোয়া মসিনার তৈলে মিশাইয়া রোগীকে খাওয়াইবে। লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য রোগীকে খাওয়াইবে। ক্রমশঃ।—শ্রীকুঞ্জবিহারি দে, চুঁচুড়া।

সার ও জীবাণু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অন্ধকার ও সিক্ত গৃহ মধ্যে যে সকল আবর্জ্জনা রক্ষিত হয় তাহা বিগলিত হইতে বহু কাল বিলম্ব ঘটে, কারণ সেই স্তূপে শীঘ্র উত্তাপ জন্মে না, এবং যে উত্তাপ জন্মে তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প। উপরন্ত সে উত্তাপও গৃহের শৈত্যতা নিবন্ধন বর্দ্ধিত হইতে পায় না বরং ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। উত্তাপ না হইলে জীবাণু জন্মিতে পারে না। ফল-পাকুড়, মৎস্য প্রভৃতি শীঘ্র গলনীয় সামগ্রীকে অনেক দূর দেশে প্রেরণ করিতে হইলে পাত্র মধ্যে বরফ দিতে হয়, এইরূপে বরফের মধ্যে সংরক্ষিত করিয়া প্রেরণ করিতে পারিলে সামগ্রীর মধ্যে উত্তাপ জন্মিতে পারে না, ফলতঃ জীবাণুও জন্মিতে পারে না। উত্তাপের সঙ্গে জীবাণুর আবির্ভাব হয় এবং শীতে তাহাদিগের মৃত্যু হয়। গ্রীষ্মকালে বায়ুমণ্ডলে জীবাণুর প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া সে সময়ে নানা রোগের বিশেষতঃ বিসূচীকা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হয় কিন্তু সে সময়ে প্রবল বারিপাত বা শীতের সমাগম হইলে রোগের অল্পাধিক উপশম হয় তাহার কারণ বৃষ্টি বা শীত হেতু জীবাণুগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বিশ্লেষণের পক্ষে সিক্ততা ভাল নহে, কিন্তু সরসতা একান্ত আবশ্যক, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বায়ু, রস ও উত্তাপের সমাবেশ না হইলে কোন দ্রব্য বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না। তবে এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইতে হইবে যে, শিক্ততা ও সরসতা একই অর্থ ব্যঞ্জক নহে। 'সুরস' শব্দ দ্বারা ঈষৎ ভিজা এবং 'সিক্ত' দ্বারা অত্যধিক ভিজা বুঝিতে হইবে। যাহা হউক, বায়ু সঞ্চালিত স্থানে জঞ্জাল রক্ষিত হইলে স্থানীয় আর্দ্রতা অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ উত্তাপও বৃদ্ধি পায়।

স্তূপ বায়ুর সংস্পর্শে থাকিলে এবং তন্মধ্যে বায়ুর প্রবেশ পথ থাকিলে এরোব (Aerobe) জাতীয় জীবাণু অধিক পরিমাণে স্তূপময় ব্যপ্ত হইয়া পড়ে। অধিক বায়ু স্তূপ মধ্যে প্রবেশ করিলে বায়ু সহনাক্ষম আনেরোব (Anaerobe) জীবাণু মরিয়া যাইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা অনেকের হইতে পারে বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, উহাদিগের ক্রিয়া-বশে স্তূপ মধ্যে ক্রমে অঙ্গারাম্লজ-বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং সেই বাষ্প হেতু অম্লজান (Oxygen) * তন্মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় না, অধিকন্তু অম্লজান তথা হইতে বিতাড়িত হয়। এজন্য স্তূপ মধ্যে বায়ু প্রবেশের যৎসামান্য পথ থাকিলেও কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু স্তূপ অধিক আল্‌গা থাকিলে প্রথমতঃ তাহাতে ভালরূপ উত্তাপ জন্মে না, দ্বিতীয়তঃ যাহা জন্মে তাহাও

বহির্গত হইয়া যায়; সেই সঙ্গে অঙ্গারাম্ল বাষ্প ও উড়িয়া যায়। এরূপ স্থলে অম্লজান প্রবেশের পথ ও সুগম হয়। এই কারণ বশতঃ স্তূপ মধ্যে উত্তাপাদির সমবস্থান রাখিতে হয়। উত্তাপের পরিমাণ ভেদে সারের গুণবত্তার ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। একই স্তূপের সার বিভিন্ন প্রকারের হইলে, উহার ব্যবহারকারীকে বিষম সমস্যায়, অপরন্তু ভ্রমে পড়িতে হয়। উত্তাপাদির সমতা রক্ষার জন্য স্তূপকে অল্পাধিক চাপিয়া দৃঢ় করিয়া দিতে হয়, অধিক উত্তাপ সঞ্চিত হইলে স্তূপকে অল্পাধিক ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, স্তূপে জল সিঞ্চনের ও আবশ্যক হয়।

আবর্জ্জনা অলগ্নভাবে রাশিকৃত হইয়া থাকিলে কিম্বা রসাভাবে বিদারিত হইলে, তাহাতে অধিক উত্তাপ জন্মে না এবং উত্তাপ ধারণ করিয়া রাখিবারও তাহার শক্তি থাকে না। কুড় মধ্যে অম্লজান যাহাতে অবাধে প্রবেশ করিবার পথ না পায়, এজন্য উহা কথঞ্চিত দৃঢ় হওয়া উচিত। কুড় ফাঁপা থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে, উহার মধ্যে শূন্য স্থান আছে—তন্মধ্যে বাতাসও আছে। চাপ দিয়া তৈয়ার করিলে, উহার মধ্যে শূন্য স্থানের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়; অগত্যা বাতাসের থাকিবার অধিক কি, প্রবেশ করিবার স্থান ও কমিয়া যায়। বিবেচনা সহকারে কুড় নির্ম্মাণ করিতে পারিলে সকল উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। কুড় মধ্যে সর্ব্বত্র সমপরিমাণে রসাদি যাহাতে অবস্থান করিতে পারে, রস যাহাতে শীঘ্র না শুকাইয়া যাইতে পারে—এই সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই উত্তম ও সমবস্থাপন্ন সার উৎপন্ন করিতে পারা যায়। উত্তাপের গতিকে স্থিতিশীলাবস্থায় রাখিবার জন্য কুড় মধ্যে রসের সমতা রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সার-কুড় অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে, তাহাতে জল-সিঞ্চন করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নীরস সারে যত অধিক পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, রসাল সারে তত পারে না, কারণ রসের স্থিতি হেতু তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশের পথ সকল অতিশয় সঙ্কীর্ণ থাকে এবং তাহার অধিকাংশই প্রায় রসে পূর্ণ থাকে।

সকল প্রকার আবর্জ্জনাই যে একই সময় মধ্যে বিশ্লিষ্ট হয়, তাহা নহে। সারের প্রকৃতি ভেদে উহা বিশ্লিষ্ট হইতে অল্প বা অধিক সময় অতিবাহিত হয়। উদ্ভিজ্জ্য পদার্থ, প্রাণীজ মল-মূত্র কিম্বা মৎস্য মাংস যত শীঘ্র বিশ্লিষ্ট হয়, মাছের কাঁটা, শম্বুকের আবরণ, পশু পক্ষ্যাদির ক্ষুর, নখ অস্থি প্রভৃতি তত শীঘ্র বিগলিত হয় না। কিন্তু ইহার মধ্যেও একটী গূঢ়তত্ত্ব আছে। যে জিনিষের মধ্যে যত অধিক পরিমাণে সোরাজানিক পদার্থ (Nitrogenous matter) থাকে, সে জিনিষ তত শীঘ্র বিগলিত হয়। ক্ষুর, নখ, অস্থি বা কাঁটাতে সোরাজানিক পদার্থের ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া উহাদিগকে বিগলিত হইতে কাল বিলম্ব ঘটে, এই জন্য উহাদিগের শীঘ্র বিগলিত করিয়া লইতে হইলে উহাদিগের সহিত উদ্ভিজ্জাদি সহজ গলনীয় সামগ্রী সংযোজিত করিয়া দিতে হয়। উদ্ভিজ্জাদি পদার্থ স্বভাবতই নরম, তাহা ব্যতীত উহাদিগের মধ্যে সোরাজানিক পদার্থের অংশ সমধিক পরি-

ভাগে অবস্থিত। এতদুভয় কারণ বশতঃ ইহারা শীঘ্রই পচিয়া যায়। এই সকল সহজ গলনীয় সোরাজানিক আবর্জ্জনা হইতে সোরাজানকে অপসারিত করিয়া দিলে বিশ্লিষ্ট হইতে তাহাদিগের বহু বিলম্ব ঘটে। সোরাজান হীন পদার্থের বিশ্লেষণকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্লেষণ না করিয়া বিচূর্ণণ বলাই উচিত। পূর্ণ সামগ্রী পচিয়া যে পরমাণুতে পরিণত হয়, তাহাই বিশ্লেষণ (Decomposition) ক্রিয়ার ফল। প্রস্তর বা খনিজ পদার্থ পচে না—রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির ও বায়ুর ক্রিয়া বশে ক্রমে ক্রমে উহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ইহাকে বিচূর্ণণ ক্রিয়া (Disintegration) বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না।—শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।

বাঁশ (বংশ)।

মালদহ জেলা বিস্তর বাঁশ জন্মিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের কিছু না কিছু বাঁশ বাগান আছে। বাঁশ অনেক জাতীয় হয়, তন্মধ্যে এ জেলায় মাকলা, জাবা, বড় বাঁশ, ভালুকা ও বেউড় এই কয়েক জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। মাকলা বাঁশে গৃহে নির্ম্মাণোপযোগী সমস্ত সাজ সরঞ্জামাদিই হয়, তদ্ভিন্ন ইহাতে কুলো, চুবড়ী, ধুচুনী, ঝুড়ি, ফুলের সাজী, চালুনী, চেটাই ইত্যাদি বহুবিধ গৃহ কার্য্যের সামগ্রী ও প্রস্তুত হয়। অপর কয়েক শ্রেণীতে কেবল ঘরের খুঁটী মাত্র করে, তবে স্থান বিশেষে একরূপ জাবা আছে তাহাতে গৃহ নির্ম্মাণের বাখারি প্রভৃতিও হয়। ঐ বাঁশকে কেহ কেহ বাঁশিণীও কহিয়া থাকে। বড় বাঁশ ও ভালুকা খুব মোটা ও বড় শক্ত, একবার ঘরের খুঁটী দিলে ৩।৪ বৎসরাধিক যায়। ভালুকা বাঁশ ভিতরে ফাঁপা ও ইহার পর্ব্ব গুলি এক হস্তের ও বেশী লম্বা। ইহাতে গাভী দোহনের কেঁড়েও প্রস্তুত করে। বেউড় বাঁশে বিস্তর কাঁটা হয়। বাঁশের পাতা, শিকড়, কাষ্ঠ, কঞ্চি সমস্তই জ্বালানী কাষ্ঠের কার্য্য করে। এতদঞ্চলের ডোম ও হাড়ি জাতীয়েরা বাঁশ দ্বারা উল্লিখিত জিনিস গুলি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে ও উহাই তাহাদের একমাত্র জীবনোপায়।

বাঁশ পল্লীগ্রামে গৃহস্থের একটী আবশ্যকীয় বস্তু। কি গৃহ নির্ম্মাণ, কি গার্হস্থ্য দ্রব্য প্রস্তুতকরণ, কি রন্ধন, কি লিখন প্রভৃতি নানা কার্য্যে বাঁশের প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাওয়া যায়। চীন দেশে বাঁশ দ্বারা যোদ্ধার ঢাল ও শিরস্ত্রাণ, নৌকা, মানদণ্ড, পাদুকা, ছত্র, সম্মার্জ্জনী, নৌকার পাইল, বর্ষাকালীন দেহাবরণ, ভেলা, পুষ্পাধার, আসন, বাক্স, কাগজ ইত্যাদি প্রস্তুত করে।

বাঁশ তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। কোনও উদ্ভিদবেত্তা পণ্ডিতের মতে তৃণের পূর্ণ বিকাশ মাত্র। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে একগাছি দুর্ব্বা ও একটী বাঁশের গঠন ও বর্দ্ধন প্রণালী একই প্রকার।

অগ্নি পুরাণ, অমরকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে বাঁশের অনেক গুলি নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা ;—

"বংশে ত্বক সারঃ কর্ম্মার ত্বচি স্তৃণ ধ্বজঃ।
শত পর্ব্বা যব ফলো বেণু, মস্কর তেজনাল॥
বেণব কীচকাণ্ডে স্যূর্যে স্বনন্ত্য নিলোদ্ধতাঃ।
গ্রন্থিনা পর্ব্ব পরুধী গুন্দ্র স্তেজনকঃ শরঃ॥"

ত্বক সার, কর্ম্মার, ত্বচি সার, তৃণ বীজ, শত পর্ব্বা, যব ফল, বেণু, মস্কর ও তেজন। বাঁশের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ করিলে শব্দ হয় তাহাকে কীচক বলে। বিভিন্ন শাস্ত্রে বাঁশের অনেক নাম আছে, যেমন মহাবল, ধনুদ্রুম, ধান্যুষ্য, দৃঢ় গ্রন্থি ইত্যাদি।

আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রেও বাঁশের কতিপয় গুণ বর্ণিত হইয়াছে যথা ;—

"বংশঃ সরোহিমঃ স্বাদুঃ কষায়ো বস্তি শোধনঃ।
ছেদনঃ কফপিত্তঘ্নঃ কুষ্ঠাস্র ব্রণ শোথ জিৎ॥
তৎকরীরঃ কটু পাকে রসে রুক্ষো গুরুঃ সরঃ।
কষায়ঃ কফ কৃৎস্বাদু বিদাহী বাত পিত্তলঃ॥
তদ্ য বাস্ত সরা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বাত পিত্ত করা উষ্ণা বদ্ধ মূত্রাঃ কফ পহাঃ॥"

বাঁশ সারক, হিমবীর্য্য, স্বাদু, কষায় রস, বস্তি শোধক ও ছেদন, ইহা কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, রক্ত দোষ, ব্রণ ও শোথ নষ্ট করে। ইহার অঙ্কুর কটু, কষায় মধুর রস বিশিষ্ট, পাকে কটু, রুক্ষ, গুরু পাক, সারক, বিদাহী, কফ, বায়ু পিত্তকে বর্দ্ধিত করে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, মূত্ররোধক ও কফনাশক, বাঁশ হইতে যে বংশলোচন জন্মে তাহা একটী লাভজনক পণ্য দ্রব্য ও অনেক ভৈষজ্যে ব্যবহৃত হয়।

দোঁয়াশ ও বালুকাময় মৃত্তিকাতে বাঁশ ভালরূপ জন্মে। বর্ষার প্রারম্ভে বাঁশের "কোঁড়া" বাহির হয়, এই সময় বাঁশ রোপণ করিতে হয়। পুরাতন পুষ্করিণীর পাঁক বাঁশের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। বাঁশ বাগান মধ্যে মধ্যে উপড়াইয়া দিলে ইহার বৃদ্ধি হয়। খনার বচনে আছে, "চৈতে আগুণ বৈশাখে মাটী, বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতামহ কাটি।"

রীতিমত বাঁশ বাগান প্রস্তত করিতে পারিলে বেশ লাভবান হইতে পারা যায়। এক এক ঝাড়ে দেড় শতাধিকেরও বেশী বাঁশ হইতে পারে। বর্ষার সময় যখন বাঁশের কোঁড়া বাহির হয়, তখন গবাদি পশুতে খাইয়া বা ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাঁশের কচি কোঁড়া অনেকে থোড়ের ন্যায় তরকারীতে খাইয়া থাকে। ইহার বিশেষ কোন পাইট করিতে হয় না। যদি বাটীর নিকট বাঁশ বাগান করিতে হয়, তবে বাটীর পূর্ব্বাংশে রোপণ বিধেয়। খনা বলিয়াছেন, "পূর্ব্বে বাঁশ, পশ্চিমে হাঁস, উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা" অর্থাৎ বাটীর পূর্ব্বাংশে বাঁশ বাগান, পশ্চিমে পুষ্করিণী, উত্তরে কলা বাগান ও দক্ষিণদিক একেবারেই খোলা থাকিবে। বাঁশ যদি কিছু দিন জলে পচাইয়া গৃহ কর্ম্মাদিতে লাগান যায়, তবে খুব শক্ত ও তাহাতে পোকা ধরে না। খনার বচনে আছে, "বাঁশ যদি পেকে পড়ে জলে, কি করতে পারে তালে আর শালে।" বাঁশ একবার লাগাইলে বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, এমন কি যত্ন-পূর্ব্বক পালন করিলে ২।৩ পুরুষ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। বাঁশের ব্যবসাও বিশেষ লাভজনক, ১০৲।১২৲ পর্য্যন্ত শতকরা বিক্রয় হয়।—শ্রীগুরু চরণ রক্ষিত।

গোময় সারের অপব্যবহার।

বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সর্ব্বত্র গোময় জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত হয় ও বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রেসিডেন্সি বিভাগ, উড়িষ্যা ও বিহারে ইহার ব্যবহার অত্যন্ত অধিক। গোময়ের কত অংশ জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত হয়, তৎসম্বন্ধে আমি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে অনুসন্ধান করিয়াছি। আমার অনুসন্ধানের ফল নিম্নে বিবৃত করিতেছি। গোবরের কত অংশ জ্বালানীরূপে বিনষ্ট হয় তাহার একটী তালিকা নিম্নস্থলে প্রদত্ত হইল :—

স্থানের নাম।	শতকরা কত ভাগ জ্বালানী-রূপে ব্যবহৃত।	শতকরা কত ভাগ সাররূপে ব্যবহৃত।
পাটনা বিভাগ ...	৭৫	২৫
ভাগলপুর ,, ...	৭৫	২৫
ছোট নাগপুর ,, ...	২৫	৭৫
উড়িষ্যা ,, ...	৬৫	৩৫
বৰ্দ্ধমান ,, ...	৪০	৬০
প্রেসিডেন্সি ,, ...	৭৫	২৫

সত্য বটে বিহার প্রদেশে পাঁচ মাস—চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন হইতে কার্ত্তিক—বলদদিগকে রাত্রি কালে ক্ষেত্রে বন্ধন করা হয়। এইরূপে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়। তাহা তথাকার প্রত্যেক কৃষকই অবগত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে ক্ষেত্র স্বামীর পরিবারবর্গ অথবা প্রতিবাসী স্ত্রীলোকগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সমস্ত গোবর সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায় এবং জ্বালাইবার জন্য ইহা দ্বারা গৈঁঠা (ঘুঁটে) প্রস্তুত করে। সুতরাং ঐ ক্ষেত্রে গোমূত্র ব্যতীত অন্য সার থাকে না। বর্ষার তিন মাস যখন গোবর দ্বারা গৈঁঠা প্রস্তুত হয় না তখনই সমস্ত গোবর সাররূপে ব্যবহৃত হয়। ছোট নাগপুরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জ্বালানী কাঠ পাওয়া যায়, কেবল তথায়ই অধিকাংশ গোবর জমির সার হইয়া থাকে। ছোট নাগপুর ও বিহারে শীতকালে প্রত্যেক ব্যক্তি রাত্রে খাটিয়ার নিম্নে প্রজ্বলিত "বসি" (মালসা) রাখে। বসিতে ঘুঁটে ও কিঞ্চিৎ তুষ থাকে। তথাকার অধিকাংশ লোক দরিদ্র। তাহাদের উপযুক্ত শীত বস্ত্র নাই; কাজেই তাহারা এইরূপে অগ্নি জ্বালিয়া শীত কাটায়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই শীত ঋতুর কয়েক মাস ব্যতীত মশকের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হয়। এই কালে গবাদি জন্তুদিগকে মশক হইতে রক্ষা করা অতিশয় কঠিন। গরিব কৃষক নিজের পুত্র কন্যার জন্যই মশারি প্রস্তুত করিতে পারে না, আর গাই বাছুরের জন্য কিরূপে মশারি সংগ্রহ করে। সুতরাং তাহারা সায়ংকালে গোয়ালে অগ্নি জ্বালিয়া যথাসম্ভব গরুদিগকে মশক হইতে রক্ষা করে। ঘুঁটের আগুন হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধূম নির্গত হয়; এই জন্য কৃষকগণ গোয়ালে ঘুঁটেই জ্বালাইয়া থাকে। কিন্তু রন্ধনের নিমিত্ত ঘুঁটে জ্বালান বড়ই গর্হিত।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ঘুঁটে জ্বালাইয়া ইহার ভস্ম জমিতে প্রদান করিলে গোময় সারের কিছুই নষ্ট হয় না। কিন্তু এই উক্তি সত্য নহে। অঙ্গারক পদার্থে নাইট্রোজেনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান উপাদান। কোন পদার্থ দগ্ধ করিলে ইহার নাইট্রোজেন বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে বিলীন হইয়া যায়।

গোবর অতি উত্তম সার, তাহা সর্ব্বজনবিদিত; তথাপি কেন ইহা এত অধিক পরিমাণে জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়? আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে জ্বালানীর মধ্যে ঘুঁটে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ; সুতরাং ঘুঁটে জ্বালানীরূপে অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইবে ইহার আশ্চর্য্য কি? মাঠের কিম্বা রাস্তার গোবর কেহ কখনও ক্রয় করে না, তাহা যাহার ইচ্ছা সে সংগ্রহ করিতে পারে। পল্লিগ্রামে কদাচিত গোবর বিক্রয় হইয়া থাকে, গোয়াল হইতে প্রতিবাসীগণ প্রায়ই গোবর লইয়া যায়, তাহাতে গৃহস্থের আপত্তি নাই। কাঠ কিম্বা পাথুরে কয়লা তো কেহ এইরূপে সংগ্রহ করিতে পারে না। সহরেও ঘুটের মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। সহরেই সাধারণতঃ ঘুঁটে বিক্রয় হয়,

নিম্নস্থ তালিকায় কতিপয় সহরের ঘুঁটে ও অন্যান্য জ্বালানীর মূল্য প্রদত্ত হইল ঃ—

সহরের নাম।	ঘুঁটের মূল্য মণ প্রতি	কাঠের মূল্য মণ প্রতি	কোক কয়লার মূল্য মণ প্রতি	কাচা পাথুরে কয়লার মূল্য মণ প্রতি
	কত হইতে কত পর্য্যন্ত	কত হইতে কত পর্য্যন্ত	কত হইতে কত পর্য্যন্ত	কত হইতে কত পর্য্যন্ত
বাঁকিপুর ...	৶০—।০	... ।৶০	... ॥০	... ।৶০
ভাগলপুর ...	৵০—।০	... ।৵০	... ॥০	... ।৵০
গিরিডি ...	... ।০	... ।০	৶১০—।০	... ৵১০
পুরুলিয়া ...	॥০—॥৵০	... ।/০	।/০—।/১০	৵০—।/০
কটক ...	৵০—৵১০	... ।/০	... ...	... ॥০
বর্দ্ধমান ...	... ।০	।/০—॥০	।৵০—॥০	... ।৵০
কলিকাতা ...	।৵০—॥০	॥৵০—॥৶০	॥৵০—॥৶০	... ।৵০
কৃষ্ণনগর ...	৶০—।০	।৵০—।৶০	... ॥/০	... ।৶০

উপরিস্থিত তালিকায় ইহা দৃষ্ট হইবে যে গিরিডি ও পুরুলিয়া ব্যতীত সর্ব্বত্র ঘুঁটে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। গিরিডিতে বহু কয়লার খনি আছে, সুতরাং তথায় কয়লা খুব সুলভ এবং পুরুলিয়ার কৃষকগণ গোবর সারের গুণে এমন মুগ্ধ যে তাহারা গোবর সার ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে ব্যবহার করে না।

ছোট নাগপুরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পল্লিগ্রামে কাঠ কদাপি বিক্রয় হয় না। হাজারিবাগ সহরে টাকায় ১৬/০ মণ হইতে ২০/০ কাঠ বিক্রয় হয়। সুতরাং ছোট নাগপুরে তিনের চার ভাগ গোবর সার রূপে ব্যবহার হয়। অন্যান্য প্রদেশে পল্লিগ্রামে প্রতি মণ কাঠের মূল্য অন্ততঃ চারি আনা। সেরূপস্থলে ঘুঁটের মূল্য প্রতি মণ দুই আনার অধিক নহে।

কোক কয়লা এখনও সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। বঙ্গদেশের বড় বড় সহরে এখন ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। বিহারেও কোন কোন সহরে কোক জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। উড়িষ্যার কুত্রাপি ইহার ব্যবহার নাই। কাঁচা পাথুরে কয়লা বঙ্গদেশের কোথায়ও ব্যবহৃত হয় না। কাঁচা কয়লা জ্বালান সুকঠিন, এবং ইহা হইতে এমন ধূম নির্গত হয় যে কোন গৃহস্থই ইহাকে জ্বালানীরূপে ব্যবহার করিবে না। বিলাতে রন্ধন শালায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত উনানে কাঁচা কয়লা দ্বারা রন্ধন হয়। এই উনানের মূল্য খুব অধিক সুতরাং তাহা এদেশে প্রচলিত হইবে না।

আমি কয়েক প্রকার জ্বালানী দ্বারা রন্ধনের পরীক্ষা করিয়াছি। কোন জ্বালানীতে কত সময়ে কত খরচে রন্ধন হইতে পারে তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল ঃ—

খাদ্য দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ।	ঘুঁটে			কাঠ।			কোক কয়লা।			কাঁচা পাথুরে কয়লা।		
	সময়	পরিমাণ	খরচ	সময়	পরিমাণ	খরচ	সময়	পরিমাণ	খরচ	সময়	পরিমাণ	খরচ
	ঘ-মি	সের-ছ	আ-পা	ঘ-মি	সের-ছ	আ-পা	ঘ-মি	সের-ছ	আ-পা	ঘ-মি	সের-ছ	আ-পা
১ নং পরীক্ষা :—												
চাউল /২ সের ...	৩-০	৬-০	০-৬	২-১০	২-৮	০-৯	৩-০	১-১২	০-৬	...	...	...
দাইল (অরহর) /।০ ...												
মৎস্য /।০ ...												
তরকারী /।০ ...												
২ নং পরীক্ষা :—												
সরু চাউল /৸০ ...	০-৪০	৪-৮	০-৪½	০-৩০	৪-০	০-৭½	০-৩০	১-৮	০-৪½	...	...	...
মোটা চাউল /৸০ ...	০-৪০			০-৩০			০-৩০					
তরকারী ...	০-৩০			০-২০			০-৩০					
৩ নং পরীক্ষা :—												
চাউল /১ ...	০-৪২	৪-৮	০-৪½	০-৩৫	৪-০	০-৭½	০-৩১	১-৮	০-৪½	...	...	...
দাইল (বুট) /।০ ...	১-১০			১-০			০-৫৫					
৪ নং পরীক্ষা :—												
চাউল /১ ...	০-৫২	৩-০	০-৪	০-৪১	২-১২	০-৫	০-৩০	১-০	০-৩	০-৩৮	১-৮	০-৩
দাইল (বুট) /।০ ...	১-৩০			১-৩০			১-০			১-০		

উল্লিখিত পরীক্ষার ফল দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে এক সের কোক কয়লা দেড় সের কাঁচা কয়লা বা আড়াই সের কাঠ বা ৴৩ সের ঘুঁটের সমান কার্য্যকরী। খরচের হিসাব ধরিলে ঘুঁটে, কোক্ ও কাঁচা কয়লা মোটামুটী একরূপ। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে পল্লিগ্রামে ঘুঁটের কোন মূল্য নাই। কয়লা জ্বালিবার নিমিত্ত ঘুঁটের মূল্য অধিক হইলেও লোকে ঘুঁটে খরিদ করিবে। এইরূপ অবস্থায় যত দিন না প্রজাগণ গোময় সারের গুণ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবে, ততদিন ঘুঁটে জ্বালানর প্রথা রহিত করা সম্ভব পর হইবে না।

বর্দ্ধমান কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে পাটের পক্ষে গোময় সার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সম পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও গোবর অন্যান্য সার অপেক্ষা অধিক পাট উৎপন্ন করিয়াছে। নিম্নস্থিত তালিকা দ্রষ্টব্য ঃ—

বর্দ্ধমানে পাটের পরীক্ষা।

সার।	এক একর জমী, সার হইতে কত নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হইয়াছিল	এক একর জমীর উৎপন্ন পাট, পাউণ্ডের ওজন।		
		১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬
গোবর	৩০ পাউণ্ড	১,৯৮৫	১,৮০৫	১,৮৮০
রেড়ির খৈল	৩০ ,,	১,৬৩৫	১,৫৭০	১,৮৬০
হাড় চূর্ণ	৩০ ,,	১,০৮৫	১,৫৪০	১,৫৬০
হাড় চূর্ণ ও	১৫ ,,	১,৬০৫	১,৫৯০	১,৬০০
সোরা	১৫ ,,			
বিনা সারে	...	১,২৩০	১,৫৪৫	১,৫৬০

৭৫৴০ মণ গোবর অথবা ৭৷৷০ মণ রেড়ির খৈল হইতে ৩০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি ৭৷৷০ মণ রেড়ির খৈল অপেক্ষা ৭৫৴০ গোবরে অধিক ফলন হয়, তবে ঐ ৭৷৷০ খৈলের মূল্য অপেক্ষা ৭৫৴০ মণ গোবরের অধিক মূল্য হওয়া উচিত। ৭৷৷০ মণ রেড়ির খৈলের মূল্য ১৮৸০। সুতরাং ৭৫৴০ গোবরের মূল্য ১৮৸০ টাকার অধিক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ৭৫৴০ মণ গোবরের মূল্য এখন ৩৸০ টাকার অধিক নয় (১০৴০ মণের এক গাড়ী গোবরের মূল্য ৷৷০)! হাড় ও সোরার মূল্য পাটের ফলনের সহিত তুলনা করিলে, গোবরের মূল্য ৭৷৷০ মণ রেড়ির খৈলের মূল্য অপেক্ষা আরো অধিক হওয়া উচিত। ধান্যের ফলনের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ৬৴০ মণ রেড়ির খৈল অপেক্ষা ৫০৴০ গোবর বর্দ্ধমান কৃষি-ক্ষেত্রে অধিক ধান্য উৎপন্ন করিয়াছে। ইহাতেও ৫০৴০ মণ গোবরের মূল্য অন্ততঃ ১৫৲ টাকা হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে আমরা যদি গোবর খৈল প্রভৃতি সারের প্রতি পাউণ্ড নাইট্রোজেনের মূল্য ।৶০ আনা ধরি, তবুও এক মণ গোবরের মূল্য ৶৫ হইবে; কারণ

গোবরে শতকরা ½ নাইট্রোজেন থাকে। তিন মণ গোবরে এক মণ ঘুঁটে হয়, সুতরাং সারের হিসাবে এক মণ ঘুঁটের মূল্য।৴১৫। নাইট্রোজেন ব্যতীত গোবরে ফস্ফরিক এসিড্ ও পটাস্ নামক মূল্যবান পদার্থ আছে। এই সকল বিচার করিলে সারের জন্য এক মণ ঘুঁটে ॥০ আনায় খরিদ করা যায়। ঘুঁটেতে অনেক সময়ে মাটী মিশ্রিত থাকে; তাহা হইলে অবশ্যই ইহার মূল্য কমিয়া যাইবে। ডাক্তার ভোল্‌কার্ শুষ্ক ঘুঁটে পরীক্ষা করিয়া শতকরা ১·৪৮ নাইট্রোজেন ও ১৮·৬২ বালি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমি ডাক্তার লেদার্ সাহেবকে ভাগলপুর হইতে যে ঘুঁটে পাঠাইয়াছিলাম তাহাতে শতকরা মাত্র ১·০৬ নাইট্রোজেন কিন্তু ৩৪·০৩ বালি ছিল। এইরূপ ঘুঁটের মূল্য মাত্র ।৴০ বা ।৴১০ আনা হইতে পারে। মোটের উপর সারের হিসাবে ঘুঁটের মূল্য অতি কম। প্রজাগণ গোবর সারের গুণ উপলব্ধি করিলে তাহারা ঘুঁটে না জ্বালাইয়া অধিক মূল্যে ঘুঁটে ক্রয় করিয়াও ইহা সাররূপে ব্যবহার করিবে। গোবর ঘুঁটে করিলে ইহার কোন সার পদার্থ বিনষ্ট হয় না, পক্ষান্তরে, ঘুটে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে প্রেরণ করা যায়। এইরূপ স্থলে ঘুঁটে সাররূপে ব্যবহার করিলে কৃষির বিশেষ উন্নতি হইবে।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী।



লাক্ষা।

লাক্ষা ভারতের একটি অত্যন্ত পুরাতন বাণিজ্য। আমাদের পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তকে নানা স্থানে লাক্ষা রসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতি পুরাকাল হইতে গৃহ সজ্জাদি ও খেলনার দ্রব্যে বার্ণিশ করিবার জন্য লাক্ষা ব্যবহৃত হইত। কুসুম ও পলাশ এই দুইটিই লাক্ষা কীট পালনের প্রধান গাছ। বস্তুতঃ পলাশ গাছের অপর নামই লাক্ষা-তরু। মুসলমানদের সময়েও লাক্ষার ব্যবহার হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। আইন-ই-আকবরিতে রাজকীয় প্রাসাদ প্রভৃতির দ্বার জানালা ইত্যাদি কারুকার্য্যে যে লাক্ষা বার্ণিশ ব্যবহৃত হইত তাহাতে কি পরিমাণ রজন আবশ্যক তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে লাক্ষা ট্যাকার্ডিয়া ল্যাক্কা (Tachardia lacca) নামক কীটের শরীর নির্গত নির্য্যাস। জীবতত্ত্ব অনুসারে ইহা হেমিপ্‌টেরা শ্রেণীর অন্তর্গত। এ স্থলে লাক্ষা কীটের বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিবরণ প্রদান না করিয়া এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ দুই পুরুষ কীট উৎপন্ন হয়। কোথাও কোথাও তিন পুরুষও হইতে দেখা যায়। বৎসরের প্রথম কীড়া জুলাই মাসে দেখা দেয় ও সেপ্টেম্বর

মাসের মধ্যকালে উহাদের সঙ্গম হয়। দ্বিতীয় পুরুষ কীড়া ডিসেম্বর জানুয়ারীতে উৎপাদিত হয় এবং ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ মাসে সঙ্গম হয়। এই দ্বিতীয় পুরুষ পুংকীট সমূহের পক্ষ উদ্গত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীড়া সমূহ সম্ভবতঃ বায়ু, পক্ষী ও অন্যান্য কীট দ্বারা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে নীত হয় এবং এইরূপে লাক্ষা কীটের অধিকার বিস্তৃত হয়। হেমিপ্‌টেরা শ্রেণীভূক্ত শোষণকারী কীটদিগের দ্বারা সমস্ত আক্রান্ত বৃক্ষেরই অপকার হয়। সেই রূপ লাক্ষা কীটের দ্বারাও গাছের ক্ষতি হয়। কিন্তু এই ক্ষতি স্থানীয় অর্থাৎ যে ডালটি আক্রান্ত হয় সেইটিই শুকাইয়া মরিয়া যায়। সমস্ত গাছ মরিয়া যাইতে কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থলেই অল্প বিস্তর লাক্ষা কীটের চাষ হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশে প্রধানতঃ পাঁচ মহাল ও সিন্ধুদেশে দক্ষিণ হাইদ্রাবাদ লাক্ষা চাষের প্রধান স্থান। মধ্য ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই লাক্ষা কীট দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে নাগোদ ও রেওয়াতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লাক্ষা জন্মায়। পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থলে ও যুক্ত প্রদেশের স্থানে স্থানে লাক্ষা পাওয়া যায়। বর্ম্মা, মান্দ্রাজ, কুর্গ, মহীশূর, আসাম ও বেরারে লাক্ষা চাষ অপেক্ষাকৃত কম। বঙ্গদেশে লাক্ষা চাষের তিনটি প্রধান কেন্দ্র আছে। পূর্ব্বে রঙ্গপুরে এবং পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা ও ছোট নাগপুর। কিন্তু লাক্ষা চাষের চরম উন্নতি মধ্য প্রদেশে। এ অঞ্চলে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার জঙ্গলেই যথেষ্ট পরিমাণে লাক্ষা উৎপাদিত হয়।

লাক্ষা প্রস্তুতের প্রথম কার্য্য, কীড়া সমেত ডাল গুলি ভাঙ্গিয়া সংগ্রহ করা। পরে ঐ ডালগুলিকে কারখানাতে ছোট ছোট করিয়া ভাঙ্গা হয় এবং ডাল হইতে লাক্ষা পৃথক করা হয়। উক্ত পৃথকীকৃত লাক্ষা পরে গুঁড়া করিয়া দুই রকম লাক্ষা হয়। (১) খুদ-চুড়ীওয়ালারা ইহা ব্যবহার করে। (২) বীজ গালা; উহা ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া যে ভিজান গালা পাওয়া যায় তাহা গঁদ বলিয়া বিক্রয় হয়। ইহা হইতেই নানা প্রকারের লাক্ষা তৈয়ারী করা হয়। এ স্থলে বিভিন্ন প্রকারের লাক্ষা প্রস্তুতের বিবরণ প্রদান অনাবশ্যক।

লাক্ষা কীট নানাবিধ গাছে জীবন ধারণ করিতে পারে। স্থান বিশেষে বিভিন্ন গাছ এই কীট পালণের জন্য ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি গাছে লাক্ষা কীটের চাষ হয়ঃ—সিলকড়ি, পলাশ দুই জাতীয়, অরহর, চিকণ, গুলবর, পাকুড়, পোলা, কুসুম, শাল ও কুল। ইহার মধ্যে কুসুম গাছ উৎপন্ন লাক্ষাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পলাশের লাক্ষাকে তাহার পরেই স্থান দেওয়া যায়। অরহর গাছ উৎপন্ন লাক্ষাই আসাম অঞ্চলের উৎকৃষ্ট লাক্ষা। শাল গাছে ভাল লাক্ষা জন্মিলেও উহার কাষ্ঠ এত মূলবান যে উহা লাক্ষার জন্য নষ্ট করা যাইতে পারে না। কুল গাছে যথেষ্ট পরিমাণে লাক্ষা উৎপাদিত হয় কিন্তু অপর কয়েকটি বৃক্ষোৎপন্ন লাক্ষা হইতে নিকৃষ্ট। এই কয়েকটি গাছ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশে অপর গাছেও লাক্ষা কীট পালন করা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কতকগুলি বঙ্গদেশে সহজ প্রাপ্য। চেষ্টা করিলে ঐ সমস্ত গাছেও লাক্ষা কীট পালন সম্ভব পর হইতে পারে। উক্ত গাছগুলির নাম—বাবুল, খদির, শিরিষ, আতা, কাঁঠাল, কাঞ্চন, করমচা, শিশু, পালিতামাদার, কথবেল, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, আম, লিচু, জিওল, সমী, তেঁতুল, সেগুণ ও পিয়াশাল। অশ্বত্থ গাছের লাক্ষা অপরাপর বৃক্ষোৎপন্ন লাক্ষা অপেক্ষা বর্ণে মলিন ও দানা বড়। ষ্টেবিং সাহেবের পুস্তকে সর্ব্বসমেত ৮৭টি লাক্ষা কীট পালন ক্ষম বৃক্ষের নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

লাক্ষা চাষের উন্নতি বিধান করিতে হইলে প্রথমতঃ অনুসন্ধান করা আবশ্যক যে কোন্ কোন্ গাছে উত্তমরূপে লাক্ষা কীট প্রতিপালন হইতে পারে। অরহর গাছ দুই বৎসরের মধ্যেই লাক্ষা বীজ গ্রহণের উপযুক্ত হয়। সুতরাং যদি অরহর দ্বারা লাক্ষার বীজ প্রস্তুত করিয়া অন্যান্য গাছে উক্ত বীজ বপন করা যায় তাহা হইলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। বন বিভাগও যদি ছোট ছোট বনগ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাদের অধিবাসীদিগের দ্বারা লাক্ষা চাষ করান তাহা হইলে লাক্ষা চাষের অনেক উন্নতি হইতে পারে।

বস্তুতঃ লাক্ষা বর্ত্তমান সময় এত মূল্যবান পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট ও জন সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বৈদ্যুতিক কল কারখানায় লাক্ষার অনেক প্রয়োজনীয়তা। গ্রামোফোনের রেকর্ড ও ইহার দ্বারা প্রস্তুত হয়। দারু ও ধাতুর তৈজস পত্রে বার্ণিশ করিবার জন্য ও লাক্ষা বহু দিবস হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। লিথোগ্রাফের কালি ও হ্যাট শক্ত করিবার জন্যও গালা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে ভারতই লাক্ষা উৎপাদনের প্রধান স্থান। ১৯০৫-০৬ সালে কলিকাতা হইতে প্রায় ১৩ শত টন লাক্ষা রপ্তানি হয়। ১৯০৬-০৭ সালে সমস্ত ভারত হইতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার লাক্ষা রপ্তানি হয়। লাক্ষার ক্রেতাদিগের মধ্যে আমেরিকাই ক্রমশঃ সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে মার্কিনে সুরাসারের উপর শুল্ক উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে এক্ষণে অধিক পরিমাণ গালা ব্যবহৃত হইবে। এই সমস্ত কারণে লাক্ষা চাষের বিস্তৃতি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

উপরোক্ত তথ্য সমূহ ষ্টেবিং সাহেব প্রণীত A nute on Lac Insect নামক পুস্তিকা হইতে সংগৃহীত। পুস্তিকা খানি ঠিক সময়োপযুক্ত হইয়াছে। পুস্তিকা খানির মূল্য ১।০ সিকা। প্রত্যেক লাক্ষা ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা অধ্যয়ন করা একান্ত আবশ্যক। লাক্ষা কীটের বিবরণ, বিভিন্ন প্রদেশে লাক্ষা চাষ প্রণালী, লাক্ষা প্রস্তুত ও উন্নতির উপায় প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

পত্রাদি।

শ্রীযুক্ত এন, এম, ঘটক মালদহ হইতে লিখিয়াছেন যে তাঁহার আলু বোখারা গাছের ফুল হইয়া ঝরিয়া যায় একটীও ফল ধরে না। গাছটীর বয়স ৭ বৎসর। ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত সহজ নহে। মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে অনেক সময় বৃক্ষাদিতে সমধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন প্রধান সার প্রদত্ত হইলে গাছের ডাল ও পত্রাদির বৃদ্ধি হয়—গাছে ফল ধরে না। গোময় অধিক মাত্রায়, খৈল বা সোরা প্রভৃতি নাইট্রোজেন প্রধান ধাতব সার প্রদত্ত হইলে গাছের ডাল পাতাই বাড়িয়া যায়। সেই জন্য বৃক্ষাদিতে নাইট্রোজেন সারের সহিত ফস্ফরাস প্রধান সার মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। সাধারণতঃ হাড়ের গুঁড়া হইতে আমরা বৃক্ষাদির গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড্ প্রাপ্ত হইতে পারি। যাহাতে ফল ধরিতেছে না সেই সমস্ত বৃক্ষের গোড়া চতুর্দ্দিক কোপাইয়া এবং খুঁড়িয়া হাড়ের গুঁড়া সরিষার খৈল চূর্ণ এবং ছাই সমভাগে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক বৃক্ষে ৪-৫ পাউণ্ড হিসাবে প্রদান করিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। বৃক্ষের ফল ধরিবার কিছু পূর্ব্বে এই কার্য্য

সমাধা করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য বৃক্ষে আবশ্যক মত জল সেচন প্রয়োজন। ইহাতে বৃক্ষ আশানুরূপ ফল প্রদান করিবে।

ময়ূরভঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষাল তাঁহার ভুট্টা গাছ সম্বন্ধে লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহার ভুট্টা গাছে ভুট্টাগুলি খুব বড় বড় হইলেও তাহাতে ২।৩টার অধিক বীজ নাই। [অত্যধিক গোময় সার প্রয়োগেই এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়।]

কোন একজন পত্র প্রেরক জানিতে চাহিয়াছেন যে তরমুজ কখন পাকিয়া থাকে বা কখন গাছ হইতে আহরণ করিতে হইবে তাহা কি প্রকারে জানা যায়—অনেক সময় ভ্রমবশতঃ কাঁচা তরমুজ তুলিয়া বৃথা নষ্ট করা হয়।

ইহার উত্তরে জানান যাইতেছে যে, তরমুজ পাকিলে তাহার গাত্র আর চক্‌চকে সবুজ থাকে না। বোঁটাটি ক্রমশঃ শুষ্কপ্রায় হয় এবং তরমুজের যে পাশ মাটির উপর থাকে ক্রমশঃ সাদা ও শক্ত হইয়া উঠে। যাঁহাদের সখের চাষ তাঁহারা এত বিচক্ষণতার সহিত তরমুজ আহরণ করিতে পারেন। যাহারা ব্যবসায়ের জন্য চাষ করিয়াছে তাহাদের এত সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই। তাহারা আঙ্গুলের টোকা মারিয়া বাজাইয়া তরমুজ পাকা না পাকা ঠিক করে। কাঁচা তরমুজের তীক্ষ্ণ কন্‌কনে আওয়াজ হয়, আর পাকা তরমুজের আওয়াজ মন্দ ও গুরুত্ব সূচক। বাজাইলেই উভয়ের আওয়াজ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

কোন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছেন যে ভুট্টা গাছের গোড়া হইতে কলাগাছ, আনারস প্রভৃতি গাছের ন্যায় তেউড় নির্গত হয়। সেগুলি মারিয়া ফেলা উচিত কি না, কারণ সেগুলি থাকিলে মূল গাছটী কমজোরি হইতে পারে এবং ফল কম হইবার সম্ভাবনা। তদুত্তরে তাঁহাকে জানান যাইতেছে যে, সেগুলি থাকিলে কিছু ক্ষতি হয় না এবং ফল কম হয় না, বস্তুতঃ যে সকল ভুট্টা অধিক ফলে তাহার মূল হইতেই এইরূপ তেউড় বহির্গত হইয়া থাকে। ভুট্টা গাছে ফুল ধরিবার সময় এই তেউড়গুলি তুলিয়া লইয়া গবাদি পশুকে খাইতে দেওয়া মন্দ নহে।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

তৈল শস্য। ১৯০৭—১৯০৮। বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে অত্র প্রদেশে যত প্রকার তৈলশস্যের আবাদ হয়, তন্মধ্যে রাই ও সরিষা শতকরা ৩৮ অংশ, তিসি ৩২ অংশ, বাকী ৩০ অংশ পরিমাণ তিল, রেড়ী প্রভৃতি তৈলপ্রদ শস্যের আবাদ হইয়া থাকে। পূর্ণিয়া, সাঁওতালপরগণা, ভাগলপুর, যশোহর, খুলনা, দারবঙ্গ এবং নদীয়ায় প্রধানতঃ রাই এবং সরিষা উৎপন্ন হইয়া থাকে; মোটের উপর যত পরিমাণ তিসি উৎপন্ন হয়, তাহার অর্দ্ধেকেরও অধিক কেবল মাত্র পাটনা বিভাগে জন্মিয়া থাকে এবং সম্বলপুর, আঙ্গুল, মেদিনীপুর, হাজারিবাগ এবং যশোহরে তিলের চাষ সমধিক পরিমাণে হয়।

বর্ত্তমান বর্ষে ১,৬২১,১০০ একার পরিমাণ জমিতে তৈলশস্যের আবাদ হইয়াছে। বিগতবর্ষে তৈলশস্যের আবাদী জমির, পরিমাণ ২,২৫০,৯০০ একর ছিল। আশ্বিন মাসে বপনের সময় সুবৃষ্টি না হওয়ায় এবং তৎপরে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টির অভাবে তৈলশস্যের আবাদ এত কম হইয়াছে। ফসল যেরূপ জন্মিয়াছে তাহাতে ষোল আনা ফসল কোথাও আশা করা যায় না।

কেবল মাত্র দ্বারবঙ্গে চৌদ্দ আনা রকম ফসলের আশা করা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য সাতটী জেলায় (যথা হুগলী, ২৪ পরগণা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, কটক, পূর্ণিয়া এবং দার্জ্জিলিং) এগার আনা বার আনা রকম মাত্র শস্য জন্মিয়াছে। অপর নয়টী জেলায় নয় আনা দশ আনা, পনেরটী জেলায় আট আনা নয় আনা ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে তৈলশস্যের অবস্থা নিতান্ত খারাপ ছিল,—মুর্শিদাবাদ, পালামাউ এবং মানভূমে সাত আনা মাত্র, সাঁওতাল পরগণায় সাড়ে সাত আনা, নদীয়া ও যশোহরে পাঁচ আনা, সম্বলপুরে সাড়ে চারি আনা এবং হাজারিবাগে ও রাঁচিতে চারি আনারও কম ফসল জন্মিয়াছে।

প্রতি একারে ৬ মণ তিসি জন্মিয়াছে এবং রাই ও সরিষা ৪৷৹ মণ হিসাবে জন্মিয়াছে ধরিয়া লইলে বর্ত্তমানবর্ষে ২০২,০০০ টন তৈলশস্য উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বিগত বর্ষে ৩৪৭০০০ টন তৈলশস্য জন্মিয়াছে।

গম। ১৯০৭—০৮। বঙ্গদেশ। সচরাচর ১,৩৫১,৪০০ একার পরিমাণ জমিতে গমের আবাদ হয়। সময় মত সুবৃষ্টির অভাবে এবৎসর ১,৩০৩,১০০ একার মাত্র জমিতে গমের আবাদ হইয়াছে। গয়া, সাহাবাদ ও মুর্শিদাবাদে গম চাষের মাত্রা অত্যন্ত কম হইয়াছে। এই সকল স্থানে অন্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর ২৫০,০০০ একার কম জমিতে গমচাষ হইয়াছে।

উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বিহারে ৬৯ ভাগ, মুর্শিদাবাদে ২৮ ভাগ, নদীয়ায় ৩১ ভাগ এবং ২২ ভাগ মাত্র। গড় হিসাব ধরিলে শতকরা ৬৮ ভাগ মাত্র ফসল জন্মিয়াছে এবং আহৃত শস্যের পরিমাণ ২৯৯,২০০ টন মাত্র। বিগত পূর্ব্ববর্ষে ৩৮৮,৭০০ টন উৎপন্ন হইয়াছিল।

বিগত এপ্রেল (১৯০৭) মাস হইতে ফেব্রুয়ারি (১৯০৮) মাস পর্য্যন্ত এগার মাসে ১৯৫,৯৩৫ মণ গম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। বিগত বর্ষে এই সময়ের মধ্যে ১৭৫,৬৬৮ মণ রপ্তানি হইয়াছিল। বিদেশ হইতে ৪,৩৯৮,০০৫ মণ গম আমদানি হইয়াছে গত পূর্ব্ববর্ষ অপেক্ষা আমদানীর মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক।

গম। ১৯০৭—০৮। পঞ্জাব। পঞ্জাবে সমধিক পরিমাণে গমের চাষ হইয়া থাকে। সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে এতদঞ্চলে গমের আবাদী জমির পরিমাণ খুব কমিয়া গিয়াছে।

	সেচন জলের সুবিধা	বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর আবাদীজমির পরিমাণ	একুন
১৯০৬—৭	৪,৪০২,২০০	৪,৬৯৭,৯০০	৯,১০০,১০০
১৯০৭—৮	৪,৩১৩,৫০০	২,৮৫৭,৭০০	৭,১৭১,২০০

উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ শতকরা ৩২·৭ ভাগ কম দাঁড়াইয়াছে। ২,১৯৮,১২৬ টন মাত্র গম উৎপন্ন হইয়াছে। মূলতান ও মজঃফরগড়ে অত্যন্ত শীতল বাতাস, গুরগাওন, দিল্লি এবং কর্ণালে অতিশয় প্রবল বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় আবাদী ফসলেরও অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

১৯০৭ সালে মে মাসে এক টাকায় ১৬ সের গম এবং জুলাই হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ১৫ সের গম বিক্রয় হইয়াছে। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় এবং যুক্তপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ হেতু ডিসেম্বর হইতে এক টাকায় ৮ সের গম বিক্রয় হইতেছে। ১৯০৭ সালে ১,২৯৬,০০৭ টন গম অন্যত্র রপ্তানি

হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আর কখন রপ্তানির মাত্রা এত অধিক হয় নাই। এই গম প্রধানতঃ যুক্ত প্রদেশে আসিয়াছে। ব্রিটীশ অধিকার ব্যতীত পঞ্জাবে দেশীয় রাজ্যে গম জন্মায়। তথায় আবাদী জমির পরিমাণ বর্ত্তমান বর্ষে ১,০৮১,২০০ একর এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ১৭২, ৫৯৭ টন।

কটকে আমন ধান্যের বুনানি। প্রায় সচরাচর আশুধান্যের বুনানি হয়, কিন্তু কটকের চাষিরা আমন ধান্যও বপন করিয়া থাকে। কটক পরীক্ষাক্ষেত্রে বপন করিবার জন্য কত ধান্য আবশ্যক হয় তাহার পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে একার প্রতি ২৫, ৩০, ৩৫ বা ৩০ সের ধান্য বপন করাই শ্রেয়ঃ। ৪০ সের বপন করিবার আবশ্যক নাই। ২৫ সের বপন করিলে ধান্যের ফলন কম হইয়া পড়ে। এই খানে কৃষকগণ আমন ধান্য বুনিয়া গাছ বাহির হইয়া গাছগুলি এক ফুট উচ্চ হইলে একবার ক্ষেত্রটীতে লাঙ্গল দিয়া থাকে, তাহাতে ফল ভালই হয়। প্রতি একারে ৩৫ সের ধান্য বপন করিয়া ১৯০৫ সালে ২৮৸০ মণ ধান ৪৩।০ মণ খড় এবং ১৯০৬ সালে যথাক্রমে ১৮৸০ মণ ধান ও ৩০৸০ মণ খড় জন্মিয়াছে। ৩০ মণ হিসাবে বপন করিলেও ফলন প্রায় সমানই দাঁড়ায়।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, রঙ্গপুর এবং কামরূপে ভারি বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আশুধান্য পাটের ক্ষেত নিড়ান হইতেছে। আমন ধানের জন্য বীজ বপন ও ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে। আসামে ইক্ষু রোপণ কার্য্য ভালরূপ চলিতেছে। কিন্তু এখনও অন্যান্য জেলায় অত্যন্ত বৃষ্টির অভাব। ফরিদপুর, নোয়াখালি, মালদা, মণিপুর, চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্যপ্রদেশ এবং সুর্ম্মা উপত্যকায় শীঘ্র আরও বারিপাত না হইলে শস্যহানির সম্ভাবনা। কাছাড়ে চায়ের অবস্থা ভাল কিন্তু লক্ষ্মীপুরে লাল মাকড় ও সবুজ মক্ষিকা চায়ের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে।

আসামের নিম্ন প্রদেশে, সুর্ম্মা উপত্যকায়, জইন্তিয়া পর্ব্বতে, বাখরগঞ্জ এবং দিনাজপুরে পশুগণ অদ্যাপিও রোগাক্রান্ত হইতেছে। মোটা চাউলের দর ১১টী জেলায় বাড়িয়াছে এবং ১২টী জেলায় কমিয়াছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আষাঢ় মাস।

সব্জী বাগ।—শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, শীতের শসা, লাউ, বিলাতি বেগুন, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হইবে।

পালম্ শাক, টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি সব্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মোকাই (ছোট মোকাই) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ, আদা, জেরুজালেম অর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বাধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি জলে গোড়া আল্‌গা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুল বাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারহ্নস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (Sunflower) মাটিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি

ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, জুই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, জুঁই, বেল প্রভৃতি ফুল-গাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান।—বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়, এখন—ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল, পিচ, নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের মোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। পেঁপে বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ায় মাটি বিচলিত করা কর্ত্তব্য। সুপারি গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুঁড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

কলার মৃত মূল এই সময় ঝাড় হইতে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য এবং কলার তেউড় এখনও নাড়িয়া রোপণ করা চলে।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছ গুলি দস্তুরমত গজাইয়া উঠিবে।

শস্য ক্ষেত্র।—কৃষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতকস্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পাট চাষ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে পাট তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ বঙ্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যায়।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা ও কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং সব্জী ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে কপি চারা ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি; কড়াই শুঁটী প্রভৃতি আমদানি হয়।

এই সময় পার্ব্বত্যপ্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কল্পকোস্ব, কেপ গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

ভারতে পাট চাষের বিস্তার।—বিদেশে পাটের রপ্তানি এত বাড়িয়াছে যে, শুধু বঙ্গদেশে পাটের চাষে কুলাইয়া উঠিতেছে না। মান্দ্রাজের শ্যামলকোট পরীক্ষাক্ষেত্রে, বোম্বায়ে গণেশখণ্ড ক্ষেত্রে এবং মধ্য প্রদেশে নাগপুর ও রায়পুর ক্ষেত্রে পাট চাষের পরীক্ষা করা হইয়াছিল। প্রথমোক্ত দুইটী ক্ষেত্রে পাট চাষ সম্ভব বলিয়া আশা করা যায়। বেহারে নীলকর সাহেবেরা পাটের আবাদে মন দিয়াছেন এবং তাঁহাদের দেখিয়া সাধারণ প্রজাও পাট চাষ আরম্ভ করিয়াছে। আসামের উপত্যকা প্রদেশে বহুতর স্থানে পাটের আবাদ হইয়াছিল, তথায় সুন্দর পাট জন্মিয়াছে। ক্রমশ আসামের নানা স্থানে পাটের আবাদের বিস্তার হইতেছে; কিন্তু এই বিস্তৃতির এক অন্তরায় ঘটিরাছে—সেটী চাষি মজুরের অভাবে। পঞ্জাবে লায়ালপুর পরীক্ষা ক্ষেত্রে ভালরূপ পাট চাষ হইয়াছিল কিন্তু এখানেও মজুরের অভাবে চিনাবে রাখাল বেষ্টিত ভূমি ভাগে পাটের আবাদ বিস্তার করা সুবিধাজনক হইতেছে না। বর্দ্ধমান ও কটকের চাষিরা অনেক স্থলে পাট কাটিয়া লইয়া আমন ধান রোপণ করিয়া থাকে এবং উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ করিলে ধান ও পাট উপযুক্ত পরিমাণ জন্মিতে পারে। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ সম্প্রতি এই তথ্য অবগত হইয়াছেন এবং এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বনে সকলকেই উৎসাহিত করিতেছেন। ইহাতে অত্যধিক পাট চাষেও খাদ্য শস্যের অভাব ঘটিবে না। কিন্তু পাট ধান দুইই জন্মিতে পারে এরূপ জমির পরিমাণ খুব বেশী হইবে না। আসল কথা এই যে, চাষিরা আপনাদের খাদ্যের উপযুক্ত বা তদতিরিক্ত শস্যের আবাদ করিতে কোন কালেই ভুলে না। কিন্তু তাহারা ঋণদায়ে ও কর ভারে তাহাদের মুখের গ্রাস পর্য্যন্ত বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। অর্থাভাবই তাহাদের দরিদ্রতা ও অনাহারের একমাত্র কারণ।

ম্যাঙ্গোও বীট—পশুখাদ্য।—শিবপুর পরীক্ষা ক্ষেত্রে ম্যাঙ্গোও বীটের চাষ করা হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন ছোট ছোট ক্ষেত্র রচনা করিয়া বিভিন্ন প্রকার সার প্রদান করিয়াও দেখা হইয়াছে। সাধারণতঃ যে লবণ ব্যবহার হয়, তাহাও ম্যাঙ্গোওের পক্ষে ফলপ্রদ সাররূপে প্রমাণিত হইয়াছে এবং প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, একার প্রতি ২০০ মণ ম্যাঙ্গোও জন্মিতে পারে। ইহা আলুর ফলনের সঙ্গে প্রায় সমান। নিম্ন বঙ্গের কাদা দোঁয়াশ জমিতে ম্যাঙ্গোও অনায়াসে জন্মিবে। সস্তায় লবণ মিলিলে তবেত চাষিরা ম্যাঙ্গোওের জন্য ব্যবহার করিতে পারে।

কলিকাতা রয়েল বটানিক গার্ডেন।—এই বৎসর উক্ত বাগানে কিউ উদ্যান হইতে মানিহোত জাতীয় মানিকোবা রবার গাছ আনীত হইয়াছে। বারবেডো হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের জন্য নূতনজাতীয় ইক্ষুর বীজ, আমেরিকা কৃষিবিভাগ হইতে বীজ শূন্য কমলা লেবুর গাছ আনা হইয়াছে এবং হনললু হইতে এক প্রকার নূতন সুদৃশ্য পাম (South Sea palm) আনা হইয়াছে। সমধিক সহস্র প্যাকেট নানা প্রকার বীজ পৃথিবীর নানাস্থান হইতে আসিয়াছে এবং প্রায় ৩০০০ প্যাকেট বীজ বিতরিত হইয়াছে। ৪০,০০০ হাজারের উপর গাছ নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছে এবং ৪০০০ হাজার প্রকার আনীত হইয়াছে। ঐ সকল বীজ ও গাছ

ব্যবহারিকীরের উপযুক্ত যথা নানা জাতীয় বাঁশ, কাষ্ঠ ব্যবহারোপযোগী গাছ, আঁশ ব্যবহার উপযোগী গাছ ইত্যাদি।

পদক পুরস্কার। "পল্লিগ্রামে স্বল্প চেষ্টায় ও সামান্য মূলধনে কি কি নূতন ব্যবসায় প্রচলিত করা যাইতে পারে" এই সম্বন্ধে যে দুই জনের বাঙ্গালা প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, চৈতন্য লাইব্রেরির কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে দুই খানি রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন। যে যে ব্যবসায়ের উল্লেখ করা হইবে, সে গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যে উপায় ও উপকরণের প্রয়োজন ও যেরূপ আয়-ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে, তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। প্রবন্ধগুলি আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সাধারণের প্রতিযোগীতা প্রার্থনীয়।

নারিকেল তৈলের ব্যবসায়।—নারিকেল তৈল প্রায় প্রতি গৃহস্থেরই একটী নিত্যব্যবহার্য্য বস্তু। এই প্রয়োজনীয় পদার্থের কারবারে বেশ লাভ হয়, ইহা মনে করিয়া আমরা এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বাজারে যত প্রকার নারিকেল তৈল পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কোচিন তৈলই প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট। অতএব ঐ তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে কোচিনে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে আমরা তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

কোচিন নারিকেল তৈল।—কোচিন, মালাবার উপকূলবর্ত্তী ভারতের একটী করপ্রদ রাজ্য। এখানে বিস্তর নারিকেল জন্মে। যথাসময়ে নারিকেলের কাঁচা (সবুজ) রঙ্গটা কমিতে আরম্ভ হইলেই উহা দো-মালা হয় এবং তখন উহা গাছ হইতে পাড়া হয়। খুব ঝুনা হইলে নারিকেলের ছোবড়া ছাড়ান কঠিন হইয়া পড়ে, তাই নারিকেলের গায়ের রঙ্গ গাছে পীতাভ হইতে দেওয়া হয় না। নারিকেল পাড়া হইলে তাহার ছোবড়া ছাড়ান হয় এবং তার-পর নারিকেলগুলিকে দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয়। একটুকু শুকাইলে নারিকেলের শাঁসগুলি মালা হইতে আলগা হয় এবং তারপর একখানা সরু কাটির সাহায্যে সহজেই তাহা বাহির করা যায়। খুব বেশী রকম না শুকাইলে নারিকেলের শাঁস সবুজ রঙ্গ ধরিয়া পচিতে থাকে। তাই মালা হইতে নারিকেল খসাইয়া আবার উহা রৌদ্রে রাখিয়া ভালরূপ শুষ্ক করা আবশ্যক। এইরূপ সম্যক শুষ্ক নারিকেল শাঁসকে কোচিনে "কপ্রা" বলে। এই কপ্রা পিষিলে তাহা হইতে তৈল নিঃসৃত হয়। সাধারণতঃ ঘানিতেই নারিকেল পিষা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু কলেও নারিকেল পিষিয়া তৈল বাহির করা যাইতে পারে।

বোম্বায়ে নারিকেল তৈলের ব্যবসা।—বোম্বাই সহরে কতিপয় বণিক এই নারিকেল তৈলের ব্যব-সায় করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আবদাস সহর হাজি মুশা, শঙ্করদাস কেটনী ও আলাভাই কাদির ভাই প্রভৃতি কোম্পানি সুপ্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ব্যবসায়ী আছে। বলা বাহুল্য তৈলের কলে বলদের পরিবর্ত্তে ইঞ্জিন ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। আবার যে কার-খানায় ইঞ্জিন যত বড় হইবে খরচ তত কম পড়িবে।

বঙ্গদেশে নারিকেল।—বঙ্গদেশে নারিকেল প্রচুর সংখ্যায় উৎপাদন করা হয় না এবং নারিকেল তৈলের বড় একটা কারবারও নাই। প্রচুর সংখ্যায়

নারিকেল উৎপাদন করিয়া বঙ্গদেশে একটী তৈলের কারখানা স্থাপন করিলে, অর্থাগমের একটী নূতন পথ খোলা হইবে। নারিকেল উৎপাদন করা অতীব সহজ এবং এই উদ্দেশ্যে সুন্দর বন অতি উপযোগী স্থান। ধান চাষে সমুদ্রের লবণাক্ত জল দূরে রাখার জন্য বড় বড় বাঁধ দিতে হয়। কিন্তু নারিকেলের জন্য সেরূপ বাঁধের দরকার হয় না। কোচিনে নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে পাথরের টুকরা আনিয়া সমুদ্রোপকূলে নাতি প্রশস্ত বাঁধ দেওয়া হয় এবং তাহার উপর অল্প পরিমাণ নরম কাদা ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ একটী সুদীর্ঘ বাঁধের উপর বিস্তর নারিকেল গাছ রোপিত হয়। জোয়ারের সময় জল বাঁধের উপর পর্য্যন্ত উঠে এবং তাহাতেই নারিকেল গাছ ভালরূপে জন্মিয়া থাকে।

নারিকেলের জলটা মাত্র কোনও কাজে আসে না। তদ্ভিন্ন নারিকেল তৈলের কারবারে আয়ের অন্য উপায়াও আছে। মরা নারিকেল গাছ জেটির জন্য বিক্রয় করা যাইতে পারে। নারিকেল গাছের পাতায় ঘর ছাউনি হয়। মালাগুলি জ্বালান যায়। তারপর নারিকেলের ছোবড়া জলে ভিজাইয়া তন্তু পৃথক্ করিয়া উহা বিক্রয় করা যাইতে পারে।

মান্দ্রাজ রেলপথের সোনারুর ষ্টেশন হইতে কোচিনের রাজধানী ঈর্ণাকুলমে যাওয়া অতি সহজ। আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গের কোনও উদ্যোগী ব্যক্তি স্বয়ং কোচিনে যাইয়া যদি নারিকেল তৈল প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়া একটী নারিকেল তৈলের কারখানা স্থাপন করেন, তবে তিনি কারবারে বিলক্ষণ লাভবান হইবেন, তাহার সম্ভাবনা আছে। বঙ্গদেশে এই ব্যবসায়ের সময় উপস্থিত।

বন বিভাগ।—১৯০৫-০৬ সালে বন বিভাগের বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে দেখা যায় যে এ বৎসর সর্ব্বসমেত ২৩৩,৬৫১ একার পরিমাণ বন বিদ্যমান আছে। বৃটিশ শাসিত ভারতের ইহা শতাংশের ২৪ অংশ। কাষ্ঠই বন বিভাগের প্রধান পণ্য। এ বৎসর উৎপাদিত কাষ্ঠের পরিমাণ ৬৭½ কোটি ঘন ফুট। জ্বালানী কাষ্ঠের পরিমাণ ১৭১½ কোটি ঘন ফুট। আর বাঁশের সংখ্যা ২১০ কোটি। সর্ব্বপ্রকার বনজাত বন দ্রব্যের হিসাব ধরিলে মোট আয় ২,৬৬,৭৪,৫৯৩৲ টাকায় দাঁড়ায়; খরচ ১,৪২,৫৮,৫২১৲ টাকা, সুতরাং মোট লাভ ১,২৪,১৬,০৭২৲ টাকা। বন বিভাগের অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে রবার, গালা ও সেগুন কাষ্ঠ। ইহাদের অধিকাংশই রপ্তানি হইয়া যায়। দেশীয় রাজ্য সমূহের মধ্যে মহীশূরের বন বিভাগই উল্লেখ যোগ্য। কারণ এই স্থানই চন্দন কাষ্ঠের উৎপাদন ভূমি। পূর্ব্বোক্ত বৎসর মোট ২,৪৬৬ টন চন্দন কাষ্ঠ উৎপাদিত হয়। উহার মূল্য ১২,৫২,৩৯৪৲ টাকা অর্থাৎ গড়ে টন প্রতি ৫০৭৲ টাকা। চন্দন কাষ্ঠ এ পর্য্যন্ত এত অধিক দরে বিক্রয় হয় নাই।

দুর্ভিক্ষ খাদ্য।—ভারতে দুর্ভিক্ষ যেমন সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, দুর্ভিক্ষের সময় উপযুক্ত খাদ্য সেরূপ সাধারণ অথবা সহজ প্রাপ্য নহে। সময়ে সময়ে অনেকেই অনেক উদ্ভিদকে অনশন-ক্লিষ্ট ভারতবাসীর উপযুক্ত খাদ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় সেগুলি অধিকাংশ সময় অখাদ্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়। সম্প্রতি এক প্রকার বন নীল দুর্ভিক্ষ খাদ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উহার বৈজ্ঞানিক নাম Indigofera glandulosa। স্থানে স্থানে ইহাকে জিগুরু, বেক্রি প্রভৃতি বলিয়া থাকে। ইহা অনেক স্থলেই বন্য

অবস্থায় পাওয়া যায়। ভীলেরা ইহা খাদ্যের জন্য ব্যবহার করে। ভুট্টার ন্যায় ইহার চাষ, রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে জিঞ্জরুর পোষণ শক্তি প্রায় গমের মতই। ইহাতে প্রতীদের মাত্রা শতকরা ৩৬ ভাগ। এ পর্য্যন্ত কোন স্থানেই ইহার রীতিমত চাষ হয় না। এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে নিয়মিত চাষ করিলে ইহা কি পরিমাণ উপকারে আসিতে পারে।

চুরুটের তামাক।—অনেকেই অবগত আছেন যে, যে তামাক সহজে নিবিয়া না যায়, যাহার ছাই শ্বেত বর্ণ সেই রূপ তামাকই চুরুটের উপযুক্ত। কোন সারে কি রূপ জমিতে এই তামাক উৎপাদন করিতে পারা যায় তাহা অনেক দিন হইতেই অনেক কৃষিতত্ত্ববিৎ অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি মার্কিন দেশীয় কৃষিবিভাগের একটি বিবরণীতে দেখা যায় যে, চুণই শুভ্র ছাই উৎপাদনের প্রধান সহায়, পটাশিয়মে দাহিকাশক্তি বৃদ্ধি করে, পক্ষান্তরে ম্যাগনেসিয়মে উহা কমিয়া যায়। ক্লোরিন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপকারী। যে স্থানে সহজ দাহ্য তামাক উৎপাদিত হয় না সেরূপ জমিতে পাতা সার কিম্বা পটাশিয়ম সিলিকেটই উৎকৃষ্ট সার। সোরাতে পাতার অতি বৃদ্ধি হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাস।—আশু ধান্যের বপন এখন প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এখানে আশু ধান্যের বাইন ও (বোনা) রোয়া দুই হইয়া থাকে। রোয়া বর্ত্তমান মাসের শেষ ভাগ হইতে আগামী ১৫ দিন পর্য্যন্ত রোপণ করা হইবে। জুমের রোপণ কার্য্যও শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন ক্ষেতের ও জুমের নিড়ান কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কাজ নাই। পাটের নিড়ান কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। পাট এখন ২।৩ হাত লম্বা হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ৭ই বৈশাখের পুর্ব্বে বারিপাত হয় নাই। ৭ই হইতে ১২ই পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত দিন রাত্রি ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কাজেই ১৫ই বৈশাখ হইতে এখানে আশু ধান্যের ও পাটের বাইন আরম্ভ হইয়াছে। আশু ধান্যের ও পাটের বাইন ও জুমের রোপণ কার্য্য নাবি হইয়া পড়িয়াছে। এখন ২।১ দিন পরই রীতিমত বৃষ্টি হইতেছে, ইহাতে শস্যের বিশেষ উপকার হইতেছে। আশু ধান্যের, পাটের ও জুমের অবস্থা ভাল। কলা, কচু, আদা ও হলুদ ইত্যাদির রোপণ কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। কলা চারা এ মাসেও রোপণ করা যাইতে পারে। ইক্ষু ও কলা গাছের গোড়া এখন কোপাইয়া উচ্চ করিয়া দেওয়া উচিত।



কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

নবম খণ্ড,—তৃতীয় সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,

সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

আষাঢ়, ১৩১৮।

মিনার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্;

১৯৬, নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।



কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

কৃষক।

৯ম খণ্ড। আষাঢ়, ১৩১৫ সাল। ৩য় সংখ্যা।

গোরুর এঁসো রোগ।

রোগ-পরিচয়।—ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশে প্রায় প্রতিবৎসরই গোরুর এঁসো রোগ হয়; যদিও এই রোগে পূর্ণবয়স্ক গোরু প্রায়ই মরে না, কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার অভাবে অনেক দিন পর্য্যন্ত অনেক গোরু রোগে ভোগে এবং কোন কোন গোরু অকর্ম্মণ্য হয়; ইহাতে চাষ আবাদের বিস্তর ক্ষতি হয়। সাধারণতঃ বর্ষাকালে গোরুদিগের এঁসো রোগ হয়, কিন্তু ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে এঁসো রোগ বহু স্থান ব্যাপী হইয়া পড়ে।

এই রোগে জ্বর হয়, মুখে এবং পায়ে ফুস্কুড়ির গুটি বাহির হয়। এঁসো রোগগ্রস্ত গাভীর পালানে সময়ে সময়ে ফুস্কুড়ির গুটি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গোরুর কেবলমাত্র মুখে গুটি হয় এবং কোন কোন গোরুর পায়ে গুটি বাহির হয়। কোন কোন স্থলে প্রথমে পায় এবং কোন কোন স্থলে প্রথমে মুখে গুটি বাহির হয়। এই রোগ এক গোরুতে ৩।৪ বার হইতে পারে। অন্যান্য জাতীয় পশুগণ অপেক্ষা গো-জাতীয় পশু সকল এই রোগে অধিক আক্রান্ত হয় এবং এই ব্যারামে অনেক বাছুর মারা যায়। পূর্ণ বয়স্ক গোরুর মৃত্যু সংখ্যা এই রোগে অতি অল্প। গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগ, শূকর, হাঁস, মুরগী ইত্যাদির এই রোগ হয় এবং দুগ্ধ পান করিয়া মনুষ্যেরও এই রোগ হইতে পারে।

এই রোগ ছোঁয়াচে ও সংক্রামক এবং ইহা কোনও বিশেষ বিষ-জনিত।

অঙ্কুরায়মানাবস্থা।—১ দিন হইতে ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত, কিন্তু সাধারণতঃ ৩৬ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ ১৷৷০ দেড় দিন হইতে ২ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রোগের কারণ।—এই রোগ সর্ব্বদা সংক্রামক বীজ হইতে উৎপন্ন হয়; বিভিন্ন বিভিন্ন কারণে এই রোগ বহুস্থান ব্যাপী হইয়া পড়ে যথা—

(১) এঁসো রোগেতে যে সকল গাভীর স্তনে বা বাঁটে ক্ষত হয়, তাহাদের দুগ্ধ দোহন করিবার পরে, গোয়ালাগণ হাত ও নখ উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিয়া, রোগবিহীন গাভীর দুগ্ধ দোহন করিলে, ঐ সংক্রামক রোগের বীজ তাহাতে লাগিয়া যায় এবং তাহাতে রোগহীন পশুও রোগগ্রস্ত হয়।

(২) পীড়িত গোরুকে রোগহীন গোরুর সহিত মিশিতে দিলে; পীড়িত গোরুর সেবা শুশ্রূষা-কারী রোগহীন গোরু সকলের সেবা শুশ্রূষা করিলে, কিম্বা যে স্থানে রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তথা হইতে খড়, কুটা অথবা অন্য প্রকার পশুদিগের খাদ্য আনীত হইলে এই রোগ পরিব্যাপ্ত হইতে পারে।

আবর্জ্জনাময় স্যাঁৎসেঁতে স্থানে গোরুদিগকে রাখিলে ও গোরুর খুরগুলি পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন না রাখিলে এই রোগ হয়।

এঁসো রোগের বিভিন্ন নাম।—এঁসো, বাদলা, বৈকরা, বাদুলখুর, চামাটসিয়া, ক্ষুর, ক্ষুরা, ক্ষুরালা, খুরিয়া, খুরা পীড়া, খুরপাকা, ফুটছা ইত্যাদি (বঙ্গদেশে)। কুঞ্জলা, ছাপছাপিয়া (বিহার)। বাঘার, ছুপছুপিয়া, খুরেস্ত, (কুচবিহার)। খুরি-ফুটা, শোবাকর, সবকার, বিনোর, হুপকা (আসাম)।

রোগের লক্ষণ।—প্রথমে কম্প দিয়া জ্বর আসে, কোন কোন গোরুর অতি সামান্য জ্বর এবং কোন কোন গোরুর অতি উগ্রজ্বর হয়। রোগীর মুখ, পা, শিং ইত্যাদি গরম হয় ও মুখ হইতে লালা পড়ে। অল্প অল্প আহার করে, দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ করে, কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে এবং শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ টের পাওয়া যায়। এই অবস্থা ২।১ দিন মাত্র থাকে।

ইহার পরে, ফুস্কুড়ির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি, মুখে ও পায়ে বাহির হয় এবং গাভী হইলে বাঁটে ও পালানে গুটি বাহির হয়। পল্লীতে, জিহ্বায়, মাড়িতে, দাঁতের গোড়ায়, গালের ভিতরে ও মুখের ভিতরের উপরিভাগে ফুস্কুড়ি বাহির হয় এবং কখন কখন নাকের ঝিল্লীতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ফুস্কুড়ি প্রায় গোলাকার সিকির ন্যায় বা তদপেক্ষা বড় ও দেখিতে সিমের বিচির ন্যায়। ১৮ ঘণ্টা হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই সকল ফুস্কুড়ি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল দাগে পরিণত হয়। এই সময়ে অধিক লালা নিঃসৃত হয় এবং এই দাগ গুলি হয় কয়েকদিনের মধ্যে শুকাইয়া যায়, নতুবা গভীর ক্ষতে বা নালীতে পরিণত হয়। মুখের ভিতর অত্যন্ত বেদনা হয়; জ্বর থাকায় ও মুখে ক্ষত থাকার দরুণ পশুটী কিছুই খায় না।

পায়ে ফুস্কুড়ি বাহির হইবার পূর্ব্বে, রোগী নড়িতে চড়িতে চাহে না; খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটে; পা চাটে, পা গুলি ঘন ঘন শূন্যে কাঁপায় এবং সমস্ত পা গুলি এক স্থানে গুটাইয়া দাঁড়ায়। খুরের সহিত চামড়ার সংযোগস্থলে প্রদাহ হয় এবং ঐ স্থানে হাত দিলে পশুটী বেদনা অনুভব করে। যোড়ের মধ্যে, দুই ক্ষুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ও পায়ের যে স্থলে চর্ম্ম ও খুর সংলগ্ন আছে, তথায় ফোস্কা বাহির হয়। ফোস্কা গুলি ফাটিয়া যায় ও ক্ষতে পরিণত হয়। ক্ষতগুলি শীঘ্র শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। এই সময়ে রোগী অত্যন্ত খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটে; শুইয়া থাকিতে চাহে এবং পা ফুলিয়া উঠে। এই সময়ে যথোপযুক্ত চিকিৎসা করিলে পায়ের ঘা গুলি শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া যায়। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেক স্থলে গোরুর উপযুক্ত চিকিৎসা হয় না এবং ইহাতে পায়ের লক্ষণ গুলি গুরুতররূপে প্রকাশিত হয়; বিশেষতঃ বলদের পীড়া হইলে পীড়াকালীন বলদকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখা হয় ও লক্ষণ গুলি গুরুতর ভাবে প্রকাশিত হয় যথাঃ—পা ফুলিয়া উঠে; লোমের ও খুরের মাঝখানে কাদা ও বালি ঢুকিয়া যায়; খুর গুলি প্রায় খসিয়া পড়ে; পায়ে ফোড়া হয় এবং সময়ে সময়ে পায়ে নালী ঘা হয়। এই সময়ে জ্বর বেশী হয়।

পালানে ও বাঁটে ফুস্কুড়ি হইলে, ঐ সকল স্থান ফুলিয়া উঠে ও উভয় স্থানেই বেদনা হয়। পালানটী শক্ত হয়, এবং দুগ্ধক্ষরণ কমিয়া যায়। কোন কোন গাভীর দুধ একবারেই কমিয়া যায়। দোহন কালে বাঁটের ফুস্কুড়িযুক্ত স্থানে চাপ পাওয়াতে পালানে অত্যন্ত বেদনা হয়, দুগ্ধ দোহন না করিলে পালানটী ফুলিয়া উঠে ও উহার প্রদাহ জন্মে। বাছুরে দুধ খাইলে বাঁটগুলি অধিক টাটায় ও বাঁটে অধিক ঘা হয়। ৭।৮ দিনের মধ্যে পালানের ফুলা কমিয়া যায়; বাঁটের ও পালানের ক্ষতগুলি শুকায় এবং গাভী পূর্ব্বের ন্যায় দুধ দেয়। কিন্তু সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে পালানে ফোড়া হয়; ২।১টি বাঁট কাণা হয় এবং কোন কোন গাভীর পালান ভয়ানক শক্ত হইয়া যায় ও দুধ একেবারেই কমিয়া যায়। ইহাও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে এই রোগে গর্ভবতী গাভীর গর্ভপাত হয়।

এঁসো রোগগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া বাছুর রোগাক্রান্ত হয়। এই রোগে বাছুরের উগ্রজ্বর হয়; ফোস্কা প্রায়ই বাহির হয় না এবং ফোস্কা বাহির হইবার পূর্ব্বে ২।১ বার প্যা প্যা শব্দ করিয়া মরিয়া যায়। কদাচিৎ ২।১টি বাছুরের ফোস্কা বাহির হয়।

উপযুক্ত যত্নের অভাবে ঘায়েতে মাছি বসিয়া মাস্তে পড়িয়া থাকে অর্থাৎ ঘায়েতে পোকা পড়ে। খুরে পোকা হইলে রোগী পা চাটে; পা গুলি শূন্যে কাঁপায় ও ঘন ঘন নাড়ে; পা ফুলিয়া যায় এবং পায়ে বেদনা হয় ও পুঁষ জন্মে। যখন মুখে ঘা থাকে ঐ সময়ে শুষ্ক খড়, ভুট্টা ইত্যাদি পশুকে খাওয়াইলে মুখের ঘা বিস্তৃত হয় এবং ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত রোগী কিছুই খাইতে পারে না।

রোগের শেষ অবস্থাতে জ্বর কমিয়া যায়; মুখের ও পায়ের ঘা শুকাইয়া যায়; পায়ে বেদনা থাকে না এবং পশুটী বেশ হাঁটিতে পারে। দুধাল গাভীর বাঁটের ও পালানের ফুলা কমিয়া যায় এবং পূর্ব্বের ন্যায় দুধ দেয়। কিন্তু পীড়িত পশুটীর উপযুক্ত যত্ন ও চিকিৎসা না হইলে লক্ষণ গুলি গুরুতর ভাবে প্রকাশিত হয়;—যথাঃ—পীড়িত পশু ক্রমশঃই দুর্ব্বল হয় এবং অনেক দিন রোগে ভুগিয়া মারা যায়: পায়ের খুর খসিয়া পড়িলে পীড়িত পশুটী অনেক দিন রোগে ভোগে ও কার্য্যের অনুপযুক্ত হইতে পারে। দুধাল গাভীর বাঁট কাণা হইয়া যায় এবং দুধ একেবারেই দেয় না। পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ হওয়াতে উদরাময় হয় ও রোগী ভয়ানক দুর্ব্বল হয়।

গো-বসন্ত রোগে উদরাময় ও আমাশয় প্রধান লক্ষণ। এঁসো রোগে উদরাময় কিম্বা আমাশয় কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় রোগে জ্বর হয় ও মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হয়। কিন্তু এঁসো রোগে মুখের ঘা গুলি অধিক বড় হয়। বসন্ত রোগে পায়ে ঘা হয় না এবং পায়ে কোন লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। গো-বসন্ত ও এঁসো রোগ এক সময়ে এক পশুর হইতে পারে, কিন্তু এরূপ ঘটনা কদাচিৎ হয়। এঁসো রোগ আমাদের দেশে প্রায় প্রবলভাবে হয় না।

কদাচিৎ আমাদের দেশে এঁসো রোগ প্রবল ভাব ধারণ করে। উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ২।৩টীর বেশী হওয়া উচিত নহে। বাছুরের মৃত্যু সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫০টী দেখা যায়, কিন্তু বাছুরের চিকিৎসা প্রায়ই হয় না এবং উপযুক্ত যত্ন ও চিকিৎসা হইলে অনেক বাছুর বাঁচিতে পারে।

পীড়িত পশুটিকে চিকিৎসাধীন রাখিলে ২।৩ দিনের মধ্যে জর কমিয়া যায় এবং ১০।১৫ দিনের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। পীড়িত গোরুকে চিকিৎসাধীন না রাখিলে ও বলদদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলে রোগ সারিয়া যাইতে প্রায় ২।৩ মাস সময় লাগে এবং অধিকাংশ স্থলেই রোগী অনেক দিন ভুগিয়া মারা যায়।

জমি ও কর্ষণ।

বঙ্গদেশের বিল, গ্রাম ও অন্যান্য সর্ব্ব স্থানের ভূমিকে নানা জাতি ও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। স্মৃতির অতীত কাল হইতে তাহাদিগের যেরূপ নাম নির্দ্দেশ করা হয় পাঠকগণের অবগতির জন্য এই অবসরে আমরা সেটুকু বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না সুতরাং এই স্থানেই তাহা বলিব যথা ঃ—

বাস্তু ভূমি, (১) উদ্বাস্তু, (২) বাগাত, (৩) ভীতা, (৪) টাটী (৫)। প্রথম তিন প্রকারের সমস্ত ভূমিই গ্রামের মধ্যে থাকে শেষোক্ত দুই প্রকারের অর্থাৎ ভীতা ও টাটী ভূমি গ্রামের মধ্যেও থাকে এবং বিলেও থাকে কিন্তু প্রথম তিন প্রকার ভূমি বিলে আদৌ থাকিতে পারে না। তৎপরে কামা (১) আবাদ জমি, (২) জলগণ্ড গ্রোপ্ত জমি (৩)। এই আট জাতীয় জমিকেই চারি চারি শ্রেণীতে (Class) বিভক্ত করা হয়।

এক্ষণে আমরা ভূমির শ্রেণী বিভাগ ও তাহার উৎকট অথচ প্রচলিত শব্দের নাম সমূহ বলিব। পূর্ব্ব কথিত অষ্ট জাতীয় ভূমির এক এক জাতীয় ভূমিকে চারি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে তাহার প্রথমটিকে আউয়াল (৪) দ্বিতীয়টীকে দৈয়ম (৫) তৃতীয়টির নাম ছেয়ম (৬) ও চতুর্থটি চাহারম (৭) নামে কথিত হইয়া থাকে। ঐ সকল ভূমি প্রজা ও ভূম্যধিকারী উভয়ের মধ্যে বিবিধ স্বত্ব নিয়ম ও চুক্তিতে হস্তান্তর বা জমা দেওয়া হইয়া থাকে। ১। করশূন্য, অর্থাৎ প্রজা কিছু কাল বিনা রাজস্বে কৃষিকার্য্য করতঃ উৎপন্ন শস্য ভোগ করিবে। ২। চর্চ্চা জমা, বৎসরান্তে শস্য সুপক্ক হইলে ভূম্যধিকারী ক্ষেত্রস্থ শস্য পরিদর্শন করিয়া রাজস্ব স্থির করিবেন (চর্চ্চা জমার অনেক স্থলে কি হারে কর গ্রহণ করা হইবে তাহা পূর্ব্বেও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে)। উহাকে মেদিনী-পুর অঞ্চলে "কুত খামার" কহে। ৩। নগদান,

(১) বাস্তু ভূমি, প্রজার বাসের উপযোগী অর্থাৎ ভদ্রাসন বাটি।

(২) উদ্বাস্তু, গৃহস্থ বাটির পার্শ্বস্থ ভদ্রাসন বাটির ন্যায় জমি অথচ তাহাতে প্রজা বাস করে না। সরিষা, তিল, কলাই চাষ করে ও উদ্যানও হইতে পারে।

(৩) বাগাত, আম্র, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেলের উদ্যান ভূমি।

(৪) ভীতা, অর্থে ভিজা অর্থাৎ যে জমি অধিক সময় জলমগ্ন হইয়া ভিজিয়া থাকে ও ধান্য চাষ হয়।

(৫) টাটী, প্রায় সর্ব্বদা শুষ্ক ধান্য ক্ষেত্র। এক্ষণে পাটও জন্মিতেছে।

(১) কামাল জমি, যাহা ধান্য চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী।

(২) আবাদ জমি, যে জমি সম্প্রতি ধান্য উৎপাদনের উপযোগী হইয়াছে। সুন্দরবনের আবাদ জমি ও অনেক সময় ঐ অর্থেই ব্যবহার হয়।

(৩) জলগণ্ড গ্রোপ্ত জমি, জলমগ্ন, লোকসান জমিকে কহে। জলগণ্ড, অর্থাৎ জলমগ্ন, গ্রোপ্ত, অর্থাৎ লোকসান, উভয় শব্দ একত্র যোগে অর্থ হইতেছে যে, যে জমি জলমগ্ন থাকিয়া কৃষির অনুপযুক্ত হইয়াছে।

(৪) আউয়াল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা প্রথম শ্রেণীর ভূমি।

(৫) দৈয়ম, দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমি।

(৬) ছেয়ম, তৃতীয় শ্রেণীর ভূমি।

(৭) চাহারম, চতুর্থ শ্রেণীর ভূমি।

নগত মুদ্রায় যাহার কর প্রদত্ত হয় তাহাকে নগদান জমা কহে। ৪। গুলা, ইহা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্যে রাজস্ব আদায় হয়। ৫। ভাগরা, ফসল উৎপন্ন হইলে প্রজা এবং ভূস্বামীর মধ্যে শস্য বিভাগ করিয়া লওয়াকে ভাগরা জমা কহে। উহাকে পূর্ব্ববঙ্গে বর্গা ভাগও কহে। উপরে উল্লিখিত পাঁচ প্রকার ব্যতীত আরও এক প্রকারের জমি বাস্ত হইয়া থাকে ; উহার বৎসরান্তে কিছু কিছু রাজস্ব বৃদ্ধি হয় (Gradual Increased Rate) অর্থাৎ প্রতি বিঘায় পূর্ণ রাজস্ব বৎসরে যদি দুই টাকা হয় তাহা লইলে প্রথম বর্ষে ১।০ টাকা, দ্বিতীয় বর্ষে ১॥০ টাকা, তৃতীয় বর্ষে ১৸০ ও চতুর্থ বর্ষে সম্পূর্ণ ২৲ দুই টাকা প্রজার দেয় এবং ভূস্বামীর প্রাপ্য হইবে এইরূপ ক্রমে বৃদ্ধি নিয়মের জমাকে রসদবার হওয়া বলা হয় ; কিন্তু এই শেষোক্ত প্রকারের বন্দোবস্ত আট মেসে বিলে নাই উহা সুন্দরবনের জঙ্গল আবাদ মহলেই সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে যে নগদান বা নগত মুদ্রায় রাজস্ব প্রদানের জমার কথা বলা হইয়াছে উহা আবার বিবিধ স্বত্ব ও স্বামীত্ব বিশিষ্ট হয় যেমন জমিদারী, তালুক, পত্তনী তালুক, গাঁতি(১) ইজারা, মেয়াদি জমা ও কৃষিকারী প্রভৃতি ; যাহা হউক এদেশে সর্ব্বদা আমরা যে কয় প্রকার স্বত্বে জমি জমা বন্দোবস্ত হইতে দেখিতে পাই তাহার মধ্যে যাহা আমাদিগের জানা আছে তৎ-সমুদয় উপরে যথা সম্ভব বর্ণিত হইল উহার মধ্যে করশূন্য "Rent free" ও রসদ বার (Gradual Increased Rate) বন্দোবস্ত জমা সুন্দরবনের আবাদ মহল ব্যতীত অন্য মহলে দৃষ্ট হয় না বিশেষতঃ আমাদিগের প্রবন্ধের প্রস্তাবিত আট মেসে বিলে ঐ জাতীয় বন্দোবস্ত আদৌ নাই অন্যান্য বিধ ও চর্চ্চা জমাই অধিক। নগদান খাজনা সাত কিস্তিতে শোধ করা হয় কিন্তু আইন মত চারি কিস্তি মাত্র নিয়মিত আছে।

বঙ্গদেশে অন্য কোন পশু দ্বারা কৃষিকার্য্য প্রায়ই লক্ষিত হয় না কদাচিৎ মহিষ কৃষি সাহায্যে নিযুক্ত করা হয় কিন্তু উহা এরূপ সামান্য যে উহা গণনার মধ্যেই আইসে না, এক মাত্র বলদই কৃষির অবলম্বন ও সম্বল। শুনিতে পাই অন্যত্রে চারি বলদ, ছয় বলদ দ্বারা হল কর্ষণ করা হয় কিন্তু বঙ্গে সে নিয়মও নাই, মৈ দিবার সময় চারিটি বলদ যোজনা করা হয় বটে, কিন্তু হলকর্ষণে দুইটি মাত্র বৃষ অথবা বলদ সংযোজিত হয় মাত্র। কোন কোন নরাধমকে গাভী যোজনা করিতেও (অল্পদিন হইতে) দেখা যায়, কিন্তু সে অতি নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ও পোদ ভিন্ন অপর কোন জাতিতে অদ্যাপী ঐরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই। দুগ্ধবতী বিশেষতঃ গর্ভবতী গাভীর প্রতি অতি কষ্টসাধ্য হল আকর্ষণের ভার ন্যস্ত করা যে কতদুর অন্যায় তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। অবৈধ দুষ্কার্য্যে যদি গভর্ণমেণ্ট

(১) গাঁতী, গাঁতী বিবিধ প্রকারের,, কায়েমি, মৌরসী, মকররী হারে প্রভৃতি বহু বিভিন্ন স্বত্বাস্পদীভূত হইয়া থাকে ; উহার মধ্যে মৌরসী মকররী হারের যে গাঁতী জমা আমাদিগের বিবেচনায় উহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারী ও পত্তনী তালুক হইতে কোন অংশে হীন নহে বরং খাজনা দাখিলের ডিউ অতীত হওয়া মাত্র তালুক ও জমিদারি বিক্রয় হইয়া যায় কিন্তু গাঁতী জমায় সে রূপ ভয় কিছু অল্প ; অর্থাৎ যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

একটু দয়াদৃষ্টি প্রদান করেন তাহা হইলে অচিরাৎ রহিত হইতে পারে। জীবক্লেশ নিবারণী সভার কি ইহাতে কোন ক্ষমতা নাই? কৃষিকার্য্যে এক খানি লাঙ্গল চালাইতে দুইটি বলদের আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঐ দুইটি বলদ বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট ও তাহাদিগের দেহে বলাধিক্য থাকিলে এবং শীতাতপ সহিষ্ণু হইলেই কার্য্য সহজে ও সত্বর সম্পন্ন হয় এবং ঐ কৃষি উত্তম ফলোৎপাদিকা হয়, কিন্তু অতি বৃহৎকায় হস্তির ন্যায় ভাগলপুরে অথবা অতি ক্ষুদ্র দেহ দুর্ব্বল এবং অত্যধিক শ্বেতবর্ণ ও বৃহৎ শৃঙ্গদ্বয় বিশিষ্ট বলদ কৃষির উপযোগী নহে। বলদ বৃহৎ স্থূলদেহ হইলে কর্দ্দমে ভাল চলিতে পারে না। বিশেষতঃ বৃহৎকায় জীবমাত্রেই কিছু মন্থরগামী হয়। ধীর গমনশীল বলদ গাড়ির পক্ষে ভাল, উহারা হলকর্ষণে উপযুক্ত বিবেচিত হয় না। দ্রুত গমন পটু চটুল বলদই কৃষিকার্য্যের অধিক উপযোগী, অত্যধিক শ্বেতবর্ণ (যাহাকে হাঁসা রং কহে) বলদ অধিক ক্ষণ রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না। অল্প রৌদ্রে দেহ উত্তপ্ত হইলেই কাতর হইয়া পড়ে। (মহিষের স্থূল দেহ ও রৌদ্রে কাতরতা দুইটি দোষই অত্যধিক পরিমাণে বিদ্যমান, এ জন্য মহিষের চাষ এদেশের লোকের অভিপ্রেত নহে (সম্ভবতঃ সেই জন্যই বর্জ্জিত হইয়াছে)। খর্ব্বদেহ বৃদ্ধ ও অল্পবয়স্ক নূতন বলদ কৃষির সম্পূর্ণ উপযোগী নহে.(১) শক্তিহীনতাই তাহার একমাত্র কারণ। বলদ সামর্থহীন অথবা রুগ্ন হইলে সে হলকর্ষণে সম্পূর্ণ সক্ষম হয় না এবং সত্বর ক্লান্ত হইয়া পড়ে। বৎসগণের চারি খানি নূতন দন্ত উদ্ভেদ হইলেই তাহাকে ক্লীবত্বে পরিণত করিবার উপযুক্ত সময় বলিয়াই কৃষক কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়, তাহার পূর্ব্বে ও পরেও ক্লীব করা হয় বটে কিন্তু অসাময়িক বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে। গোরুর দুই চইলের অর্থাৎ মাড়ির দন্ত ব্যতীত সম্মুখে নীচের পাটিতে সাধারণতঃ ৮ খানি মাত্র দন্ত থাকে। উপরের পাটিতে দন্ত থাকে না। নীচের পাটির ঐ দন্ত পরীক্ষা দ্বারা বয়স বুঝা যায়। যে বৎসের মুষ্ক মোশন করা হয় তাহার কুকুদ পরিপুষ্ট ও স্থূলতা প্রাপ্ত হয় না। আবার ছয় দাঁত বাছুরের ঐ রূপ মুষ্কচ্ছেদ কার্য্য সম্পন্ন করিলে বৎসটি অনেক দিন দুর্ব্বল ও রুগ্ন থাকে। চারি দাঁত বাছুরের সেরূপ আশঙ্কা কিছুই নাই, কদাচিৎ আট দন্ত পূর্ণ হইলেও ক্লীব করা হয়, কিন্তু তাহার অধিক বয়স হইলে আর দামড়া করা হয় না, ইহাই এ দেশের রীতি। বৃষদিগকে ক্লীব করাকে এদেশে কৃষকেরা "ছাইট" দেওয়া কহে। পূর্ব্বে এদেশের ভদ্র লোক(১) দিগের বাটিতে যে সকল পুং বৎস জন্ম গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে কখনই দামড়া করিতে দেওয়া হইত না, কোন বিশ্বাসী হিন্দুকে দান করিয়া তাহার পুংস্ত্ব বজায় রাখিয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। তাহাতেও বিস্তর বলবান অনুৎসর্গিত বৃষ দৃষ্টি গোচর হইত, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই, এখন ঐরূপ ষণ্ড আর একটিও দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, তখন কি বুঝিব? ইহাই কি বুঝিব যে এখন আর, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের গৃহে পালিত গাভীগণ পুং বৎস প্রসব

(১) পশুর অর্থাৎ বৃষ গাভী ও ঘোটকের দন্ত দেখিলেই বয়স স্থির করা যায়। গরুদিগের শিশু কালের সহজাত দন্ত পড়িয়া গিয়া আট খানি নূতন দন্ত উদ্ভেদ হইলেই যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল বুঝিতে হইবে। পুনরায় দন্ত যতই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে ততই বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে জানিবে, গোরুর এক এক বারে দন্ত যুগল উত্থিত হয়। তিন বৎসর বয়সে প্রথম দন্তদ্বয় বাহির হয়। সম্মুখে আট খানির অধিক দন্ত প্রায় হয় না।

(১) ভদ্রলোক শব্দে এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

করে না(১)। ভদ্রলোক ব্যতীত অপর হিন্দুগণ একটি সাধারণ নিয়ম পালন করে যে, তাহাদিগের স্বগৃহজাত বৎসগণকে আপনারা বাটীতে রাখিয়া ক্লীব করে না, অপরের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলে এবং যাহা করণীয় তাহারাই করে। কদাচিৎ অন্যথা করিয়া নিজের বাটীতে রাখিয়া দামড়া করিলে সমাজে একঘরে হইতে হয়, কিন্তু মুসলমান ও মুচিদিগের সম্বন্ধে সে সব নিয়ম কিছুই নাই; তাহারা কোন নিয়মের অধীন নহে, যদৃচ্ছা ব্যবহার করে।

বৎসগণের চারি খানি দন্ত নূতন উত্থিত হইলেই তাহাকে ছাইট দেওয়া, পরে রজ্জু আবদ্ধ করিয়া যে ক্ষেত্রে তিন চারি খানি হল যোজনা করা হইয়াছে ও অনেকগুলি বলদ ক্ষেত্র মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের সকলের পশ্চাতে কৃষক নূতন শিক্ষানবীসের (বৎসের) বন্ধন রজ্জু স্বীয় হস্তে ধারণ অথবা কটিদেশে আবদ্ধ করিয়া উহাকে পুনঃপুনঃ ঘুরাইতে থাকে। এইরূপ চারি পাঁচ দিন ঘুরানর পরে অপর একটি ধীর প্রকৃতি বলবান শিষ্ট শান্ত বলদকে বামে ও নব শিক্ষার্থীকে দক্ষিণে যোজনা করিয়া, সমুদয় লাঙ্গলের পশ্চাতে রাখিয়া উহাদিগকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলে, স্বীয় সহযোগীর অভ্যাস ও দক্ষতা গুণে অগ্রগামীগণের হল পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্ব পুরুষের সংস্কার বশে চলিতে থাকে। এইরূপে দশ পোনর দিবস বৎসকে লাঙ্গলে যোজনা করিয়া পরিচালন করিলে সৈকড়(১) হইয়া আইসে, তখন নিয়মিতরূপে ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু প্রথম শিক্ষার সময়ে প্রতি দিন উপর্য্যুপরি যোজনা করা হয় না, এক দিবস হল চালনার পরে দুই এক দিবস উহাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়, নচেৎ দেহের ও স্কন্ধের বেদনায় কাতরতা জানায় এবং চঞ্চলতা প্রদর্শন করে। বৎসটিকে বিলের জলযুক্ত ক্ষেত্রেই প্রথম কয়েক দিন শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে সুবিধা এই যে বৎস দুষ্টামি করিলেও জলের মধ্যে শয়ন করিবে না। দ্বিতীয়তঃ কর্দ্দমে সহজে সামান্য আয়াসে ভূমি কর্ষিত হইয়া যায়। তৎপরে বৎস সুশিক্ষিত হইলে উক্ত বর্ষে তাহাকে অবিচ্ছেদ কর্ষণে নিযুক্ত না রাখিয়া সময় সময় কার্য্যে নিযুক্ত ও সময় সময় বিশ্রাম দিয়া, দ্বিতীয় বৎসরে যখন তাহার ছয় খানি দন্ত উদ্ভেদ হয় তখন তাহাকে কার্য্যোপযোগী গণনা করিয়া প্রতি দিবসই কর্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করে, পর বৎসর সম্পূর্ণ আট খানি দন্ত বাহির হইলে সে একটী সৈকড় বা শিক্ষিত বলদের মধ্যে পরিগণিত হয়; তখন তাহার ও তাহার সহযোগীর উপর এক লাঙ্গলের ভারার্পণ করিয়া কৃষক নিশ্চিন্ত হয়। শিক্ষার সময় পুরাতন অভিজ্ঞ কৃষকের হস্তে নূতন বলদের শিক্ষার ভার অর্পিত থাকে। অল্প বয়স্ক বলদকে দক্ষিণে ও ধীর প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত বয়োধিককে বামে যোজনা করা হয়, অল্প বয়স্ক নূতন বলদ চটুল ও দ্রুতগামী হয়। বলদ দ্বয়কে

(১) গরুর দেহ পরীক্ষা করিয়া সুলক্ষণ, কুলক্ষণ স্থির করা হয়। যে বৎসের মহর দন্ত ক্ষয়ীত হইয়া ছয় খানি অথবা নয় খানি নূতন দন্ত উঠে উহাদিগকে ছইল ও লইল বলে উহারা সুলক্ষণ সম্পন্ন, সাত দন্ত হইলে সাতাইল কহে সাতাইল বড় অলক্ষণ, এক বা দুই খানি পঞ্জরাস্থি ক্ষুদ্র হইলে উন্ পাঁজুরে, গলকম্বলের পশ্চাতের ঝুঁটাটীতে শ্বেত বর্ণ দাগ থাকিলে কোল সগুণে ও অশ্ব খুরের ন্যায় উন্নত খুর হইলে বরা খুরে কহে। উন্ পাঁজুরে, কোল সগুণে এবং বরা খুরে গরু অতি অলক্ষণা। কপালে শ্বেত বর্ণ চিত ও লাঙ্গুলের অগ্রভাগের চুল শ্বেত বর্ণ, সুলক্ষণ; আবার শৃঙ্গের অগ্রভাগে সাদা দাগ থাকিলে অতিশয় মন্দ।

(১) সৈকড়, শিক্ষিত হওয়াকে কৃষক সৈকড় কহে এবং অশিক্ষিতকে "সায়া" কহে।

এক লাঙ্গলে যোজনা করিতে হইলে পরীক্ষা করা আবশ্যক যে উভয়ের স্কন্ধ সমউচ্চ ও বলদ দুইটীই সমান বলবান হয়, তদ্ভিন্ন একটি বড় একটি ছোট ও একটী অত্যধিক বলবান ও দ্রুতগামী হইলে অল্প উচ্চ ও দুর্ব্বল বলদটী ক্রমে দুর্ব্বল কৃশ হইয়া শেষে মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। কৃষকের একখানি লাঙ্গলে কখনই চাষ করা কর্ত্তব্য নহে। এক লাঙ্গল, দুর্ব্বল ও খর্ব্বকায় বলদ দ্বারা চাষ করিলে কখনই জমি সুচারুরূপে কর্ষিত হইবে না, ভূমি কর্ষণ ভাল না হইলে শস্য উৎপাদনেরও ব্যাঘাত হইবে। লাঙ্গল তিন খানির কম রাখা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে, একান্ত অভাব হইলে অন্ততঃ দুই খানি লাঙ্গলে এক সঙ্গে চাষ করা কর্ত্তব্য। যাহার তিন খানি লাঙ্গল করিবার অর্থ সংগ্রহ না হয় সে অপরের সহিত গাঁতা (১) করিবে, তাহা হইলে উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল। বিশেষতঃ কর্ষিত ক্ষেত্রে মৈ দেওয়া এক লাঙ্গলে কিছুতেই সুবিধা হয় না, দুই হেলে মৈ কার্য্যের অধিক উপযোগী, এক হেলে মৈ চালনায় ঢিল ভালরূপ চূর্ণ অথবা কর্দ্দম সুন্দররূপে গুলিয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয় না, এসব কারণে এক লাঙ্গলে চাষ কোন রূপে সমীচিন নহে। ভূস্বামীগণের এক লাঙ্গলের কৃষককে ভাগরা জমি দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, এদেশের লোক দিতে ও সম্মত হয় না।

ভূমি কর্ষণের সময় ভূমিতে দাঁড়াইলে যে দিকে দক্ষিণ হস্ত থাকে ভূমির সেই পার্শ্ব হইতে প্রথম কর্ষণ আরম্ভ করিতে হইবে, বাম দিক্ হইতে কর্ষণ আরম্ভ করিলে কার্য্য হইবে না। কারণ এদেশের সকল কৃষকই যে বলদটি দক্ষিণে যোজিত হয় তাহাকেই ক্ষেত্রের শেষ সীমা হইতে আবর্ত্তন করিয়া আনিতে অভ্যস্থ, বামের বলদ এক স্থানে দাঁড়াইয়া অথবা অল্প স্থান পরিক্রমণ করিয়াই ঘুরিয়া বিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই কারণে লাঙ্গলের দক্ষিণের বলদটি ও মৈ (১) দেওয়ার সময় দুই জোড়ার মধ্যে দক্ষিণের জোড়া ও দুইটীর মধ্যে দক্ষিণেরটি চতুর অল্প বয়স্ক ও বলবান দেখিয়া যোজনা করিতে হয়। ঐরূপে ভূমির দক্ষিণদিকের শেষ সীমা হইতে সর্ব্বাগ্রের লাঙ্গলবাহী কৃষক ভূমি কর্ষণ জন্য লাঙ্গল দ্বারা যে রেখা পাত করিবে, পশ্চাদ্বর্ত্তী কৃষকগণ পর্য্যায় ক্রমে পর পর তাহার বাম ভাগে লাঙ্গল ধারণ ও লাঙ্গল পদ্ধতির রেখা পাত করিয়া অগ্র পশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইবে এক বিন্দু স্থানও ত্যাগ করিবে না। অগ্রে অগ্রে যাহারা লাঙ্গল চালাইতেছে পশ্চাদ্বর্ত্তীগণ তাহাদিগের সিরেলের(২) দক্ষিণ পার্শ্বে অহেতু লাঙ্গল ধরিয়া কর্ষণ করিবে না। সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হল কর্ষণে ক্ষেত্র বক্ষে দক্ষিণ সীমায় ইংরাজী "U" ও অক্ষরের ন্যায় হলাগ্রে রেখাপাতে লিখিয়া দিবে তৎপশ্চাদ্বর্ত্তীগণ উক্ত অঙ্কিত রেখাকে দক্ষিণে রাখিয়া ঐ শূন্য গর্ভ ও অক্ষরের গর্ভ পূরণ করিতে থাকিবে; কিঞ্চিৎমাত্র ভূমি অক্ষত অবস্থায় ত্যাগ করিবে না যদি নিতান্ত অসুবিধা জন্য কোন কৃষককে সামান্য মাত্র স্থান অকর্ষিত অক্ষত অবস্থায় ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে তৎপশ্চাদ্গামী হল কর্ষককে ডাকিয়া বলিয়া যাইবে যে "ধরিয়া আইস" পশ্চাৎ অনুসরণকারীরা ঐ "ধরিয়া আইস" কথা শুনিলেই বুঝিয়া লইবে ঐ স্থানে কিছু স্থান কর্ষণের বাকি রহিয়া গিয়াছে তখন ঐ ব্যক্তি সাধারণ বিধি বামে গতি

(১) গাঁতা করা বা গাঁতা বেড়া, অর্থে পরস্পর আপনাপন হলবলদ ও কৃষক লইয়া দুই তিন দলে এক সঙ্গে কার্য্য করা। ঐরূপ কার্য্যে এক দিন এক জনের পর দিন অপরের কার্য্য করিয়া দিতে হয়। সমবেত মণ্ডলী গঠন করাকে গাঁতা করা বলা হয়।

(১) মৈকে এদেশে বাগুই কহে।

(২) সিরেল, লাঙ্গল পদ্ধতি।

ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের পরিত্যক্ত স্থান টুকু সংশোধন করিয়া যাইবে। এইরূপে এক দুই বা তিন জনে অকর্ষিত স্থানটুকু কর্ষণ দ্বারা সংশোধন করিয়া লইবে; বিশেষ কারণ ভিন্ন কেহই অগ্রগামীয় হল রেখার দক্ষিণে যাইবে না, এইরূপে একটি "0" ও অক্ষরে গর্ভের কতকাংশ পূরণ হইয়া উঠিলে ঐ "0"র গর্ভ হইতেই আর একটি "ও" অঙ্কিত করিয়া লইয়া পূর্ব্ববৎ কর্ষণ করিবে। এইরূপে ক্রমে যতক্ষণ ভূমির অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কর্ষণ না শেষ হইবে, ততক্ষণ ঐরূপেই বার বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে কার্য্য সমাধা হইলে ক্ষান্ত দিবে। উভয় "0" ওর অগ্র এবং পশ্চাৎ ভাগে যদি সামান্য একটু ভূমি পতিত রহিয়া যায় তাহা হইলে অনুসরণকারীরা তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইবে। এইরূপ একবার দীর্ঘে একবার প্রস্থে, দুইবার কর্ষণ শেষ হইলে শেষ বারে যে দিকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ করিয়া কার্য্য করিয়াছিল সেই দিকদ্বয়কে বামে ও দক্ষিণে রাখিয়া চারিটি বলদ যোজিত মৈ দিবে। অভাব হইলে দুই বলদ দ্বারাও এক হেলে মৈ দেওয়া চলিতে পারে। উচ্চ শুষ্ক ভূমি ও স্বল্প জলযুক্ত ভূমি হইলে মৈ দিবে। নিম্ন জলমগ্ন অথবা কর্দ্দমময় ভূমি হইলে তাহাতে "পেটো" (১) দিবে। এইরূপে প্রথম এক পালা মৈ দেওয়া হইলে দ্বিতীয় বারে পূর্ব্ব বারকে দীর্ঘ গণনা করিয়া তাহার প্রস্থ ভাবে মৈ দেওয়াই নিয়ম। ভূমি কর্ষণের সময় অধিক সংখ্যায় লাঙ্গল হইলে অগ্র পশ্চাতে সুশিক্ষিত বলদ যুক্ত হল ও পুরাতন কৃত কর্ম্মা কৃষক থাকিবে। অশিক্ষিত কৃষক ও নূতন বলদযুক্ত হল মধ্যে রাখিয়া কর্ষণ করিবে। দুইখান হল হইলে অগ্রে নূতন বলদ ও অশিক্ষিত কৃষককে দিয়া পুরাতন পাকা কৃষক ও সুশিক্ষিত বলদযুক্ত হল পশ্চাতে রাখিবে। অগ্রের নূতন অশিক্ষিত কৃষক যাহা ভ্রম করিবে অভিজ্ঞ সুশিক্ষিত গো মানবে সাবধানতা সহকারে সে ভ্রম সংশোধন করিয়া যাইবে। কৃষক দ্বিতীয় বার কর্ষণ-করাকে "দর" ও তৃতীয় কর্ষণকে "ত্যার" কহে এবং একেবারে "0" ও অক্ষরের যে জমি টুকু কর্ষণ জন্য বেষ্টন করিয়া লয় তাহাকে এক আঁতর জমি কহে। কৃষকগণ ভূমির অথবা দুরত্বের পরিমাণ জন্য আঁতর "ভুঁই" ভূমি এক বাঁশুই মই ভুঁই প্রভৃতি শব্দ সর্ব্বদাই ব্যবহার করে। দেশী প্রচলিত লাঙ্গলে কর্ষণ কালে ভূমি নিখাত হইয় উপরের তৃণসহ লম্বা লম্বা যে চাবড়া উঠে, উহা উল্টাইয়া ঘাস নিম্নে ও মৃত্তিকা উপরে উত্থিত হয় এবং ঐ রূপ সকল চাবড়াই বামদিকে পড়ে। ভূমি কর্ষণ কালে সরল রেখায় কর্ষণ কার্য্য সুসম্পন্ন জন্য যেমন মনযোগ রাখিতে হয় সেই রূপ লাঙ্গলের ভূগর্ভ বিদারক লৌহময় সুতীক্ষ্ণ ফলক বলদের পশ্চাৎ পদে বিদ্ধ না হয় সে দিকেও তেমনই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। লৌহ ফলক মৃত্তিকার ঘর্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া রৌপ্যবৎ চাকচিক্যশালী ও খর ধার হইয়া উঠে। যদি অসাবধানতায় কোন রূপে একবার বলদের পাদদেশে ফাল বিঁধিয়া যায়, তাহা হইলে অনেক দিন আহত বলদটিকে পীড়িত ও কর্ম্মের অযোগ্য অবস্থায় বসিয়া খাওয়াইতে হয়; তবে

(১) পেটো, শব্দ বিগত ১৩১৩ সালের পৌষ মাসের কৃষকের ২১৪ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভে দ্রষ্টব্য।

সুস্থ সবল পশুকে যে পরিমাণে তৃণাদি—আহারীয় দিতে হয়, রুগ্ন পশুকে অবশ্য তাহা অপেক্ষা অল্প দিতে হয়। কৃষকের বলদ ঐ রূপ আঘাত প্রাপ্তির পরে ডাক্তারখানায় "গোয়াল ঘরে' ঢুকিলে হয়ত উহাই উহার জন্মের শেষ গোশালা প্রবেশ। আর আরোগ্য হইলেও বহু দিন তাহার ঔষধ পথ্য যোগাইতে হইবে অথচ হয়ত আর এ জন্মেও সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক ও অবিকল অঙ্গ হইতে পারিবে না, খোঁড়া হইয়া শেষে জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইবে।

বলদের শৃঙ্গ বড় বড় হইলে কৃষক উহার উভয় শৃঙ্গ মূলে সর্ষপ তৈল প্রক্ষেপ পূর্ব্বক (মানুষের নড়া দাঁত উঠানর ন্যায়) দৃঢ় মুষ্টিতে সজোরে ধারণ পূর্ব্বক কৌশলে মোড়া দিয়া উপরের দৃঢ় শৃঙ্গদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলে। গো, মহিষ প্রভৃতির শৃঙ্গের মধ্যে আর একটি ছোট কাঁচা শৃঙ্গ (মাইজ) থাকে, সর্পের নির্ম্মোক ত্যাগের ন্যায় উপর হইতে শৃঙ্গটি উঠাইয়া লইলেই মাইজটি রহিয়া যায়, তাহাতে যদিও কিঞ্চিৎ রক্তপাত হয় ও পশু একটু ক্লেশ বোধ করে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে বৃহৎ শৃঙ্গ বহনের দায় হইতে অব্যাহতি পায় ও অসাবধানতা বশতঃ অন্য পশুর ও কৃষকের দেহে আঘাত প্রদান রহিত হয়। অবশ্য সকল কৃষকই ঐ রূপ কৌশলে শৃঙ্গ উৎপাটনে অভ্যস্থ নহে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিই উহাতে সক্ষম। তথাপি একথা আমরা বলিতে বিশেষ সঙ্কুচিত নহি যে গভর্ণমেণ্টের অনেক হসপিটাল এসিস্‌টাণ্ট (নেটিভ্ ডাক্তার) দিগের বৃদ্ধ রোগীর নড়া ক্ষয়িত মূল দন্ত উত্তোলনের বিদ্যা অপেক্ষা এই সকল নিরক্ষর কৃষকের শৃঙ্গোৎপাটন বিদ্যায় কৃতকার্য্যতা কম প্রশংসার কার্য্য নহে। কলিকাতার প্রস্তর আস্তৃত রাজ পথে ভ্রমণকারি শকটবাহি বলদের খুরে যেরূপ লৌহময় নাল বাঁধান থাকে. কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত বলদ পুঞ্জের খুরে সেরূপ লৌহ সংযুক্ত করা হয় না, ঐরূপ খুর লৌহবদ্ধ করিলে ক্ষেত্র মধ্যস্থ কর্দ্দমে পশুর পদ প্রোথিত হইয়া কার্য্যের অধিক অসুবিধা ঘটিতে পারে এজন্য কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয় না। কিন্তু রোগ বিশেষ হইয়া বলদের খুর বৃদ্ধি হইলে উহা কর্ত্তন করিয়া এবং ঔষধাদি সেবনে আরোগ্য করিয়া দেওয়া হয়। ঐরূপ খুর বৃদ্ধি হওয়া রোগকে এদেশে পয়জেরে রোগ কহে, খুর বৃদ্ধি রোগে গাভী ও বলদ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। যে সকল পশুর অত্যধিক ব্রণ (ফোড়া) হইতে আরম্ভ হয়, অবিলম্বে উহাতে অস্ত্র প্রয়োগ অথবা উপযুক্ত ঔষধি প্রদান না করিলে গো-জাতীর প্রায়ই খুর অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি হইয়া তাহার চলৎশক্তির বাধা জন্মে, সুতরাং তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই লম্বমান খুর কর্ত্তন করিয়া দিতে হয়। কিন্তু কেবল মাত্র খুর কর্ত্তনেই উহা আরোগ্য হয় না, যতই বার বার কাটিয়া দিবে ততই বার বার উহা অযথা বর্দ্ধিত হইবে, এবং পশুটি চলিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইবে যেন টোলের অধ্যাপক চটি জুতা পায়ে ফট্ ফট্ শব্দ করিয়া ক্রিয়া বাটিতে বিদায় গ্রহণ করিতে আসিতেছেন। —শ্রীরাজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

জাপানে কর্পূর কৃষি।

১। বাহ্যিক বর্ণনা।—গ্রীষ্মমণ্ডল ও সমমণ্ডলের সীমান্তপ্রদেশে কর্পূর বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এতদ্ব্যতীত চীনরাজ্যে সেক্কো "ফুকেন" দেশে এবং "কোনেই"

প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানে অতি অল্পমাত্র কর্পূর বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

"জাপান রাজ্যে"র কতিপয় প্রদেশসমূহ, "শিক্কু," "কিউস্থ, "ফর্ম্মোজা," এবং "ম্যানজো" পথে এবং "কিনিমাই"র এক অংশ অথবা "কি" এবং "জু"র অপেক্ষাকৃত উষ্ণ সমুদ্রোপকুলবর্ত্তী স্থানে প্রধানতঃ কর্পূরবৃক্ষ সমূহ বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

যে সমুদয় কর্পূরবৃক্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতে জাপানে সুদৃঢ় ভিত্তিতে দেহভার ন্যস্ত করিয়া উন্নত মস্তকে গগন স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তৎসমস্তই অতি স্থূল, প্রাচীন ও বিশাল, এবং এই সমুদয় বৃক্ষরাজি জনমানব পরিপূর্ণ বাসস্থানের সন্নিকটেই বনস্থলিতে উৎপন্ন। কিন্তু ফর্ম্মোজাতে কর্পূরবৃক্ষ সমূহ স্বভাবতঃ একত্র সম্মিলিত হইয়া ৩,৫০০ "সাকু" (১ সাকু=১ ফুট ২৩/৪ ইঞ্চি) উচ্চ ভূমিখণ্ডে উৎপন্ন হয়, কিন্তু এতদপেক্ষা উচ্চতর স্থানে উৎপন্ন হয় না। অধিকন্তু, কতিপয় কর্পূর-বৃক্ষ "বানচোরিয়োর" (ফর্ম্মোজা) দক্ষিণের বহির্দ্দেশে দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং এতদ্দৃষ্টে অনুমান হয় যে কর্পূরবৃক্ষ সমূহের উৎপত্তি স্থান গ্রীষ্ম-মণ্ডলের প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত নিবদ্ধ; কিন্তু আর কিঞ্চিৎ মাত্রও মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত নহে, কারণ সে পর্য্যন্ত আর ইহার অস্তিত্ব নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শত শত "চো" বিস্তৃত ফর্ম্মোজার অরণ্যানি কেবল মাত্র কর্পূরবৃক্ষ দ্বারাই পরিবেষ্টিত। কিন্তু এ কথার সারবত্তার কোন প্রমাণ দেখা যায় না। যেহেতু তথায় আরও অপরাপর নানা-জাতীয় বহুতর বন্য-পাদপ জন্মিয়া থাকে। এতদ্ব্যতিত বাছবিবেচনাশূন্য হইয়া ফর্ম্মোজার পর্ব্বতের পাদদেশস্থ বন্যবৃক্ষরাজি কর্ত্তন করিয়া ফেলা হইয়াছে, এবং অপরাপর বৃক্ষসমূহ অগ্নিতে পুড়িয়া লয়প্রাপ্ত হইয়া তথায় জোত জমি এবং মাঠের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব নানাকারণে অধুনাতন আমাদের কল্পনানুযায়ী এত অধিক বৃক্ষের সংখ্যা তথায় আর নাই এবং আমরা যে প্রকার ভাবিয়া থাকি, তুলনা করিতে গেলে তদপেক্ষা অনেক কম বৃক্ষই তথায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২। দিকনির্ণয় ও চাষ।—যাহাহউক, কর্পূরবৃক্ষ চাষ করিতে হইলে যথাযথভাবে মৃত্তিকা কোমল কর্দ্দমাক্ত হওয়া আবশ্যক; দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া শীতল বায়ুর পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিতে পারিলে বৃক্ষ সমূহ অত্যন্ত সতেজ ও উন্নত হইয়া উঠে। যে স্থানে সূর্য্যের উত্তাপ উত্তমরূপে প্রবেশ করিতে পারে, তথায় যথাযথ ভাবে শীতল সমীরণ বা ঠাণ্ডা বাত্যা হইতে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিয়া বীজ বপন করিলেও তদ্দারা কোনও সুফল ফলিবে না। পর্ব্বত কিনারা কিম্বা সেঁতসেঁতে জমির যে স্থানে সমুদ্রের উষ্ণবায়ু প্রবেশ করিতে পারে তথায় দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া বৃক্ষ রোপণ করাই কর্পূরকৃষির প্রশস্ত উপায়। অতি অল্পকাল হইল আমেরিকাস্থ ফ্লরিডা এবং কালিফর্ণিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে কর্পূর বৃক্ষের ঝাড় উৎপন্ন হইয়াছে। এবং সেস্থানে অতি উত্তম কর্পূর জন্মিতেছে বলিয়াই শুনিতে পাওয়া যায়।

৩। কর্পূর বৃক্ষের উপকারিতা।—

কর্পূর বৃক্ষ কর্ত্তন করিলে যে কাষ্ঠ প্রস্তুত হয় তাহার বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ এবং আভ্যন্তরীক সার বা উৎকৃষ্টাংশ লোহিত ও পিঙ্গল বর্ণের ছায়া বা আভাস সংমিশ্রিত। পরন্তু এই বৃক্ষ সমূহ অত্যন্ত দুর্ভেদ্য কঠিন বলিয়া ইহাকে রেঁদা দ্বারা চাঁচিয়া ফেলিলে ইহার উপরিভাগ অত্যন্ত চাকচিক্যশীল হয় এবং সুঘ্রাণে চিত্তের প্রফুল্লতা উৎপাদন করে।

প্রাচীন কালের জাপানীগণ পোত নির্ম্মাণ কার্য্যে এই কাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া অসীম বারিধি বক্ষে ইহার দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের বিলক্ষণ প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে এই সমুদয় কার্য্যে লৌহ ব্যবহৃত হওয়ায় ইহার সামুদ্রিক কার্য্যে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত লাঘব হইয়া পড়িয়াছে। তত্রাপি ইহার সুস্নিগ্ধ গন্ধ, সুন্দর বর্ণ, এবং উৎকৃষ্ট আভার জন্য জাহাজের অপরাপর দ্রব্য সজ্জার নিমিত্ত এই কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথাঃ—ডেস্ক, টেবিল, কামান বা বন্দুক রাখিবার আধার, কাষ্ঠাবর্ত্ম, মেজ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিত পাইল সাহায্যে চালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোত, ফর্ম্মোজার "জাঙ্গ" (চীন ও জাপান দেশীয় জাহাজ বিশেষ, জলযান) এবং নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত লোকদিগকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিবার জাহাজ এই কর্পূর বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণ বাস গৃহের আসবাব সামগ্রী, থালা, বাসন, প্লেট, ইত্যাদি রাখিবার আলমারি এবং অপরাপর দারুকার্য্যের জন্য এই কর্পূর বৃক্ষের কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনাবশ্যকীয় টুকরাগুলি অগ্নিতে ফেলিয়া তাহার ধোঁয়া দ্বারা মশক ইত্যাদি বিতাড়িত করা যায়। পুস্তকের পৃষ্ঠাভ্যন্তরে এই বৃক্ষের পাতা রাখিলে গ্রন্থ কীটের অত্যাচার হইতেও রক্ষা পাইতে পারে।

কর্পূর বৃক্ষের কাষ্ঠে অতি উত্তম আঁস থাকা প্রযুক্ত ইহাকে অত্যন্ত পাতলা কাগজের আকৃতিতে ফালি করা যাইতে পারে এবং এই কাষ্ঠফালি দ্বারা বাদ্য যন্ত্র এবং বেশ ভুষার বাক্স (টয়লেট বাক্স) প্রভৃতি মণ্ডিত করা হয়। সাবানাদিও এই কাগজাকৃতি কাষ্ঠ ফালি দ্বারা আচ্ছাদিত হয় কিম্বা ইহা দ্বারা মোড়ক করা হইয়া থাকে।

কর্পূর বৃক্ষের যাবতীয় প্রয়োজনীয়তার মধ্যে কর্পূর প্রস্তুতই বিশেষ প্রয়োজনীয়। ক্ষতি কারক জন্তু, বিশেষতঃ কৃমি, কীট, পতঙ্গ, মাছি, ছারপোকার অত্যাচার নিবারণের জন্যই ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ঔষধ প্রক্রিয়া প্রকরণে এবং শিল্পানুসঙ্গীক অনেকানেক মহদুপকারী কাজে ইহার নিত্যপ্রয়োজন উপলব্ধি হইতেছে।

৪। অংশ বিশেষে কর্পূর সমষ্টি।—

অতি সুবৃহৎ প্রায় অশীতিপর বয়োবৃদ্ধ বৃক্ষের কাষ্ঠ খণ্ডেই অধিক কর্পূর উৎপন্ন হয়। কিন্তু একটী বৃক্ষের সকল অংশে সমান মাত্রায় কর্পূর থাকে না। আকৃতি বিশেষে এবং নীচে উপর ক্রমান্বয়ে কর্পূরের সমষ্টির তারতম্য হয়। যথাঃ—বড় বড় শাখায় ৩·৭০%, ক্ষুদ্র শাখায় ২·২১%, গুঁড়ির মধ্যস্থলে ৪·২৩% এবং নিম্নভাগে ৫·৭৫%, এতদ্ব্যতিত শিকড়াভ্যন্তরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর্পূর জন্মে।

সেই নিমিত্ত পূর্ব্বকালে কেবল মাত্র বৃক্ষের নিম্নাংশ হইতেই কর্পূর প্রস্তুত করা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এমন কি বৃক্ষের শাখা পল্লব এবং পত্র হইতেও কর্পূর প্রস্তুত হয়। অধিকন্তু গুঁড়ি

দেশে মাত্র পূরাকালে যে প্রথা অবলম্বন করা হইত তাহাতে কেবল মাত্র ৩% কি ৪% ভাগ মাত্র কর্পূর পাওয়া যাইত। কিন্তু কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিত প্রথামতে এমন কি বৃক্ষ পত্র হইতেই ততধিক কর্পূর পাইবার আশা করা যাইতে পারে।

৫। চাষ সম্বন্ধে উপদেশ।—যে সমুদয় সুবৃহৎ বৃক্ষসমুহ হইতে বীজ পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত বিশাল ও প্রাচীন হওয়া আবশ্যক। ঐ বৃক্ষের ৪০ হইতে ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স হওয়া প্রয়োজন। বৃক্ষগুলি যেন অত্যধিক রৌদ্র না পায়। সুপক্ক বীজ সকল যখন আপনা হইতে মাটিতে পড়িয়া যায় তখনই তাহা সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু এতাবৎ কাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইলে অনেক বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং একটী যষ্টির সাহায্যে বীজ গুলিকে ঝাড়িয়া পাড়া হয় অথবা একটী সুদীর্ঘ কাষ্ঠ দণ্ড বা লগির মস্তকে এক গাছা কাস্তে বান্ধিয়া তদ্বারা ক্ষুদ্র শাখা বা ফেঁকড়ি কাটিয়া ফেলা হইয়া থাকে। বীজগুলি আপনা আপনি পড়িবার সময় হইলেই তাহা কৃষ্ণ বর্ণে পরিণত হয়। বীজ সংগ্রহ করিয়া তৎক্ষণাৎ রোপণ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথা। কিন্তু শীতকালে পোকায় কাটিয়া বীজ নষ্ট করিয়া ফেলে বলিয়া বসন্তকালেই বীজ বপনের উপযুক্ত ও নিরাপদ সময় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এতাবৎকাল বীজগুলিকে নির্দ্দোষ অবস্থায় রাখিতে হইলে শুষ্ক বালুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করিয়া রাখিতে হয় অথবা ছায়াতে রাখিয়া শুষ্ক অবস্থায় রাখিতে পারিলেও চলিতে পারে। সহসা জ্বলিয়া উঠিবার ভয়ে আঁটাল বা কসাকসি ভাবে বস্তা বা বাক্সের ভিতরে বীজ রাখা হয় না। মাদুর কিম্বা কাটের উপর উহা আলগাভাবে ছড়াইয়া রাখা হয়। সুতরাং, এপ্রকার বিপদপাত হেতু এবং কোন দুরদেশে পাঠাইবার সুবিধার জন্য বীজগুলিকে ধুইয়া পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। কর্পূর বীজ পরিষ্কার করিতে হইলে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উহাদিগকে জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখিয়া, পরে উপরের খোসাগুলি অত্যন্ত কোমল হইলে যষ্টির সাহায্যে নড়িয়া খোসা তুলিয়া ফেলা হয়; পরে যাহাতে উহা ভিজা অবস্থায় না থাকে সেই নিমিত্ত কোন নির্ঝরিণীতে বীজগুলি উত্তমরূপে পরিষ্কার ভাবে ধৌত করিয়া ছায়াবৃত স্থানে রাখিয়া শুষ্ক করা হইয়া থাকে। বীজগুলি ধৌত করিবার সময় অপক্ক ও হাল্‌কা বীজ সমূহ উপরে ভাসিয়া উঠে, তখন তাহা অতি সহজেই বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়। বীজগুলিকে একটু সাবধানতার সহিত রক্ষা করা যুক্তিযুক্ত, যেহেতু ইঁদুর জাতীর বীজ ইত্যাদি সমগ্র দ্রব্যই রসনা তৃপ্তিকর।

বীজ বপন করিবার স্থান বা জমি "সিডার" অথবা "জুনিপার" বৃক্ষের জমির ন্যায় প্রস্তুত করিতে হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বেড়া দ্বারা চতুর্দ্দিকে ঘেরাও করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পরন্তু যদিও বীজগুলি এলোমেলো ভাবে কিম্বা সারি বান্ধিয়া বপন করা হয়, তত্রাপি যাহাতে অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে ছড়াইয়া না পড়ে সে জন্য যত্ন লওয়া আবশ্যক। নতুবা বৃক্ষের শিকড়গুলি পরস্পর জড়াইয়া বা পাক লাগিয়া থাকিবে; অতঃপর নূতন চারা উঠিবার সময় তাহাদের পরস্পরের আলিঙ্গনপাশ হইতে চারাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা বড় সহজ ব্যাপার হইবে না।

ধৌত বীজ ২ "গো" (যব ওজনের ১০.৯৩৭ ইঞ্চি।) অথবা ছায়াবৃত স্থানে শুষ্ক খোসা সমেত বীজ ৫ "গো") অথবা টাটকা সদ্য বৃক্ষ হইতে সংগৃহিত বীজ ৮ "গো") অন্তর বপন করিতে হয়। অতঃপর এক একটী ক্ষুদ্র

কোদালির সাহায্যে ঐ বপিত জমির উপরিভাগে $\frac{৩}{২০}$ × ২ অথবা $\frac{৩}{২০}$ × ৩ ইঞ্চি পুরু সার মাটি চাপাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে বীজ বপনের বিশেষ ভূমি প্রস্তুত করা হয় না, কেবল মাত্র হল চালনা করিয়া ১ ফুট ২[illegible] ইঞ্চি দ্বিগুণ পাশের আলি বান্ধিয়া সাধারণ জোত জমিতে বপন করা হয়। অধিকাংশ সারই প্রথম অবস্থায় চারাগুলিকে অত্যন্ত সতেজ ও বলশালী করিয়া তুলে কিন্তু চারা তুলিয়া রোপণ করিবার কালীন অধিকাংশ বৃক্ষই মরিয়া যায়। সুতরাং মধ্যম প্রকার সার জমিতে দেওয়াই বিধেয়। অর্থাৎ একেবারে মন্দ জমি ও না হয় অথচ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট জমিরও বড় বিশেষ আবশ্যক করে না। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পরে বর্ষাকালে কিছু কিছু সার পুনরায় দেওয়া হয়। এইসব নানা কারণে শিকড়দেশে সার দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য চারা বৃক্ষের উপর কোন প্রকার আবরণ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন দেখিতে পাই না। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সময় যদি কখন অকাল তুষারপাতের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে রাত্রিকালে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখা হয়, অথবা অপরাপর অন্য কোনও উপায়ে কচি চারা বৃক্ষগুলিকে রক্ষা করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত গ্রীষ্মকালে চারিদিকের আগাছা ও বন্যলতা সমূহ সর্ব্বদাই তুলিয়া পরিষ্কার রাখিতে হয়। হেমন্তকালে তুষারপাতের ভয়ে বীজ ভূমির উপরিভাগে আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত করিয়া অথবা চারা বৃক্ষের উপর ঝুড়ি ঝুড়ি পাতা নিক্ষেপ করিয়া সমগ্র স্থান উত্তমরূপে আবৃত করা হয়। এই হেতু কোন কোন অঞ্চলে চারা বৃক্ষগুলি ক্রমশই মৃত্তিকার দিকে নত হইয়া পড়ে এবং অল্পে অল্পে ভিজা মাটির উপর ঢলিয়া যায়। পরন্তু যে সমুদায় চারা বৃক্ষ এ প্রকার ঢলিয়া পড়ে তাহারাই পরিশেষে উত্তম স্থান অধিকার করিয়া থাকে। যাহাই হউক না কেন পর বৎসর মুকুল অঙ্কুরিত হইবার সময় আচ্ছাদন তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। ভারতবর্ষ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এ প্রকার কোন রূপ সাবধানতা অবলম্বন করিবার আবশ্যক নাই। তথায় গাছ আপনা হইতেই সতেজ ও সুদীর্ঘ হইয়া উঠিবে।

মুকুল অঙ্কুরিত হওয়ার পর বৎসর জুন মাসে, যখন চারা গাছগুলি লম্বা ও বড় হইয়া উঠে তখন চারাগুলি তুলিয়া অপর জায়গায় রোপণ করা হয়। অথবা পর বসন্তকালে নূতন মুকুল দেখা না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহা স্থগিত রাখা যাইতে পারে। কিন্তু কখন কখন বৃক্ষের সমুদায় পাতা ঝরিয়া পড়িয়া গেলে নূতন মুকুল আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব্বেই তাহা অন্যত্র রোপণ করিবার আবশ্যক অনুভূত হয়। কর্পূর বৃক্ষের পক্ষে শীঘ্র মুকুল হইলে যে পর্য্যন্ত না আবার নূতন মুকুলগুলি ফুটিয়া উঠে, সে পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া পরে অপর বৃক্ষের সহিত রোপণ করাই শ্রেয়ঃ।

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার দত্ত গুপ্ত।



কৃষক। আষাঢ়, ১৩১৫।

উই।

কীটশাস্ত্রে উইয়ের নাম Termes taprobanus; ইহা Insecta শ্রেণীর অন্তর্গত Neuroptera উপশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। নিউরোপটেরা উপশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত কীট সমূহের প্রধান লক্ষণ এই যে উহাদের চারিটি পক্ষ সমভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং বহু-শিরা-বিশিষ্ট। এই উপশ্রেণীর অপরাপর পরিচিত কীটের মধ্যে ঝিঁঝি পোকাই বিশেষ জানিত। শারীরিক গঠনের হিসাবে উই ও পিপীলিকার মধ্যে কোন সাদৃশ্য না থাকিলেও স্বভাবে ও সামাজিক প্রথায় উই ও পিপীলিকার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। গঠন প্রণালীর হিসাবে বরং আর্শলার সহিত উইএর কতকটা সামঞ্জস্য আছে।

উই ও পিপীলিকার সমাজবন্ধন, জাতি ও শ্রমবিভাগ প্রভৃতি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। উই সমাজে প্রধানতঃ তিনটি জাতি দৃষ্ট হয়—রাণী ও রাজা, শ্রমিক ও সৈনিক। উই আলোক সহ্য করিতে পারে না—মৃত্তিকার নিম্নেই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। যাহাকে উইএর ঢিপী বলা যায়, তাহা জমির উপরিভাগে নির্ম্মিত কোন প্রকার বাসগৃহ নহে। নিম্নভাগে গৃহ খনন করিবার সময় যে মৃত্তিকারাশি অপসারিত করা হইয়াছিল তাহারই স্তূপমাত্র। সমুদ্রের উপকূল হইতে ৩০০০ ফিট উচ্চ পর্য্যন্তও উইয়ের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কিন্তু সকল প্রকারের উই মৃত্তিকার নিম্নে গৃহ নির্ম্মাণ করে না। এমন কয়েক প্রকার উই আছে—তাহাদের প্রাদুর্ভাব এতদ্দেশে কম—যাহারা বৃক্ষের কোটরে, শুষ্ক কাষ্ঠ কিম্বা গৃহ সজ্জায়, এমন কি পুরাতন কাগজ পত্রের মধ্যেও বাসা করিয়া থাকে। এক প্রকার উই গাছের ডালেও বাসা করে, উহাদের বাসা কাল প্রস্তর খণ্ডবৎ ঝুলিতে থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উই সমাজে তিন জাতি আছে। তন্মধ্যে সৈনিক ও শ্রমিক ক্লীব। অবশ্য ক্লীব কীট দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং সন্তানোৎপাদনের জন্য পুং ও স্ত্রী কীট আবশ্যক। বর্ষার শেষে এক এক দিন যে অসংখ্য উড্ডীয়মান কীট দেখা যায় ঐ সমুদয়ই উইএর স্ত্রী ও পুং কীট। এই অগণিত কীট সমূহের মধ্যে অতি সামান্যই মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। ইহাদের শত্রু অনেক—পক্ষী, বাদুড়, কাঠবিড়ালী, ইন্দুর, বেঙ্গ, টিকটিকী এমন কি স্থানে স্থানে মানুষ পর্য্যন্তও এই সমস্ত কীট ভক্ষণ করিয়া থাকে। তামিল কুলীর নিকট উই পোকা ভাজা অতি উপাদেয় খাদ্য। এমন কি দুই এক জন সাহেবও বলিয়াছেন যে বেঙ্গের ছাতার ন্যায় উই পোকা সুস্বাদু। যাহা হউক যে সমস্ত উই পোকা পক্ষ বিস্তার করিয়া, বিবাহ উৎসবে মত্ত হইয়া শূন্যপথে বিচরণ করিতে থাকে, তাহাদের শতাংশের এক অংশের ভাগ্যেও বিবাহিত জীবনের সুখ সম্ভোগ ঘটিয়া উঠে না। যে সৌভাগ্যশালী দম্পতি পূর্ব্বোক্ত অগণিত শত্রুসমূহের হস্ত হইতে রক্ষা পায় তাহারা

প্রথমেই পক্ষগুলি অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করে। তাহার পর মৃত্তিকার ফাটে কিম্বা জমির অন্য কোন নিরাপদ স্থানে গমন করিয়া মৃত্তিকার উপরিভাগ হইতে অনতিদূরে গর্ত্ত করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করে। এই স্থানে স্ত্রী কীট ডিম পাড়িতে থাকে। প্রথম বারের সন্তানগণ উহাদের মাতা পিতা দ্বারা পালিত হয় কিম্বা নিকটবর্ত্তী অন্য কোন উপনিবেশ সংশ্লিষ্ট শ্রমিক কীট উহাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকে তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ শ্রমিক কীটগণই উহাদের পরিপালক। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত দম্পতি অতি অল্প দিনের মধ্যেই অসংখ্য শ্রমিক দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। এই দম্পতিই রাজা ও রাণী। ইহাদের জন্য কঠিন কাদা দ্বারা বিশেষ কক্ষ প্রস্তুত করা হয়। রাজা ও রাণী যাবজ্জীবন এই কক্ষেই বাস করে। এই কক্ষ হইতে চারিদিকে অসংখ্য বর্ত্ম নির্ম্মিত হয়। এই বর্ত্ম সমূহের ভিতর দিয়া শ্রমিকেরা রাজকীয় কক্ষে গমনাগমন করে, ডিম সমূহ ঐ স্থান হইতে লইয়া আইসে ও রাজকীয় দম্পতির সেবা শুশ্রূষা করে। ডিমগুলি অপসারিত করিয়া অন্য কক্ষে রক্ষিত হয় এবং যত দিন না কীড়া নিজ আহার সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় ততদিন পর্য্যন্ত শ্রমিকেরা উহাদের পোষণ করিয়া থাকে। রাণীর শরীর ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বতন আয়তন অপেক্ষা প্রায় এক শত গুণ বড় হয়। কিন্তু শরীরের সকল অংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। সম্মুখের অংশ যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। পশ্চাতের অর্থাৎ ভ্রূণকোষই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একটি পরিপুষ্ট রাণী দৈর্ঘে তিন ইঞ্চিরও অধিক হইয়া থাকে। পুং কীটের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। রাণীর ডিম্ব প্রসবের ক্ষমতা অদ্ভুত। মিনিটে প্রায় ৬০টি ডিম্ব প্রসব হয় এবং এক দিনে গড়ে ৮০,০০০ হাজার ডিম্ব প্রসব হয়। যতই পরিবার বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই নূতন নূতন বর্ত্ম ও কীড়া-পালন কক্ষ প্রস্তুত হইতে থাকে। এই সমুদয় বর্ত্মাপসারিত মৃত্তিকা উপরে ক্রমশঃ স্তূপীকৃত হইয়া ঢীপি প্রস্তুত হয়। বায়ু চলাচলের জন্য বাসার সর্ব্ব নিম্নস্তর হইতে ঢীপির উপরিভাগ পর্য্যন্ত নল প্রস্তুত হয়। এই নলের চতুঃপার্শ্বেই স্পঞ্জের ন্যায় গঠিত মৃত্তিকা পূর্ণ গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলিই কীড়া পালন কক্ষ। এই গুলিকে ইংরাজিতে Fungus Garden বলে। এবং এই সমুদয় পরিপাচিত উদ্ভিজ্জ্য পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। এতদ্ভিন্ন এই মৃত্তিকা সমূহ এক প্রকার ছত্রকের ছত্রকযোনি (Mycelium) দ্বারা পরিবেষ্টিত। কেবল উইএর বাসাতেই এই ছত্রক দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহারই ছত্রক যোনি ভক্ষণ করিয়া কীড়াগণ পরিপুষ্ট হয়। বাসার মধ্যে অসংখ্য কক্ষ সমূহ সূক্ষ্ম বর্ত্ম দ্বারা সংযোজিত। বর্ত্মসমূহের ভিতর দিয়া এক সময়ে একটি কীট মাত্র গমন করিতে পারে। পূর্ব্বে উই সমাজের বিভিন্ন জাতি সমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে। সমাজের অধিকাংশ কীটই ক্ষুদ্র, শ্বেত দেহ ও রক্তাভ মস্তকবিশিষ্ট—ইহারাই শ্রমিক। ইহারাই গৃহ-নির্ম্মাণ ও সন্তান লালন পালন করে এবং ইহারাই বৃক্ষাদির অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ইহারা ক্লীব। সৈনিকগণের মস্তক বৃহত্তর এবং চোয়াল বড়। ইহারাও ক্লীব, এবং ইহাদের কায শত্রু হইতে গৃহ রক্ষা। বর্ণ বিহীন মস্তকযুক্ত ক্ষুদ্রতর কীট সমূহ অপ্রাপ্ত বয়স সৈনিক ও শ্রমিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কয়েক জাতি ভিন্ন মলিন বর্ণের, অপূর্ব্ব পক্ষ বিশিষ্ট এক জাতীয় কীট পরিবারের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ইহারাই কালে পক্ষ

বিস্তার করিয়া স্ত্রী ও পুং কীট রূপে উড্ডীয়মান হয়। পরিবারের মধ্যে কতিপয় অর্দ্ধপুষ্ট স্ত্রী কীটও থাকে। কোনরূপ আকস্মিক ঘটনাদ্বারা রাণী বিনষ্ট হইলে ইহারা তাহার স্থান অধিকার করে। অনেক প্রকার উইএর শ্রমিকেরা অন্ধ। তাহারা কোনরূপ আবরণের অন্তরালে কার্য্য করিয়া থাকে। যখন উহারা বাসা ছাড়িয়া দূর স্থানে যাইতে বাধ্য হয়, তখন বর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া যাতায়াত করে। পূর্ব্বে যে কাল উইএর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, উহাদের শ্রমিকগণ চক্ষু বিশিষ্ট। উহারা বর্ত্ম প্রস্তুত করে না।

উইএর অন্যায় ব্যবহারের বিষয় আমরা বাল্যকাল হইতেই অবগত আছি। কিন্তু উই যে 'যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার', এ কথাটা বলিলে উইএর উপর অনেকটা অন্যায় দোষারোপ করা হয়। জীবন্ত এবং সুস্থ উদ্ভিদতন্তু উই দ্বারা সাধারণতঃ আক্রান্ত হয় না। রোগগ্রস্ত ও মৃত উদ্ভিদাংশই উইএর স্বাভাবিক আহার্য্য। অবশ্য উই উক্তরূপ স্থান আক্রমণ করিলে বৃক্ষের সুস্থ ও সবল অংশ কতক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু উইএর আক্রমণ এ স্থলে গৌণ কারণ। বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশে আম্র ও গুজরাটে লঙ্কা বিশেষরূপে উই দ্বারা আক্রান্ত হয়। ভারতবর্ষের নানাস্থলে ইক্ষু, গোধূম, চিনের বাদাম, ধান, পাট, অরহর এবং অন্যান্য শাক সব্জীও উইএর জন্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু গৃহসজ্জা ও গৃহ নির্ম্মাণের দ্রব্যাদিই উই দ্বারা সমধিক পরিমাণে নষ্ট হয়।

যাহা হউক উইএর প্রতিকারের প্রকৃত উপায় উইএর বাসা একবারে ধ্বংশ করা। কিন্তু অনেক সময় যে স্থলে উইএর আক্রমণের চিহ্ন দেখা যায়, সে স্থান হইতে উইএর বাসা অনেক দূরে অবস্থিত। যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে একটি পরিবারস্থ অর্থাৎ এক ঢীপির অন্তরস্থ সমস্ত কীট মরিয়া যায় তৎসমুদয়ই উই নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। কয়েক প্রকারে এই রূপে এক পরিবারভুক্ত সমস্ত উই নষ্ট করিতে পারা যায়, যথা—(১) যথেষ্ট জল প্রয়োগদ্বারা; ইহাতে কীটসমূহ ডুবিয়া মরিয়া যায়। (২) বাসা খুঁড়িয়া অগ্নি প্রয়োগ দ্বারা বিনষ্ট করা—(৩) কার্ব্বণ-বাই-সল্ফাইড প্রয়োগ— ৪) গন্ধক ও আর্সেনিক ধূম প্রয়োগ। প্রথমোক্ত দুইটী উপায় সম্বন্ধে বিশেষ বলা অনাবশ্যক। তৃতীয় উপায় অবলম্বন করিতে হইলে বাসার এক বা ততোধিক মুখ কাদা দিয়া বন্ধ করিয়া কার্ব্বণ-বাই-সল্ফাইডে পাট ভিজাইয়া উহা অপর গর্ত্তের মুখে দিতে হয়। কার্ব্বণ-বাই-সল্ফাইড বাতাস অপেক্ষা ভারী, সুতরাং উহা ক্রমশঃ নীচে নামিয়া যায়। কার্ব্বণ-বাই-সল্ফাইড সকল প্রকার জন্তুর পক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ এতদ্ভিন্ন ইহা অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র উপিয়া যায়। এই সমস্ত কারণে কার্ব্বণ-বাই-সল্ফাইড প্রয়োগে উই সমূহ সমূলে বিনষ্ট হয় বটে কিন্তু কার্ব্বণ-বাই-সল্ফাইড অতীব সহজদাহ ও অনেক স্থলে দুষ্প্রাপ্য। তজ্জন্য কার্ব্বণ-বাই-সল্ফাইড অপেক্ষা চতুর্থ উপায় অনেকে উৎকৃষ্টতর মনে করেন। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় Universal Ant Exterminator নামক একটি কল আবিষ্কৃত হইয়াছে উহা দ্বারা উই ও পিপীলিকা অনায়াসে বিনাশ করিতে পারা যায়। এই যন্ত্রে একটি কয়লার উনুনের সহিত একটি এয়ার পাম্প সংলগ্ন আছে। উনানের উপর এক চামচা গন্ধক ও সেঁকো (গন্ধক শতকরা ১৫ ভাগ+সেঁকো ৮৫ ভাগ) ফেলিয়া দিয়া মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাসার অপরাপর সমস্ত মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া একটি মুখের ভিতর

পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের সহিত সংযোজিত নল ঢুকাইয়া দিতে হয়। তাহার পর পাম্প করিলে গন্ধক-সেঁকো বাষ্প বাসার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কয়েক মিনিট উত্তমরূপ পাম্প করার পর নলটি সরাইয়া লইয়া গর্ত্তের মুখ ও অন্যান্য ফাট প্রভৃতি বেশ করিয়া কাদা দিয়া প্রায় এক সপ্তাহ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। তাহাতে সমস্ত পোকা মরিয়া যায়। এই কলের মুল্য ৭৫৲ টাকা এবং পাইবার ঠিকানা Messrs S. Henwood, Son, Soulter & Co., Durban। যে সমস্ত গাছ উই দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহাদের মৃত অথবা অসুস্থ ডাল পালা কাটিয়া ফেলিতে হয়। গাছের নিম্নভাগে কেরোসিনের জল ছড়াইয়া দিলে উই আসিতে পারে না। ১ ভাগ কেরোসিন ২০ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। মিশ্রিত করিতে হইলে অনেকক্ষণ উত্তমরূপে নাড়া আবশ্যক। নতুবা তৈল ও জল সহজে মিশ্রিত হয় না।

তামাক ও সাবানের জল প্রয়োগেও উইএর আক্রমণ নিবারিত হয়। গুজরাটে উই নিবারণের জন্য আমগাছে গেরি মাটির প্রলেপ দিয়া থাকে। স্যানিটারি ফ্লুইড নামক ঔষধের দ্রাবণেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ক্ষেত্রস্থ ফসলের উই নিবারণের প্রধান উপায় ঢীপি নষ্ট করা। যে স্থলে ঢীপি দেখিতে পাওয়া যায় না, সে স্থলে চাষের বিশেষ প্রণালী অবলম্বন আবশ্যক। ইক্ষু ঝাড় হইতে ইক্ষু তুলিয়া রোপণ করিতে হইলে, রোপণ করিবার পূর্ব্বে স্যানিটারি ফ্লুইড, সাবান, কেরোসিন অথবা তুঁতের মিশ্রণে ডুবাইয়া লইলে তাহাতে সহজে উই ধরে না। রেড়ীর খৈল, হিং, দিকামালী আটা প্রভৃতিও কিয়ৎ পরিমাণে উই নিবারক। সেচনের জলের সহিত বিষাক্ত দ্রব্য মিশাইয়া দিলে ক্ষেত্রের অনেক উই বিনষ্ট হয়। সেচনের জলের সহিত মিশাইতে হইলে যে স্থান হইতে জল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে সেই রূপ স্থলে বিষাক্ত পদার্থ (কঠিন হইলে থলের ভিতর ও তরল হইলে টিনে) রাখিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে অল্প অল্প মাত্রায় উহা জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। গুজরাটে আকন্দ, কালজীরা, নিম ও রেড়ীর খৈল মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রয়োগ করা হয়। ক্রুড্ তৈল মিশ্রণ, স্যানিটারি ফ্লুইড, কেরোসিন অথবা কেরোসিন মিশ্রণও টিনে করিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। শুষ্ক অথবা অসম্পূর্ণভাবে বিগলিত ক্ষেত্রজ সার উইএর খাদ্য! যাহাতে ঐ প্রকার সার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

পত্রাদি।

নারিকেলের রোগ।

ডায়মণ্ডহারবার হইতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন যে সুন্দরবনে অনেক নারিকেল গাছ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মরিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের অনেক স্থলে বিশেষতঃ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ও সিংহলে নারিকেলের কয়েক প্রকার ছত্রক রোগ দেখা দিয়াছে।

১। প্রথম প্রকার রোগ Metasphoeria গণের (Genus) ছত্রক বিশেষ জনিত। ইহাতে মাথার মাঝামাঝি অংশের ২।১টি পত্র অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ শুকাইয়া মরিয়া যায়। শুকাইয়া যাইবার পূর্ব্ব হইতেই পাতা গুলি পীতবর্ণ হয়। ব্যাধি ২।১ বৎসর হইলে নারিকেল অপক্ক

অবস্থায় পড়িয়া যায় এবং শাঁসও ভাল হয় না। গাছ ক্রমশঃ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া ৫ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে একেবারেই শুষ্ক হইয়া যায় এবং মাথা খসিয়া পড়ে। শুপারি গাছের এই রোগ হইলে উহা অপেক্ষাকৃত অল্প দিনের মধ্যে মরিয়া যায়। মৃত্তিকায় এই রোগ বীজাণু অবস্থিতি করে। আক্রান্ত বৃক্ষের সমস্ত অংশ বিশেষতঃ মূল ও নিকটবর্ত্তী মৃত্তিকা পোড়াইয়া ফেলাই প্রশস্ত। যে স্থানে রোগ দেখা দিয়াছে সে স্থান হইতে মৃত্তিকা স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া আদৌ উচিত নহে।

২। Thielaviopsis ethaceticus নামক ছত্রকও নারিকেল গাছ আক্রমণ করে। ইহাকে ইংরাজীতে Bleeding disease বলে। গাছের গায়ে কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কাণ্ড একেবারেই ভুয়া হইয়া যায় এবং ৫ বৎসরের মধ্যেই গাছ মরিয়া যাইতে পারে। বাহিরে অনেক সময় কোন লক্ষণই দৃষ্ট না হইতে পারে।

আর এক প্রকার ধসায় গাছের অন্তমূল পচিয়া গিয়া গাছ একেবারেই মরিয়া যায়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ায়ও এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে ইহা Pestalozzia palmarum (Cooke) নামক ছত্রক জনিত। অনেক রোগ বিষের মত। বৃক্ষ এই রোগাক্রান্ত হইলে রোগ উপশমের আর কোন উপায় নাই। গাছ কাটিয়া ফেলাই প্রশস্ত। তৎপরে আক্রান্ত গাছগুলি পোড়াইয়া ফেলিলে রোগ বিস্তারের অধিক আশঙ্কা থাকে না। এতদ্ভিন্ন সময়ে সন্দেহ যুক্ত গাছের অগ্রভাগ তুঁতের জল দ্বারা বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলা আবশ্যক। বস্তুতঃ অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে রোগ নিবারণ দুঃসাধ্য।

চীনা ধান্য ঃ—মাঘ, ফাল্গুন কিম্বা শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে চীনা ধান্যের বুনানি হয়। আশু ধান্যের ক্ষেত্র লাল চিটা হইলে তাহাতে আর ধান্য জন্মে না। ঐ লাল চিটা ক্ষেত্রে দোয়ার চাষ দিয়া চীনা বপন করা হয়। বপনের পর অন্য কোন রূপ পাইট করিতে হয় না। বুনানির পর ষাট দিনের মধ্যে পাকিয়া থাকে। বীজের পরিমাণ বিঘা প্রতি ✓১ সের।

রেড়ী ঃ—উচ্চ দোঁয়াশ জমি ইহার পক্ষে প্রশস্ত। গাছ তিন বৎসর থাকিতে পারে। আকার ভেদে ছোট, মধ্যম ও বড় তিন জাতীয় রেড়ী আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে চুনাকি, গোহুমা ও জাগিয়া। চুনাকি বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, গোহুমা কার্ত্তিক ও জাগিয়ার বীজ আষাঢ় মাসে বপন করা হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি বীজের পরিমাণ (বড় জাতীয়) ✓১ সের।

মেহগি ঃ—চাষের কোন বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক নাই। বর্ষার সময় গাছ বসাইয়া প্রথমত গবাদি পশু হইতে রক্ষা করিতে হইবে। গোবর সার প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সঃ কৃঃ।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র লাল সিংহ।

কলের লাঙ্গল ঃ—কলের লাঙ্গল এদেশের পক্ষে তেমন উপযুক্ত নয়। কলের লাঙ্গল কয়েক স্থানে পরীক্ষা হইয়াছে। তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার মিঃ অর্চ্চিহিলস্ ও দেরাদুনের মিঃ আরমষ্ট্রংএর পরীক্ষা উল্লেখ যোগ্য। যে স্থানে শ্রমিকের পারিশ্রমিক অত্যন্ত অধিক এবং অনেক পরিমাণ জমি এক সঙ্গে চাষ করিতে হয়, সেই স্থানেই কলের লাঙ্গলে লাভ হয়। ইংলণ্ডে কলের আপেক্ষিক কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যে সমুদয় পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে অশ্ব পরিচালিত লাঙ্গল অপেক্ষা কলের লাঙ্গলের কার্য্যকারিতার অনুপাত ১০ : ৯। আমেরিকার চিকাগো সহরের

Moutgonry Ward & Co.র নিকট কলের লাঙ্গল পাওয়া যায়। মূল্য ৫০০৲ শত টাকার কম নহে। সঃ কৃঃ।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

তুলার আবাদ।—জুলাই ১৯০৮।—রেওয়ায়। আকাশে মেঘ আছে কিন্তু বারিপাত হইতেছে না। তুলার বীজ বপন কার্য্য ও খাদ্য শস্যের আবাদ সুচারুরূপ চলিতেছে।

অমরাবতী। তুলার বীজ বপন হইতেছে।

খামগাঁও। আশু বৃষ্টির খুব সম্ভাবনা। তুলার বপন কার্য্য ভালরূপ অগ্রসর হইতেছে।

ধুলিয়া। আকাশ মেঘাবৃত। ভালরূপ রৌদ্র না হওয়ায় তুলার গাছ খারাপ হইতেছে।

জাগাঁও। এখানে আবাদোপযোগী বৃষ্টি হইয়াছে। এখনও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তুলার বপন কার্য্য সুন্দররূপ চলিতেছে কিন্তু আপাততঃ বৃষ্টি বন্ধ হওয়া দরকার হইয়াছে।

ব্রোচ।—উপযুক্ত পরিমাণ বর্ষণ হইয়াছে। এখনও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

ওয়াধওয়ান। সর্ব্বত্র বৃষ্টিপাত হইয়াছে। আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হইতেছে। আকাশ পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। তুলার আবাদ ভাল চলিতেছে।

ধোলেরা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কিন্তু বৃষ্টি নাই। তুলার চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

ভাবনগর। বৃষ্টি হয় নাই, শীঘ্র হইবার খুব সম্ভাবনা। তুলা বীজ বপন আরম্ভ হইয়াছে।

বারসী। আকাশে মেঘ ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। তুলা চাষ বেশ চলিতেছে।

সোলাপুর ও হুবলী। আকাশে মেঘ আছে কিন্তু বৃষ্টি নাই। তুলার আবাদ আরম্ভ হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে বিগত মাসে শস্যের অবস্থা।—সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়াছে। ক্ষেত্রের বর্ত্তমান ফসলের অবস্থা ভাল। সকল স্থানেই পাট নিড়ান শেষ হইয়াছে। ত্রিপুরা ও পাবনার পাট কাটা আরম্ভ হইয়াছে। ছয়টী জেলায় আউস ধান্য কাটা হইয়া গিয়াছে। ৭টী জেলায় আমন ধান্যের চারা রোপণ আরম্ভ হইয়াছে। চাষের আবাদও আশাপ্রদ।

বাখরগঞ্জ, রাজসাহী, মালদা, শ্রীহট্ট, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে, দারাঙ্গ ও গোয়ালপাড়ায় গবাদি পশুর রোগাক্রমণের কথা শুনা যায়।

মোটা চাউলের দর ৮টী জেলায় চড়িয়াছে। ১৩টী জেলায় কিছু কমিয়াছে।

পাটের আবাদ।—১৯০৮ বর্ত্তমান বর্ষে ৫,৭৪,৩০০ একর পরিমিত ভূমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। ১৯০৭ সালে ৯,৩১,২০০ একর পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত কুচবিহারে ৩০,০০০ একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছে। বিগত বর্ষে ৩২,০০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছিল।

পূর্ণিয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ পাটের চাষ হয়। সমস্ত প্রদেশের উৎপন্ন পাটের প্রায় ⅓ অংশ পাট পূর্ণিয়ায় জন্মায়।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের এবৎসর অপেক্ষাকৃত কম জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। বিগত বর্ষে ৩০,১০,৮০০ একর জমিতে পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ২০,৬৩,৯০০ একর জমিতে পাট বোনা হইয়াছে। সর্ব্বসমেত বঙ্গদেশে এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম একত্রে ২৮,৬৮,২০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। বিগত বৎসর অপেক্ষা শতকরা ২৮ ভাগ কম জমিতে বর্ত্তমান বর্ষে পাটের আবাদ হইয়াছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

শ্রাবণ মাস।

সব্জী বাগ।—এই সময় শাকাদি, সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শশা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই, বরবটী, বেগুন, শাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি সব্জী বীজ বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই।

এ বৎসর বর্ষা নাবি সুতরাং মোকাই (ছোট) এবং দে-ধান চাষের এখনও সময় যায় নাই।

ফুল বাগিচা।—দোপাটী, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা), এমারন্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (sun-flower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল বীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাত্লা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, জুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল কাটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, জুঁই, বেল প্রভৃতি ফুল-গাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখনও বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ নানাপ্রকার লেবু গাছের গুলকলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এই রূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের গাছের ফেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তরমত গজাইতে পারে।

শস্য ক্ষেত্র।—কৃষকের এখন বড় মরশুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পূর্ব্ব বঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ বঙ্গে পাট নাবি হয়। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাসে বীজ ধান্য বপনের উপযুক্ত সময়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি বিচলিত করা কর্ত্তব্য। গুপারী গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোময় দিলে বিশেষ উপকার পাইবার

সম্ভাবনা। হাড়ের গুঁড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা এই সময় বিশেষ আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাও, কোন গাছের গোড়ায় অনবরত জল বসিতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার তেউড় এমাসে পুতিলেও হইতে পারে। বেগুন, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটী ধরাইয়া দিবে। আখের গাছে কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতেই হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কায় ঝাল হয় না। যে দোয়াঁশ মাটীতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে, সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁক আলুর বীজ পুতিবে। শাঁক আলুর ক্ষেত সর্ব্বদা আলগা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষে কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউস ধান কাটে।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

লাল আলুর রোগ।—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের আলবামা প্রদেশে যথেষ্ট পরিমাণে লাল আলুর চাষ হয়। সেখানে লাল আলু সাত প্রকার রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এই সমস্ত রোগের মধ্যে দুই একটি আমাদের দেশে অপরিচিত নহে। রোগসমূহের প্রকৃতি ধসার ন্যায় এবং সমস্তই ছত্রক জনিত। 'কাল ধসা',—প্রথমে মূলে হরিদ্রাভ কিম্বা পাটকিলে দাগ দেখা যায়, তাহার পর সমস্ত মূলই কাল হইয়া যায়। ইহা ছোট গাছেও হয়। "শুষ্ক ধসা",—ইহাতে মূলের মাথার দিক শুকাইয়া যায় এবং ছোট ছোট ব্রণ দ্বারা আবৃত হয় পরে সমস্ত মূলেই ঐ সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। 'স্কারফ',—প্রথমে পাটকিলে দাগ দেখা যায়। উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মূলের অধিকাংশ ভাগ শুষ্ক করিয়া দেয়। 'নরম ধসা,' ইহা প্রায় গুদামেই দেখা দেয়, ইহাতে আলু পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয়। 'মাটি ধসা,' ছোট ছোট মূলাংশুদ্বারা ইহা মূলে প্রবেশ করে। 'ডাঁটা ধসা,' প্রথমতঃ জমির উপরিভাগের কাণ্ডাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দিকেই অগ্রসর হয়। 'সাদা ধসা' ইহাদ্বারা মূল ক্রমশঃ সাদা সাদা গুঁড়ায় পরিণত হয়। শেষোক্ত ব্যারামোৎপাদক ছত্রকের নাম এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। প্রথমোক্ত ছয়টি ব্যারাম যথাক্রমে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার ছত্রক দ্বারা উৎপাদিত হয়:—Ceratocystis fimbriata, Phoma Batatae, Monilochaetes infuscans, Rhizopus nigricans, Aerocystis Batatus ও Nectria Ipomeae।

ছায়ার উপকারিতা।—তামাক, আনারস প্রভৃতি গাছ আওতায় (তাঁবু কিম্বা চালার ভিতর) চাষ করার প্রথা মার্কিন দেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তাঁবুর ভিতর শৈত্য অনেক পরিমাণে রক্ষিত হয়। অনাবৃষ্টির সময় ইহাতে বহুল পরিমাণে উপকার দর্শে। বাহিরের উত্তাপ হইতে তাঁবুর ভিতরের উত্তাপ সাধারণতঃ ১°—৩° ডিগ্রি বেশী হয়। তাঁবুর ভিতরের গাছের বাহিরের গাছ অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি হয় এবং ফসলও শীঘ্র তৈয়ারী হয়। কিন্তু ওজনের হিসাবে একার প্রতি উৎপন্ন বাহিরের গাছ ভিতরের গাছ অপেক্ষা ১ মণ দশ সের অধিক ভারী। সম্ভবতঃ পাতাগুলি স্থূলত্ব অপেক্ষা আয়তনে অধিক বৃদ্ধি হওয়াই ইহার কারণ।

লেবুর ধসা।—আমাদের দেশে সাধারণতঃ এত লেবুর চাষ হয় না যে বিক্রয়ের পূর্ব্বে উহাদিগকে গুদামে রাখিতে হয়। কিন্তু ক্যালিফর্ণিয়া প্রভৃতি দেশে, যেখানে অনেক লেবু গুদামে থাকে, সেখানে লেবুর এক প্রকার ধসা রোগ দৃষ্ট হয়। এই রোগে প্রচুর পরিমাণ ক্ষতিও হইয়া থাকে। ইহা Pythiacystis citropthora নামক ছত্রক দ্বারা উৎপাদিত হয়। ইহার বীজ (Spore) গাছের নীচে মৃত্তিকার উপরেই পরিপুষ্ট হয়। বর্ষাকালে কতকগুলি ফল গাছে থাকিতে থাকিতেই আক্রান্ত হয় এবং অন্যগুলি ধুইবার সময় টবের জলস্থিত বীজ দ্বারা আক্রান্ত হয়। বলা বাহুল্য যে ধুইবার সময় টবে বহুসংখ্যক রোগ বীজানু সঞ্চিত হইতে থাকে। রোগ এক ফল হইতে অন্য ফলে অতি শীঘ্র সঞ্চারিত হয় এবং অল্প দিবসের মধ্যেই এক বাক্সের অথবা স্তুপের অধিকাংশ লেবু খারাপ হইয়া যায়।

ব্রহ্মদেশের খনিজ পথার্থ।—১৯০৭ সালের বিবরণীতে প্রকাশ যে ২,৩৮০ জন কেরোসিন তৈলের ব্যবসায়ে খাটিতেছে. মূল্যবান প্রস্তর সঞ্চয়ে ১,৩৫৬ জন, সোণার খনিতে ১৪১ জন এবং টিন আহরণে ৭৫ জন খাটিতেছে।

খনি হইতে উত্তরোত্তর অধিক সোণা পাওয়া যাইতেছে,—১৯০৬ সালে ২,৩০১ আউন্স যাহার মূল্য ১,৩২,৮৩০৲ টাকা, পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ২,২৩,৮৪৪৲ টাকা মূল্যের ৩,৮৩৮ আউন্স সোণা পাওয়া গিয়াছে। এদ্ব্যতীত এতদ্দেশীয় লোকেরা নদীর স্রোতাদি হইতে সোণা সংগ্রহ করিয়া থাকে।

উৎপন্ন কেরোসিন তৈলের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে।

	গ্যালন	মূল্য
১৯০৭	১৪৮,৮৮৮,০০২	৮৯,৯৩,৮২৬৲ টাকা
১৯০৬	১৩৭,৬৫৪,২২১	৮৪,৬৯,৯৯৫৲ ,,
১৯০৫	১৪২,০৬৩,৮৪৬	৮৮,৯১,২০৭৲ ,,

হীরক প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তর যাহা পাওয়া যায় তাহার ব্যবসা এত সামান্য যে তাহা উল্লেখ যোগ্য নহে। মূল্যবান প্রস্তরের মধ্যে রুবীই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ১৯০৭ সালে ১৭,৩১,৯৭৭৲ টাকা মূল্যের রুবি সংগৃহিত হয় এবং এইজন্য ২,৯৭,৭৪০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। গত পূর্ব্ব বর্ষে ২,৬১,৬২৩৲ টাকা রাজস্ব পাওয়া গিয়াছিল।

১৯০৭ সালে টীন উত্তোলন কার্য্য বন্ধ ছিল, ১৯০৬ সালে ৭৫ টন ৬¾ হন্দর মাত্র টীন উত্তোলিত হইয়াছিল। এই টীনের মূল্য ১,৭২,৮২৯৲ টাকা মাত্র। উৎপন্ন টীনের পরিমাণ এত সামান্য হইলেও ব্রহ্মের মারগুই প্রদেশে টীন ব্যবসায়ের পন্থা প্রশস্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। খনিতে কার্য্যকারী মজুর সংগ্রহ করিতে পারিলে এই ব্যবসা উত্তমরূপ চলিবে।

ভারতে রেল বিস্তার।—১৯০৭ সালে ৯২৪ মাইল রেল লাইন খোলা হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ৩০,০১০ মাইল রেল লাইনে আরোহী ও মাল গাড়ী চলাচল করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ২৯০ মাইল রেল লাইন খুলিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে অতএব দেখা যাইতেছে যে ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৩০,২০৬ মাইল রেল লাইনে গাড়ী যাতায়াত করিবে। তদ্ব্যতীত ২,৫১৬ মাইল রেল লাইন নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে।

১৯০৭ সালে খোলা লাইন গুলিতে ৩৯,৮৪৩·১৫৲ লক্ষ টাকা, নূতন লাইন নির্ম্মাণ কার্য্যে ২৪২·৩৫৲

লক্ষ টাকা এবং রেল সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যে ৪৪·০৬৲ লক্ষ টাকা খাটিতেছে অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ৪০,১৬৯·৫৬৲ লক্ষ টাকা খাটিতেছে।

১৯০৭ সালে ২২৯ খানা এঞ্জিন, ৭৩৬ খানা আরোহী গাড়ী এবং ৬,১১৮ খানা মাল গাড়ী বাড়িয়াছে এবং ৫১৪ খানা এঞ্জিন, ১,৮৭৯ খানা আরোহী গাড়ী অনতি বিলম্বে বৃদ্ধি করা হইবে।

১৯০৭ সালে সমগ্র ভারতীয় রেলের মোট আয় ৪,৭২৬·৮৭৲ লক্ষ টাকা, অতএব দেখা যাইতেছে যে, ১৯০৬ সালে আয় ৪,৪১১·৭৩৲ লক্ষ টাকার তুলনায় ৩১৫ ১৪৲ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। এই বৎসর খরচের মাত্রাও কিছু অধিক হইয়াছিল, তথাপিও খরচ বাদে ২,২৯৮·২৮৲ লক্ষ টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। উক্ত বৎসরে কাবুলের আমীর ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসায় এবং কলিকাতায় শিল্প প্রদর্শনী খোলা হওয়ায় এবং যুক্ত প্রদেশে ও বিহারে দুর্ভিক্ষের জন্য শ্রমজীবিগণ ইতঃস্ততঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য হওয়ায় রেল যাত্রীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

	রেলযাত্রী	আয়
১৯০৭	৩০·৫৮৯ কোটী	১,৫০৪·৫০৲ লক্ষ টাকা
১৯০৬	২৭·১০৬ ,,	১,৩৬৮·৩১৲ ,,

১৯০৭ সালে খাদ্যশস্য ও কলাই প্রভৃতির রেলে রপ্তানি অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃদ্ধির পরিমাণ ৬১৮ সহস্র টন অর্থাৎ ৮৫·২৮৲ লক্ষ টাকা। নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ হেতু রেলযোগে নানা স্থানে শস্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল, ইহাই রেলে শস্য রপ্তানি বৃদ্ধির এক মাত্র কারণ।

তিসি, রেড়ী, সরিষা, রাই ও তুলা বীজ ইউরোপে সমধিক পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছিল। ঐ সমস্ত তৈল শস্যের রেলযোগে রপ্তানি বাড়িয়াছে। বৃদ্ধির পরিমাণ ৬২০ সহস্র টন অর্থাৎ ৩৪ ৬১৲ লক্ষ টাকা। তুলাও অধিক পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানি হইয়াছে; সুতরাং ২৫৫ সহস্র টন অর্থাৎ ২৮·৫৭৲ লক্ষ টাকা অধিক রেল মাশুল তুলা হইতে পাওয়া গিয়াছে।

রেলে কয়লা রপ্তানিও বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯০৬ সালে ৯০·৭৮৲ লক্ষ টন কয়লা খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল। ১৯০৭ সালে উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ ১১০·১৫ লক্ষ টন। এই কয়লা প্রধানতঃ কলিকাতা হইতে বোম্বাই, করাচি ও মান্দ্রাজে প্রেরিত হইয়াছে।

আকবরের রাজস্ব-নীতি।—রাজস্ব সম্বন্ধে আকবরের নীতি বিশেষ বিদ্যাবত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সাম্রাজ্যের ভিতরে সমস্ত জমি মাপ করাইয়াছিলেন। বিঘা প্রতি আনুমানিক উৎপন্ন স্থির করিয়া উহার ভিতর হইতে রাজার প্রাপ্য অংশ নির্দ্দিষ্ট ও উহার মূল্য ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন। বাদসাহ স্থানে স্থানে গোশালা ও ভাবী দুর্ভিক্ষ হইতে প্রজা-রক্ষা জন্য শস্য-গোলা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কৃষি-কার্য্যে উৎসাহ দিয়া কৃষকের দারিদ্র নিবারণে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন কি আবশ্যক হইলে প্রজাগণকে বীজধান্য সরকার হইতে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ভূমিকে ৫টি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দিয়া গতপূর্ব্ব ১৯ বৎসরের শস্যের মূল্যের হার ধরিয়া প্রজার দেয় খাজনার পরিমাণ ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন এবং বর্ষে বর্ষে খাজনা বন্দোবস্ত না করিয়া প্রতি দশ বৎসরের জন্য সরাসরি মতে প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্তের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিচারের জন্য কাজি ও তাহাদের উপরে সদর উপাধিধারী বিচারক নিয়োগ করিয়া দেন। যখনই রাজ-কর্ম্মচারীকর্ত্তৃক উৎকোচ গ্রহণের বা অত্যাচারের সংবাদ পাইতেন, তখনই তাহাকে কঠোরশাস্তির সহিত বিদায় করিয়া দিতেন। ইহাতে রাজস্ব আদায়কারী কর্ম্মচারী সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত, প্রজাগণও অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইত। জমি মাপিবার জন্য বাদসাহ নবনব উৎকৃষ্ট যন্ত্রের সাহায্য লইতেন। কথিত আছে বাদসাহ প্রতি বিঘায় দশ সের পরিমাণ কর (royalty) গ্রহণ করিতেন। পরে ঐ শস্যাংশের পরিবর্ত্তে মূল্য-গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হয়।

REGISTERED No. C 709.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

নবম খণ্ড,—চতুর্থ সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,
সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।
ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্‌।

শ্রাবণ, ১৩১৫।



মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌;
১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।



কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

কৃষক।

৯ম খণ্ড। শ্রাবণ, ১৩১৫ সাল। ৪র্থ সংখ্যা।

গোরুর এঁসো রোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পীড়িত পশুকে আবর্জ্জনা বিহীন দুর্গন্ধ শূন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোয়ালে বা গাছের ছায়ায় রাখিবে; গোয়ালের মেজেটী যাহাতে স্যাঁতসেঁতে হইতে না পারে ও যাহাতে গোয়াল ঘর দিয়া বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিবে।

৩।৪ দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন দিবসে ২ বার নিম্নলিখিত ঔষধের কোনটী খাওয়াইয়া দিবে।

১।	সোরা	... ...	১$\frac{১}{৪}$ তোলা
	নিশাদল	... ...	১$\frac{১}{৪}$,,
	জল	... ...	⁄১$\frac{১}{২}$ সের

একবারের ঔষধ।

২।	কর্পূর	... ...	১$\frac{১}{২}$ তোলা
	সোরা	... ...	১$\frac{১}{২}$,,
	দেশী মদ*	... ...	৵০ ছটাক
	জল	... ...	১$\frac{১}{২}$ সের

প্রথমে দেশী মদে কর্পূর গলাইয়া লইবে।

একবারের ঔষধ।

৩।	সোরা	... ...	২$\frac{১}{২}$ তোলা
	লবণ	... ...	$\frac{১}{২}$ ছটাক
	চিরেতার গুঁড়া	...	২$\frac{১}{২}$ তোলা
	গুড় (ইক্ষু)...	...	৵০ ছটাক
	জল	... ...	২$\frac{১}{২}$ সের

দুই বারের ঔষধ।

উপরোক্ত ঔষধের $\frac{১}{৮}$ (অষ্টম) ভাগ বাছুরকে খাওয়াইবে এবং বাছুরের গায়ে বস্ত্র (ছালা, চট বা কম্বল) বান্ধিয়া দিবে। এঁসো রোগগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ বাছুরকে খাইতে দিবে না এবং রোগ শূন্য গাভীর দুগ্ধ ⁄৷৹ আধ সের পরিমাণ প্রত্যহ বাছুরকে খাওয়াইয়া দিবে। বড় বড় বাছুরদিগকে চাউল ধোয়া জল, ফেন বা ছাতুর মণ্ড ৻৫ এক কাচ্চা পরিমাণ লবণের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে। পীড়িত গোরুদিগকে দুর্ব্বা প্রভৃতি কোমল টাট্‌কা ঘাস, ফেন, চাউল ধোয়া জল, ছাতুর মণ্ডও ৻১০ দুই কাঁচ্চা পরিমাণ লবণ প্রত্যহ খাইতে দিবে। দিবসের মধ্যে ২।৩ বার গরম জল দিয়া মুখ ধোয়াইয়া নিম্নলিখিত ঔষধের যে কোনটি দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করাইবে এবং এই সময়ে রোগা গোরুকে শুষ্ক খড়, কুটা ইত্যাদি দ্রব্য খাইতে দিবে না, কেন না শক্ত বিচালী খাইলে মুখের ঘা বিস্তৃত হয় এবং মুখে বেদনা হয়।

মুখ প্রক্ষালনকারী ঔষধ।

৪।	ফিট্‌কারী চূর্ণ	...	১¼ তোলা
	জল ...	...	১০ ছটাক

দ্রব করিয়া মুখ শোধনের জন্য ব্যবহার করিবে।

৫।	সোহাগা চূর্ণ	...	১¼ তোলা
	জল ...	...	১০ ছটাক

দ্রব করিয়া মুখ শোধনের জন্য ব্যবহার করিবে।

দুধাল গাভীকে ৪ নং ঔষধ দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করাইবার কালীন, উক্ত ঔষধ কিয়ৎ পরিমাণে তাহার উদরস্থ হইতে পারে এবং ইহাতে দুধ কমিয়া যাইতে পারে। দিবসে ২।৩ বার পীড়িত পশুটীর মুখ প্রক্ষালন করাইতে অসুবিধা ভোগ করিলে ও যাহারা ফিটকারীর জল দিয়া দুধাল গাভীর মুখ প্রক্ষালন করাইতে অনিচ্ছুক তাহারা প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে পানীয় জলের সহিত ১¼ তোলা পরিমাণ খদির প্রত্যেক বারে গোরুকে খাওয়াইবে। খদির খাওয়াইয়া কোষ্ঠ বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইলে প্রত্যহ ২ দুই ছটাক পরিমাণ গুড় পানীয় জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে।

দিনে দুইবার নিমপাতা দিয়া জল গরম করিয়া উক্ত জল দিয়া পাগুলি ধোয়াইয়া দিবে এবং ক্ষুরের মাঝখানের ময়লা বাহির করিয়া লইবে। পরে নিম্নলিখিত ঔষধের যে কোন ঔষধ ঘায়ে লাগাইয়া দিবে ও ক্ষত স্থানে পটি বাঁধিয়া দিবে। পা ফুলিয়া গেলে কুসুম কুসুম গরম বালির সেঁক দিবে। অতি সামান্য ঘা হইলে পীড়িত পশুটীকে কাদা মাটীতে বান্ধিয়া রাখিলে ২।৩ দিনের মধ্যে পায়ের ঘা সারিয়া যায় কিন্তু ক্ষুরে অধিক ঘা থাকিলে কাদা মাটীতে বাঁধিয়া রাখা উচিত নহে, এরূপ অবস্থায় বালি বা কাদা মাটী পায়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ইহাতে পা ফুলিয়া যাইতে পারে ও খুর খসিয়া পড়িয়া যাইতে পারে।

পায়ের ঘায়ের মলম।

৬।	কর্পূর ...	...	২ ভাগ
	তার্পিন তৈল	...	সিকি ভাগ
	মসিনার তৈল	...	৪ ভাগ

ভাল করিয়া মিশাইয়া লইয়া ঘায়ে লাগাইবে।

৭।	খড়ি মাটী গুঁড়া	...	২ ছটাক
	কাঠ কয়লার গুঁড়া	...	½ ,,
	ফিটকারী	...	¼ ,,
	তুঁতে ...	...	⅛ ,,

সকল গুলি একত্রে মিশাইয়া ঘায়ে লাগাইবে। মাংস বৃদ্ধি হইলে এই ঔষধ ঘায়ের পক্ষে উত্তম।

৮।	ফিনাইল ...	...	১ ভাগ
	জল ...	...	১০ ,,

প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া দিলে ঘা শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হয় এবং মাছি বসিয়া ঘায়ে মাস্তে পড়িতে পারে না।

৯।	কার্ব্বলিক এসিড্	...	১ ভাগ
	মিঠা তৈল	...	২০ ,,

কার্ব্বলিক তৈল ঘায়ে দিলে মাছি বসে না এবং শীঘ্র শুকায়।

৬নং, ৮ নং কিম্বা ৯ নং ঔষধ বারম্বার ঘায়ে পটি বাঁধিয়া দিবার আবশ্যক হয় না। ক্ষত স্থানে

শুষ্ক ঔষধ লাগাইলে ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া যায় এবং কিরূপ অবস্থায় আছে তাহাও প্রত্যহ সহজে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। ৭নং পায়ের ঘায়ের গুঁড়া ঔষধ অল্প মিঠা তৈলের সহিত কিম্বা আল-কাতরার তৈলের সহিত মিশাইয়া ঘায়ে দেওয়া যাইতে পারে এবং ইহাতে পাগুলি বস্ত্র দিয়া বাঁধিয়া না দিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। ইহাও দেখা গিয়াছে যে ক্ষত স্থান বস্ত্র দিয়া বাঁধিয়া দিলে পাটী ফুলিয়া যায় এবং পায়ে পূঁয় জন্মে। যাহারা পায়ে পটি বাঁধিয়া দিতে অনিচ্ছুক ও অসুবিধা ভোগ করে তাহাদের পীড়িত পশুটীর পা গুলিকে যতদুর সম্ভব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত এবং যাহাতে পায়ে কোন রকমে কাদা, মাটী, বালি ইত্যাদি প্রবেশ করিতে না পারে তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত; বিশেষতঃ ঘায়ে মলম লাগাইবার পরে পায়ে আলকাতরার তৈল দেওয়া উচিত এবং ইহাতে ঘায়ে মাছি বসিয়া রোগ বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। ক্ষুরে ফোড়া হইলে ছুরি দিয়া স্ফোটক কাটিয়া দিবে; গরম জল দিয়া নালী প্রত্যহ ২ বার ধোয়াইবে ও পায়ে সেঁক দিবে এবং ৬ নং, ৮ নং, কিম্বা ৯ নং ঔষধ ঘায়ে লাগাইবে ও ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিবে। ঘায়ে পোকা থাকিলে নিম্নলিখিত ঔষধ ঘায়ে দিলে পোকা মরিয়া যাইবে অথবা পোকা বাহির হইয়া আসিবে। লোহার চিমটা দ্বারা পোকা বাহির করিয়া দিলে বেশ ভাল হয়।

পোকা মরিবার ঔষধের নাম।

তার্পিন তৈল; কার্ব্বলিক এসিড্; ফিনাইল; তামাকের পাতা; কর্পূর বা চিনি। কার্ব্বলিক এসিড্ বা ফিনাইলে পোকা মরিয়া যায়। কর্পূর, বা তার্পিন তৈলে পোকা বাহির হইয়া আসে। তামাকের পাতা ব্যবহার করিলে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ঘায়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া ক্ষত স্থানে পটি বাঁধিয়া দিলে পর দিন দেখিতে পাইবে যে সমস্ত পোকাগুলি মরিয়া গিয়াছে। ঘা হইতে পোকা বাহির করিয়া, নিমপাতা দিয়া জল গরম করিয়া উক্ত জল দিয়া ক্ষত স্থানগুলি পরিষ্কার করিয়া ধোয়াইবে; কুসুম কুসুম গরম বালির সেঁক দিবে এবং সেঁক দেওয়ার পরে ঘায়ে মলম লাগাইয়া পটি বাঁধিয়া দিবে। দিবসে ৩।৪ বার ঘায়ে মলম লাগাইবে ও যাহাতে মাছি বসিয়া ঘায়ে মাস্তে পড়িতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে।—শ্রীকুঞ্জবিহারী দে, জি, বি, ভি, সি।

খুলনা জেলায় ধানের চাষ।

আটমেসে বিলধারে (বিল কোনাচে) টাটি জমিতে মোটো রাঙ্গি ও ছোটনা, তালমুগুর প্রভৃতি ধান্য রোপিত হয়, তন্নিম্নে পাটনাই রাজমৌ ও হামাই ধান্য "ধান্যের পর্য্যায়ক্রমে" আবাদ হয়। তৎপরে অপেক্ষাকৃত স্বল্প জলে কাঁটারাঙ্গি ও সর্ব্বশেষে অধিক জলে ক্যারশালী ও লাউতেলী ধান্য জন্মে। বর্ষায় বিলের জল বর্দ্ধিত হইয়া অন্যান্য ধান্য নষ্ট করে, কিন্তু একবার নুতন শিকড় ছাড়িয়া ধান্য

লাগিয়া পত্রনিচয় হরিৎবর্ণ হইয়া উঠিলে কাঁটারাঙ্গি, ক্যারশালী, লাউতেলী ধান্যের কোনটী কি রোপিত কি উপ্ত কোন প্রকারের গাছই জলে ডুবাইয়া মারিতে পারে না। জল যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ধান্য ততই দীর্ঘ হইয়া লতার ন্যায় বর্দ্ধিত ও মস্তকোত্তলন করিয়া বর্দ্ধিত জলরাশিকে উপহাস করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে নয় দশ ফিট পর্য্যন্ত জলেও এই সকল ধান্য অনায়াসে জীবিত থাকে। এই সকল বিলের সাধারণ নিয়ম এই যে, এক দিন দুই চারি ঘণ্টা প্রবল বর্ষণ হইলে ক্রমে বিলে জল পতিত হইয়া পরবর্ত্তি দুই তিন দিন পর্য্যন্তও বিলে জল বৃদ্ধি হইতে থাকে। যদিও (Sluice-gate) স্লুস্ গেট সাহায্যে বহুল পরিমাণে জল নদ নদীতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তথাপি বর্ষাকালে নদীর জল স্বভাবতঃ বর্দ্ধিত ও সর্ব্বক্ষণ স্ফীত থাকায় শেষ ভাঁটার সময় দুই আড়াই ঘণ্টা কাল ব্যতীত গেটের কপাট ছাড়িয়া জল বাহির করিয়া দেওয়ার কোন সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অগ্রপশ্চাৎ অর্থাৎ একাদশী (১) হইতে পঞ্চমী পর্য্যস্ত নয় দিবস নদীর জল ভাঁটার সময় অধিক কমে না। পরে পঞ্চমী তিথির শেষাংশ হইতে দশমী পর্য্যন্ত ভাঁটার সময় নদীর জল অত্যন্ত কমিয়া যায়; এজন্য শেষোক্ত কয়দিন বিলের জল অত্যধিক পরিমাণেই সরিয়া যায়, আর প্রথমে উল্লিখিত নয় দিন অল্প অল্প যে টুকু নিঃসৃত হয়, তাহাই যথেষ্ট গণ্য করিয়া বেলদার (২) গণ সদাসর্ব্বদা কলের কপাটে কোন রূপে অস্বাভাবিক ফাঁক না থাকে ও কাঙ্গানের ভেড়ি (১) ঘোগা (২) বা ভাঙ্গন হইয়া বিলে জল প্রবেশ করিবার পথ উন্মুক্ত পায় কি না তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে; বর্ষাকালে মাটির বাঁধে লোণা জল রক্ষা করা অতিশয় কষ্টসাধ্য, কিন্তু উহাপেক্ষাও অধিক ভয়াবহ পাকা কলের গাঁথনির মধ্যে ঘোগা করিয়া যদি একবার জল সরিতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে লোণা জলের জোয়ার ভাঁটা উভয় দিকের জলের আক্রমণে উহা দ্রুত বাড়িয়া যাইয়া শেষে সমস্ত পুলটি আক্রান্ত ও সমূলে ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়।

কাঁটারাঙ্গি প্রভৃতি মিঠান বিলের নিম্নভূমির ধান্যের অতি প্রবল শত্রু কাঁটা শেওলা নামক এক জাতীয় শৈবাল; উহা একবার জন্মিলে সমুদয় ক্ষেত্রের রোপিত ধান্যের চারা সমূলে নষ্ট করিয়া ফেলে, এজন্য অবিলম্বে উহা ধান্যক্ষেত্রের জল হইতে উঠাইয়া স্থানে স্থানে রাশি করিয়া রাখা হয়; শৈবাল উঠাইয়া ফেলিলে ধান্য পুনরায় সতেজ ও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহা উঠাইতে অযথা বিলম্ব করিলে অথবা জলাধিক্য বশতঃ উঠাইতে অক্ষম হইলে অচিরাৎ ধান্যের

(১) দশমীতে গণের জন্ম হয়, অর্থাৎ ঐ দিবস হইতে নদীর জলের হ্রাসতা শেষ হইয়া জল বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়।

(২) বেলদার, বাঁধরক্ষককে বেলদার কহে।

(১) কাঙ্গান, স্লুস গেটের দুই পার্শ্বে যে মাটির বাঁধ থাকে তাহাকে কাঙ্গান ভেড়ি কহে। স্লুস গেট অধিক স্থানে Main খালের গর্ভে করা হয় না; কারণ খালের মধ্যের মাটি প্রায়ই শক্ত পাওয়া যায় না, উহা পলিমাটি বা কর্দ্দমময় থাকায় ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা গাঁথনিযুক্ত গেট ঐ কর্দ্দমের উপর করিলে অবিলম্বেই উহা ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়, এজন্য খালের গোড়ায় নদী ছাড়িয়া দুই এক রশির পরেই একটি শক্ত করিয়া মাটির বাঁধ দিয়া আসল খাল বন্ধ করিয়া দিয়া উক্ত বাঁধের দুই এক রশি উপর হইতে (দক্ষিণে বা বামে যে দিকে শক্ত মাটিযুক্ত উচ্চ ভূমি পাওয়া যায়) সেই দিক দিয়া আর একটি নূতন প্রয়োজনানুরূপ প্রশস্ত খাল কাটিয়া তাহার গর্ভে Sluicegate স্লুস গেট প্রস্তুত করা হয়। ঐ নূতন খালকে কৃষক ও আবাদকারগণ গৈ বা গই কহে। কেহ কেহ কল খালিও বলে।

(২) ঘোগা, বাঁধের গায়ে যে গর্ত্ত হয়। ইন্দুর, কাঁকড়া ও লাল কাঁকড়ায় সর্ব্বদাই ভেড়ি ও বাঁধে গর্ত্ত করে।

চারা সমূহ দুর্ব্বল ক্ষীণ ও শেষে সমূলে ধ্বংশ হইয়া যায়। শৈবাল ব্যতীত উহার আরও এক ভয়াবহ শত্রু আছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি ও রৌদ্র বিহীন অবস্থায় চারি পাঁচ দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকিলে ধান্যের গাছেই একজাতীয় কীট জন্মে, উহাকে পাপড়ি কাটা পোকা কহিয়া থাকে। বোধ হয় উহার প্রকৃত নাম অজ্ঞাত থাকাতেই উহার ঐরূপ নাম করণ করা হইয়াছে। ঐ পোকা এমন ভয়ঙ্কর যে উহা যে ক্ষেত্রে একবার জন্মে সেই ক্ষেত্রের ধান্যের চারাগুলির সমুদয় পত্র খাইয়া উদরসাৎ করিয়া ক্ষেত্র ধান্যশূন্য করিয়া ফেলে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে ঐ কীটের জন্মবৃত্তান্ত একবার পক্ষীগণ অবগত হইতে পারিলে তাহারা উহাদিগকে প্রায় সমূলে ধ্বংশ করিয়া ফেলে।

উহার প্রতিকার কল্পে, প্রারম্ভেই কৃষক গণ কীট যুক্ত গুটিকতক ধান্যের চারা উপাড়িয়া পক্ষীর আবাসভূমি গ্রামের মধ্যে স্থানে স্থানে ও বিলের ধারে স্থান বিশেষে নিক্ষেপ করে। ঐরূপ কৌশলে পক্ষীগণ অবিলম্বে জানিতে পারিয়া অতি সত্বর বিল অভিমুখে ধাবিত হয়। কৃষকগণও পক্ষীকুলকে নিমন্ত্রণ করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া নিমন্ত্রিতগণের ভোজনান্তে বিশ্রামের জন্য ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে পালা (বৃক্ষশাখা) ও কঞ্চিসহ বংশের অগ্রভাগ প্রোথিত করিয়া দিয়া নিমন্ত্রিত অতিথির আদর আপ্যায়ন করে। কিন্তু ইত্যবসরে যদি প্রবল বেগে বারিপাত অথবা প্রখর রৌদ্রের তাপ ক্ষেত্রে পতিত হয়, তাহা হইলে কীটবংশ আপনা আপনিই ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়া কাল কবলে নিপতিত হয়।

ধান্যের চারা একবার ভাল করিয়া লাগিয়া গেলে শেষে বিলের জল বৃষ্টিতে যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে ধান্যের গাছও তত বর্দ্ধিত হয় এবং পরে কার্ত্তিক মাসের শেষে ও অগ্রহায়ণ মাসে যখন জল শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয় তখন ধান্যের গাছও অসহায় বল্লরীর ন্যায় জলের উপর হেলিয়া লতাইয়া পড়ে। কেবল মাত্র (সদ্য প্রসূত সন্তানগণ) শীর্ষ গুলি (ধান্যের শীষ) অতি যত্নে সন্তর্পণে জলের উপরি ভাগে অতি কষ্টে উচ্চ করিয়া রাখে। ঐ সকল রোপিত ক্ষেত্র পার্শ্বে যদি অকর্ষিত পতিত শূন্য গর্ভ ভূমি থাকে তাহা হইলে ধান্য গাছের দীর্ঘতা হেতু ক্রমে ক্রমে স্বীয় প্রসূতি ও জন্ম ক্ষেত্র ছাড়িয়া ঐ ভূমির মধ্যে যাইয়াই সমুদয় ধান্য সহ শীর্ষ অবস্থান করিবে এবং প্রথম দৃষ্টিতে পতিত ভূমিতেই বহু শস্য জন্মিয়াছে বলিয়াই বোধ হইবে। ইতস্ততঃ রোপিত ভূমির মধ্যবর্ত্তি ভূমি অপেক্ষা পার্শ্ববর্ত্তী পতিত ভূমির মধ্যবর্ত্তি ভূমিতেই ধান্য অত্যন্ত অধিক জন্মে। যাহা হউক উপরের উল্লিখিত সূতিকা ও বাল্য রোগ পীড়া এবং শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলে কার্ত্তিক মাসে অগ্র পশ্চাৎ ধান্য গাছ সমূহের গর্ভ ধারণ ও ফুল ফল বাহির হইয়া অগ্রহায়ণের প্রথমে ধান্যের মধ্যে শস্য সংগঠন জন্য প্রথমে দুইটি তুষের একটি শূন্য গর্ভ কোষ ও পরে ঐ কোষ গর্ভে গাঢ় গো বা মহিষ দুগ্ধের ন্যায় দুগ্ধ (উহাকে ধানের দুধই কহে) পরিলক্ষিত হয়। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে দুই চারি দিন পরে ঐ দুগ্ধ ক্রমে ক্ষীরের ন্যায় গাঢ় হইতে গাঢ়তর অবস্থা প্রাপ্তান্তে নরম ভিজা চাউলের ন্যায় চাউল (প্রথমাবস্থায় চাউলের উপরের বর্ণ হরিত ও মধ্যে সাদা থাকে) ও পরিণামে শস্য সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া পৌষ মাসে সুপক্ক হইয়া উঠে। এই সকল ধান্য অন্যান্য ধান্যের পূর্ব্বে বপিত ও রোপিত এবং শেষে পক্ক হয়। ধান্য যে সময়ে সুপক্ক হয় ক্ষেত্রে তখনও কর্দ্দম ও জল সঞ্চিত থাকে। এ অবস্থায় ধান্য

কর্ত্তন না করিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না কিন্তু তখন আর এক মহাভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব বন্ধু, প্রলুব্ধ পক্ষীগণ যাহারা কীট ভক্ষণ করিয়া এক সময়ে ধান্য রক্ষা করিয়া গিয়াছিল এক্ষণে আবার তাহারা ও বহু জাতীয় পার্ব্বত্য জলচর পক্ষী কুল বিনা নিমন্ত্রণে স্বয়মাগত হইয়া এক এক দিনে এক এক ক্ষেত্র উজাড় করিয়া ধান্য ভক্ষণ করিয়া ফেলে। এই সময়ে কৃষকেরা দাউলেগণের সাহায্যে তাল বৃক্ষ খোদিত ডোঙ্গা জলে ভাসাইয়া ও কর্দ্দমে টানিয়া লইয়া কর্ত্তরী (কাচি) হস্তে সদলে আপনা-পন ক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক দেড় ফুট দুই ফুট লম্বা ডাঁটা (পল) ধান্যের ফল সহ শীষ কর্ত্তন করিয়া আটি বদ্ধ করতঃ ডোঙ্গায় স্থাপন পূর্ব্বক ডোঙ্গা সহ ধান্য কর্দ্দম ও জল শূন্য বিল কোলাচের শুষ্ক ভূমিতে আনয়ন করিয়া তথা হইতে গো শকটে, মানব মস্তকে অথবা বাঁকে করিয়া দুই প্রান্তে দুই বোঝা রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোময় লিপ্ত খামারে আনয়ন করে। ধান্য সমূহ ঐ সময়েও জলসিক্ত থাকে, এজন্য মস্তকে বহন করা সুসাধ্য নহে। শকট সাহায্যে ও ভারে আনাই সুবিধা এবং অধিক স্থলে সেই পন্থাই অবলম্বিত হয়। ধান্য খামারে পৌঁছিলে ঐ সকল জলসিক্ত ধান্যের বিড়া লম্বা লম্বা জালি (১) দিয়া রাখিয়া পলসহ ধান্য উত্তমরূপে বিশুষ্ক করণান্তে বিড়া গণনা করিয়া দাউলেগণের (ভাগযোত স্থলে কৃষকের নিজেরও) প্রাপ্য আলিয়া বিড়া (মজুরীর ধান্যের বিড়া) প্রদান করা হয়। কুড়ি খানা প্রজা ও ভূস্বামীর রাখিয়া তিন খানি ধান্য কর্ত্তনের পারিশ্রমিক প্রদত্ত হয়। এইরূপে মজুরী প্রদান কালে বিড়া গণনার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দাউলেগণের সাহায্যে নিম্নভাগ ক্রমে স্থুল ও ঊর্দ্ধভাগ ক্ষীণ করিয়া, গাদা দিয়া সুচারু প্রণালীতে ধান্য মধ্যেও পল বাহিরে রাখিয়া, এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবের মন্দিরের ন্যায় গাদা দিয়া, ঐ অবস্থায় ফাল্গুন সম্পূর্ণ ও চৈত্র মাসের কিছু দিন সুরক্ষিত খামারে রাখিয়া, চৈত্র মাস হইতে গাদা ভাঙ্গিয়া ধান্য বলদ সাহায্যে মাড়ান হয়। প্রস্তাবিত ধান্য চাষের একটা বিশেষ লাভ এই যে, যে সময়ে কৃষকের হৈমন্তিক ধান্য চাষের কার্য্য আরম্ভ না হয়, তখন গ্রীষ্মকালে সর্ব্বাগ্রে ইহার চাষ সম্পন্ন ও অপরাপর ধান্য কর্ত্তন ও ক্ষেত্র হইতে গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া সর্ব্বশেষে ইহা কর্ত্তন করা চলে। সুতরাং যে সময় কৃষক কার্য্যাভাবে আলস্য পরতন্ত্র হইয়া নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিত, সেই সময়ে এই একটা অতিরিক্ত কৃষি অল্লায়াসে ও অল্প পরিশ্রমে সম্পন্ন করিয়া প্রচুর লাভবান হয়। যদিও ইহার চাষ ও পাটের চাষ কথঞ্চিত সমকালে হয় বটে, কিন্তু কৃষক যত্নবান হইলে পাটের চাষ সম্পন্ন করিয়া তৎপরে অনা-য়াসে এদেশে আটমেসে বিলের চাষ করিতে পারে। আর উত্তর বঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গের ত কথাই নাই। সে দিকে চৈত্র মাসেই পাটের চাষ শেষ হইয়া যায়। আমাদিগের এ প্রদেশের কৃষকগণ যে কাঁটারাঙ্গি প্রভৃতি জাতীয় ধান্য চাষে আগ্রহা-তিশয় প্রদর্শন করে, তাহার আর একটা বিশেষ হেতু এই যে, এদিকে উচ্চভূমি অপেক্ষা নিম্ন বিল ভূমি "ধান্য চাষের উপযোগী" অত্যন্ত অধিক।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের কথিত ধান্য নিচয়ের আদৌ বিচালি হইতে পারে না। উহার গাছ সমূহ জল মগ্ন অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকায় পলও ভাল হয় না

(১) জালি. ভিজা ধান্যের বিড়া শুষ্ক করিবার জন্য উপর্য্যুপরি চারি পাঁচ খানি পরস্পর বিপরীত মুখে বিড়া সাজাইয়া তাহার আট দশ হাত লম্বা যে লাইন করা হয় তাহাকে জালি দেওয়া কহে। কাঁচা ইষ্টক শুষ্ক করিবার জন্য যে সারি দিয়া রাখে, জালিও তদনুরূপ।

বলদদ্বারা ধান্য মাড়াই করার সময়ে পল ভাঙ্গিয়া কুচি কুচি হইয়া ঘুটিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। সুতরাং উহা পশুখাদ্য রূপে ব্যবহারের উপযোগী থাকে না। উহা দ্বারা কৃষকেরা পটল, উচ্ছে প্রভৃতি ক্ষেত্রের তৃণ জন্মান নিবারণ জন্য ক্ষেত্রের আচ্ছাদন (পাড়ন) করিয়া দিয়া একটা কার্য্যের উপযোগী করিয়া লয়। আর উহার মূল অংশ তিন চারি হস্ত, যাহা প্রথমে ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত ও ধান্য কর্ত্তনকালে কর্দ্দম ও জলের উপর পতিত থাকে, পরে প্রখর সূর্য্যোত্তাপে কাদা জল শুষ্ক হইয়া গেলে উহা কর্ত্তন করিয়া গাড়ি বোঝাই দিয়া বাটী আনয়ন করিয়া সামান্য কিয়দংশে ঘর ছাওয়া কার্য্যে ব্যয় করে ও অবশিষ্ট বহুলাংশ দ্বারা খেজুর রস জ্বাল দেওয়ার কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে জ্বালানীরূপে ব্যবহার করে। ঐ সকল নাড়া এক একটী নল অথবা খড়ির গাছের অপেক্ষাও স্থূল ও লম্বা হয় এবং উহার গাত্রে কর্দ্দম লিপ্ত থাকে। খেজুর রস জ্বালান বাইনে প্রদানের পূর্ব্বে একটু জোরে নাড়াচাড়া দিলে অনেক কর্দ্দম ধূলি হইয়া উড়িয়া যায়। সুতরাং জ্বালানী কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়। তৎপরে রস জ্বালান সমাধা ও বাইন নির্ব্বাণ হইলে যে ছাই রাশি অবশিষ্ট থাকে, তাহা উঠাইয়া লইয়া ক্ষেত্রে সার দেওয়া হয়।

কাঁটারাঙ্গি প্রভৃতি আলোচ্য ধান্য নিচয়ের আর এক অসাধারণ গুণ এই যে উহা বিশ বৎসর গোলায় সঞ্চয় রাখিলেও একটী মাত্র ধান্যও কীটে খাইয়া নষ্ট করিতে পারিবে না। যে গোলায় ঐ ধান্য বোঝাই থাকে, সে গোলায় বেঁশে প্রভৃতি কোন জাতীয় কীট পতঙ্গ দৃষ্ট হইবে না। তৎপরে উহা ওজনে অন্য ধান্য অপেক্ষা অনেক ভারি। উহার ভার গুরুত্ব এরূপ অধিক যে উহার এক বিশ অপর ধান্য যদি তের মণ ওজনে হয়, তাহা হইলে সেই একই বিলের কাঁটারাঙ্গি প্রভৃতি "জলজ" ধান্য পোনের মণ হইবে। সুতরাং কাঁটার ওজনে বিক্রেতা গৃহস্থের সবিশেষ লাভপ্রদ তাহাতে সন্দেহ মাত্রও নাই। পক্ষান্তরে আটমেসে বিলে ও ডাঙ্গার গ্রামমধ্যের উচ্চ ছোটনা ধানের তীতা ও টাটী জমীতে জন্মে কিছু অল্প ; নদীর ধারের জোয়ারিয়া নিম্ন (লোণা) বিলের এক বিঘা ভূমিতে যে স্থানে বড়ান এক বিশ ধান্য জন্মে, আটমেসে বিলে সেই স্থানে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ষোল আড়ির উপর কোন মতে ফলন হয় না। তদুপরি আবার রোপিত ভূমি অপেক্ষা বপিত ধান্যক্ষেত্রে আরও কম ধান্য উৎপন্ন হইবে। আর একটি অত্যাবশ্যকীয় কথা যথাস্থানে বলিতে ভ্রম হইয়াছে যে, ক্ষেত্রে ধান্য বপন করিয়া যদি একেবারে বিফল অথবা আংশিক ধান্য মরিয়া যায়, তাহা হইলে বড় লম্বা পাতা দ্বারা শ্রাবণ মাস মধ্যে রোপণ করিয়া দিলেও উত্তম ফসল হইবে। বপন করা ধান্য স্থানে স্থানে মরিয়া গেলে পুনরায় যে রোপণ করা হয়, উহাকে খুঁচি দেওয়া কহে। প্রথমে ধান্য বপন করিয়া শেষে খুঁচি দিলে সে ক্ষেত্রে ধান্য ভাল জন্মে। কাঁটারাঙ্গি, ক্যারশালী ও লাউতেলী ধান্যের পাতা ভিন্ন অন্য ধান্যের ধুলুচি পাতা প্রস্তুতের রীতি বড় অধিক চলন নাই। অন্যান্য ধান্যের কলা করিয়া চাতরে লেপী করিয়াই পাতার বীজ বপন করে। কাঁটারাঙ্গি প্রভৃতির লেপী পাতা আদৌ করে না, অথবা পাতা করিবার সময় সে সুবিধা জলাভাবে ঘটিয়া উঠে না। কাঁটারাঙ্গি দিগরের বীজ ধুলচি করিয়াই সর্ব্বাগ্রে চাতারে বপন করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে বড় বড় পাতা জন্মাইয়া লয়। এই সকল বিলের সুপক্ক ধান্য কাটার সময় ও বহন করিয়া খামারে আনার সময়ে যে সকল ধান্যের শীষ হইতে ধান্য ঝরিয়া বিলের ক্ষেত্র মধ্যে পতিত হয় উহার কতকাংশ পক্ষী

প্রভৃতি খাইয়া ফেলে। ভোজনাবশিষ্ট যে ধান্যসমূহ ক্ষেত্রে মৃত্তিকার উপর রহিয়া যায়, ফাল্গুনের শেষে কি চৈত্র মাসে বৃষ্টির জল পাইলে দূর্ব্বা ঘাসের সহিত উহারও চারা বাহির হয় ও গবাদিতে ঘাসের সঙ্গে বার বার ঐ চারা খাইয়া ফেলিলেও যে ক্ষেত্র সমূহ অকর্ষিত পতিত অবস্থায় থাকে তাহার ঐ সকল স্বভাব জাত চারাতেও ধান্য জন্মে। উহাও নিতান্ত কম নহে। এরূপ বৎসর বৎসর পর্য্যায়-ক্রমে স্বভাব শক্তিতে ধান্য জন্মিতেছে, ফল ধরিতেছে, আবার ঝরিয়া পড়িতেছে এইরূপে পুরুষানুক্রমে তাহাদিগের বংশ বৃদ্ধি ও বিলীন হইতেছে। ঐ স্বভাব জন্মা ধান্যকে "উড়ি" ধান্য কহে। উহা হস্তগত করিতে পারিলে কৃষকের একটা অতিরিক্ত লাভ হইত। কিন্তু উহার দোষ এই যে উহা সুপক্ক হওয়ার পূর্ব্বেই মানবের কঠিন হস্ত স্পর্শ বিহনেও সামান্য বাতান্দোলিত হওয়া মাত্র ঝরিয়া পড়িয়া যায়। উড়ি ধান্যের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটার ন্যায় পদার্থ বিদ্যমান থাকে হস্ত স্পর্শে ঐ কাঁটার তীক্ষ্ণতা ও খস খসে ভাব অনুভব হয়। অধিকন্তু ঐ ধান্যের পশ্চাতে এক ইঞ্চের অষ্টমাংশ দীর্ঘ সরু চুলের মত মূল দেশে স্থূল ও সূক্ষ্মাগ্র একটা লেজ (সুক্ষা) ও দুই খানি পাখনা থাকে। কৃষকেরা বিশেষতঃ অকৃষক অতি দরিদ্র লোকেরা কেহ কেহ ঐ ধান্য পাঁচ সাত সের সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিয়া (ঐ ধান্যের আর কেবল উড়ি ধান্য বলিয়াই নহে কাঁটারাঙ্গি প্রভৃতি কথিত চারি প্রকারের ধান্যেরও আতপ চাউল হয় না উহা সিদ্ধ করিয়া চাউল করিতে হয়) অন্ন পাক করিয়া আহার করিয়া দেখিয়াছে যে উড়ি ধান্যের চাউলের অন্ন স্পর্শে কঠিন এবং ভোজনে গুরুপাক হয় এবং চাউলও দেখিতে "কাবর" অর্থাৎ ময়লা লাল রঙ্গের হয়।

কাঁটারাঙ্গি প্রভৃতি ধান্য সুপক্ক হইলে মানুষের দৌরাত্ম ও এদেশে বড় কম হয় না। এক দল অতি দরিদ্র স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সর্ব্বদাই বিলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদিগের সঙ্গে ধামা কিম্বা বস্তা থাকে কৃষকের ধান্য কর্ত্তন কালে ও স্থানান্তরিত করার সময়ে যে সকল ধান্য সংযুক্ত শীষ হস্তচ্যুত হইয়া অথবা ভাঙ্গিয়া ক্ষেত্রে পতিত হয় ঐ সকল কাওরা, বাগদী ও মুচি জাতীয় অসহায় দরিদ্রগণ ঐ সকল ধান্যের শীষ কুড়াইয়া লইয়া যায়। তাহাতে ক্ষেত্র স্বামী কোন রূপ অসম্মতি প্রকাশ করে না কিন্তু দরিদ্রগণের মধ্যে এরূপ দুষ্ট অনেক আছে যে তাহারা ঐ কুড়ান শীষের সহিত ক্ষেত্রে পতিত মৃত সম্বুক দ্বারা অবসর ও সুযোগ মতে কৃষকের অজ্ঞাতে বিস্তর শীষ কাটিয়া লইয়া ঐ উভয় প্রকারের অর্জ্জিত ধান্য একত্র মিশাইয়া ফেলে। আর এক দল লোক আছে তাহারা অতি সৎপ্রকৃতি। তাহারা কেবল কোদাল ও বস্তা লইয়া বিলের শুষ্ক অংশের ক্ষেত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইন্দুরের গর্ত্ত খনন করিয়া এক এক গর্ত্তে ইন্দুরের সঞ্চিত দেড় মণ, দুই মণ পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত ধান্য বাহির করিয়া বস্তায় পুরিয়া বাটি লইয়া যায়।

শ্রীরাজ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ক্রমশঃ।



কৃষক। শ্রাবণ, ১৩১৫।

ভারতীয় কৃষিবিভাগ।

ভারতীয় কৃষিবিভাগ এখনও শৈশবাবস্থায়। বয়ঃক্রম প্রায় চারি বৎসর হইল। অবশ্য ভারতীয় কৃষিবিভাগ বলিতে আমরা নব প্রতিষ্ঠিত কৃষি-বিভাগের কথাই বলিতেছি। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এই বিভাগের ১৯০৫—৬ ও ১৯০৬—৭ সালের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। বিভাগে অভিজ্ঞের অভাব নাই। স্বয়ং বড়কর্ত্তা ইনস্পেক্টার জেনারেল ব্যতীত আরও ১৭ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯০৬—৭ সালে এই বিভাগের জন্য ব্যয় হইয়াছে সর্ব্ব সমেত চারি লক্ষ দুই শত চৌষট্টি টাকা। অনেকেই অবগত আছেন যে, ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের প্রধান কেন্দ্র পুষা। পুষার কৃষি-কলেজ নির্ম্মাণ জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে ও হইতেছে তাহা এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত বাৎসরিক ব্যয় ব্যতীত ইনস্পেক্টার জেনারেল নিজ হস্তে বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসন্ধান কল্পে এক লক্ষ দুই শত ত্রিশ টাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্ব সমেত কৃষি-বিভাগে ব্যয়ের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ চারি শত চুরানব্বই টাকা। বলা বাহুল্য যে ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উন্নতির জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় কিছু অধিক নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে সরকারী কৃষিবিভাগ সমূহের ইহা মোট ব্যয় নহে। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম, বর্ম্মা, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও পূর্ব্ব পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ—প্রত্যেক প্রদেশেই এক একটী কৃষি বিভাগ আছে। তাহাদের ব্যয় স্বতন্ত্র। প্রত্যেক প্রাদেশিক কৃষিবিভাগে একজন ডাই-রেক্টার, ২ জন সহকারী ডাইরেক্টার, একজন প্রাদেশিক কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ, একজন রসায়ন তত্ত্ববিদ নিযুক্ত হইয়াছেন অথবা শীঘ্রই হইবেন। এই সমস্ত বিদেশীয় অভিজ্ঞ আনাইতে ও যন্ত্রাগার, পুস্তকাগার, কলেজ, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি স্থাপন করিতে যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছে। এত বিপুল অর্থ বিনিময়ে আমরা কি উপকার লাভ করিতেছি তাহাই এখন আলোচ্য বিষয়।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, ভারতীয় কৃষি-বিভাগ এখনও শৈশবাবস্থায়। সুতরাং ইহা দ্বারা আমরা অধিক কার্য্যের আশা করিতে পারি না। বস্তুতঃ এই কয় বৎসর এক রকম সাজ সরঞ্জাম ঠিক করিতেই কাটিয়া গিয়াছে। অধি-কাংশ অভিজ্ঞই ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষের নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইয়াছেন। বোর্ড অফ্ এগ্রিকালচার তিনটি বাৎসরিক সভায় বর্ত্তমান সময়োপযুক্ত কার্য্যাবলী ও কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পুষায় কৃষি-কলেজও খুলিয়াছে। কিন্তু যত দিন প্রাদেশিক কৃষি কলেজগুলিতে কার্য্য আরম্ভ না হয়, ততদিন পুষা কৃষি-কলেজের কার্য্যও কতক পরিমাণে স্থগিত থাকিবে। আপাততঃ কতকগুলি বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত কৃষি ছাত্রকে পুষায় শিক্ষা প্রদান করা হইবে। উহারা হাতে কলমে বৈজ্ঞা-

নিক কৃষি প্রণালী শিক্ষা করিয়া প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগ সমূহে কার্য্য করিবেন। ভবিষ্যতে প্রাদেশিক কৃষি-কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রসমূহকে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিয়া কৃষি-রসায়ন, কীটতত্ব ছত্রকতত্ব প্রভৃতি বিভাগে নিযুক্ত করা হইবে।

বিগত দুই বৎসরে পুষা কৃষিক্ষেত্রে কার্পাস, ইক্ষু, পাট ও তিসির চাষ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অপরাপর স্থানে কৃষি-বিভাগের পরামর্শ অনুসারে নিম্নলিখিত কয়েকটি ফসলের পরীক্ষা হইয়াছিল:— চা, নীল, শণ, মেস্তাপাট, তামাক, গম ও চিনার বাদাম। কৃত্রিম সার, জল সেচন, রেশম চাষ প্রভৃতি বিষয়েই কিয়ৎপরিমাণ কার্য্য হইয়াছে।

অপরাপর ফসল অপেক্ষা তুলা চাষের প্রতি সরকারের মনযোগ কিছু অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশের উদ্ভিদ তত্ত্ববিৎ মিঃ গ্যামি গাছ ও বাৎসরিক তুলার শ্রেণীবিভাগ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। ইহাতে ক্ষেত্রজ কার্পাসসমূহের 'প্রকার' ও 'ভেদ' নির্দ্ধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে। বীজ নির্ব্বাচন কার্য্যও কতক পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে। তুলা চাষের উন্নতি অনেকটা বাণিজ্যের বিশেষ বিশেষ অভাবের উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমান সময় হ্রস্বসূত্র কার্পাস কম দরের পশমী কাপড়ের সহিত মিশাল দেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বীজ নির্ব্বাচন দ্বারা বোম্বাই প্রদেশে 'কুমতা', 'খান্দেস' ও 'লালিও' জাতীয় কার্পাস ও মধ্যপ্রদেশে 'বানী' ও 'ঝাড়ি' কার্পাসের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। এতদ্ভিন্ন শঙ্কর উৎপাদন দ্বারা 'সুরত-ব্রোচ' ও 'বুরবোঁ-মিসর' জাতীয় যে কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছে তৎসমুদয় হইতে অনেক সুফল আশা করা যায়। বিদেশীয় কার্পাস সমূহ সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, 'সিন্ধু-মিসর' ব্যতীত অপর সকল জাতির প্রবর্ত্তন এখনও পরীক্ষাধীন। দুই এক স্থানে গাছ কার্পাসের পরীক্ষা হইয়াছিল। মেঃ স ওয়ালেস্, মিঃ স্পেন্স ও মিঃ টিট্‌লারের পরীক্ষা সমুদয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু মিঃ মলিসনের মতে গাছ তুলার বিস্তৃত চাষ হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। ভারতবর্ষের নানাস্থানে তুলা-পরীক্ষা সমূহ তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য শীঘ্রই একজন তুলাতত্ত্ববিৎ নিযুক্ত হইবেন এবং ভবিষ্যতে তুলা পরীক্ষাক্ষেত্র সমূহও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

পাট, আধুনিক পরীক্ষা সমূহ দ্বারা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে বঙ্গদেশ ভিন্ন মান্দ্রাজ, বর্ম্মা ও আসামের বিশেষ বিশেষ স্থানে পাট উৎপাদন করা যাইতে পারে। পাট গাছ ও তন্তুর যে ক্রমশঃ অধোগতির বিষয় শুনিতে পাওয়া যায় তাহা অমূলক। পুষায় যে ৪৪ রকম পাটের চাষ হইতেছে ও মেসার্স ফিনলো, ক্রস্ ও বিভান্ যে পাট তন্তু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, পাটের তন্তু আদৌ খারাপ হয় নাই। পাটের চাষ শীঘ্রই অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত হইবে ইহা আশা করা যায়।

বিগত দুই বৎসর গোধূমের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে। গোধূমের কতিপয় কীটও ও ছত্রক রোগ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কি প্রকারে গমসঞ্চয় করিলে শস্য নষ্ট হয় না এবং কোন

জাতীয় গমে কি প্রকার ময়দা, আটা ও সুঁজি হয় তাহাও পরীক্ষা সাপেক্ষ। কানপুর পরীক্ষা-ক্ষেত্রের বীজগুদাম হইতে মুজাফারনগর গমের বীজ বিগত দুই বৎসর অনেক পরিমাণে বিতরিত হইয়াছে এবং এই জাতীয় গমের জন্য সাধারণের যথেষ্ট আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গদেশে এই গমের পরীক্ষা বিশেষ আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের দেশে কৃত্রিম সারের এখনও বিশেষ প্রচলন নাই এবং এতদ্দেশীয় কৃষকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কৃত্রিম সার কখন লাভজনক হইবে কি না তাহাও সন্দেহের বিষয়। এক্ষণে তুলার উপরেই কতকগুলি কৃত্রিম সারের পরীক্ষা চলিতেছে; ভবিষ্যতে গম, ইক্ষু প্রভৃতি অপরাপর মূল্যবান ফসলের উপরেও পরীক্ষা চলিবে। জাভা এবং মরিচ দ্বীপের অধিবাসীরা ইক্ষু চাষে সলফেট অব্ অ্যামোনিয়া সাররূপে ব্যবহার করে। তাহাতে উৎপাদনের মাত্রা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহা এতদ্দেশে পরীক্ষা যোগ্য। সুখের বিষয় যে, একটি পারসি কোম্পানি শীঘ্র কাশ্মীরে ক্যালসিয়াম নাইট্রেটের কল খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখনও এতদ্দেশে অধিক পরিমাণে কৃত্রিম সার প্রচলনের বিলম্ব আছে মনে হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতীয় কৃষি বিভাগে অনেক গুলি অভিজ্ঞ নিযুক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে রসায়নতত্ত্ববিৎ, ছত্রকতত্ত্ববিৎ, কীটতত্ত্ববিৎ, ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ ও কৃষিতত্ত্ববিৎ অন্যতম। ইহাদের সকলের কার্য্যবিবরণীই বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। রসায়নতত্ত্ববিদের যাবতীয় অনুসন্ধানের মধ্যে, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল ভেদে মৃত্তিকা হইতে জলীয় বাষ্প উদ্গীরনের মাত্রা নির্দ্ধারণ আমাদের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। ঋতু ও মৃত্তিকার বিভিন্নতায় জলীয়াংশের অপচয় ও মৃত্তিকাভ্যন্তরে জলের গতি নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সম্ভব। ছত্রকতত্ত্ববিৎ বিগত দুই বৎসরে তাল, গুপারি, নারিকেল, ইক্ষু, গোধুম, চিনার বাদাম, অরহর, বাজরা, জোয়ার, কাওন ও আম্র প্রভৃতির ছত্রক রোগ অনুসন্ধান করিয়াছেন। এই সমুদয় ব্যাধির এ স্থলে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ সম্ভবপর নহে। তবে এস্থলে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, বিগত দুই বৎসরে মিঃ বাটলার ভারতীয় ছত্রকতত্ত্বে যে সমস্ত নব নব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি জনসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ, উৎকৃষ্ট জাতীয় ফল উৎপাদন, গোধূমের শ্রেণী বিভাগ, নির্ব্বাচন ও শঙ্কর উৎপাদন ও তামাক, যব ও গাঁজা প্রভৃতির চাষ প্রণালীর অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

কৃষিবিষয়ক যাবতীয় উন্নতির মধ্যে কৃষিশিক্ষাই সর্ব্বপ্রধান। সেক্রেটারি-অব্-ষ্টেট্ সাতটি প্রাদেশিক কৃষি-কলেজ স্থাপনের ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম ব্যতীত অপর সমস্ত প্রদেশেই কৃষি-কলেজ সমূহের জন্য স্থান নির্ব্বাচন ও গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য শনৈঃশনৈঃ অগ্রসর হইতেছে এবং আশা করা যায় যে, দুই বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ কৃষি-কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যে কতিপয় ছাত্রকে কেম্ব্রিজ ও মার্কিন বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহে প্রেরণ করিয়া শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। বোম্বাই হইতে ৪ জন কেম্ব্রিজে এবং বঙ্গদেশ হইতে ৬ জন আমেরিকায় কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা করিতেছেন।

কিন্তু কৃষিবিষয়ক উচ্চ শিক্ষার জন্য যে রূপ সুবন্দোবস্ত হইতেছে, নিম্ন শিক্ষার জন্য সেরূপ সুবন্দোবস্ত হইলে বিশেষ সুখপ্রদ হইত। আমরা অনেক দিবস হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে কৃষি-উন্নতির সাধন করিতে হইলে প্রধানতঃ কৃষককে উন্নত করিতে হইবে। প্রাইমারি স্কুল সমূহে দুই চারি খানা সামান্য কৃষিপুস্তক পাঠ করাইলেই জনসাধারণের কৃষিজ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না। প্রাদেশিক কৃষি-কলেজ সমূহে কৃষিশিক্ষার কিরূপ বন্দোবস্ত হইবে তাহা আমরা এখনও সঠিক অবগত নহি। কিন্তু ইহা স্থির নিশ্চয় যে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গই এস্থানে শিক্ষা পাইবেন। কৃষি কলেজ স্থাপনের আমরা আদৌ বিরোধী নহি। কিন্তু কৃষি-কলেজের সহিত যাহাতে সাধারণ কৃষকের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়; যাহাতে কৃষিবিষয়ক জ্ঞান দেশ মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে তাহার সুব্যবস্থা দেখিতে আমরা একান্ত ইচ্ছুক। আমেরিকানগণ স্কুলে, কলেজে অথবা পরীক্ষাক্ষেত্রে কৃষি-শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত নহে। গ্রামে গ্রামে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, পরিব্রাজক কৃষি-অধ্যাপকগণ শিক্ষা প্রদান করেন, কৃষকগণ বিশেষ বিশেষ কৃষি-সভায় আহূত হয় এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে কৃষককে বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্যে আকৃষ্ট করা হয়। আমাদের দেশে এতদিন কৃষি-বিভাগ গুলি যে কেন অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে তাহার কারণ বোধ হয় গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে আমরা আশা করি যে নব কৃষি-বিভাগ প্রতিষ্ঠার সহিত কৃষি-শিক্ষার নব প্রণালীও প্রবর্ত্তিত হইবে এবং যাহাতে সাধারণের কৃষি-বিভাগের উপর আস্থা জন্মে তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে।

পত্রাদি।

"পাট ও শণ চাষের আধিক্যই অন্নকষ্টের কারণ।"

মাননীয় কৃষক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—

ইদানীং পাট বঙ্গদেশের একটী প্রধান বাণিজ্যের সামগ্রী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। দেশ যতই সভ্য হইতেছে ততই পাটের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে। দড়ি, দড়া, গুণ, চট, নৌকার পাইল ইত্যাদিত আছেই, আবার বিলাতী কাপড় যত এদেশে আসিতেছে. তৎসমুদায়েই পাট মিশ্রিত থাকে। এইরূপে দিন দিন পাটের প্রয়োজন বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব যত পাট উৎপন্ন করা যাইতে পারে ততই বিক্রয় হইয়া যায়, পড়িয়া থাকিবার জিনিষ নহে।

কথাটী সত্য বটে, পাটের চাষে লাভও বিস্তর। কয়েক মণ পাট বিক্রী করিলেই এক মুঠা টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে প্রকৃত চাষীর লাভ কি? পাটের চাষ করিতে হইলে ধান্যাপেক্ষা খরচও বেশী পড়িয়া থাকে। জমীর খাজনা, আবাদী খরচ, বীজ, নিড়ানী, কাটা ও কাচা ইত্যাদিতে প্রায় দেড়গুণ দ্বিগুণ খরচ পড়ে, কিন্তু সচরাচর বিঘা প্রতি ২।৩ মণের বেশী পাট জন্মিতে দেখা যায় না। বিল কাঁছড়ে জমীতে, উচ্চ ডাঙ্গা জমী অপেক্ষা কিছু বেশী ফলন হয় বটে, কিন্তু উহা শতকরা কয় বিঘা? তৎপরে এদেশের কৃষকেরা জমীতে সার দিতেই জানে না, অথবা জানিলেও অর্থাভাবে তাহাতে সক্ষম হয় না। গরীব কৃষক ক্ষুধার জ্বালায় বীজধান্য পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে, আর সার দিবে কোথা হইতে? আরও পাটের চাষ করিবার জন্য অধিকাংশ এমন কি বার আনা

রকম কৃষকই মহাজনের নিকট হইতে সুদে বা আগী ধরতায় ফাল্গুন চৈত্র মাসেই টাকা কর্জ্জ লয়, উহার সুদ বা ধরতা সমেত ভাদ্র আশ্বিন পর্য্যন্ত আসল টাকার দ্বিগুণ হইয়া উঠে। আবার বৎসর গতিকে পাটের বাজারও এত নিম্নে নামিয়া আইসে যে তাহাতে কৃষকের আবাদী খরচ সংকুলান কঠিন হইয়া উঠে। সুতরাং যদি কোন বৎসর কৃষকের খরচ বাদে দু দশ টাকা হাতে থাকে, তাহা মহাজনের ঘরেই যায়, এবং কৃষকের যে হাহাকার সেই হাহাকার। এমন অনেক গৃহস্থকে দেখা গিয়াছে যে ২।৩ শত টাকার পাট বিক্রয় করিয়া খরচাদি ও মহাজন দেনা দিয়া শেষে সম্বৎসর দেড়া দুনা ইত্যাদি মূল্যে ধান্য খরিদ করিয়া কষ্টে কাল কাটাইতে হইয়াছে।

ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা পাট ও শণের আবাদ করিতে একেবারেই নিষেধ করিতেছি। তবে এক্ষণে যে পরিমাণ জমিতে প্রত্যেক কৃষক ধান্য গোধুমাদি বপন করিয়া অবশিষ্ট জমিতে পাট ও শণ দিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে যদি অধিকাংশ জমীতে ধান্য গোধুমাদি দিয়া অল্প পরিমাণ অর্থাৎ স্বীয় খরচ ও দেশের কলকারখানাদির জন্য যে পরিমাণ পাট ও শণের আবশ্যক তাহাই বপন করে, তাহা হইলে অচিরেই লক্ষ্মী দেবী সুপ্রসন্না হইয়া গৃহে গৃহে বিরাজ করিবেন। আর ঘরে ঘরে অন্নের জন্য হাহাকার বা ঘন ঘন অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়া দেশের কঙ্কালাবশিষ্ট রোগ শোক জর্জ্জরিত মানবগণের কালস্বরূপ হইবে না। নচেৎ দেশ হইতে এই চির দুর্ভিক্ষ অন্তর্হিত হইবার আর গত্যন্তর নাই।

যাহারা মনে করে যে স্বীয় প্রয়োজন মত ধান্য হইলেই হইল, সেটী তাহাদের বিষম ভ্রম, কারণ তাহাতে দেশের লোকের ত ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেই পারে না, তদুপরি আবার স্বীয় উদর পূরণ বিষয়েও অক্ষম হইয়া পড়ে। কারণ সকল বৎসর কিছু সমান ফসল হয় না। যদি কোনবার অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইল, তাহা হইলে অন্যের কথা দূরে থাকুক নিজেরই হাহাকার উপস্থিত হয়। শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

জামালপুর, (২৪ পং) ২৪ জুলাই, ১৯০৮।

মাননীয় শ্রীযুক্ত "কৃষক" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়!

বাঁধা কপির যাহা সর্ব্ববৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট জাতি তাহার নাম কি? বাঁধা কপির যাহা জল্‌দী জাতীয় অথচ সর্ব্ববৃহৎ তাহার নাম কি? ফুল কপিরও যাহা জল্‌দী জাতীয় অথচ সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহার নাম কি? জল্‌দী জাতীয় কপির বীজ কোন সময়ে অর্থাৎ কি মাসে গাম্‌লায় বপন করিতে হয়? শ্রীজীতেন্দ্রনাথ বসু, মেম্বর এগ্রিকালচার এসোসিয়েসন।

বাঁধা কপি রিডল্যাণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও জলদী জাতীয়। ফুল কপি আর্লি-স্নোবল সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও জল্‌দী জাতীয়। জল্‌দী বাঁধা কপি ও ফুলকপি নিম্নবঙ্গে শ্রাবণের শেষ ও ভাদ্রের প্রথমেই বপন করিতে হয়। নাবী জাতীয় কপি বীজ ভাদ্রের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলে। কৃঃ সঃ।

শ্রীযুক্ত বামাচরণ সামন্ত:—ইষ্টকালয়ের উপরিস্থিত আগাছা বিনষ্ট করিবার উপায়—[যথেষ্ট পরিমাণে চূণের জল অথবা করসিভ্ সব্লিমেট, ১ সের জলে ১ ড্রাম প্রয়োগে অনেক গাছ বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। বিলাতী নানাপ্রকারের

উইড্ কিলার দ্বারা গায়ের শেওলা প্রভৃতি বিনষ্ট করিতে পারা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ বট, অশ্বত্থ প্রভৃতির মূল এতদূর বিস্তৃত যে উহাদিগকে সহজে ধ্বংশ করা যায় না। কৃঃ সঃ।]

শ্রীনীরদ ভূষণ ঘোষালঃ—দাড়িম্বের কীট রোগ।—[দাড়িম্বের ফুল ফুটিলে উহাতে কীট প্রসব করে। কীড়া উৎপন্ন হইয়া কচি দাড়িম্বের মধ্যে প্রবেশ করে। কীড়ার রং কাল, স্থানে স্থানে ফিকে পশ্চাতের অংশ চেপ্টা ও অনেকটা ঢালের ন্যায়। কথিত আছে যে এই অংশ দ্বারা উহার প্রবেশদ্বার বন্ধ করে। কীড়া বীজ খাইয়া জীবন ধারণ করে। পূর্ণ বয়স্ক হইলে উহা ফল হইতে বাহির হইয়া ফলের ডাঁটা ও নিম্নাংশে রেশম বয়ন করিয়া পুনর্ব্বার ফলে প্রবেশ করে ও গুটি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রেশম বয়নের উদ্দেশ্য এই যে ফল গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া না যায়। গুটি হইতে শীত কালে প্রজাপতি বাহির হয়। কীড়া দাড়িম্ব ব্যতীত পেয়ারা ও লকেট ফলকে আক্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। একবার কীড়া উৎপন্ন হইলে আর রোগ নিবারণ করা সম্ভব নহে। রোগ নিবারণের জন্য তিনটি উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায়—(১) ফুল পরাগ অভিষিক্ত হইলেই উহাকে পাতলা বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া বাঁধিয়া রাখা (২) সমস্ত আক্রান্ত ফল গুলি ও পার্শ্বে যদি পেয়ারা ও লকেট থাকে তাহা হইলে তৎসমুদয়েরও আক্রান্ত ফল বিনষ্ট করা এবং (৩) যতদূর সম্ভব প্রজাপতি গুলিকে জালদ্বারা ধৃত করিয়া ধ্বংস করা। পোকার নাম ভিরাকোলা আইসোক্রেটিস্ Virachola Isocrates. কৃঃ সঃ।]

ভারতে জাতিব্যবসা।—জাতিভেদ থাকায় এক এক জাতির সম্বন্ধে এক এক প্রকার শিল্প নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার উপকারিতা এই যে, যাহার পুরুষানুক্রমিক যে ব্যবসা সেই ব্যবসায়ে তাহার কেমন একটু বিশেষত্ব থাকে, অপর ব্যবসায়ীকে সেই বিশেষত্বটুকু লাভ করিতে হইলে বিস্তর আয়াস স্বীকার করিতে হয়। আয়াস স্বীকার করিলেও সকলেই যে সেই বিশেষত্বটুকু লাভ করিতে পারে এমনও বলিতে পারি না। স্যাকরার ছেলে রূপার তার ছোট করিয়া কাটিয়া বাঁ হাতের বুড়া আঙ্গুলের টিপ দিয়া কেমন সেগুলিকে গোলাকার করিতেছে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ঐ কাজ যাহাদের বংশগত নয় তাহাদের একটা ছেলেকে ঐ রকম কাজ করিতে শিখাইতে বোধকরি বিস্তর সময় লাগে। সোণা রূপায় তার যাহারা করে তাহারা চুলের অপেক্ষাও সরু তার করিতে পারে। সেইরূপ সূক্ষ্মতারের মধ্যে দুইটা তার তোমাকে যদি কেহ দিয়া বলে যে, এই দুইটা তারের মধ্যে কোন্‌টি সূক্ষ্মতর বলিয়া দেও। তোমার পক্ষে উহা বলা খুবই কঠিন হইবে। কিন্তু জিহ্বার অগ্রভাগে ঠেকাইলেই স্যাকরা বুঝিতে পারিবে উহারই মধ্যে কোন্ তারটি বেশী সূক্ষ্ম। এই বিশেষত্ব পুরুষানুক্রমিক একই ব্যবসা চালাইয়া আসিবার ফল। আট বছর বয়স ছুতারের ছেলে বাপের সঙ্গে কেমন কাজ করিতেছে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাপ কাঠে দাগ দিয়া দিয়াছে, তদনুসারে সে বাটালি ধরিয়া বিধ করিতেছে; বীট কাটিতেছে, ঘিস্কাপ করিতেছে, তুরপুণ দিয়া ছ্যাঁদা করিতেছে, স্ক্রু বসাইতেছে, প্রেক মারিতেছে, করাতে কাঠ চিরিতেছে। জাত ব্যবসা বলিয়া এই সকল মোটা কাজ ছুতরের ছেলেরা ত দশ দিনের মধ্যেই শিখিয়া ফেলে। অন্য জাতির বা ব্যবসায়ীর ওরূপ ছেলেদের বাটালি ধরা শিখাই-

তেই কত কাল যায়। ফলকথা, যাহাদের যে জাত ব্যবসা সেই ব্যবসায়ে সংস্কার বশতঃ তাহাদের সন্তানসন্ততির কেমন একটু বিশেষত্ব জন্মে যেটুকু অন্য ব্যবসায় অবলম্বীদের ছেলেদের জন্মিতে অনেক আয়াস করিতে হয়। শিল্প ব্যবসায়ের জাতিভেদ প্রথাই ভিত্তি ছিল। সকল জাতির মধ্যে একজন প্রধানপক্ষ থাকিতেন, তাঁহার কথা তজ্জাতীয় লোকে মানিয়া চলিত। এখন শিক্ষিত দল ঐরূপ জাতীয় অগ্রণী কাহাকেও স্বীকার করিতে চায় না।

মিঃ শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, মহাশয়ওইষ্ট-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কিছু দিন পূর্ব্বে একটি সভায় এই মর্ম্মে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

গভর্ণমেণ্টও এই সকল বুঝিয়া পল্লীঅঞ্চলে কৃষি-জীবির সন্তানগণের জন্য যেরূপ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চান, সেরূপ শিক্ষায় চাষীর ছেলেদের হাতে হেতেরে কাজ করিতে বিরাগ হইবে না, তাহারা কেরাণীগিরি চাকরীর জন্য লোলুপ হইবে না এবং পৈতৃক ব্যবসাও ছাড়িতে চাহিবে না। অধিকন্তু একটু পড়া শুনায় তাহাদের উপকার এই হইবে যে, চাষের সম্বন্ধে নুতন তথ্যও কিছু কিছু জানিতে পারিবে, জমিদার ও তাঁহার কারপরদাজদিগের সহিত বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করিতে পারিবে। জমিদারের লোকেরা উহাদিগকে মনে করিলেই ঠকাইতে পারিবে না, এবং উহারাও পূর্ব্বের ন্যায় অনভিজ্ঞতা জন্য জমিদার পক্ষকে ন্যায় কার্য্যে বাধা দিবে না। একটু লেখা পড়া শেখা বলিয়া উহাদের মধ্যে একযোগিতা জন্মিতে পারিবে এবং অনেকে মিলিয়া বুদ্ধি প্রয়োগ করতঃ কাজ করিলে নূতন নূতন কৃষি শিল্প সম্বন্ধেও উন্নতি করিতে পারিবে। ইতি শ্রী—

তৈল ও তৈলশস্যের আমদানী ও রপ্তানি।—এদেশ হইতে বৎসর বৎসর কি পরিমাণ তৈলশস্য বিদেশে রপ্তানি হয় তাহা নিম্নের তালিকা দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

	হন্দর (।৪ সের)	টাকা
১৯০৪-৫	২৬,৭০৩,৯১৩	১৪২,৭৬৯,৪৯৭৲
১৯০৫-৬	১৭,৩৩৮,৬২৬	১৪৪,০১৭,৪৪৯৲
১৯০৬-৭	১৯,৫৩৯,৮৭৩	৯২,৮২৯,৭০৩৲

বিদেশে তৈলশস্য রপ্তানি করিয়া আমরা বিদেশ হইতে তৈল আমদানী করি। আমদানী তৈলের নিম্নে একটী তালিকা দেখুন।

	গ্যালন।	টাকা।
১৯০৪-৫	৭২৬,৮০৮	১,১১৯,৭৯৩৲
১৯০৫-৬	৯০১,৫০৫	১,৪৪০,৮০৫৲
১৯০৬-৭	১,৪৬৮,৭২৪	২,৬৩৩,৭২৪৲

এই বিদেশ হইতে আমদানী তৈলে, কিন্তু আমাদের তৈলের খরচ কুলায় না।

ভারতবর্ষে দেড় শতেরও অধিক তৈলের কল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে একটু আশার সঞ্চার হয়।

ভারতে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ।

	গ্যালন (৵৫ সের)	টাকা।
১৯০৪-৫	৪,৮২৯,৭২২	৬,২৪০,০২৯৲
১৯০৫-৬	৩,৭৯৬,২৪৪	৫,৩৯৯,৪৭৫৲
১৯০৬-৭	২,৯৯১,০২০	৪,৬৭৭,৩৮৭৲

তৈলশস্য রপ্তানি না হইয়া এখানে তৈল উৎপন্ন হইলে আমাদের লাভ অনেক এ কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এদেশে উৎপন্ন তৈল বিদেশী আমদানী তৈল অপেক্ষা নিশ্চয়ই দরে সস্তা। এখানে কল চলিলে এই

দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে অনেক শ্রমজীবির অন্নসংস্থান হয় এবং তৈল-খৈল গুলি এদেশে থাকিয়া যায়, তাহাতে কম লাভ নহে। অধিকাংশ তৈলের খৈল গবাদি পশুর পুষ্টিকর ও সুখাদ্য এবং ইহা জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধিকারী তেজস্কর সার। নাইট্রোজেন, পটাস্, ফস্ফরিক এসিড প্রভৃতি যাহা বৃক্ষলতাদির পুষ্টিকর খাদ্য তাহা বিবিধ প্রকার খৈল হইতে অল্লাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

কেবলমাত্র তৈলশস্য রপ্তানি করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত নহি। আমরা খৈল ও হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সারও বিদেশে রপ্তানি করি। রপ্তানির মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া আরও শঙ্কার কারণ হইয়াছে। সার রপ্তানি,—

	টন (২৭ মণ)	টাকা।
১৯০৫-৬	১৩১,৬৫৬	৭,০৯৭,০৩৮৲
১৯০৬-৭	১৬৪,০৭০	১০,১৫৪,৮৯২৲

ইহার মধ্যে খৈলের পরিমাণই অধিক, যথা—

	টন।	টাকা।
১৯০৫-৬	৩৭,১২৭	১,৬৯৯,১৮৬৲
১৯০৬-৭	৫৮,১৪৪	৪,০০৯,৩৮১৲

অতএব এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, তৈল ও তৈলশস্যের আমদানী রপ্তানিতে আমাদের দেশের কি সমূহ ক্ষতি হইতেছে। এখানে তৈল নিষ্কাষণ করিয়া দেশের খরচের মত তৈল রাখিয়া উদ্বৃত্ত তৈল বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিলে এদেশের লোকে কিন্তু লাভবান হইতে পারেন। এদেশে পশুখাদ্যের দিন দিন অভাব হইয়া পড়িতেছে। এদেশে সমস্ত তৈল নিষ্কাষিত হইলে পশুগণের আহারের কতক কুলান হইতে পারে, এবং অবশিষ্ট সার জমিতে প্রয়োগ করিয়া ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিতে পারে।

*সাধারণতঃ সরিষা, তিসি, তিল, রেড়ী, চীনা বাদাম, নারিকেল, করঞ্চা, কুসুম ফুলের বীজ, সরগোজা, তুলা বীজ, পোস্তদানা, মূলা বীজ ও মহুয়া বীজ তৈল শস্য নামে অভিহিত। এদেশে এই সকলেরই ব্যবসা চলে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত তেঁতুল, বকুল, সিম ও কুমড়া প্রভৃতি বীজ হইতে প্রচুর তৈল নিষ্কাষন করা যাইতে পারে। নিম বীজ ও শিয়াল কাঁটা বীজ হইতেও তৈল পাওয়া যায় এবং তাহাদের তৈল ঔষধার্থে ব্যবহার হইতে দেখা যায়।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

পূর্ব্ববঙ্গে পাটের চাষ।—১৯০৮।— অন্যান্য বৎসরের তুলনায় পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামে পাট চাষের পরিমাণ কম হইয়াছে। বিগত পাঁচ বৎসরের যদি গড় ১০০ ধরা যায় তবে এ বৎসর শতকরা ৮৩·৪ ভাগ হইয়াছে। বিগত বর্ষে বর্ষার বৃষ্টি কম হইয়াছিল। তারপর শীত ও গ্রীষ্মের সময় আদৌ বৃষ্টি না হওয়ায় এবং উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হওয়ায় পাটের আবাদী জমির পরিমাণ এত কমিয়া গিয়াছে। এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত বার বার পাট বীজ বুনিয়া ও কোন ফল হয় নাই। রাজসাহী বিভাগে ৪,০০,০০০ একর, মৈমনসিংহে ১,২৫,০০০ একর, মধ্যপ্রদেশে অর্থাৎ ঢাকা, ত্রিপুরা এবং ফরিদপুর জেলায় ১,৫০,০০০ একর কম জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। বিগত বৎসর পাটের দর অত্যন্ত কম থাকায় লোকের পাট চাষের উপর তত অবস্থা ছিল না। পাটের আবাদ কম হইবার ইহাও একটী কারণ। মোটের উপর সমস্ত বিভাগে

২২,৬৩,৯০০ একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছে। ১৯০৭ সালে ৩০,১০,৮০০ একর পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে ৮০ আনা জমিতে মাত্র পাট চাষ হইয়াছে। নীচু জমিতে জলদি জাতীয় যে পাট চাষ হয় তাহার অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। উচ্চ জমির পাট ভাল রকম হইতেছে। কোন দৈব বাধা ব্যতিক্রম না হইলে অন্য বৎসর অপেক্ষা ভাল ফসল হইবে।

আসামে রেল লাইনের ধারে পাটের চাষ।—আসাম বেঙ্গল রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ রেল লাইনের ধারের পতিত জমিতে পাটের আবাদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই জন্য তাঁহারা পাটের আবাদের বিশেষজ্ঞ ফিন্‌লো সাহেবকে তাঁহাদের লাইনের জমি গুলি পরিদর্শন জন্য বিগত বর্ষ ১৯০৭ সালে আহ্বান করিয়াছিলেন। ফিন্‌লো সাহেব গৌহাটি হইতে দিব্রুগড় পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিয়া কোন কোন ষ্টেসনের ধারে পাট চাষ হইতে পারিবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসর রাজসাহী হইতে বীজ আনাইয়া রেল লাইনের ধারে ধারে পাট চাষ হইয়াছিল। লমডিং ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক তত্ত্বাবধারক সাহেব এই সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে আবহাওয়া তাদৃশ অনুকূল না থাকিলেও অনেক ষ্টেসনে পাট মন্দ জন্মায় নাই। যে কয়েক স্থানে খারাপ হইয়াছে সেই সকল স্থানে হয় অত্যন্ত উচ্চ বা অতিশয় নিচু জমিতে চাষ হইয়াছিল। তিনি বলেন যদি আবহাওয়া অনুকূল হয় এবং চাষ একটু সুপ্রণালীমত হয় তাহা হইলে উত্তর আসামে পাট চাষ সুন্দররূপ হইবে। সাধারণ চাষিরা ব্রহ্মপুত্র নদের উপকূলে পাট চাষ আরম্ভ করিয়াছে এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চাষিরা আসিয়া গোয়ালপাড়া, দারঙ্গ ও নওগাঁও জেলায় পাট চাষ করিতেছে।

উত্তর আসামে পাটের চাষ।—আমাদের এসোসিয়েসন হইতে শিবসাগর, লক্ষীপুর ও কামরূপ প্রভৃতি স্থানে কতিপয় লোককে চাষের জন্য পাট বীজ সরবরাহ করা হইয়াছিল। আমরা যতদুর সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে জানা যায় যে, প্রথমতঃ অনাবৃষ্টির জন্য, তারপর অতিবৃষ্টির জন্য পাটের চাষ নষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে কোথাও পাট ভালরূপ জন্মায় নাই। কিন্তু ইহাতে নিরাশ হইবার কিছুই নাই। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, যাঁহারা পাট চাষ করিয়াছেন তাঁহারা পাট চাষের প্রণালী সম্যক অবগত নহেন, হয় অত্যন্ত জলদি কিম্বা অত্যন্ত নাবী করিয়া পাট বোনা হইয়াছে, পাটের চারা বহির্গত হইলে ক্ষেত নিড়াইয়া ঘাস বা আগাছা মারিয়া দিবার কিম্বা ঘন চারা বাহির হইলে পাতলা করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। আমাদের জানা দুই এক জন মাত্র পাটের জমিতে সার ব্যবহার করিয়াছেন।

আমাদের বিশ্বাস যে, উপযুক্ত জমি নির্ব্বাচিত হইলে, উপযুক্ত সার ব্যবহার করিলে এবং সুপ্রণালী অবলম্বন করিলে আসামে পাট চাষ ভাল রকমই হইবে।

জামালপুর।—গত বৎসর "কৃষক" আফিস হইতে, হাফ্ আর্লি ফ্রেঞ্চ ফুলকপি, ব্রান্স্ইক্ জাতীয় বাঁধাকপির বীজ, বীট (ইজিপ্সিয়ান) আনিয়াছিলাম। ফুলকপিগুলি অতি বৃহৎ এবং সুস্বাদু হইয়াছিল। বাঁধাকপি এবং বীট গুলিও বেশ হইয়াছিল। আর কয়েকটী পরীক্ষার বিষয় লিখিতেছি যে, গত তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের সূক্ষ্ম আউস ধান্য (C. P. fine Aush paddy.) এখানে চাষ করিতেছি, বেশ সুন্দর জন্মায়। ইহার চাউল, এতদ্দেশীয় নামজাদা সূক্ষ্ম উৎকৃষ্ট আমন ধান্যের চাউল অপেক্ষা কোন

রকমে নিকৃষ্ট নহে। ফলন বিঘাপ্রতি ৬/০ মণের অধিক হয় নাই। বপনপ্রণালী এবং পরবর্ত্তী তদ্বির, দেশীয় আউসের মত। তবে এইবারে আমরা ধান্য গুলি গোবরের জলে ১ রাত্রি ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন বপন করিয়া একটি বিশেষ সুফল পাইয়াছি যে, অতি শীঘ্র এবং প্রত্যেক ধান্য হইতে দ্রুত বেগে চারা বাহির হইয়াছে। পূর্ব্বের ২ বৎসরে চারা ভাল জন্মিত না।

কালিম্‌পং জাতীয় বৃহৎ মক্কা গত বৎসর ও চাষ করা হইয়াছিল, কিন্তু এবৎসর গাছ এবং ফল খুব ভাল হইয়াছে। ইজিপ্সিয়ান তুলা;—গত বৎসর অল্প পরিমাণ জমিতে ইহার চাষ করিয়াছিলাম। গাছগুলি বেশ পরিপুষ্ট হইয়াছিল ও প্রচুর ফল ধারণ করিয়াছিল। ইহার তুলাও পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। পুকুরের পচা পাঁক মাটী ক্ষেত্রে ছড়াইয়া (বিঘা প্রতি ৫০।৬০ গাড়ি) দিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে ইহার চারা ক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছিলাম।

বর্ত্তমান বৎসরে এতদ্দেশে পাটের চাষ অপেক্ষা আশু ধান্যের চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাষিরা বলে, পাটের দর কমিয়া গিয়াছে বলিয়াই, তাহারা ধান্যের চাষে মনযোগ দিয়াছে। পাটের চাষ বৃদ্ধি হওয়াতে, কৃষকদিগের অন্নকষ্ট হইতেছে, এই মর্ম্মের একটি সুন্দর গান, কৃষকদিগের ছেলেরা মাঠে কাজ করে,গরু চরায় আর গাহিতে থাকে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু,

Member Dist. Agricul. Assn., কালীগঞ্জ।

বর্ত্তমান বর্ষের অতীব গ্রীষ্মে নারিকেল সুপারির প্রভূত পরিমাণে ক্ষতি করিয়াছে। সুপারি ও নারিকেলের ফুল এবং মুচি শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া এক একটা বৃক্ষ শূন্য করিয়াছে।

অপরিমিত বর্ষণে এবৎসর ধান্যের বিস্তর বীজ এবং চারা কতক ক্ষেত্রে রোপণান্তে কতক চাতরে জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে। কৃষকগণ ব্যাকুলিত-চিত্তে এক্ষণে পুনরায় উদ্গত অঙ্কুর বীজধান্য বপন করিতেছে কিন্তু চাষের বলদ পীড়িত হওয়ায় ও বীজ ধান্য অভাবে তাহাতেও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতেছে না। খাদ্যাভাবে বহু লোকের অনশনে ও উপবাসে কাল কাটাইতে হইতেছে, বোধ হয় এবৎসর এক তৃতীয়াংশ ধান্য ক্ষেত্র পতিত থাকিবে।

পাটের চাষ বর্ত্তমান বর্ষে অতি সামান্যই হইয়াছিল তাহারও অধিকাংশ প্রথমে বৃষ্টি অভাবে ও পরে অতিবৃষ্টিতে জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে।

আম্র, কাঁঠালের ফসল জ্যৈষ্ঠ মাসের সঙ্গেই শেষ হইয়াছে। আনারস, লেবু এবৎসর অতি অল্পই জন্মিয়াছিল।

বৃষ্টির জলে গোচারণ ভূমি জলমগ্ন হওয়ায় তৃণ সমুদয় পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। খড়, বিচালী গত বৎসরের আদৌ সঞ্চিত ছিল না বলিলেই হয় সুতরাং পশু খাদ্যের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে, জঠর জ্বালায় গো ও গোবৎসগণ মাঠের পচা ঘাস খাইয়া রক্ত আমাশয়, বসন্ত ও এঁশো রোগাক্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অবস্থা যেরূপ তাহাতে রোগের প্রসার ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু এদেশে পশু চিকিৎসকের নাম মাত্র লোকে জানে না সুতরাং বিনা চিকিৎসায় আয়ু স্বত্বেও বিস্তর পশু অকালে কাল কবলে কবলিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রও নাই। এদেশের সাধারণ লোকের সংস্কার যে, গরুর পীড়া হইলে ঔষধ নাই।

দুর্ভিক্ষ ক্রমেই প্রবলাকার ধারণ করিতেছে। ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে সকল গৃহস্থ দুই চারি জনকে অন্ন দিয়া প্রতিপালন করিত, বর্ত্তমান বর্ষে তাহারাও ভিক্ষা-অবলম্বন করিয়াছে। আগামী আশ্বিন কার্ত্তিকে বোধ হয় বিস্তর লোক অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত

হইবে। সাতক্ষিরার ডেপুটীবাবু ও মুন্সেফবাবুগণ লোকের দুর্গতি দর্শনে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া আপনাদিগের ও উকিল মোক্তারগণের মধ্যে চাঁদা করিয়া এবং অন্যান্য লোকের সাহায্য লইয়া অতি সামান্য আকারে দাতব্য ফণ্ড খুলিয়া আপাততঃ দুই দশ জন লোকের সাহায্য করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে নিজ সাতক্ষিরা ও পার্শ্ববর্ত্তী দুই দশ খানি গ্রামের লোকের উপকার হওয়া ব্যতীত এলাকার দুরস্থ লোকের কিছুমাত্র সাহায্যের সম্ভাবনা নাই, আর অর্থই বা কোথায়! বহু ভদ্র পরিবার নিঃশব্দে এখনই অনাহারে কালযাপন করিতেছেন এবং নিম্নশ্রেণীর মুসলমান প্রভৃতি জাতিরা স্ত্রী ও শিশু পুত্রকন্যা ত্যাগ করিয়া নিজের উদর পূরণ জন্য অনির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং নিম্নশ্রেণীর যুবতী রমণীগণও অৰ্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় ছিন্ন বসন পরিধান পূর্ব্বক এক একটী ভাঁড় হস্তে ভিক্ষায় বাহির হইতেছে ইহাদিগের এখন আর লজ্জা বা সম্ভ্রমের ভয় নাই, উদরপোষণেই ব্যস্ত। মুসলমান কামিনীগণ এইক্ষণে হিন্দুর অন্ন ভোজনে দ্বিধা বোধ করে না, অন্ন পাইলেই হইল।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীগঞ্জ, জেলা খুলনা।

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ চাষের অবস্থা।— সরকারী রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, ৩রা আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে সমগ্র বাঙ্গালা প্রদেশের সাধারণতঃ সর্ব্বত্র বৃষ্টি হইয়াছে, দার্জ্জিলিং, বালেশ্বর, সম্বলপুর এবং কুচবেহারে পরিমাণে কিছু বেশী এবং বেহার বাদে আর সর্ব্বত্র অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। বেহারে ক্ষেত সমূহে ভাদুই ফসল এবং আমন ধান রোয়ার জন্য এখনও বেশী বৃষ্টির প্রয়োজন। হাওড়া, ২৪ পরগণা, যশোহর এবং খুলনা ব্যতীত পাটের অবস্থা আর সকল স্থানে এক প্রকার ভাল। পাটনা, গয়া এবং সারণে যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টির অভাবে ধান্যের ক্ষতি হইতেছে। ইক্ষুর অবস্থা ভাল; পূর্ব্ব সপ্তাহের সহিত তুলনায় সাধারণের ব্যবহার্য্য চাউলের দর ২৪ পরগণা, গয়া, দ্বারবঙ্গ, পূর্ণিয়া এবং পালামোয় চড়িয়াছে; বাঁকুড়া, যশোহর, সাঁওতাল পরগণা, পুরী এবং সম্বলপুরে কিছু নরম হইয়াছে, অবশিষ্ট জেলাগুলিতে সমানই আছে। নদীয়া, মুরসিদাবাদ, বালেশ্বর ও পালামোয় খাদ্য শস্যের সঞ্চয় যথেষ্ট পরিমাণে আছে। যশোহর, গয়া, সারণ, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, সম্বলপুর, হাজারিবাগ, পালামো এবং মানভূমে গবাদির ব্যারাম হইতেছে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষ প্রতিকার ব্যবস্থায় ৩০৬০৯ লোক সাহায্য পাইয়াছে; তন্মধ্যে কেবল ঐ উড়িষ্যাতেই ১৫৩৫২। নদীয়া, যশোহর, কটক, বালেশ্বর, আঙ্গুল, পুরী, হাজারিবাগ এবং রাঁচিতে ৯১১৪ লোক আসিয়া কার্য্য করিয়াছে। রাঁচিতে দুর্ভিক্ষ পূর্ত্তে কাজ করিয়াছে ১০৭৩৭।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

ভাদ্র—আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর।

কৃষিক্ষেত্র। যে সকল জমিতে শীতকালের ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া চষিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

সার মিশ্রিত গামলা বা কাটের বাক্সে কপি বীজ বপন করিয়া এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতা সার মিশ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। জলদি ফসলের জন্য ইতিপূর্ব্বেই চারা প্রস্তত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে বা গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না।

উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাঁধিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা আবশ্যক মত হোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কোন কোন সুনিপুণ চাষি থেঁতো বাঁশের মাচান করিয়া তাহার উপর "৬।৮" ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়া বীজ বপন করে।

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোমা বা বিচালি গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজ ক্ষেত্রে জল ছিটাইতে হয়।

আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যাহাতে আলু বসাইবে তাহাতেও এই সময় উত্তমরূপ চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে।

শীতকালের জন্য লাউ, কুমড়া বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ৩।৪ দিন হুকার জলে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজ গুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারে না।

ওল ও মানকচু এই তুলিবার সময়। এই সময় তাহারা খাইবার উপযুক্ত হয়।

মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানের কপির চারা ক্ষেতে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে মাসের শেষে কার্য্য আরম্ভ হইবে। পাটনাই ফুলকপির চারা কিন্তু ক্ষেতে বসান এতদিন হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Celery), এসপ্যারেগস (Asparagus) ও দুই এক জাতীয় টমাটোর (Tomato) চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ, কুমড়া, শাঁকালু, বীট, পাটনাই শালগম ও গাজর, পালম, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী, শসা প্রভৃতি দেশী সব্জী তৈয়ারি করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মূলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইবে।

ফলের বাগান।—লিচু, লেবু, প্রভৃতি ফল গাছের যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে, তাহাদের গুল কলম করা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আম প্রভৃতির জোড়কলম বাঁধা এখনও চলিতেছে।

বীজ নারিকেলের চারা করিবার জন্য এই সময় মাটিতে বসাইতে হইবে।

যে সকল নারিকেল, গাছ হইতে পাকিয়া ও শুকাইয়া আপনি পড়ে, তাহাদিগের গলন নারিকেল কহে। একটী শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়া বোটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয় ও আবশ্যক মত জল সিঞ্চন করিতে হয়।

ফুলের বাগান।—বালসম (Balsam) জিনিয়া (Zinnia), কনভলভিউলাস মেজর (Convolvulus Major), আইপোমিয়া (Ipomœa) প্রভৃতি ফুল গাছ তৈয়ারি করিবার এই সময়। কতকগুলি জাপানী লিলি আছে সেগুলি জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বসান উচিত কারণ সেগুলির বর্ষাতেই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সময় প্যান্সী, এষ্টার মিগ্নোনেট বীজ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বপন করা উচিত।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

পূর্ব্ববঙ্গে কল কারখানা।—১৯০৭ সালের শেষ ভাগে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে সর্ব্বসমেত ১০৮টি কারখানা চলিয়াছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসরে কারখানার সংখ্যা ছিল ৯৯। পূর্ব্বোক্ত কারখানা সমূহের মধ্যে ছাপাখানা ১, রেলের কারখানা ৮, পাটের কল ৮৬, তেলের কল ২, কলের করাত ৯, টিনের কারখানা ১ এবং মৃৎপাত্রের কারখানা ১। গড়ে

প্রতিদিন উক্ত কারখানা সমুদয়ে ১৮,৫৪৭ জন কাজ করিয়াছে।

কৃষির সাহায্যে অর্থ মঞ্জুর।—ভারতীয় কৃষি-বিভাগের বড়কর্ত্তা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অনুসন্ধান জন্য অর্থ সাহায্যের অঙ্গীকার করিয়াছেনঃ—(১) সিন্ধুদেশে মৃত্তিকার অপকারী লবণ—(২) পঞ্জাবে শস্যঝাড়ান কল পরীক্ষা—(৩) তিসি তন্তু ব্যবসায় (৪) বিশেষ মুল্যবান ফসল সমুদয়ের বাছা বীজ বিতরণ—(৫) কতিপয় জেলার পক্ষে উপযুক্ত কৃষি-প্রণালী, কৃষিযন্ত্র ও সার পরীক্ষা—(৬) মুরগীর চাষ—(৭) কৃষির সহিত গৌণ ব্যবসায় রূপে মধু-মক্ষিকার চাষ।

বোম্বাই প্রদেশে জল সেচনের উন্নতির উপায় বিধান।—সম্প্রতি বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট বাষ্পীয় পম্প সাহায্যে জল সেচনের উন্নতিকল্পে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে একজন যন্ত্রবিৎ ও ৪০৲ টাকা বেতনে উহার একজন সহকারী নিয়োগ করিয়াছেন। যে কোন ভূস্বামীর জলোত্তন বিষয়ে পরামর্শ আবশ্যক হইলে, তিনি কৃষি ডাইরেক্টারের নিকট আবেদন করিলেই সদুপদেশ পাইতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন যে, শীঘ্রই বিলাত হইতে একজন অভিজ্ঞ আনাইয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করাইবেনঃ—(১) তৈল, জলীয় অথবা অপর বাষ্প কিম্বা বায়ু কিম্বা বলদ চালিত জলোত্তোলন যন্ত্রের উপকারিতা এবং লাভ জনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে উপরোক্ত প্রণালী সমূহের যে কোন প্রণালী সাধারণ সমক্ষে প্রদর্শন—(২) কূপ খনন ও বোম্বাই প্রদেশে নিম্ন মৃত্তিকায় জলের পরিমাণ নির্দ্ধারণ—(৩) কৃষিযন্ত্র প্রবর্ত্তন ও প্রচলন। আমাদের দেশেও এইরূপ অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। প্রতিবৎসর জলাভাবে অনেক জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকিতেছে এবং কৃষকের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর হইতেছে। এরূপ অবস্থায় জলাভাব নিবারণের ব্যবস্থা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল।

পরিভ্রমণ।—বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টার মিঃ গোরলে বাঁকিপুরে কৃষি-সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতা হইতে গিয়াছেন। ভারতীয় কৃষি-বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনারেল মিঃ সলিমন বঙ্গের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিবেন এবং মিঃ গোরলেও তাঁহার সহিত থাকিবেন। মুঙ্গেরে তামাকের কারখানা পরিদর্শন করিয়া তাঁহাদের ভাগলপুরে গিয়া সবর কৃষি-কলেজের ভিত্তিস্থাপনের কার্য্যে যোগদান করিবার কথা ছিল। শ্রীযুক্ত ছোট লাট মহোদয় এই কলেজের ভিত্তিস্থাপন করিবেন। শরীর অসুস্থতার জন্য তিনি ১৭ই আগষ্টের পূর্ব্বে ভাগলপুর গমন করিতে পারিবেন না। সুতরাং মিঃ সলিমন ও মিঃ গোরলের পরিভ্রমণের বন্দোবস্তে কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। যাহা হউক তাঁহারা এইবারে মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, রূপসা, বারিপদা, খড়্গপুর, চক্রধরপুর, চাঁইবাসা, ও রাঁচি প্রভৃতি স্থানে গমন করিবেন ও প্রত্যেক স্থানে কৃষির বর্ত্তমান অবস্থা ও উন্নতি প্রণালী নির্দ্ধারণ করিবেন।

ফসলের আশা।—বাঙ্গালার বহু স্থানেই দুই সপ্তাহের পূর্ব্বের অতিবর্ষণে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ধান্যের বীজচারাসমূহ অনেক স্থানেই নষ্ট হইয়াছে; এখনও বহু গ্রাম জলে ডুবিয়া আছে। হুগলী জেলায় একাধিক গ্রাম হইতে সংবাদ পাইয়াছি,

অনন্যোপায় কৃষকগণ ভিন্ন গ্রাম হইতে ছয় টাকা পণ বীজ কিনিয়া আনিয়া দশ পাঁচ কাঠা আবাদ করিতেছে। ষ্টেটস্‌ম্যান ভারী আনন্দ করিয়া বলিতেছেন,—"সে দিনের বৃষ্টিতে চাষের ভারী সুবিধাই হইয়াছে।" আমরা যেরূপ অবস্থার সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে তেমন আশা বা আনন্দের কিছুই নাই।

অন্নকষ্ট।—মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমা। রামনগর এবং এগরা থানা এই মহকুমায়। দুই থানায় প্রায় আড়াই হাজার লোকের সবিশেষ অন্নকষ্ট উপস্থিত। আর্ত্তত্রাণের জন্য এক কমিটি হইয়াছে। চাঁদায় প্রায় দুই হাজার টাকা উঠিয়াছে। এই টাকায় গ্রামে গ্রামে চাউলাদি বিতরিত হইতেছে। জুন মাসে দুই শত সত্তর টাকা এবং জুলাই মাসে ছয় শত টাকার চাউল বিতরিত হইয়াছে। কমিটির অনুমান,—প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা আবশ্যক,—নবেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে পঁচিশ হাজার টাকা আবশ্যক। নূতন ফসল না উঠিলে ত আর অন্নকষ্ট হ্রাসের সম্ভাবনা নাই। কমিটির উদ্বেগ,—কেমন করিয়া এত টাকা সংগৃহীত হইবে। দুই চারি জন রাজা জমিদারের কৃপা হইলেই, এ টাকাটা উঠিতে কতক্ষণ?

দামোদরের বান।—হুগলী বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর নদের বানে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রতিকারের আশায় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কতবার কত দরখাস্ত হইল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন সুফলই ফলে নাই। এই বার শুনিতেছি, কিছু সুফল ফলিবে। দামোদর নদের দক্ষিণ তীরবর্ত্তী কতক কতক হানা বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। এ সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং পত্রে যে সংবাদটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতীব সংক্ষিপ্ত। সুতরাং কোথায় কিরূপ কাজ হইবে, তাহা এখন ঠিক করিয়া বলা দুরূহ। ব্যয়ের অনুমান হইয়াছে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা। এই সাড়ে চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিলে, এক হুগলী জেলারই ছয় লক্ষ টাকার ফসল বন্যাবিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। এরূপ বিপদ-প্রতিকার ত শীঘ্রই আবশ্যক।

অনাবৃষ্টি।—দুর্ভিক্ষের দুইটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্যের অভাব, দ্বিতীয়তঃ, শস্য ক্রয় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হইলে, অথবা যথাসময়ে বারিবর্ষণ না হইলে, ভূমি হইতে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় না। ভারতবর্ষে ইদানীং অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি এবং অসময়ে বৃষ্টি এই তিনটী উপদ্রবই দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিনটী উপদ্রবের ফল একই প্রকার অর্থাৎ শস্যের হানি। তবে, অসময়ে বৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি অপেক্ষা অনাবৃষ্টি হইতেই অধিকতর অনিষ্ট হইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে বর্ত্তমান বর্ষেও অনাবৃষ্টি হেতু চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছিল। স্মরণাতীত সময় হইতে অনাবৃষ্টির প্রতিকারসাধনের জন্য ভারতবর্ষে নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের নিমিত্ত প্রাচীনকাল হইতে নানা স্থানে কূপ, পুষ্করিণী ও খাল প্রভৃতি নিখাত হইয়া আসিতেছে। পঞ্জাব ও রাজপুতনা প্রদেশে কস্মিন্ কালেও প্রচুর বারিবর্ষণ হয় না। এই প্রদেশসমূহে কূপ হইতে জল উত্তোলন করিয়া শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করিতে হয়। ইদানীং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের নানা স্থানে খাল (canal) কাটাইয়া জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদ্দ্বারা কৃষিকার্য্যের যে বিলক্ষণ সহায়তা

হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের আরও অনেকগুলি কর্ত্তব্য আছে। তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান না করিলে, কৃষিকার্য্যের সম্যক্ উপকার হইবে না। প্রাচীন হিন্দুরাজগণ এবং মুসলমান বাদশাহগণ নানা স্থলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা ও জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত জলাশয়ে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল সঞ্চিত থাকিত এবং অনাবৃষ্টির সময়ে সেই জল শস্যক্ষেত্রে সেচনের জন্য ব্যবহৃত হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে, বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কোনও বৃহৎ জলাশয় খনন করাইতেছেন না এবং পুরাতন জলাশয়গুলির পঙ্কোদ্ধার অথবা সংস্কারেও মনোনিবেশ করিতেছেন না। রাজপুরুষেরা কেবল খাল কাটাইতেই অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন। কিন্তু খালের জল সর্ব্বত্র লইয়া যাওয়া সহজ নহে। যেখানে খাল খনন করা দুরূহ কার্য্য, সেখানে জলাশয় খনন করিলে, কৃষকগণের বিলক্ষণ উপকার হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন কালের অনেকগুলি "দাঁড়া" অর্থাৎ খালও আছে। সংস্কারাভাবে, সেগুলিও অকর্ম্মণ্য হইয়া আছে। এই দাঁড়াগুলির সংস্কারসাধনও গভর্ণমেণ্টের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, সময়ে হউক আর অসময়ে হউক, ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। কিন্তু এই বৃষ্টির জল সঞ্চিত করিয়া রাখিবার সুচারু ব্যবস্থা না থাকায়, তাহার অপব্যয় হয়। আমরা যদি এই অপব্যয় নিবারণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগকে যে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে এবং পানীয় জলের অভাবে হাহাকার করিতে হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি ?

কিন্তু অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ কারণ নহে। অতি বৃষ্টিই হউক, আর অনাবৃষ্টিই হউক, ভারতবর্ষে কখনও প্রচুর শস্যের অভাব হয় নাই। যে বৎসর ভারতবর্ষে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সে বৎসরেও শস্যের অভাব ঘটে না ; এমন কি, এরূপ দুর্ব্বৎসরেও খাদ্য শস্য সকল প্রভূত পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষে যে একটী দুর্ভিক্ষ-কমিশন বসিয়াছিল, সেই কমিশনের রিপোর্টেই এই কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রচুর পরিমাণ শস্যের অভাব জন্য ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় না। কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষে লোক সংখ্যা অতিশয় বর্দ্ধিত হইতেছে ; সেই কারণেই এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু ভারতে অতিরিক্ত লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির কথা নিতান্ত অমূলক। ভারতবর্ষের আকার অনুসারে, তাহার যেরূপ লোক সংখ্যা, ইউরোপের আকার অনুসারে, তাহার লোক সংখ্যা তদ্রূপ নহে। ভারতবর্ষে লোকের জন্ম সংখ্যাও ইংলণ্ড, জার্ম্মনী প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা অল্পতর। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা ভারতবাসিগণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। এখনও ভারতবর্ষে যে অকৃষ্ট ভূমি পড়িয়া আছে, তাহা কৃষি-উপযোগী করিতে পারিলে, শতবর্ষের মধ্যে এদেশের লোকের অন্নকষ্ট হইবে না।

ভারতের দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ, ভারতবাসিগণের দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য এরূপ ভয়ঙ্কর যে, যে বৎসর প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, সে বৎসরেও তাহারা উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পায় না। দরিদ্র ব্যক্তিরা যাহা উপার্জ্জন করে, তদ্দ্বারা দুর্ভিক্ষের সময়েও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। অর্থসঞ্চয় করা তো দূরের কথা। সুতরাং যে বৎসর দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সে বৎসর তাহারা আর আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। হয়, তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিম্বা গভর্ণমেণ্টের

সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কোনওরূপে প্রাণরক্ষা করে। দুর্ভিক্ষ-কমিশনের রিপোর্টে যখন প্রকাশ যে, দুর্ভিক্ষের বৎসরেও প্রচুর পরিমাণ শস্য বিদেশে রপ্তানী হয় তখন শস্য ক্রয়ের উপযুক্ত অর্থাভাবই যে প্রজাপুঞ্জের অন্নকষ্টের কারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

তেঁতুল বীজ।—দুর্ভিক্ষ বা অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইলে অনেক স্থলে ঐ বীজ সিদ্ধ করিয়া খাইয়া থাকে। তেঁতুল একটী অম্লরসাত্মক ফল। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই নানাপ্রকার চাট্‌নি, আচার বা ব্যঞ্জনাদিতে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে শতকরা শাঁস ৫৫, বীজ ৩৩·৯, খোলা ও আঁশ ১১·১ মাত্রায় আছে। সচরাচর শাঁসই ব্যবহার হয়, বীজ অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

কিন্তু ভারতবর্ষে আজকাল বৎসরের পর বৎসর দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় বলিয়া অপকৃষ্ট খাদ্য সমূহও লোকের জীবন রক্ষার উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। মান্দ্রাজের অনন্তপুর, উত্তর আর্কট, বেলারি, ভদ্রচালম, চিঙ্গিলিপুট, কইম্বাটুর, কদ্দালোর, কদাপা, গাঞ্জাম, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কর্ণূল, নীলগিরি, ভিজিগাপট্টম, ভেলাভরম, প্রভৃতি স্থানে; মধ্যপ্রদেশের নাগপুরে; মধ্যভারতের ভুপাল, ভোপাওয়ার, গোয়ালিয়র, জালওয়ার, মালুওয়া, মেরওয়ার, এবং সাপুরায়; বঙ্গদেশের হুগলী, মুঙ্গের, মানভূম, মুর্শিদাবাদ, রাঁচি এবং সিংভূমে বহুবার লোকে তেঁতুল বীজ খাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে। বীজগুলি ভাজিয়া বা জলে ভিজাইয়া বা সিদ্ধ করিয়া উপরের পাটলবর্ণ খোলাটী ছাড়াইয়া ফেলা হয়। তৎপরে ভিতরের শাঁস ভাজিয়া বা সিদ্ধ শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করে এবং ঐ চূর্ণে রুটি বা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া খাইয়া থাকে। রাঁচিতে চালভাজার গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া লাড়ু প্রস্তুত করিয়া খায়। সাঁওতালেরা মহুয়া ফুলের সহিত মিশাইয়া খাইয়া থাকে। তেঁতুল বীজের শাঁসচূর্ণ জলে গুলিয়া লেই প্রস্তুত করিলে সুন্দর লেই হয়। উহা পশমী বস্ত্র বয়নকারী, চামড়ার সাজ নির্ম্মাণকারী বা দপ্তরীগণের বিশেষ কাজে লাগে। ইহা প্রায় বিলাতি গ্লু বা সাইজের (Glue or size) মত। অনেক সময় তেঁতুল বীজ ভক্ষণে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার ব্যাধি দেখা দিয়াছে। ভুপালে স্নায়ুদুর্ব্বলতা, কদাপায় কোষ্ঠবদ্ধতা, উত্তর আর্কটে উদরাময়, ঝালওয়ারে শোথ রোগাক্রান্ত হইয়াছে। বীজের খোসাটাই এই সমস্ত উৎপাতের কারণ। এই খোসাটা যত্নপূর্ব্বক ছাড়ান উচিত। ভিতরের শাঁস অনেকাংশে পুষ্টিকর তাহা নিম্নের রাসায়নিক ভাগগুলি দেখিলে বুঝা যায়।

	খোসা সমেত বীজ।	খোসা ছাড়ান বীজ।
জল	১০·৫০	৯·৩৫
আলবুমেনোরডস্	১৩·৮৭	১৮·০৬
চর্ব্বি	৪·৫০	৬·৬০
কার্ব্বোহাইড্রেট	৬৩.২২	৬২·৮৮
আঁশ	৫·৩৬	·৬৬
ছাই	২·৫৫	২·৪৫

এতদ্ব্যতীত বীজের খোসায় যথেষ্ট পরিমাণ ট্যানিন্ বিদ্যমান আছে, যাহাতে শরীরের অনিষ্ট করে। তেঁতুল বীজে তৈল ভাগ অতি অল্প মাত্রায় বিদ্যমান আছে। যেটুকু আছে তাহাও অনেকটা চর্ব্বির মত। তেঁতুল বীজ চূর্ণ ঘা বা স্ফোটকাদিতে প্রলেপ বা পুল্‌টিসের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। তেঁতুলের শাঁস ভারতবর্ষে ব্যবহার ব্যতীত ঔষধ প্রস্তুতের জন্য ইউরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে।

REGISTERED No. C.102.

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

নবম খণ্ড,—পঞ্চম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,

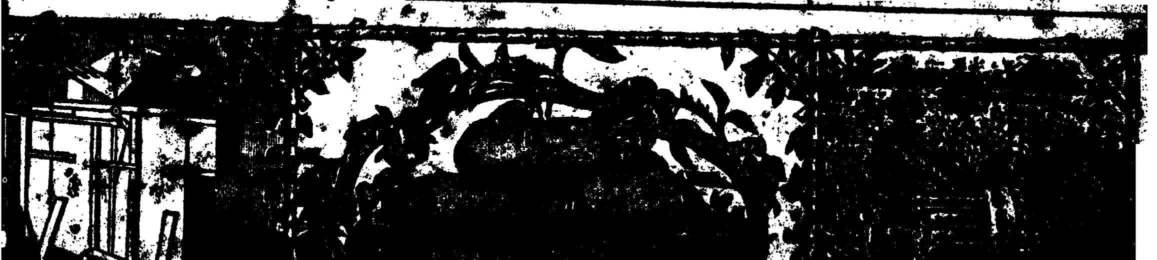
সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস।



ভাদ্র, ১৩১৫।

মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত;
১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।



কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

কৃষক।

৯ম খণ্ড। ভাদ্র, ১৩১৫ সাল। ৫ম সংখ্যা।

গোরুর এঁসো রোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনেক গোরুর চিকিৎসা করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত প্রথা অবলম্বন করা উচিত যথাঃ—৮।৯ দৈর্ঘ্যের ও ৪।৫ হাত প্রস্থের এক খণ্ড জমির মাটী ৮।১০ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত খনন করিয়া লইয়া মাটী গুলি খনিত জমি হইতে পৃথক করিয়া রাখিবে; পরে ঐ জমিটী বেশ করিয়া পিটিয়া লইবে। এরূপ ভাবে পিটিয়া লইবে যাহাতে জল সহজে মাটীর নিম্নে যাইতে না পারে। তৎপরে মাটীগুলি যাহা জমি হইতে পূর্ব্বে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা খনিত জমিতে ছড়াইয়া দিবে এবং ঐ মাটীতে জল ঢালিয়া দিয়া কাদা মাটী করিয়া লইবে। ঐ কাদা মাটীতে ফিনাইল, সোহাগা চূর্ণ, ফিটকারী চূর্ণ কিম্বা তুঁতে চূর্ণ মিশাইবে। রোগাক্রান্ত গোরুদিগকে, যাহাদের পায়ে ক্ষত আছে, প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে দুই বার ঔষধযুক্ত কাদা মাটীর মধ্য দিয়া হাটাইয়া লইবে এবং ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত ঐরূপ করিবে। কয়েক দিন পরে দেখিতে পাইবে যে অনেক গোরুর ক্ষত শুকাইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন গোরুর সামান্য ক্ষত আছে এবং যাহাদের পায়ে সামান্য ক্ষত থাকে তাহাদিগকে পুনরায় ক্ষত শুকাইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ঔষধ দেওয়া কাদা মাটী দিয়া হাটাইয়া লইবে। এরূপ করিলে দেখিতে পাইবে যে কদাচিৎ ২।১টী গোরুর ঘা বিস্তৃত হইয়াছে, যে সকল গোরুর পা ফুলিয়াছে, ঘায়ে দুর্গন্ধ হইয়াছে ও অত্যন্ত বড় ঘা হইয়াছে তাহাদিগকে কাদা মাটীতে না হাটাইয়া গরম জল দিয়া পা ধোয়াইয়া ঘায়ে মলম লাগাইয়া দিবে ও সেঁক দিবে কারণ ঐ অবস্থায় কাদা মাটী দিয়া হাটাইলে ক্ষুরের ভিতরে মাটী প্রবেশ করিতে পারে ও খুর খসিয়া পড়িয়া যাইতে পারে।

পালানে কিম্বা বাঁটে ঘা থাকিলে প্রত্যহ গরম জল দিয়া ঘা গুলি ধোয়াইয়া দিবে ও বারম্বার গরম ঘি অথবা তৈল লাগাইয়া দিবে। বেশী পরিমাণে ক্ষত থাকিলে ৬ নং অথবা ৯ নং ঔষধ লাগাইয়া দিবে। আস্তে আস্তে দুধাল গাভীর দুধ দোহন করিবে এবং হাতে বড় নখ থাকিলে নখ কাটিয়া লইবে; কেননা দুধ দোহন কালে নখের চাপ লাগিয়া ক্ষত বিস্তৃত হইতে পারে। রোগাক্রান্ত গাভীর দুধ বাছুরদিগকে খাইতে দিবে না যেহেতু বাছুর দাঁত দিয়া ক্ষত বৃদ্ধি করিতে পারে ও বাছুরের এই রোগ হইতে পারে। পালান ও বাঁট ফুলিয়া

গেলে সেঁক দিবে। পালানে পূঁয জন্মিলে ছুরি দিয়া পালানটী চিরিয়া দিয়া পূঁয বাহির করিয়া লইবে ও প্রত্যহ নালী ধোয়াইয়া ৬ নং অথবা ৮ নং ঔষধ লাগাইয়া দিবে। বাঁট কাণা হইলে সূঁই দ্বারা বাঁটের মুখ ছিদ্র করিয়া দিবে।

গোরু অত্যন্ত রোগা হইলে ¼ ছটাক লবণ ও ১ তোলা হীরাকস একত্রে মিশাইয়া গুঁড়া করিয়া প্রতিদিন ১ বার খাদ্যের সহিত খাইতে দিবে। উদরাময় থাকিলে অর্দ্ধ ছটাক খড়ি মাটী গুঁড়া, ¼ ছটাক খয়ের, ¼ ছটাক শুঁঠ চূর্ণ, ৩টী দুয়ানির সম ওজন আফিং ও ।০ এক ছটাক দেশী মদ একত্রে মিশাইয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ভাতের কিম্বা তিসির মাড়ের সহিত খাওয়াইয়া দিবে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে সংক্রামক রোগের বীজ হইতে এঁসো রোগের উৎপত্তি হয়; অতএব নিম্ন-লিখিত সংক্রামক রোগ নিবারণের উপায় অবলম্বন করিবে যথা ঃ—

(১) যখন ১টী গোরুর এঁসো রোগ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইবে তখন প্রথমতঃ ঐ পীড়িত পশুকে সুস্থ পশুগণ হইতে পৃথক রাখিয়া চিকিৎসা করাইবে।

(২) রোগ শূন্য পশুগুলিকে প্রত্যহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে তাহাদের মধ্যে কোনটীর রোগ হইয়াছে কি না এবং রোগাক্রান্ত হইলে অগৌণে স্থানান্তরিত করিবে।

(৩) পীড়িত পশুর শুশ্রূষাকারীকে সুস্থ পশু-গণের পরিচর্য্যা করিতে দিবে না এবং খড়, কুটা ইত্যাদি যে সকল জিনিষ পীড়িত পশুর সংস্রবে আসিয়াছে তাহা সুস্থ পশুগণকে খাইতে দিবে না বা তাহাদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতে দিবে না।

(৪) এই রোগে মৃত গোরুর চর্ম্ম যাহাতে রোগ বিস্তার করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে।

(৫) গো-চারণ ভূমি রোগাক্রান্ত গোরুর দ্বারা দূষিত হইলে যে পর্য্যন্ত বিষঘ্ন ঔষধ দিয়া চারণ ভূমি বিশুদ্ধ না হয় ও চারণ ভূমিতে পরিবর্ত্ত চাষ আবাদ না হয় সেই পর্য্যন্ত সুস্থ গোরুদিগকে চরিতে দিবে না।

(৬) রোগ হওয়া মাত্র গোরুদিগকে তিন ভাগে শ্রেণী বদ্ধ করিয়া প্রত্যেক দল পৃথক পৃথক লোক দ্বারা পরিচর্য্যা করাইবে যথা ঃ—

(ক) রোগাক্রান্ত গোরু।

(খ) যাহারা রোগ শূন্য হইয়াও রোগাক্রান্ত গোরুর সংস্পর্শে আসিয়াছে।

(গ) যাহারা রোগ শূন্য অথচ রোগাক্রান্ত গোরুর সংস্পর্শে আসে নাই।—শ্রীকুঞ্জবিহারি দে, জি, বি, ভি, সি।

খুলনা জেলার কতিপয় হৈমন্তিক ধান্য।

এদেশে বহু জাতীয় ধান্য বিভিন্নশ্রেণীর ভূমিতে উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ তাহাদিগকে বড়ান,

আধবড়ানে, অতিবড়ান ও ছোটনা এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। উপরের কথিত চারি শ্রেণীই হৈমন্তিক ধান্য। উহা ব্যতীত আর এক প্রকারের ধান্যও জন্মে, তাহাকে আশু ধান্য বা আউস ধান্য কহে। আশু ধান্য সম্বন্ধে আমাদিগের অত্র প্রবন্ধের কোন বক্তব্য নাই সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমরা কোন কথা কহিব না। কেবলমাত্র হৈমন্তিক চারি জাতি ধান্যের মধ্যে যত গুলি ধান্যের নাম আমাদিগের জানা আছে, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিব। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জন্মে, এবং সর্ব্বশেষে সুপক্ক হয়, তাহা অতিবড়ান নামে অভিহিত হয়। তদপেক্ষা অল্প জলে জন্মা এবং অগ্রে সুপক্ক হওয়াকে বড়ান ; তদপেক্ষা কম জলের ও সত্বর সুপুষ্ট হওয়াকে আদবড়ানে এবং যে ধান্য সর্ব্বাগ্রে পাকিয়া উঠে এবং সামান্য জল বিশিষ্ট গ্রাম মধ্যস্থ উচ্চ অথচ লবণাম্বুচিরসংস্পর্শশূন্য (মিঠান) জমিতে জন্মে তাহাকেই ছোটনা ধান্য কহে। এক অতিবড়ান নাম ব্যতীত অন্য তিনটি নামই সর্ব্বজন বিদিত এবং কৃষক কর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকে। বড়ান ধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মোটা, ইহার আতপ চাউল অতি সুমিষ্ট ; কেহ কেহ উহাকে ভেটে ধান্যও বলিয়া থাকেন। আধবড়ানে উহাপেক্ষা কিছু মিহি। অতিবড়ান তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু ইহার আতব চাউল হয় না। আতপতাপে উত্তপ্ত ধান্যের চাউল করিতে গেলে ঢেঁকি অথবা উদুখলের আঘাতে ধান্য ভাঙ্গিয়া চাউল চূর্ণ হইয়া যায়, এজন্য সিদ্ধ করিয়াই চাউল প্রস্তুত করে। সিদ্ধ শুষ্ক ধান্যের চাউলে একটিও ক্ষুদ বাহির হয় না। তবে সিদ্ধ চাউলের একটা সাধারণ দোষ এই যে, ইহা ছাটিলে আদৌ কুঁড়া বাহির হয় না, সমস্তই তুষ রহিয়া যায়। তৎপরে ছোটনা ধান্য ; ইহার চাউল অতি সুন্দর, মিহি ও পরিষ্কার। ইহাতে আতপ ও সিদ্ধ দুই প্রকারের চাউলই হয়। কি বড়ান, কি ছোটনা সকল চাউলের ক্ষুদই কৃষক ও কৃষকপত্নীরা অন্নের পরিবর্ত্তে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে। ভদ্র গৃহস্থেরা দুগ্ধবতী গাভীকে ক্ষুদের যাউ রন্ধন করিয়া বিচালী অথবা পলের সহিত কুঁড়া জল দিয়া মাখিয়া খাইতে দেয়। উহার ফলে গাভী অধিক দুগ্ধবতী হয়।

খুলনা জেলায় যে সকল ধান্য জন্মে, তাহাদের নাম যথা—অতিবড়ান অর্থাৎ যে ধান্য সর্ব্বাপেক্ষা গভীর অথচ লোণা সংস্পর্শশূন্য গভীর বিলে জন্মে ও সর্ব্বশেষে সুপক্ক হয়। কাঁটারাঙ্গি, কুমড়াগড়ী, লাউতেলি ও ক্যারশালী এই চারি প্রকার ধান্য অতিবড়ান শ্রেণীভুক্ত।

বড়ান। এই ধান্য দেড় হাত দুই হাত জলে এবং নদী তীরের বড় বড় "জোয়ারিয়া" বিলে জন্মে। (১) খেজুরছড়ি, (২) দেঁড়েখচ্চি, (৩) নলভোগ, (৪) হোগলা, (৫) পাড় হোগলা, (৬) বঁড়ান তালমুগুর, (৬) বাস্ (বাইস্) মুগুর, (৮) গোড়েমুড়ি, (৯) সাইট চাইল, (১০) বর্ণচাঁপা, (১১) বরারঞ্জাট, (১২) চেঙ্গো, (১৩) সইলপোনা, (১৪) হনুমানজটা, (১৫) মাদারী, (১৬) বাঁশমুগুর, (১৭) গজাল (১৮) কলা ড্যাম, (১৯) দুদেবোঁট, (২০) পানবোঁট, (২১) বড়ান পাটনাই প্রভৃতি ধান্য বড়ান জাতীয়।

আধবড়ান। যে ধান্য বড়ান এবং ছোটনা ধান্য সুপক্ক হওয়ার মধ্যবর্ত্তী সময়ে পাকে এবং উক্ত উভয় ধান্যের জন্য ক্ষেত্রের উপযোগী ভূমির মধ্য শ্রেণীর ভূমিতে জন্মে। আধবড়ান জাতীয় ধান্যের নামঃ—১। হামাই, ২। কনকচুর, ৩। মরিচ মুট, ৪। হন্নে কনকচুর, ৫। নগর ঘেটে কনকচুর, ৬। বঙ্গেশ্বর, ৭। মরিচশালী, ৮। রাধশালী, ৯। ছেলেট্ ইত্যাদি।

ছোটনা ধান্য, এই ধান্যই রাজা। লোণা সংস্পর্শ শূন্য গ্রাম মধ্যস্থ উচ্চ "মিঠান" স্বল্প জলযুক্ত বেলে দোআঁশ ভূমিতে অধিক চাষ দিতে হয়; আইল বাঁধিয়া জল সঞ্চয় করিতে হয়। কলিকাতায় বাঁক-তুলসী ও অন্যান্য নামধেয় যে সকল টেবিল রাইস্ (Table Rice) ও পোলাওয়ের উপযোগী চাউল বহু মূল্যে বিক্রয় হয় তন্মধ্যে বালাম ও পেশোয়ারি চাউল ব্যতীত প্রায় সমস্ত চাউলই ছোটনা ধান্যের চাউল। এই চাউল অন্যান্য জাতীয় চাউল অপেক্ষা বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় এবং ইহাদের আদরও অধিক। ভদ্র পরিবারে বেশীরভাগই ছোটনা ধান্যের চাউল ব্যবহার হয় ও অবস্থা অনুসারে আতব ও সিদ্ধ উভয় প্রকার চাউলই প্রস্তুত করা হয়।

ছোটনা ধান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি প্রধান :—

১। পাটনাই, ২। লাল পাটনাই, ৩। আকুন্দি, ৪। লতা মৌ, ৫। বালাম, ৬। মেঠো রাঙ্গি, ৭। বাঁশমতী, ৮। রাধুনি পাগল, ৯। চিনাকানী, ১০। হরিভোগ, ১১। নঁগর ঘেটে কনকচুর, ১২। সুন্দরশালী, ১৩। পেশোয়ারী, ১৪। ছোটনা তালমুগুর, ১৫। বোকড়া, ১৬। কার্ত্তিকশালী, ১৭। বাঁশকাঁটা, ১৮। রাজ মৌ, ১৯। হেতেগড়, ২০। করিমশালী, ২১। ব্যানা-ফুলী, ২২। সদায় সরু, ২৩। কামিনী সরু, ২৪। পিঁপড়াদারি, ২৫। গাংচি, ২৬। কেলেঘরা, ২৭। হুরকুল, ২৮। মুক্তাহার, ২৯। গোছড়ি, ৩০। মরিচশালী, ৩১। জিরেশালী, ৩২। গোপাল ভোগ, ইত্যাদি। এই সকল ধান্য ব্যতীত আরও বহু জাতীয় "বড়ান ও ছোটনা" ধান্য এদেশে বিদ্যমান আছে।—শ্রীরাজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।



যৌথ ঋণদান সমিতি।

আমাদের কৃষকবর্গ চিরকালই নিস্বঃ। নির্দ্দয় মহাজনের অত্যাচারে তাহারা বহুকাল প্রপীড়িত হইয়া আসিতেছে। তাহাদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে এবং যাহাতে তাহারা কৃষিজাত দ্রব্যের উচিত মূল্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কৃষক ও কৃষির উন্নতি আদৌ সম্ভবপর নহে। ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ১৯০৪ সালে যৌথ ঋণদান সমিতি আইন (Co-operative Credit Societies Act X of 1904) প্রবর্ত্তন করেন। এই আইন দ্বারা যে কি পরিমাণ উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইবে তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সম্প্রতি কলিকাতায় কৃষি-বিভাগের আফিসে যৌথ ঋণদান বিষয় সমালোচনার জন্য একটি বৈঠক বসিয়াছিল। ইহার সভাপতি ছিলেন বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের উপযুক্ত ডাইরেক্টর মিঃ গোরলে। এই বৈঠকে সরকারী ও বেসরকারী অনেক ব্যক্তিই আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত কৃষির উন্নতি আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-

বর্গও ছিলেন ঃ—মিঃ ই, এল, ট্যানার, চম্পারন ; আর, এস, কিং ; জে, জি, রুদারফোর্ড, দক্ষিণ বিহার ; ই, এম, হুইলার, মুর্শিদাবাদ ; এফ হোয়াইট, ছোট নাগপুর ; মিঃ বোস, ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জি ও বালমুকুন্দ কাননগো, উড়িষ্যা ; শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, খুলনা ও বাবু অম্বিকা চরণ, যামিনী মোহন মিত্র এবং যতীন্দ্র নাথ সরকার। মিঃ ডব্লিউ, এচ, বুকান এই বৈঠকের সভাপতি ছিলেন।

উপরোক্ত বৈঠকের কার্য্য বিবরণী প্রদানের পূর্ব্বে যৌথ ঋণদান সমিতির উদ্দেশ্য ও গঠন প্রণালী বিবৃত করা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কৃষককে ঋণজাল হইতে মুক্ত করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। একথা বলা অনাবশ্যক যে সাধারণ কৃষককে কেহ সহজে ঋণদান করিতে সম্মত হয় না। যে মহাজনেরা ঋণদান করে তাহারা সাধারণতঃ বৎসরে শতকরা ৩৭।৷০ হারে সুদ গ্রহণ করে অর্থাৎ কৃষককে মাসে টাকা প্রতি দুই পয়সা সুদ দিতে হয়। কখন বাৎসরিক ৭৫৲ টাকা হিসাবেও সুদ গ্রহণ করা হয় এবং সময়ে সময়ে মহাজনের অর্থ পিপাসা এত অধিক হয় যে তাহারা বৎসরে শতকরা ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্তও সুদ গ্রহণ করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যদি কোন স্থানের কৃষকবর্গ একত্র মিলিত হইয়া একটি সমিতি গঠিত করে এবং সমিতির নামে ঋণ গ্রহণ করে তাহা হইলে সুদের হার যে অনেক কম হয় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন যদি প্রত্যেক কৃষক নিজের সাধ্যমত এই সমিতিতে চাঁদা প্রদান করে তাহা হইলে উক্ত একত্রীভূত অর্থ হইতে তাহারাই অসময়ে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহাদিগকে নির্দ্দয় উত্তমর্ণের দ্বারস্থ হইতে হয় না। এরূপ স্থলে ৬৲ টাকা কিম্বা ৬৷০ সুদে টাকা ধার পাওয়া যাইতে পারে। ইহা যে কেবল কাল্পনিক কথা নহে তাহা বর্ত্তমান ঋণদান সমিতি সমূহের বিবরণী দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিগত চারি বৎসরে বঙ্গদেশে চারি শত সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত সমিতি প্রায়ই ৬৲ হইতে ৬৷০ হিসাবে টাকা ধার পাইয়াছে এবং সভ্যগণকে ৯৲০ হইতে ১২৷৷০ সুদে টাকা কর্জ্জ দিয়াছে।

যাহাতে এই প্রকার সমিতি দেশ মধ্যে বহু সংখ্যায় স্থাপিত হয়, গভর্ণমেণ্ট তদুদ্দেশ্যে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—সমিতির সভ্যগণ চাঁদা করিয়া যে পরিমাণ অর্থ তুলিবেন, সরকার হইতে তাঁহারা প্রথম তিন বৎসরের জন্য সেই পরিমাণ টাকা বিনা সুদে পাইবেন। সমিতির তরপে অথবা সমিতির জন্য যে সমস্ত দলিল প্রস্তুত হইবে তাহার রেজেষ্টারি অথবা ষ্টাম্প খরচ দিতে হইবে না। সমিতির লভ্যাংশের উপর অথবা সমিতির সহিত কারবারে প্রাপ্ত লভ্যের টাকার উপর ইনকম্ টেক্স দিতে হইবে না। সমিতি রেজেষ্টারি জন্য কোন খরচই হইবে না এবং সেভিংস ব্যাঙ্কে সমিতি ইচ্ছামত অর্থ রাখিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন যাহাতে সরকারী নিম্ন কর্ম্মচারীরা সমিতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিতে পারেন তজ্জন্য নিয়ম হইয়াছে যে কালেক্টার কিম্বা সমিতি রেজিষ্ট্রার ভিন্ন অন্য কেহই সমিতির

খাতাপত্র তদারগ করিতে পারিবেন না। সমিতির কার্য্যাবলী নির্ব্বাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভার সভ্যগণের উপর স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য মূলধন কেবল সভ্যগণকে ঋণদান ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। পুরাতন ঋণ অথবা খাজনা শোধ, লাভজনক কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান, ভরণপোষণ অথবা বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যের জন্য ঋণ প্রদত্ত হইবে না। এস্থলে ইহা বুঝা উচিত যে যখন গ্রামবাসীরাই সমিতির সভ্য তখন কোন কৃষক প্রবঞ্চনা করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্ভিন্ন অন্যত্র ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে যেমন জমি জমা বন্ধক দেওয়া আবশ্যক এস্থলে সেরূপ না করিলেও চলে। কোন আত্মীয় সভ্য অথবা পরিচিত কৃষক সভ্য জামিন হইলেই টাকা পাওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বশেষে ইহা বলা আবশ্যক যে ঋণদান সমিতি দুই প্রকারের; নাগরিক এবং উপনাগরিক। নাগরিক ঋণদান সমিতি প্রধানতঃ শিল্পীদিগের উপকারের জন্য গঠিত। উহার সভ্যগণের চারের পাঁচ অংশ শিল্পী হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে উপনাগরিক সমিতির সভ্যগণের চারের পাঁচ অংশ কৃষক হওয়া প্রয়োজনীয়।

স্থূলতঃ যৌথ ঋণদান সমিতির গঠন ও কার্য্য প্রণালী উক্ত রূপ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে চারি শত সমিতি গঠিত হইয়াছে। কিরূপে এই সমস্ত সমিতির কার্য্য আরও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে এবং কিরূপে সমিতি সমূহের মধ্যে পারস্পারিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া এইরূপ সমিতি বিস্তার লাভ করে এই সমুদয় বিষয়ই পূর্ব্বোক্ত বৈঠকের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল। চারি বৎসর ঋণদান সমিতি স্থাপনার্থে মিঃ গোরলে যে অকাতর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন ও তাহার ফলে তিনি যে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা সভাপতির বক্তৃতায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। আমরা স্বাবলম্বনের অভাবে কি শিক্ষায়, কি কৃষিবাণিজ্যে সর্ব্বদিকেই অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের যদি পরস্পরের উপর সহানুভূতি ও বিশ্বাস থাকিত তাহা হইলে আমরা আজ উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিতাম। যাহাতে আমরা স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে পারি এক্ষণে সেইরূপ উপায় অবলম্বনই আমাদের দারিদ্রতার হইতে মুক্তির একমাত্র উপায়। এই যৌথ ঋণদান সমিতি দেশ মধ্যে প্রবর্ত্তন, কৃষিকার্য্যে স্বাবলম্বন শিক্ষার অন্যতম উপায়। আমরা আশা করি যে ইহা সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর এইরূপ সমিতি স্থাপন আদৌ কঠিন ব্যাপার নহে। যদি এক গ্রামের কৃষকগণ একত্র মিলিত হইয়া সামান্য সামান্য চাঁদা দেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনও হিসাব পত্র রাখিবার মত শিক্ষিত লোক থাকেন, তাহা হইলেই অনায়াসে এইরূপ সমিতি গঠিত হইতে পারে।

যৌথ ঋণদান সমিতি স্থাপনে যে কেবল ঋণ গ্রহণেরই সুবিধা হইবে তাহা নহে। সকলেই অবগত আছেন যে ঋণভার প্রপীড়িত কৃষককে অনেক সময় ঋণের দায়ে কোড়ে অথবা মহাজনকে নাম মাত্র মূল্যে ফসল বিক্রয় করিতে হয়। তাহাতে এমন কি কৃষকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়েরও সংকুলান হয় না। যদি সমিতি এই সমস্ত ফসল নিজের তত্ত্বাবধারণে রাখিয়া উচিত মূল্যে বিক্রয় করেন তাহা হইলে কৃষকের যে প্রভূত উপকার হয় তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ বিগত বৈঠকে সুপ্রসিদ্ধ ধনশালী বণিক স্যার ডেনিয়েল্ হ্যামিল্টন্ এ বিষয়ে পরীক্ষার জন্য যত অর্থ প্রয়োজন হয় তাহা দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কৃষিজাত

দ্রব্যের উচিত মূল্য যাহাতে কৃষকেরা পায় সে সম্বন্ধে সুবন্দোবস্তের জন্য আমরা অনেক দিবস হইতেই বলিয়া আসিতেছি। এক্ষণে এই বিষয়ে বিশেষ মনযোগ প্রদানের সময় হইয়াছে এবং সাহায্যের জন্য সদাশয় ব্যক্তিও উপস্থিত হইয়াছেন। এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করা অত্যন্তই পরিতাপের বিষয় হইবে। যৌথ বিক্রয়ের সহিত যৌথ উৎপাদনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। একটি কৃষক একাকী বার বিঘা জমি চাষ করিতে পারে। একত্রে অনেক পরিমাণ জমি চাষ করিলে যে খরচের মাত্রা অনেক কম হয় এবং অনেক অংশীদার থাকিলে যে ব্যক্তিগত ব্যয়ভার অধিক বলিয়া বোধ হয় না তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি অপরাপর দেশে প্রভূত ধনশালী ব্যক্তিগণ কৃষি ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন। সুতরাং তাঁহারা এককই বহু পরিমাণ জমি চাষ আবাদ করিতে পারেন। এদেশীয় নিস্বঃ কৃষকের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। তথাপি যদি পাঁচজন কৃষক একত্র সম্মিলিত হয় তাহা হইলে পাঁচজন পৃথক পৃথক ভাবে যে পরিমাণ জমি চাষ করিত তাহা হইতে অধিক জমি চাষ করিতে পারিবে এবং পৃথক ভাবে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইত তদপেক্ষা অল্প অর্থ ব্যয় হইবে। আর একটি বিষয়েরও এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেশে জলাভাবের জন্য অনেকসময়েই ফসল নষ্ট হয়। সমস্ত বৎসরের বারিপাতের হিসাবে দেখিলে বুঝিতে, পারা যায় যে মোট বারিপাতের পরিমাণ কম নহে; কিন্তু অসময়ে বারিপাত হইলে কিম্বা সময়ে অত্যধিক বারিপাত হইলে তাহা কাজে আসে না। যদি বাঁধ বাঁধিয়া উক্ত জল সংরক্ষণ করিতে পারা যাইত তাহা হইলে সময়ে ঐ জলেই অশেষ উপকার সাধিত হইতে পারিত। বাষ্পীয় অথবা হাতে পরিচালিত যন্ত্র সাহায্যে জলোত্তলনও ঐরূপ। কোন কার্য্যই একজন কৃষকের যত্ন, পরিশ্রম অথবা অর্থ দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একত্র মিলিত হইলে সমস্তই সম্ভবপর, সমস্তই সল্লায়াস সাধ্য। দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে পারস্পরিক সাহায্য এবং সহানুভূতি ভিন্ন কোন গুরুতর কার্য্য সাধিত হইবে না। আমরা আশা করি সে সাধারণে এই সত্য উপলব্ধি করিয়া যৌথ সমিতি সংস্থাপনে অগ্রসর হইবেন।

ভাগলপুর কৃষি কলেজ।

বিগত ১৭ই আগষ্ট সোমবার (১৯০৮) বঙ্গের ছোটলাট সাহেব ভাগলপুর কৃষি-কলেজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তথায় কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ডবলিউ, আর, গোরলে সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি কয়েকটী সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ইতিপুর্ব্বে কতিপয় কর্ম্মচারীকে কৃষি-শিক্ষা দিবার জন্য সাইরেনসেষ্টর কলেজে পাঠান হইয়াছিল কিন্তু তাহা বিশেষ ফলদায়ক হয় নাই। ইহাতে কর্ম্মচারাগণের কোন দোষ ছিল না; পরন্তু কৃষি-বিভাগের কোন সুব্যবস্থা ছিল না বলিয়াই তাঁহাদের শিক্ষা কোন কাজে আসে নাই।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংশ্রবে সামান্য কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কলেজের ছাত্রগণ প্রায়ই সরকারি সিভিল বিভাগে কার্য্য পাইতেন এবং তাহাতে কৃষিকার্য্যের কোন উন্নতি বিধান হওয়া সম্ভব ছিল না। এক্ষণে কৃষি-বিভাগের সুবন্দোবস্ত হইতেছে, সুপ্রণালি ও পদ্ধতি মত দেশে কৃষি-শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। জমিদারগণের ও প্রজাবৃন্দের মধ্যে কৃষি শিক্ষার বন্দোবস্ত

করা একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং ব্রিটিস্ গভর্ণমেণ্টের ভারতের ন্যায় বিশাল জমিদারীর মালিক হইয়া কৃষি-শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন থাকা কিছুতেই যুক্তি-যুক্ত নহে। মিঃ গোরলে সাহেব ইহাই বুঝাইয়াছেন। আমরাও এতাবৎকাল এই কথাই বলিয়া আসিতেছি; কিন্তু সকল কাজই সময় সাপেক্ষ। আজ ভাগলপুরে কৃষি কলেজ স্থাপিত হইল। দেশময় কৃষি-শিক্ষার যেন একটু সাড়া পড়িয়াছে কিন্তু শিক্ষাদান করিবার লোকের অভাব। শিবপুর কলেজ হইতে কতিপয় ছাত্রকে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারিক কৃষি-শিক্ষার জন্য কর্ণেল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠান হইয়াছে। কিন্তু বিদেশ হইতে কৃষিকার্য্য শিক্ষা করা অপেক্ষা দেশে বসিয়া শিক্ষা করা কতক অংশে শ্রেয়ঃ; কারণ দেশে ও বিদেশে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে; সে দিকে দৃষ্টি রাখা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। গোরলে সাহেব ইহাও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; আমরাও তাঁহার মতের সমর্থন করি। কিন্তু যাহাতে যথার্থ ফলপ্রদ শিক্ষা প্রদান করা হয়, যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং যাহাতে দেশ-কাল-পাত্র সকল দিক বজায় রাখিয়া কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় ইহাই গভর্ণমেণ্টের এক মাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ভাগলপুর কলেজ দুইটী উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপিত হইতেছে; ১ম, এদেশীয়দিগকে কৃষি-শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহারিক কৃষি-শিক্ষাপ্রদান করা; ও ২য়, চাষাবাদ সম্বন্ধে অভাব অভিযোগ ও তৎপ্রতিকার প্রভৃতি বিষয় বিশেষের অনুসন্ধান করা। দুইটী উদ্দেশ্যই খুব মহৎ এবং যথার্থ কার্য্যে পরিণত হইলে কথঞ্চিৎ মঙ্গলের আশা করা যায়।

যে ক্ষেত্রে ভাগলপুর কৃষি-কলেজ স্থাপিত হইতেছে তাহার পরিমাণ ৩০০ একর। এই ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। ইহার সর্ব্বোত্তরাংশে প্রায় ২০ একর ধান জমি আছে। এই ধান জমির পরে এবং রেল লাইনের মধ্যে যে উচ্চ ভূমি খণ্ড তাহাতেই কলেজের গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে। ইহার পশ্চিমে উচ্চ ভূখণ্ডের উপরে ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইবে এবং পূর্ব্বাংশের ময়দানে ছেলেদের খেলার মাঠ থাকিবে। রেল লাইনের অপর পারে কর্ম্মচারিগণের বাস স্থান নির্ম্মিত হইতেছে। ইহার দক্ষিণে ১৫০ শত একর জমি লইয়া কৃষি-ক্ষেত্র রচনা করা হইতেছে, উহার মধ্যে ৫০ একর পরিমাণ জমি কৃষি-পরীক্ষার জন্য নির্দ্দেশ করা হইবে। মিঃ থরনটন সাহেব কলেজ গৃহের নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং উহার নির্ম্মাণ কার্য্য আমাদের দেশের সুবিখ্যাত গৃহনির্ম্মাণ-কারক মার্টিন কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

উক্ত ক্ষেত্রের জন্য জমি সংগ্রহ করিতে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে ৩।৹ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান হইতেছে।

এক্ষণে এই অর্থের সদ্ব্যবহার হইয়া বঙ্গের কৃষককুলের কিছু উপকার দর্শিলে আমরা সুখী হইব।

পত্রাদি।

ধান্যের পোকা।

বৰ্দ্ধমান, গুস্‌করা, হইতে শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ দাস লিখিতেছেনঃ—

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গুস্‌করা গ্রামের চতুঃ-পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে এবৎসর ধান্য ফসল সুচারুরূপে আবাদ হইয়াছে, ধান্যগাছও ভালরূপ জন্মিয়াছে, কিন্তু প্রায় সমস্ত ধান্যগাছে একপ্রকার কীট লাগিয়া ধান্য গাছ নষ্ট করিতেছে। যে সকল ক্ষেত্রের ধান্য গাছে কীট লাগিয়াছে, সেই সমস্ত গাছ দিন দিন হরিদ্রাবর্ণ, শীর্ণ, শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে।

[আর্দ্র ধান্যের গাছের সহিত পোকা এক সঙ্গে প্যাক করিয়া পাঠানয় পোকা গুলি ছিন্ন ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই পোকার নাম সম্ভবতঃ Cecido-myia Oryzeæ। ব্লটিং কাগজের ভিতর পোকার সহিত আক্রান্ত ধান্য পাঠাইলে পোকার জাতি নির্দ্ধা-রণ করার বিশেষ সুবিধা হয়। ইহার জীবনবৃত্তান্ত এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। বিহার অঞ্চলে ইহাকে মেছে পোকা বলে। বস্তুতঃ ইহা দ্বিপক্ষ কীট এবং মাছির সহিত ইহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। ইহা গাছের রস খাইয়া জীবন ধারণ করে। গাছ গুলি ক্রমশঃ বিবর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। স্থূল দৃষ্টিতে ইহা অনেকটা ক্ষুদ্র তিসি বীজের ন্যায় দেখা যায়। ইহা ধান্যের পরাগ রেণু ভক্ষণ করে, তজ্জন্য আদৌ ফল হয় না। ধান্যের কাণ্ডে ও শীষে ইহার কীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। কীড়াগুলি দেখিতে প্রথমতঃ খুব সাদা, তাহার পর ক্রমশঃ গাঢ়বর্ণ প্রাপ্ত হয়। নিবারণের উপায়ঃ— (১) আক্রান্ত গাছ গুলি তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা; (২) সম্ভবতঃ শ্যামা প্রভৃতি গাছও এই কীট দ্বারা আক্রান্ত হয়; তাহা হইলে ক্ষেত্রে শ্যামা প্রভৃতি জন্মাইয়া ঐ ফসলে কীট ধরিলে ফসল তুলিয়া নষ্ট করা; (৩) এই জাতীয় হেসিয়ান ফ্লাই সম্বন্ধে পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, জলদি ফসলে পোকা কম হয়; ধান্যের সম্বন্ধেও তাহাই হইতে পারে। (৪) সকল জাতীয় ধান্য এই পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় না বা সমান ভাবে আক্রান্ত হয় না। নির্ব্বাচন করিলে এমন জাতীয় ধান্য পাওয়া যাইতে পারে, যাহা এই পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় না।—প্রতি-কারের উপায়ঃ—এক ভাগ চূণ ও দুই ভাগ ঝুল একত্র মিশাইয়া গাছের উপর ছড়াইয়া দিলে কীড়া বিনষ্ট হইতে পারে। সঃ কৃ।]

আম্রে ছিটে পোকা।

মাননীয় শ্রীযুক্ত "কৃষক" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে হিমালয়ের পাদদেশে আম্র গাছের আদি স্থান ছিল। তথা হইতে ক্রমে ক্রমে ভারতের সর্ব্বস্থানেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকা, বার্ম্মুডাস্, হাওয়াই, প্রশান্ত দ্বীপাবলী প্রভৃতি যে যে স্থানে এখন আম জন্মে তাহাও ভারতজাত বীজ দ্বারা প্রবর্ত্তিত। ঐ সমস্ত স্থানের এবং ভারতের আম তুলনা করিয়া দেখিলে ভারতের ফল অনেকগুণে মর্য্যাদাহীন হইয়া পড়ে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; অন্যান্য দেশে যেমন আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিয়মে দিন দিন ফলের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। আমাদের দেশে তেমন হওয়া দূরে থাকুক, লোকের অমনোযোগবশতঃ ক্রমেই অপকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ পোকা প্রভৃতি শত্রুরা অবাধে অধিকতর অনিষ্ট করিতেছে।

আমরা যাহাকে "ছিটে পোকা" বলি, বোধ হয় উহারই নাম "Cryptorhynchus mangiferae" অনেক স্থলেই উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

১। Systematic Entomology—Fabricus, 1774.

২। A Paper on mango weevil., Mr. Simmons ("Nature" vol. 37, 1888 Mar.)

৩। Indian Museum Notes, vol 1. 1889-1891, No. 11.

দুই বৎসর হইল হাওয়াই দ্বীপের আমেতেও এক প্রকার পোকার অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। কিরূপে ঐ শত্রু তথায় প্রবেশ করিল তাহার যথেষ্ট অনুসন্ধান করাতে জানা গিয়াছে যে ভারতবর্ষ হইতে যে বীজ আনা হইয়াছিল তাহাতেই ঐ পোকা বিদ্যমান ছিল। এই পোকা এবং বাঙ্গালার পোকার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উভয়কে তুলনা করিয়া পরীক্ষা করিতে না পারিলে ঠিক বুঝা যায় না।

জীবনবৃত্তান্ত।

আম-পোকার জীবনচক্রে চারিটী বিভিন্ন অবস্থা সংঘটিত হয়। ১ম। ডিম্ব (Egg.) ২য়। কীড়া (Larvae). ৩য়। গুটী (Pupae). ৪র্থ পতঙ্গ (Adult)।

ডিম কোথায় কি ভাবে আমের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা নিশ্চিন্তরূপে স্থির করা যায় নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ কচি আমে অথবা অর্দ্ধপক্কাবস্থায় ত্বকে ঈষৎ ক্ষত স্থানের উপর ডিম দেখা গিয়াছে। যদিও ডিম পাড়িবার সময় পতঙ্গের আচরণ সুন্দররূপে কোথাও পরীক্ষিত হয় নাই তথাপি বোধ হয় যে, আমগুলি আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হইবার সময় রস নির্গম (Exudation of Juiceএর) প্রভাবেই ডিমগুলি ভিতর হইতে বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় বুঝিতে পারা যায়, আপেলের পোকা যেমন ফুলের মধ্যে ডিম পাড়িয়া রাখে এবং ফল বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ডিমগুলি আচ্ছাদিত হইয়া যায়, তেমনি কোনও কৌশলে আমের পোকাও আমের মধ্যে প্রবেশলাভ করে।

এ পোকার কীড়া পদশূন্য ও মাংসপিণ্ড ক্রিমি বিশেষ। রং মাথার দিকে একটু গাঢ়; মাথাটী শ্যামবর্ণবিশিষ্ট। ডিমগুলি আমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ১০।১২ দিনে উহারা ফুটিয়া বাহির হয়। কীড়ারূপে পরিণত হইবার পর প্রথম মাসেই আবার কায়া পরিবর্ত্তনের বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। এই একমাসকাল আমের শাঁস খাইয়াই জীবন ধারণ করে। শাঁসে যে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করে, তাহার মধ্যে নিজের মলমূত্র দ্বারা একটী কোয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিজে গুটী অবস্থা ধারণ করে। ৫।৬ দিন পরে আবার পতঙ্গরূপে বাহির হয়। গুটী অবস্থায় উহার রং সম্পূর্ণ শাদা এবং মাথা পা, ডানা ও অন্যান্য অবয়ব পরিস্ফুট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

কোয়া হইতে বাহির হইলেই পতঙ্গের বর্ণ কতকটা শাদা থাকে। কিন্তু অচিরেই গাঢ় বাদমী রঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। দুই একটা হলুদে দাগও সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পতঙ্গ

অনেকাংশে মাছির মত কিন্তু ডানার উপরে খুব শক্ত কতকটা গোলাকার দুখানা আবরণ থাকে। যখন পোকাটী স্থিরভাবে থাকে, তখন দেখিতে ঠিক একটী শুক্তির মত। মাথাটী সম্মুখের দিকে একটু বর্দ্ধিত হইয়া শৃঙ্গ (antonnæ) ও চঞ্চু (beak) রূপে পরিণত হয়। চঞ্চুর অগ্রভাগেই মাছির মত চাটিয়া খাইবার জন্য মুখ আছে। আমের পোকার চঞ্চু অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব ও মোটা। নিশ্চেষ্টভাবে থাকিবার সময় বুকের নীচে প্রথম দুই পায়ের মাঝে চঞ্চুটী গুটাইয়া রাখে। কোন প্রকার একটু বিরক্ত করিলে মাথা, পা প্রভৃতি উত্তমরূপে গুটাইয়া মরার মত পড়িয়া থাকে। ধাড়ি পতঙ্গ দৈর্ঘ্যে ¼ হইতে ³⁄₁₆ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখা যায়।

আমের মধ্য হইতে পতঙ্গরূপে বহির্গত হইয়া বৎসরের অবশিষ্ট কাল কি অবস্থায় কাটায় সে বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে। ঐ সময়ে উহাদের আহার সামগ্রী সম্বন্ধেও কোন মীমাংসা হয় নাই। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোয়া হইতে বহির্গত হইয়া নুতনাকারে সম্পূর্ণরূপে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইবার পরও অনেক দিন উহারা আমের মধ্যে থাকিতে পারে কিন্তু একবার বাহির হইবার ছিদ্র তৈয়ারি করিলে আর থাকিতে পারে না। সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ইএর মধ্যে সকলেই বাহির হইয়া যায়। এই সময় হইতে মে মাসের প্রথম পর্য্যন্ত উহারা গাছের নীচে শুষ্ক পত্রাদির মধ্যে, গাছের ছালের ফাঁটালে অথবা অন্য কোন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া থাকে। তারপর মরশুমে বাহির হইয়া ডাঁসা আমের উপর (অথবা ফুলের উপর) ডিম্ব প্রসব করিয়া রাখিয়াই নিজে প্রাণত্যাগ করে।

পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, ফলের গাত্রের উপরেই ডিম ফুটিয়া অতি ক্ষুদ্র কীড়া জন্মে এবং একটী ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে; ইহাতে যে ক্ষুদ্র ক্ষত হয়, তাহা ফল বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সময় শীঘ্রই সারিয়া যায়। পরে দেখিলে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

এ স্থলে আমাদের দেশের পোকা এবং হাওয়াই এর পোকার স্বভাব বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। কারণ হাওয়াইতে পোকা একেবারে বরাবর আমের আঁটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পতঙ্গরূপ ধারণ করা পর্য্যন্ত তথায় থাকে। আদত ভোজ্যাংশের কোন অনিষ্ট করে না। কিন্তু আমাদের দেশে পোকাগুলি বিশেষতঃ আমের শাঁসের উপর আক্রমণ করিয়া এমন সুন্দর ফলকেও মূল্যহীন করিয়া ফেলে। আঁটিতে কোন অনিষ্ট সাধন করে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। এবিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান বাঞ্ছনীয়।

এই পোকার স্বভাব আবিষ্কৃত হওয়ার পর উহা দমনের উপায় উদ্ভাবন জন্য হাওয়াই দ্বীপে অনেক চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু অদ্যাপি কোনটাই সম্যক কৃতকার্য্য হইয়া উঠে নাই। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যেহেতু এই পোকা আমের শাঁস কিম্বা আঁটি খাইয়াই জীবনধারণ করে ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতি বৎসর ফলোৎপত্তির পরিমাণ অনুসারে পোকার পরিমাণও হ্রাস বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ যে বৎসর আম অধিক জন্মে, সে বৎসর পোকার সংখ্যাও অধিক দেখা যায়; আবার ফল কম জন্মিলে পোকাও কমিয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, যে কারণ ফলের অনিষ্টজনক তাহা পোকার পক্ষেও সাংঘাতিক।

এই শত্রুবিনাশের জন্য Insecticide প্রভৃতি কোন প্রত্যক্ষ উপায়াবলম্বন করাও সম্ভবপর নহে। কারণ পোকারা আমের মধ্যে থাকিয়াই পরিপুষ্টি লাভ করে এবং আমের বাহিরে উহার অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় কোন বিশেষ পরোক্ষ উপায়াবলম্বন ভিন্ন অনন্যোপতি। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহারা কীড়া রূপে পরিণত হইয়াও কিছু দিন পরে ডিম পাড়ে। এই সুযোগে যদি প্রত্যেক পোকাধরা আম এবং গাছের নীচের শুষ্কপত্রাদি যত্নসহকারে পুড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে বোধ হয় পোকার সংখ্যা বৎসর বৎসর হ্রাস পাইতে থাকে। ডাঁসা আম সমস্ত পাড়িয়া ফেলাও বেশ সঙ্গত উপায়। কিন্তু পোকা ও পোকাধরা অংশ পুড়াইয়া ফেলিবার দিকে মনোযোগ না দিলে কোন বিশেষ ফলের আশা করা যায় না।

২।৩ বৎসর পোকার খাদ্যাভাব সংঘটন করাই উহা বিনাশের প্রশস্ত উপায়। আমাদের দেশে ঐরূপ উপায় অনায়াসসাধ্য না হইলেও যাঁহাদের বাগিচা আছে তাঁহারা চেষ্টা করিলে এই ভয়ানক শত্রুর হাত এড়াইতে পারেন। আম পাকিয়া উঠিবার পুর্ব্বেই গাছের সমস্ত আম পাড়িয়া যত্নসহকারে উহার মধ্যস্থিত পোকা পুড়াইবার চেষ্টা করিলে এবং গাছগুলিকে পুনরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিলে, আমার বোধ হয় দুই বৎসর মধ্যে পোকা সমূলে বিনষ্ট হইবে। হাওয়াই দ্বীপে এই রূপ চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হইয়াছে।

বশম্বদ

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বসু।

রাজকীয় কৃষি কলেজ, স্যাপোরো. জাপান।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

বঙ্গদেশে তুলার আবাদ।

আগষ্ট, ১৯০৮।

সাঁওতাল পরগণা, সম্বলপুর, মানভূম, সিংভূম এবং রাঁচিতে জলদি তুলার আবাদ হইয়া থাকে। বর্ষা আরম্ভ হইবার পুর্ব্বেই উহাদের বীজ বপন করা হয়। মানভূম, আঙ্গুল, পোলামাউ এবং মুঙ্গেরের স্থানে স্থানে বৃষ্টি অভাবে বীজ বপনের বিলম্ব ঘটিয়াছে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের কতকাংশ, মুঙ্গেরে ও ২৪ পরগণা ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানে জলদি তুলার অবস্থা ভাল দেখা যাইতেছে। সম্বলপুরে কিন্তু পোকা লাগিয়া কিছু ক্ষতি করিতেছে।

সারণে, মজঃফরপুর, দারবঙ্গ, সিংভূম ও কটকে নাবী জাতীয় তুলার আবাদ হয়, ঐ সকল স্থানে বীজ বপন কার্য্য অল্পে অল্পে চলিতেছে।

প্রায় ৪০,৫০৬ একর জমিতে জলদি তুলার আবাদ হইতেছে। বিগতবর্ষে ৩৫,৩৫১ একর মাত্র জমিতে তুলার আবাদ হইয়াছিল। ইতি মধ্যেই নাবী তুলার বীজ ২৮,৭৬০ একর জমিতে বপন করা হইয়াছে। কত একর জমিতে নাবী তুলার আবাদ হইবে, এখনও ঠিক করা যায় না। বিগত বর্ষে ৩৪,৯২৪ একর জমিতে নাবী তুলার আবাদ হইয়াছিল।

কুমিল্লা।—শ্রাবণ মাস।

এখানে (পার্ব্বত্য প্রদেশে) ২।১ দিবস পরে পরে সুবৃষ্টি হওয়ায় জুমের ও ক্ষেত্রের আশু ধান্যের অবস্থা আশাতীত ভাল হইয়াছে।

আশু ধান্য প্রায়ই ফুলিয়া বাহির হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রের ধান্য কাটাও আরম্ভ হইয়াছে। এখানে "ফুল বাদাম" নামক আশু ধান্যই ক্ষেত্রে কি জুমে খুব বেশী দেওয়া হয়। এবৎসর ধান্যে "লেউয়া" নামক এক প্রকার পোকা পড়িয়াছে। ইহারা ধান্যের মধ্যস্থিত দুগ্ধের ন্যায় বস্তটী খাইয়া ধান্যকে চিটায় পরিণত করিয়া দেয়। উক্ত পোকার ঔষধ কি অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। আশু ধান্য এখানে এত অধিক জন্মিয়াছে যে লোকে আশা করিতেছে শীঘ্রই ২৲ বা ২৷৷০ টাকা মণ চাউল বিক্রয় হইবে। বর্ত্তমান সময়ে নূতন ফুলবাদামের চাউল ৩৲।৩৷৷০ টাকা বিক্রয় হইতেছে। ফুল বাদাম ধান্যকে এখানে আশু ধান্য বলিয়া থাকে কিন্তু ইহার চাউল সরু, খুব সাদা, গোবিন্দভোগ চাউলের ন্যায় গন্ধ আছে এবং খাইতে খুব সুস্বাদ।

আমন ধান্যের হালী পত্তন দেওয়ার কাজ শেষ হইয়াছে। এখন হইতে ক্ষেত্রে রোপণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আশ্বিন মাসের ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত রোপণের কাজ চলিবে।

জুম—এই স্থানের পার্ব্বতীয় লোকেরা অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ টিলার জঙ্গল কাটিয়া যায়। পরে ফাল্গুন, চৈত্র মাসে উক্ত জঙ্গল গুলি খুব শুষ্ক হইলে তাহাতে আগুণ লাগাইয়া দেয়। ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত খুব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে তাহাতে বৈশাখ মাসের মধ্যে স্থানে স্থানে দা দিয়া গর্ত্ত করিয়া ধান্য, তুলা, সাদা তিল এবং যাবতীয় তরিতরকারীর (সময়োপযোগী) বীজ বপন করিয়া থাকে। ইহারই নাম "জুম"।

যদি কেহ এখানে ৫০০৲।৬০০৲ টাকা মূলধন লইয়া আসিতে পারেন তাহা হইলে তিনি এখানে জমি লইয়া কৃষি কাজ করিতে পারেন। অবশ্য সমস্ত টাকা একত্রে না আসিলেও চলিতে পারে। এখানে সমস্ত প্রকার শস্যই জন্মে। ধান্য বৎসরে তিন ফসল করা চলে (আশু, আমন ও বোরো) পাট, তুলা, গম, শরিষা, কলাই ইত্যাদি সকলই জন্মে। বিবিধ প্রকার ফলের বাগান করা চলে। ৩।৪ বৎসরের পর কাঁঠাল, আম গাছে ফল হয়।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র বসু মজুমদার, রাণীছড়া, শান্তি-নিবাস কৃষিক্ষেত্র।

বঙ্গদেশে ভাদ্র মাসের প্রথমে শস্যের অবস্থা।

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে। দার্জ্জিলিং, বালেশ্বর, সম্বলপুর এবং কুচবিহারে কিছু অধিক বৃষ্টি হইয়াছে। বিহারে এখনও উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টি হয় নাই। ভাদুই শস্য ও হৈমন্তিক ধান্য রোপণের ব্যাঘাত জন্মিতেছে। পাটনা, গয়া এবং সারণে বৃষ্টির অভাবে বীজ ধান নষ্ট হইতেছে। হাওড়া, ২৪ পরগণা, যশোহর এবং খুলনা ব্যতীত অন্যত্রে পাটের অবস্থা ভাল। ২৪ পরগণায় নানা-স্থান হইতে ধান্যে পোকা লাগার খবর শুনা যাইতেছে।

প্রায় সর্ব্বত্র ইক্ষু চাষের অবস্থা ভাল। ২৪ পরগণা, গয়া, দারবঙ্গ, পূর্ণিয়া, পালামাউয়ে মোটা চাউলের দর বাড়িয়াছে। বাঁকুড়া, যশোহর, সাঁওতাল পরগণা, পুরি, এবং সম্বলপুরে কিছু কমিয়াছে, এবং অন্যান্য স্থানে প্রায় সমান আছে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বালেশ্বর এবং পালামাউয়ে খাদ্যশস্য অল্প পরিমাণই সঞ্চিত আছে। সমগ্র বঙ্গদেশে পানীয় জল বা পশুখাদ্যের এখনও বিশেষ অভাব নাই। তবে যশোহর, গয়া, সারণ, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, জব্বলপুর হাজারিবাগ, পালমাউ ও মানভূমে গবাদির রোগাক্রমণের খবর পাওয়া যাইতেছে। এখনও ৩০,১০৯ জন সরকারি

সাহায্যে জীবন যাপন করিতেছে, তন্মধ্যে উড়িষ্যাতেই ভিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫,৩৫২ জন। ইহা ব্যতীত নদীয়া, যশোহর, কটক, বালেশ্বর, আঙ্গুল, পুরী, হাজারিবাগ ও রাঁচিতে পূর্ত্তকার্য্যে ৯,১১৪ জন লোক খাটিতেছে। রাঁচিতে দুর্ভিক্ষ-সাহায্যার্থ পূর্ত্তকার্য্যে ১০,৭৩৭ জন লোক খাটিতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ভাদ্র মাসে শস্যের অবস্থা।

সুরমা উপত্যকা, লুসাই পর্ব্বত এবং অন্যান্য স্থানে খুব বৃষ্টি হইয়াছে। অন্যত্র সামান্য মাত্র বারিপাত হইয়াছে। আশুধান্য ও পাট কাটা চলিতেছে। আমন ধান্যের আজিও রোপণ শেষ হয় নাই।

নদীতে জল কমিয়া যাওয়ায় অনেক স্থানে রোয়া ধান্য ও পাটের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্র একটী ভারি বর্ষার আবশ্যক হইয়াছে। সর্ব্বত্র চায়ের অবস্থা ভাল। সুরমা উপত্যকা ও কামরূপে নিতান্ত মন্দ নহে। কাছাড়ে কিন্তু মশকে চায়ের অনিষ্ট করিতেছে।

বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, মালদহ, দারঙ্গ, নওগাঁও এবং শিবসাগরে গবাদির ব্যারাম হইতেছে।

১৩টী জেলায় চাউলের দর চড়িয়াছে, কিন্তু ১৭টী জেলায় কিছু কমিয়াছে।

কৃষকের ক্লেশ, মেদিনীপুর।

অনেক স্থানে সুবৃষ্টি হইয়াছে। চাষী লোক চাষ লইয়া মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। খাইয়া না খাইয়া ভবিষ্যতের আশায় লোকে মাঠে যাইয়া জমি চষিতেছে। যাহারা বীজ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে তাহারা বীজও বুনিতেছে। কোন কোন স্থানে সরকারী ও বে-সরকারী অন্নসত্রে আজকাল লোকের সংখ্যা কিছু কিছু কমিয়াছে। অনেকে মনে করিতেছেন, এইবার লোকের অন্নকষ্ট কমিয়া গেল। প্রকৃত কথা কিন্তু উহা নহে। এই শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসই প্রকৃতই অনেক স্থলে প্রজার দারুণ কষ্টের সময়। এ সময়ে মজুরের জন্য অন্নের প্রয়োজন, পয়সার প্রয়োজন, বীজসংগ্রহের প্রয়োজন, হালের প্রয়োজন,—চাষের জন্য যাহা কিছু সকলেরই প্রয়োজন। অন্য বার পূর্ব্ব হইতেই চাষী প্রজা এ সব সংগ্রহ করিয়া রাখে। এবার সংগ্রহ করিবে কি, তাহার নিজের অন্ন সংস্থান ছিল না। প্রজা যাহাতে আপন চাষ পুরা চালাইতে পারে, তৎপক্ষে তাহাকে এখন সাহায্য করিতে পারিলে তবে ভবিষ্যত রক্ষা।

খুলনা জেলায় চাষের অবস্থা।

দুরমুল্য ধান্য বীজ।

ধীরে ধীরে ধান্য রোপণকার্য্য অগ্রবর্ত্তী হইতেছে, যদিও চাতরে অধিকাংশ পাতা জলমগ্ন হইয়া মরিয়া গিয়াছিল, তথাপি কৃষকগণ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুনঃপুন বীজ বপন ও পাতা কতক প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে, কতক দূরতর স্থান হইতে ক্রয় করিয়া আনিতেছে, কিন্তু পাতার মূল্য শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পাঁচ সের পালির এক পালি ধান্য যাহা তুলাদণ্ডে ওজন করিলে ৴৩॥০ সাড়ে তিন সের মাত্র হয়, তাহারই পাতা ১॥০ দেড় টাকা বা ততোধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, আর না হইবেই বা কেন, ধান্যই ঐ পালির সাড়ে তিনটা বিক্রয় হইতেছে। জমি বিস্তর পতিত হইবে।

চাউলের দর।

এইক্ষণে দেশী ধান্য চাউল হাটে বাজারে আর প্রায় আমদানী নাই। রেঙ্গুণ চাউল (মোটা)

কলিকাতা হইতে আমদানী হইতেছে, তাহাই ধনী, দরিদ্র সকলেরই জীবন রক্ষার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে।

পাটের অবস্থা।

পাট এ বৎসর এ অঞ্চলে জন্মে নাই বলিলেই হয়, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টির অভাবে বহু কৃষকই ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপনে অক্ষম হয় নাই। যাহারা দুই এক বন্দ বীজ বপন করিয়াছিল, তাহাও জলাভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই, সকলই প্রায় অঙ্কুরে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, এ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা জন্মিয়াছে, তাহাও গাছের খর্ব্বতা জন্য "মালে" পোশাইবে না, সুতরাং কৃষকের অসময়ে একটা প্রচুর লাভের অর্থ এবৎসর আর হস্তগত হওয়ার আশা নাই। এক্ষণে কৃষক চাতক পক্ষীর ন্যায় অনন্যসহায় একমাত্র ধান্য ফসলের দিকে চাহিয়া অগ্রহায়ণ পৌষ মাস পর্য্যন্ত আশায় বুক বাঁধিয়া অনাহারে বা একাহারে কাল কাটাইবে, শেষে ভগবান যাহা করেন। এ বৎসর ধান্য ফশলের একমাত্র বিশেষ সুবিধা এই যে, নদীর জল অতি সত্বরই "আষাঢ় মাসেই" মিষ্ট হইয়াছে, এবং একাল পর্য্যন্ত সমভাবেই আছে, নচেৎ "ইতি" যে কয়টা, তাহার অনেক গুলিই প্রায় দেখা দিয়াছে, যথা,—অনাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টি, পাপড়িকাটা পোকা ইত্যাদি অবশিষ্ট যে দুই চারিটি অদ্যাপি উপস্থিত হইতে বাকি আছে, উহারা যে দেখা দিবে না, কে বলিতে পারে?

আম্র বৃক্ষের পাইট।

আপনাদিগের পরামর্শ মত বিগত তিন চারি বৎসরের অফলা আম্র বৃক্ষের বিগত কার্ত্তিক মাসে গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় বাহির করিয়া পক্ষাধিককাল পরে সার মাটি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দেওয়ায় এ বৎসর ঐ গাছে আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি, কিন্তু আম্র কিছু ছোট ছোট হইয়াছিল, বোধ হয় অধিক ফল হওয়ার জন্যই ফল ছোট হইয়াছিল।

[বর্ষাকালে ফলের গাছ মাত্রেই আইল বাঁধিয়া জল খাওয়াইয়া লইলে আরও ভাল হয়। কৃঃ সঃ]

কানল সূত্র।

এদেশে পতিত উষার ভূমিতে "কানল" নামে এক জাতীয় বনজ গাছ জন্মায়, উহা আনারস জাতীয় গাছ হইতে পারে। কিন্তু আনারস অপেক্ষা গাছ খুব বড় হয়, এক একটা পত্র সাড়ে তিন হস্ত চারি হস্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ঐ পত্র জলে পচাইলে বা ছেঁচিয়া ফেলিলে উহা হইতে এক প্রকার দীর্ঘ মোটা সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সূতা অত্যন্ত ভারসহ এবং দীর্ঘ, এ জন্য আমাদিগের বিশ্বাস যে, উহার চাষ করিলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। উহার গাছ বহুকাল স্থায়ী, একবার গাছ লাগিয়া গেলে বহুকাল উহার পাতা পাওয়া যাইতে পারে। কলে উহার সূত্র উত্তোলন করিয়া পরিষ্কার করিতে পারিলে উহা দ্বারা রজ্জু, মোটা গণি ক্লথ প্রস্তুত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যাঁহারা অধ্যবসায়ী তাহারা উহার চাষ করিয়া দেখিতে পারেন।

খুলনা জেলায় পানের চাষ।

খুলনা জেলার সদরের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ এবং যশহর জেলায় বহু বিভিন্ন স্থানে (পর্ণ) পানের, চাষ বহু বিস্তৃত, এজন্য এ প্রদেশের বারুইদিগের মধ্যে বিস্তর সম্পন্ন গৃহস্থ দেখা যায় এবং অন্যান্য স্থানের নীরক্ষর বারুইদিগের অপেক্ষা ইহারা

বিদ্যা বুদ্ধিতেও অগ্রগণ্য সুতরাং অনেকে স্বীয় পৈত্রিক বৃত্তি পানের চাষ ও বরজাদি ছাড়িয়া চাকুরী ও ওকালতী প্রভৃতিতে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক যে সকল লোক স্বজাতীয় ব্যবসায়ে অদ্যাপি নিযুক্ত আছেন বর্ত্তমান বর্ষারম্ভে নিদারুণ গ্রীষ্মও প্রায় ৮।৯ মাস বৃষ্টির অভাবে অনেক বরজ সমূহ ধ্বংশ ও পানের গাছ সমূহ শুষ্ক হইয়া তাহাদিগের অত্যন্ত ক্ষতি করিয়াছে। বিগত চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনটি চারিটি পান পয়সায় বিক্রয় হওয়ায় যদিও কেহ কেহ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন বটে কিন্তু বৃষ্টির অভাবে পত্রোদগম না হওয়ায় মাল জন্মিয়াছেও সামান্য। ফলে যাহাদিগের বরজ বজায় আছে তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অমঙ্গল ঘটে নাই। কিন্তু যাহাদিগের ফসল সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়া বরজ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকেই দুর্ব্বিসহ ক্ষতি গ্রস্থ হইতে হইয়াছে। সে ক্ষতি পূরণ হইতে যে বহু বিলম্ব হইবে তাহাতে আর সন্দহ মাত্রও নাই সুতরাং পানের দরও পূর্ব্ববৎ সুলভ হওয়ায় প্রত্যাশা হঠাৎ নাই। পান দ্রব্যটা ভারতবাসী হিন্দু, মুশলমান প্রভৃতির একটা বিলাসের উপকরণ হইলেও এরূপ এক এক জন পান খোর আছেন যে সমস্ত দিবা-রাত্রি পান চর্ব্বন করিতেছেন। পানের দর মহার্ঘ হওয়ায় তাঁহাদিগের সমূহ ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় যদি কেহ এই অবসরে পানের বিস্তৃত চাষ করিতে পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন।

ফসলে কীট।

বোধ হয় অত্যধিক বর্ষার জন্য এবৎসর কীট, পতঙ্গের আমদানী ও দৌরাত্ম অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ধান্যের চাতরে পাপড়ি কাটা পোকা জন্মিয়া মাঠকে মাঠ পাতা ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে আবার এক্ষণে কদলি বৃক্ষে সুয়া পোকা জন্মিয়া বাগানের কলা গাছের কচি পাকা সর্ব্বপ্রকারের পাতা খাইয়া কলা গাছের বিশেষ ক্ষতি সাধন করিতেছে। আর মালিদিগকেও ইহাদিগের কণ্টক বিদ্ধ হইয়া জর্জ্জরিত হইতে হইতেছে। সুয়া পোকার কাঁটা ফুটিলে যদি তাহার কোন ভাল ঔষধি পাঠকবর্গের কাহারও জানা থাকে তাহা কৃষক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনুগ্রহীত করিবেন।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।
কালীগঞ্জ, জেলা খুলনা। ভাদ্র মাস।

সার-সংগ্রহ।

রিফরমেটরী স্কুল। ১৯০৭।

ছেলেদের যতদূর সম্ভব তাহাদের জাতীয় ব্যবসা শিখান হইয়াছে। হাজারিবাগে কৃষি কর্ম্ম এবং আলিপুরে শিল্পকর্ম্ম শিখান হইয়াছে। ছেলেদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রাথমিক, মধ্য এবং উচ্চ। স্কুলে ২০৯ জন ছেলের মধ্যে ১৩৫ জন শিল্প বিষয়ে পরীক্ষা দেয়, ১০১ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। ফল খুবই সন্তোষজনক। হাজারিবাগ স্কুলে ক্ষেত্রের কাজ এবং শাকসব্জী উৎপাদনের কাজে বেশ উন্নতি দেখান হইয়াছে। ঐরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা ১৯০৬ সালে ৭৯ জনছিল, ১৯০৭ সালে ১০৪ জন হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসর কালের মধ্যে ১৬৬ জন ছাত্রকে আলিপুর স্কুল হইতে এবং ১৫৭ জন

ছাত্রকে হাজারিবাগ স্কুল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তদন্তে জানা গিয়াছে যে, স্কুলে ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছে এরূপ ১৪৪ জন ছাত্রের মধ্যে ৪৬ জন সেই শিক্ষিত ব্যবসায় এবং ৪৭ জন অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। হাজারিবাগের ১৫৭ জন ছাত্রের মধ্যে ১০৩ জনকে কৃষিকার্য্য শিখান হইয়াছে। তদন্তে জানা গিয়াছে যে, তন্মধ্যে কেবল ৫২ জন ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। উহা কিন্তু সন্তোষজনক নহে। হাজারিবাগে রিফরমেটরীতে কৃষি-শ্রেণী গুলির উন্নতি সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে, গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। সেই মত ব্যবস্থা হইলে ভবিষ্যতে এতৎসম্বন্ধে ফল ভাল হইবার কথা।

অষ্ট্রেলিয়া দেশীয় আয়কর বৃক্ষ।

এক্ষণে আমরা দেখিতে পাই যে, অনেকেই অরণ্য-জাত বৃক্ষাদি রোপণ করিতেছেন এবং কি প্রকারে দেশের ধন বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টি অল্প-বিস্তর আকৃষ্ট হইয়াছে। এতদবস্থায় অষ্ট্রেলিয়া দেশীয় কতিপয় আয়কর বৃক্ষের নামোল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচুর পরিমাণে ইউকালিপ্টস্ বৃক্ষ জন্মে। তত্রস্থ লোকে উহাকে গম বৃক্ষ বলে। ইহার কাষ্ঠ হইতে রেল পাতিবার স্লিপার কাষ্ঠ তৈয়ারি হয়। উহা এত দৃঢ় ও স্থায়ী যে, ২৪ বৎসর অন্তর বদলাইলে চলে এবং তখনও উহা ব্যবহার উপযোগী থাকে। রেলে পাতিবার কাষ্ঠ ব্যতীত ইহা হইতে খুঁটী, ঘরের কড়ি প্রভৃতি বহুতর কার্য্য হইতে পারে। ইহার নির্য্যাস হইতে প্রসিদ্ধ ইউকালিপ্টস্ তৈল ও ঔষধাদি প্রস্তুত হয়। এবং শুনা যায় যে ম্যালিরিয়া প্রধান স্থানে ঐ বৃক্ষ রোপণ করিলে তথাকার স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। অষ্ট্রেলিয়ার নানা জাতীয় ইউকালিপ্টস্ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় লাল সিডার, বীচ, রোজ উড প্রভৃতি অন্যান্য বৃক্ষ আছে। সে গুলির কাষ্ঠে সুন্দর আসবাব তৈয়ার হইতে পারে। আর এক প্রকার একেসিয়া(বাবুল)জাতীয় গাছ আছে। উহার নাম রুবিনিয়া সিডো একেসিয়া। এই গাছ উচ্চে ৯০ ফিট পর্য্যন্ত হয়। ইহার ছালে যথেষ্ট ট্যানিন্ আছে। ইহার ফল পশুখাদ্য রূপে ব্যবহার হয়। নিস্তেজ জমির ধারে ধারে ইহা রোপণ করিলে তলস্থ জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। ইহার কাষ্ঠ খুব শক্ত ও অধিক দিন স্থায়ী। উহাতে লৌহ ও ইস্পাতের যন্ত্রাদির হাতল, গাড়ীর চাকা ও অন্যান্য কার্য্য হইতে পারে। অধিকন্তু মধুমক্ষিকারা এই গাছে আশ্রয় লইতে ভাল বাসে। ফলতঃ ইহা অনেকাংশে আমাদের দেশের বাবুল ও খদির গাছের অনুরূপ। অষ্ট্রেলিয়ায় টরপেনটাইন্ ও অন্যান্য আটা বৃক্ষ প্রচুর জন্মায়। তথায় পাইন গাছও আছে। তথায় যে সমস্ত প্রদেশে ঐ সকল বৃক্ষ জন্মায় তাহার জলহাওয়া আমাদের দেশের অনুরূপ নাতি-শীতোষ্ণ ও প্রচুর বৃষ্টি হয়। আমাদের বঙ্গদেশে যাহাতে ঐ প্রকারের গাছ অধিক মাত্রায় রোপিত হয় তাহার চেষ্টা আবশ্যক।

শিমুল আলু।

কৃষকের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে শিমুল আলু সিদ্ধ, শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে সুন্দর ময়দা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সেই ময়দা চাউলের গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া উত্তম রুটী, পিঠা তৈয়ারি হয়। এবং চির দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে উহাদ্বারা সস্তায় প্রাণ বাঁচাইবার একটা উপায় হয়। সম্প্রতি এই শিমুল আলুর সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের কৃষি-বিভাগ অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। বিগত বর্ষে পুণা ও মাঞ্জরি

ক্ষেত্রে শিমুলের গাছ ভালরূপ জন্মিয়াছিল। এ-বৎসর খুলাবোহদ, ধায়ওয়ারে এবং রত্নগিরি প্রদেশে শিমুল আলুর চাষ করা হইবে। বেলে দোঁয়াশ ও উচ্চ ধরণের জমিতে উহা অনায়াসে জন্মিতে পারে। জমি কিন্তু সারবান হওয়া আবশ্যক। জল-বসা জমিতে উহার শিকড় পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সমুদ্রোপকূলে নিচু জমিতে যেখানে জল নিকাশের ব্যবস্থা আছে সেখানেও উহা সুন্দর জন্মায়। সমুদ্রোপকূলে যেখানে প্রচুর বৃষ্টি হয় তথায় জল সেচনের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। শিমুল আলুর মূল অল্পাধিক বিষাক্ত। কিন্তু সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিলে উহার বিষগুণ ক্ষয় হয়। কেহ কেহ এই জন্য তিন বার সিদ্ধ করিয়া তিন বার জল ফেলিয়া দিয়া তবে উহা আহার করে। সাধারণতঃ কিন্তু আলুগুলি কাটিয়া একবার রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া তারপর দুইবার সিদ্ধ করিয়া কিম্বা মূলগুলি তুলিয়া সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া তৎপরে খাইবার পূর্ব্বে আর একবার সিদ্ধ করিয়া আহার করিয়া থাকে। শুষ্ক মূলগুলি হাত জাঁতায় গুড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। এই ময়দা, চাউল গুঁড়া, বাজরি, জোয়ার বা ভুট্টার ময়দার সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা হয়। এই ময়দাকে ট্যাপিওকা বলে। ইহা হইতে প্রস্তুত খাদ্য মৌ আলুর (Sweet potato) প্রস্তুত খাদ্য আপেক্ষা খাইতে সুস্বাদু। ইহা গমের ন্যায় সারবান না হইলেও প্রায় চাউলের সমান। খান্দেশে ভিলেরা ইহা আদর করিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তথায় ইহা ৪০ পাঃ এক টাকায় পাওয়া যায়।

পিপুল।

বঙ্গের নানা স্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ বনজঙ্গলে পিপুল গাছ স্বতঃই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু অযত্নে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া, ক্রমাগত দুই তিন বৎসর সামান্য পরিমাণে ফল প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়। পতিত ফলগুলির কোন প্রকার সদ্ব্যবহার করা হয় না। বঙ্গের সর্ব্বত্রই পিপুল জন্মে।

পাটের আবাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিম্নভূমির আদর দিন দিনই যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু উচ্চভূমিগুলিতে ভালরূপ ধান্য অথবা পাট জন্মে না। উচ্চভূমিতে পিপুলের চাষ করিতে পারিলে, তাহাতে পাটের প্রায় দ্বিগুণ আয় হইবার সম্ভাবনা, অথচ খাটুনি বড় কম। বিশেষতঃ ইহাতে পাটের ন্যায় প্রতি বৎসরই সমভাবে খাটিতে হয় না। এক বৎসর খাটিলেই ক্রমাগত তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত ফলভোগ করা যায়।

পিপুল দুই প্রকার।—এক প্রকার সরু ও লম্বা এবং অন্য প্রকার অপেক্ষাকৃত মোটা ও বেঁটে। এই শেষোক্ত জাতীয় লতাই রোপণ করিতে হয়। উভয় প্রকার পিপুলের পার্থক্য সাধারণ লোকে ফল দর্শন ব্যতীত বুঝিতে পারে না। বাজারে বেণেদের নিকট যে পিপুল পাওয়া যায়, সেই জাতীয় পিপুলেরই চাষ করা কর্ত্তব্য। লম্বা জাতীয় পিপুলকে "ঘোড়া পিপুল" বলে। যত্ন করিয়া ঘোড়া পিপুলের চাষ করিবার আবশ্যক নাই।

উচ্চ (যে জমি বর্ষাকালেও জলমগ্ন হয় না), দোঁয়াশ এবং সমতল জমিই পিপুল আবাদের পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু আসামের প্রায় সর্ব্বত্র পর্ব্বতগাত্রে যথেষ্ট পিপুলগাছ দেখা যায় এবং যথেষ্ট পিপুলও জন্মিয়া থাকে।

চৈত্র মাসের শেষ অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে দুই একবার বৃষ্টি হইয়া, জমি একটু সরস হইলে পর বারম্বার উত্তমরূপে জমি চাষ করিতে

হয়। পিপুলের চাষের জন্য জমি ধূলিবৎ চূর্ণ এবং তৃণশূন্য করিতে পারিলেই ভাল। ভূমি উত্তমরূপে কর্ষিত এবং ধূলিবৎ চূর্ণ হইলে প্রথমতঃ তাহাতে ধঞ্চে, অড়হর অথবা জয়ন্তী গাছের বীজ পাতলা করিয়া বপন করিতে হইবে। তৎপরে বীজোদ্ভূত গাছগুলি একটু বড় হইলে অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে সমূল অথবা খণ্ডিত পিপুল লতাকে ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা খণ্ড করিয়া ক্ষেত্রে বসাইতে হইবে। কিন্তু কর্ত্তিত লতা হইতে যে গাছ জন্মে, তাহাতে ভাল ফল ধরে না বলিয়া আমাদের দেশের অনেক অনভিজ্ঞ কৃষকদিগের বিশ্বাস আছে। এ বিষয়ে কিন্তু সুনিশ্চিত পরীক্ষা হয় নাই। লতা ৩ ফিট অন্তর রোপণ করিতে হয়। সম্মুখস্থ এক একটী ধঞ্চে অড়হর বা জয়ন্তী গাছ রাখিয়া, অবশিষ্টগুলি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। অবশিষ্ট গাছগুলি পিপুল লতাকে ছায়া ও আশ্রয় প্রদান ও ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে ঐরূপ এক সার গাছ থাকিলে বেড়ার কার্য্য করিবে। যে গাছগুলি তুলিয়া ফেলা হয়, তাহা অন্যত্র না ফেলিয়া ক্ষেত্রের মধ্যেই ফেলিয়া রাখিতে পারিলে, উহা পচিয়া কাঁচা সারের কার্য্য করিবে। ফলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাও যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

অধিক রৌদ্রে লতাগুলি শুষ্ক হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই জন্য গাছগুলিকে ছায়া ও আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য ধঞ্চে, অড়হর অথবা জয়ন্তী গাছের প্রয়োজন। এই কার্য্যের জন্য অড়হর গাছ রাখিলে, ক্রমাগত তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত অধিকন্তু কৃষকের অড়হর কলাই লাভ হয়।

ভাদ্র মাসে একবার ঘাস নিড়াইয়া ফেলিয়া মাটী গুঁড়া করিয়া দিতে হইবে। অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত আর কিছুই করিতে হইবে না। মাঘ মাসের শেষ ভাগ হইতেই রৌদ্রের তাপ প্রখর হইবে, এই সময় ধানের নাড়া অথবা বিচালীদ্বারা গাছের গোড়াগুলিকে ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম বৎসরই বর্ষাকালে পিপুল ধরিতে পারে। কিন্তু প্রথম বৎসর তত অধিক হয় না—বিঘা প্রতি গড়ে ॥০ মণের কিছু বেশী হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় বৎসরে—কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগে জমি নিড়াইয়া তৃণাদি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপর কোপাইয়া অল্প পরিমাণ শুষ্ক এঁটেল মাটি চূর্ণ দিলে আর কিছুই করিতে হইবে না। দ্বিতীয় বৎসরে প্রচুর পরিমাণে পিপুল জন্মিয়া থাকে। তৃতীয় বৎসরে একবার মাত্র নিড়াইয়া দিলেই হয়। তৃতীয় বৎসরেও দ্বিতীয় বৎসরের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে পিপুল পাওয়া যায়। চতুর্থ বৎসরে অপেক্ষাকৃত ফসল কম হয়। এই বৎসরই লতা তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে হয়।

মাঘ মাসের শেষ অথবা ফাল্গুনের প্রথম ভাগে হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ফল সংগ্রহের সময়। ফল সুপক্ক হইলেই, উহা তুলিতে হয়। ফল তুলিয়া, বেশ ভালরূপে শুকাইয়া লইলেই হইল।

প্রথম বৎসর অর্দ্ধমণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে দেড় মণ হিসাবে তিন মণ এবং চতুর্থ বৎসরে এক মণ। চারি বৎসরে মোট উৎপন্ন ফসল সাড়ে চারি মণ। পিপুলের দর কম নহে। এমন কি সময় সময় ৬০৲ টাকা মণ মূল্যে বিক্রয় হইতে শুনা গিয়াছে। প্রত্যেক মণের মূল্য ৪০৲ করিয়া ধরিলেও ১৮০৲ টাকা। মূল এবং লতা বিক্রয় করিয়া এক বিঘা হইতে ২০৲টাকা পাওয়া যায়।

চারি বৎসরে মোট ব্যয় প্রতি বিঘায় ৪০৲—৫০৲ টাকার বেশী হয় না। যাহাদের নিজের লাঙ্গল আছে, তাহাদের খরচ ইহার অনেক কম হইবে এবং দরের কম বেশী হেতু বা দৈব প্রতিকূলতায় লোকসানের জন্য মোটের উপর

৫০৲ টাকা বাদ দিলেও পিপুল চাষে বিঘা প্রতি ২৬৲ টাকা লাভ হওয়া সম্ভব।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

ভ্রম সংশোধন। আটমেসে বিলের ধান্য চাষ।—আমার প্রেরিত প্রবন্ধের যে অংশ বিগত শ্রাবণের ৪র্থ সংখ্যক কৃষকের ৭৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, উহার "খুলনা জেলায় ধানের চাষ" বলিয়া যে নাম প্রদান করিয়াছেন, উহা যথাযথ হয় নাই; কারণ খুলনা জেলায় সাধারণতঃ ধান্যক্ষেত্রে ঐরূপ কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বিত হয় না, ও ঐরূপ কৃষি-প্রণালী অবলম্বন করিলেও তাহাতে ফসল উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। উহা কেবলমাত্র লবণ জল সম্পর্ক বিরহিত গভীর অথচ ক্রমোচ্চ ভূমিতে নির্দ্দিষ্টরূপে উক্ত প্রথা আবদ্ধ ও প্রচলিত আছে, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত। খুলনা জেলার কালীগঞ্জ থানার এলাকা গুলির বিল প্রভৃতির সুগভীর বিলে যেরূপ পূর্ব্বোক্ত রীতিতে কৃষি প্রচলিত আছে, ২৪ পরগণার বসুর হাটের এলাকা দাঁতভাঙ্গা বিলে ও বল্লির বিল প্রভৃতি সুবৃহৎ বিলেও ঐ একই নিয়মে চাষ আবাদ করিয়া কাঁটারাঙ্গি প্রভৃতি ধান্য উৎপাদন করিয়া লওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। সুতরাং ঐ প্রথাটি কেবলমাত্র খুলনা জেলার নিজস্ব বলিলে অন্যায় কথা বলা হইবে এজন্য—"আটমেসে বিলের ধান্য চাষ" নাম দিলে ভাল হয়।

জলৌকা ও তাহার স্বভাব শত্রু।—উপসংহারে পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিবেদন করিতেছি যে, শৈবাল কীট ও পক্ষীকুল সমবেত হইয়া কৃষির যেরূপ অনর্থোৎপাদন করে, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে সুবৃহৎ জলৌকা, বিলের জল মধ্যে জন্মগ্রহণ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া কৃষক ও কৃষির প্রধান সম্পত্তি বলদ সমূহের দেহে লাগিয়া তাহাদিগের অজ্ঞাতে অপর্য্যাপ্ত রক্ত শোষণ করিয়া তাহাদিগকে ক্ষীণ, দুর্ব্বল অধিক কি যম সদনে প্রেরণ পর্য্যন্ত করিয়া আরও অধিক অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল এমনই বিচিত্র যে তাঁহার নিকট কাহারও সীমা লঙ্ঘনের উপায় নাই। যে বৎসর অধিক জলৌকা জন্মিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে, সে বৎসর অপর্য্যাপ্ত মৎস্য জন্মিয়া অবিলম্বে উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিয়া গো এবং মানবের দুর্দ্দমনীয় শত্রু বংশ নির্ম্মূল করিয়া দিয়া স্বীয় ক্ষুধা নিবৃত্তি ও দেহের পুষ্টি সাধন করতঃ পরে আপনারাও জালবদ্ধ ও পক্ষীগণের সহযাত্রী হইয়া যথারীতি মানবকুলের উদরশায়ী হইয়া, জঠর জ্বালা নিবারণ ও রসনার তৃপ্তি করে।

জল কামড়ান।—উপরে যে সমুদয় বাধা বিঘ্নের কথা লেখা হইল। ঐ গুলি ব্যতীত আটমেসে ডাবর (গভীর) বিলে আরও এক অবধ্য শত্রু আছে, তাহার নাম "জলকামড়ান"। জলে, মানুষ গোরুকে দন্তদ্বারা কামড়াইয়া দেয়, এ কথা শুনিলে অবশ্যই পাঠকগণ হাস্য করিবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জলরাশি দন্তদ্বারা দংশন না করিলেও যে সমস্ত কৃষক ও বলদ বিলের জলে অর্দ্ধঘণ্টামাত্র নিমজ্জিত অঙ্গে ভূমি কর্ষণ ও ধান্য রোপণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে, তাহাদিগকে তৃণ-পত্র গলিত বিষাক্ত জলের জ্বালায় অস্থির হইয়া হস্তপদাদি চুলকাইতে চুলকাইতে বেগে ছুটিয়া জল ও কর্দ্দমশূন্য স্থানে আশ্রয় লইতে হইবে। বলদগণ বিষের

জ্বালায় এরূপ অস্থির ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া যায় যে, সময় সময় চিরাভ্যস্থ হল পদ্ধতি পরিত্যাগ, লাঙ্গলাদি ভগ্ন ও যোত ছিন্ন করিয়া বেগে পদ চতুষ্টয় চালনা করিতে করিতে অবিলম্বে তীরে উঠিয়া ঘন ঘন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লেহন ও শৃঙ্গ দ্বারা স্থানে স্থানে চুলকাইতে থাকে। কৃষক শত চেষ্টাতেও তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত ও কার্য্যে আবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হয় না। যাহা হউক, উহার প্রথমাবস্থায় ঐরূপ যন্ত্রণা দায়ক হইলেও দ্বিতীয় অবস্থায় যন্ত্রণার কথঞ্চিত লাঘব হইয়া কুষ্ঠ রোগীর ন্যায় গাত্র স্থানে স্থানে চক্রাকারে স্ফীত হইয়া উঠে এবং শেষে ঐ স্ফীত স্থানসমূহে ক্ষত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট প্রদান করে। গো-দেহে অবশ্য ক্ষত হয় না বটে, কিন্তু স্ফীতি কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত সম ভাবেই রহে। মানবদেহে উহার একমাত্র ঔষধ প্রথমাবস্থায় যথেষ্ঠ পরিমাণে শর্ষপ তৈল মর্দনান্তে দেহে অগ্নির উত্তাপ প্রদান করা।

কৃষকগণ বিষজলের ঐরূপ ক্রিয়াকেই "জল কামড়ান" কহে। প্রকৃতপক্ষে জলের যদি বরফের দন্ত থাকিত ও তদ্দ্বারা দংশন করিত, তাহা হইলে বোধ হয় এতাধিক যন্ত্রণা দায়ক হইত না ও রক্তে বিষ মিশ্রিত হইয়া পরেও কষ্ট প্রদান করিত না।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপধ্যায়, কালীগঞ্জ, খুলনা।

ধান চাষ।—ইংরাজ অধিকৃত গিনি দেশে ধানের চাষ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯০০ সালে ধানের জমির পরিমাণ ছিল ৬০০০ হাজার একর। ১৯০৬ সালে উক্ত জমির পরিমাণ ২৪০০০ হাজার একর হইয়াছে অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে চারি গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তাল জাতীয় উদ্ভিদের বীজ।—সাধারণতঃ তাল জাতীয় উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত হইতে অধিক সময় আবশ্যক হয়। এমন কি ২।৪ বৎসর পরে উক্ত জাতীয় উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছে। মুঁসো ড্রাপো ডেঁ। বলেন যে তালের বীজ প্যাকেট খুলিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত জলে ফেলিয়া দিয়া উহাকে ২৪ ঘণ্টা কাল ভিজিতে দিলে ১ এক পক্ষের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হইবে।

হোয়াই দ্বীপে আমের চাষ।—ভারতবর্ষ হইতেই প্রথমে হোয়াই দ্বীপে আম চাষের প্রবর্ত্তন হয়। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত স্থানে প্রায় ৪০ রকম আম্র দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশই নিকৃষ্ট জাতীয় আঁশাল ও সুগন্ধ বিহীন। কিন্তু চাষের উন্নত প্রণালী ও শঙ্কর উৎপাদন দ্বারা শীঘ্রই উক্ত স্থানে ভাল আম্র জন্মিবে এরূপ আশা করা যায়। আমাদের দেশে ৫০০ জাতির কম আম্র নাই এবং তন্মধ্যে কতিপয়ের ন্যায় ফল একান্ত দুর্লভ। কিন্তু এখানে উন্নতির চেষ্টা কই ?

কীট ন্যাশক ঔষধ।—নানাবিধ দ্রব্য কীট বিনষ্ট করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সকল দ্রব্য কিন্তু সকল কীট নাশের পপযুক্ত নয়। গন্ধক চুণ মিশ্রণ কোকৃসিডিই জাতীয় পোকা (যেমন তুঁতের টুকরা পোকা) নিবারণে বিশেষ ফলপ্রদ। উক্ত পোকার জন্য হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ বাষ্প প্রয়োগও উত্তম ঔষধ। যাবতীয় পত্র আক্রমণকারী পোকার বিনাশের পক্ষে সেঁকো বিষযুক্ত কয়েক প্রকার মিশ্রণ বিশেষ উপযুক্ত। সেঁকো মিশ্রণ প্রয়োগে আগাছা প্রভৃতিও নষ্ট হয়। ১ ভাগ সাদা সেঁকো ৪ ভাগ সাজিমাটি একত্র করিয়া জলে দিয়া ফুটাইলে উক্ত মিশ্রণ প্রস্তুত হইবে। রাস্তা, ভিত প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিতে হইলে ৩০ ভাগ জলের সহিত মিশাইয়া লওয়া আবশ্যক।

ফস্ফরিক সার।—ফস্ফরিক এসিড্ সংযুক্ত সার সম্বন্ধে মার্কিণ রাজ্যে যে পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় পূর্ব্বে জমিতে চূণ দিয়া রাখিলে ফস্ফেট্ অধিক কার্য্যকর হয়। নয় প্রকার ফস্ফেট্ লইয়া নানাবিধ ফসলের উপর পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মটর পরীক্ষার ফলকে অনেকটা গড়পড়তা ফল বলিয়া ধরিতে পারা যায়। চূণ সারযুক্ত ও চূণ বিহীন মৃত্তিকা ভেদে যথাক্রমে গলিত হাড় অঙ্গারে ২৯ পাঃ ও ১৫ পাঃ, গলিত হাড়ে ৩২ ও ২০ পাঃ, হাড়ের গুঁড়ায় ২৯ ও ২১ পাঃ, ডবল্ সুপার ফস্ফেটে ২৯ ও ১২ পাঃ এবং ফস্ফেট বিহীন জমিতে ১৫ ও ৬ পাঃ শুঁটি সমেত মটর উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা চূণ ও ফসফেট সার সম্মিলনের উপকারিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

মৃত্তিকা জীবাণু শূন্য করণ।—অধিক উত্তাপে জীবাণু (Bactria) মরিয়া যায়। মৃত্তিকায় অসংখ্য জীবাণু অবস্থিতি করে; তন্মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত উপকারী, আবার কতকগুলি বিশেষ অপকারী। জমিকে উত্তপ্ত করিয়া অপকারী জীবাণু সমূহকে মারিয়া ফেলিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে উপকারী জীবাণুও লয় প্রাপ্ত হয়। জলীয় বাষ্পই জমিকে উত্তপ্ত কর্‌বার প্রশস্ত উপায়। গার্ডনার্স ক্রনিকল নামক পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে উত্তাপের পরিমাণ ১৪০° হইতে ১৬০° ডিগ্রি ফারেন হিট্ হইলে উপকারী জীবাণু মরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা কম। পক্ষান্তরে উক্ত পরিমাণ উত্তাপে অপকারী আণুবীক্ষনিক জীবাণু সমুদয় ও কীট, ডিম্ব ও কীড়া প্রভৃতি নিশ্চয় বিনষ্ট হয়।

সূচিকাভরণ।—মানব এবং অপরাপর প্রাণীর ন্যায় বৃক্ষ ত্বক বিদ্ধ করিয়াও ঔষধ অথবা আহার্য দিতে পারা যায়। মিঃ সাইমন নামক জনৈক উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ দেখিয়াছেন যে ত্বক মধ্যে কোন উপায়ে পুষ্টিকর দ্রব্যের দ্রাবণ প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলে জরাগ্রস্থ ফলবৃক্ষ সমূহ আবার সতেজ হইয়া উঠে। তিনি নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। বৃক্ষের সন্নিকটে মৃত্তিকা হইতে ছয় ফুট উচ্চে দ্রাবণ পূর্ণ পাত্র রাখিতে হইবে। ইহার সহিত একটি নল সংযোজিত থাকিবে এবং ঐ নলের অপর প্রান্তে আর একটি তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম কাচ অথবা ধাতব নল লাগাইয়া মৃত্তিকার ঠিক উপরিস্থিত বৃক্ষাংশে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে দ্রাবণ উপর হইতে কতক পরিমাণে চাপ পাইবে এবং সহজে উদ্ভিদ রসের সহিত মিলিত হইয়া বৃক্ষের শরীরের সর্ব্ব স্থলে ছড়াইয়া পড়িবে। ফল বৃক্ষ ব্যতীত ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু প্রভৃতি শাকসব্জীতে এই উপায়ে পুষ্টিকর দ্রাবণ প্রয়োগ করিয়া সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে।

ফণী মনসা।—ফণী মনসা জাতীয় উদ্ভিদ আমেরিকার আদিম অধিবাসী। কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীর অনেক স্থানে উহা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষেও কয়েক প্রকার মনসা দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজ প্রদেশে মনসা পশু খাদ্য রূপে প্রচলন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু চেষ্টা তাদৃশ ফলবতী হয় নাই। মনসার বিশেষ গুণ এই যে জল অভাবে অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং কতিপয় জাতীয় মনসার ফলও পুষ্টিকর খাদ্য। মেক্সিকো, টেক্সাস ও সিসিলি দেশে মনসার যথেষ্ট আদর। অনেক মনসা কাঁটা বিহীন কিন্তু অধিকাংশ মনসার ফলও কাঁটাযুক্ত। মেক্সিকো দেশে ২-৩ গাইটযুক্ত কলম দ্বারা মনসার চাষ হয় এবং তিন বৎসরের মধ্যেই ঐ কলম হইতে ফল

পাওয়া যায়। ফলের কাঁটাযুক্ত ত্বক ছাড়াইয়া খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। ফলের সরবত, পনির, তাড়ি ও শুঁটি আহার্য্যরূপে পরিগণিত হয়। দুর্ভিক্ষ ও জল কষ্টের সময় মনসার চাষে অনেক উপকার দর্শিতে পারে।

কৃষি শিক্ষা বিস্তার।—বিগত ১৯০৭ ডিসেম্বর মাসে সুরাটে যে শিল্প সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল তথা হইতে কৃষি-শিক্ষা বিস্তার কল্পে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের নিকট কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। উক্ত গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি তাহার উত্তরে জানাইয়াছেন যে,অধিক সংখ্যক কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্র স্থাপন করা গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে এবং ঐ সকল পরিচালনের জন্য উপযুক্ত লোক মিলিলেই উহা কার্য্যে পরিণত হইবে। চাষি এবং জমিদারগণের মধ্যে যাহাতে ব্যবহারিক এবং বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-শিক্ষা প্রচার হয় তদ্বিষয়েও গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট বলেন যে,যতদিন উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক না পাওয়া যায় ততদিন স্থানে স্থানে কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারে না। পুণা কৃষি-কলজের ছাত্রবৃন্দ হইতে যাহাতে এই অভাব দূর হয় সেই জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কৃষকগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার না করিলে কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপনেও কোন ফল হইবে না, সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। আপাততঃ উক্ত গভর্ণমেণ্ট বিশেষ প্রকারে বীজ নির্ব্বাচন ও নূতন শস্যের আবাদ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইক্ষু চাষের জন্য চেষ্টা চলিতেছে। সেচন জলের সুবিধা করিবার চেষ্টা হইতেছে,—চাকাপুরে গিয়ার্ডা এবং নাসিকে গোদাবরী খাল কাটা হইতেছে। আমেদনগরেও খাল বিস্তার হইবে।

বাতি বাদাম।—ইহা এক প্রকার জঙ্গলী আখরোট। ইহার উদ্ভিদ শাস্ত্রীয় নাম alcurites moluccana। আসাম, মান্দ্রাজ এবং ব্রহ্মদেশে অল্পসংখ্যায় ইহার গাছ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ঐ সকল স্থানের কোথাও এই বাদাম হইতে তৈল বাহির করা হয় না। দক্ষিণ সান ষ্টেটে এই গাছ জঙ্গলে জন্মায় এবং যত্নপূর্ব্বক রোপণ করাও হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জই ইহার আদিম স্থান। তত্রস্থ অধিবাসীগণ এই বাদাম ছাড়াইয়া বাঁশের বাখারিতে বা নারিকেলের ডাঁটায় বিঁধিয়া রাখে। সেই রকম ৪-৫টা ছড়ি একত্রে বাঁধিয়া এক একটী মশাল তৈয়ারি করে। ইহা রাত্রে মৎস্য ধরিবার কালীন তাহারা ব্যবহার করে। ইহাতে উজ্জ্বল আলো হয়। কিন্তু এই মশাল হইতে অতিরিক্ত কাল ধূম বাহির হয় এবং গন্ধও ভাল নহে। ধূম হইতে যে,কাল ঝুল পড়ে, তাহা গাছের গায় লাল রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহারা এক প্রকার রঙ্গ প্রস্তুত করে। উক্ত প্রকারে জ্বালান হয় বলিয়া উহাদিগকে বাতি বাদাম বা Candle nut বলে। এই বাদাম সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা হইতেছে।

ক্ষার লবণ ও অনুর্ব্বরতা।—যাহাকে সাধারণতঃ লোণা ফোটা কহে তাহা সাধারণতঃ কয়েক প্রকার ক্ষার লবণের আতিশয্যে সংঘটিত হয়। উত্তর পশ্চিমের অনেক স্থলে এবং নিম্ন বঙ্গে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এইরূপ জমি দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এরূপ জমির পরিমাণ কম নহে। উক্ত প্রকার জমি কিরূপে চাষের

উপযুক্ত করা যাইতে পারে তজ্জন্য মার্কিন দেশে অনেক পরিক্ষা চলিতেছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ক্ষার লবণ দ্বারা অস্ত মূল ঝলসাইয়া যায় এবং মূলাম্বু সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সাধারণ লবণ ও সোডা কার্ব্বনেটই বিশেষ রূপে এই প্রকার ক্ষতি করে। বৃক্ষের অভ্যন্তরে ক্ষার প্রবেশ করিলে পাতার বহির্ভাগ কাল হইয়া যায় এবং পরে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া বৃন্তচ্যুত হয়। কতকগুলি গাছের, ক্ষারে বিশেষ ক্ষতি হয় না। উক্যালিপটাস্ ও তাল শ্রেণীর উদ্ভিদ অনেকটা ক্ষার সহ। ফলের মধ্যে দাড়িম, ডুমুর ও নাসপাতি ক্ষার দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যে সমস্ত উপায়ে জমি হইতে ক্ষার লবণের আধিক্য দূর করিতে পারা যায় তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ঃ—(১) গভীর জল নিকাশি পয়োনালা ও জলপ্লাবন, (২) ঘন ঘন চাষ (৩) ক্ষেত্রজ সার প্রয়োগ ও (৪) জল দ্বারা উপরিস্থিত ক্ষার দূরী করণ।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আশ্বিন—সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর।

সব্জী বাগান। এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বেই জলদি জাতীয় কপি, টমাটো, বিলাতি লঙ্কা প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তৈয়ারি হইয়াছে। এই সময় নাবী জাতীয় বীজ বপন করিতে হয়। মূলজ সব্জীর চাষ এই সময় হইতে আরম্ভ। মূলা, সালগম, বীটের এই সময় চাষ আরম্ভ করিবে। বেগুন চারা ইতি পূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সীম, মটর বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে। জলদি কপি চারা যাহা ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে তাহাতেও এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকা পাতা গুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আলুও এই সময় বসাইবে, পিঁয়াজ চাষেরও এই সময়।

ফুলের বাগান। এই সময় এষ্টার, প্যান্সি, ভার্ব্বিনা, ডালিয়া, ক্লিয়াস্থাস, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুল বীজ বপন করিতে আরম্ভ করিবে।

পার্ব্বত্য প্রদেশে এই সময় বেগেনিয়া, জিরেনিয়ম প্রভৃতি কোমল গাছগুলির বিশেষ পাট করিতে হয়। এই সকলের কটিং বসাইতে পারা যায়, কিন্তু পাহাড়ে অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হয়—সুতরাং সাসি দ্বারা আবৃত স্থানে সে সকল কটিং পোতা উচিত। গোলাপের কলম (Budding) এখন করা যাইতে পারে—বিশেষতঃ হাইব্রীড, পারপেচুয়াল জাতীয় গোলাপের, চিনা, টি, বুরবণ জাতীয় গোলাপের কটিং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এখন করা যাইতে পারে। বৃষ্টির সম্পূর্ণ অবসান না হইলে পার্ব্বত্য প্রদেশে সব্জী তৈয়ারি করা হইয়া উঠে না। তবে আচ্ছাদনের ভিতর যত্ন করিয়া করিলে কিছু কিছু হইতে পারে। পর্ব্বতে দ্রাক্ষালতার এই সময় বড় বাড় হয়। সেগুলির কাটিয়া ছাঁটিয়া গোড়া খুঁড়িয়া একটু বাড় কমাইতে হইবে।

পশ্চিম ভারতে যেখানে বৃষ্টির আতিশয্য আদৌ নাই, তথায় গোলাপ হাপর হইতে নাড়িয়া বসাইয়া গোলাপ ক্ষেত তৈয়ারি করা যাইতে পারে। এই সময় উক্ত প্রদেশে ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান হইতেছে। আশ্বিন মাসের শেষে কার্ত্তিকের প্রথমেই তথায় ফুলকপি তৈয়ারি হইয়া উঠিবে।

REGISTERED No C.192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



নবম খণ্ড,—৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,
সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।
ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

আশ্বিন, ১৩১৫।

মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত;
১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।



কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

কৃষক।

৯ম খণ্ড। আশ্বিন, ১৩১৫ সাল। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

গবাদির বিষ চিকিৎসা।

আফিং।

ঔষধরূপে অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে বিষ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়; এতদ্ভিন্ন চামারেরা আফিং খাওয়াইয়া গোরুদিগকে মারিয়া ফেলে। ২।৩ আউন্স অর্থাৎ এক বা দেড় ছটাক আফিং খাওয়াইলে গোরু সকল বিষাক্ত হয়।

লক্ষণ।—প্রথমতঃ রোগী ভয়ানক উত্তেজিত হয়; গাঁ গাঁ শব্দ করে; নাড়ীর গতি অতি দ্রুত হয়; মুখ দিয়া ফেণা বাহির হয়; চোখ দিয়া জল পড়ে এবং গাত্রোত্তাপ বৃদ্ধি পায়।

কয়েক ঘণ্টা পরে রোগী ঘোর নিদ্রাচ্ছন্ন হয়; চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া অথবা শুইয়া থাকে; কর্ণে কোনরূপ শব্দ প্রবেশ করিলে ঘুমের ঘোরে চক্ষু মেলে; পরে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে। পূর্ব্ব হইতে কোন কষ্টদায়ক পীড়াতে ভুগিতে থাকিলে এই সময়ে সেই কষ্টের লাঘবতা পরিলক্ষিত হয়। গাত্রোত্তাপ কমিয়া যায়; কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে এবং পেট ফাঁপে।

রোগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়; চক্ষুমণি ক্ষুদ্র দেখায়; নাড়ীর স্পন্দন টের পাওয়া যায় না; ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে এবং সংজ্ঞাহীনাবস্থায় দম আটকাইয়া রোগী প্রাণত্যাগ করে।

পোস্ত দানা।—অধিক মাত্রায় পোস্ত দানা (Poppy heads) খাইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়ঃ—রোগী কাঁপিতে থাকে; মুখ দিয়া ফেণা বাহির হয়; গাঁ গাঁ করে; পেট ফাঁপে; চক্ষুমণি অত্যন্ত বড় দেখায় ও চক্ষুক্ষরণ হ্রাস পায়। পশুটী সংজ্ঞাহীন হয় এবং চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকে। কোন কোন পশু ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয় ও ক্ষেপিয়া যায়; শিং দিয়া গুঁতায় এবং মানুষ দেখিলে কামড়ায়। সমস্ত মাংস পেশী সমূহে খিল ধরে। টল্‌মল্ করিয়া চলে ও প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে আর্ত্তনাদ করে।

চিকিৎসা।—রোগীর শরীর মার্জ্জন ও মর্দ্দন করিয়া দিবে; রোগীকে হাঁটাইবে; মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিবে। এমোনিয়া কিম্বা হলুদ পোড়াইয়া নাকে আঘ্রাণ করাইবে। খোরাসানি আজোয়ান ও ধুতুরা বিষের চিকিৎসার মত এই রোগের চিকিৎসা করিবে ও পথ্য দিবে।

তামাক।

তামাক।—(Tobacco) চর্ম্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু ও উদ্ভিদাণু মারিবার জন্য তামাক পাতার

ক্বাথ গায়ে ঘসিয়া লাগাইতে হয় এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত উহার বাহ্যিক প্রয়োগে গোরুর বিষ লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে পারে; এতদ্ভিন্ন ঘাসের অনাটন হইলে কোন কোন গোরু তামাক খাইয়া বিষাক্ত হয়। অর্দ্ধ সের তামাক উদরস্থ হইলে বিষ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

লক্ষণ। মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হয়। ক্ষুধামান্দ্য, পেট ফাঁপা, শূলবেদনা, ঘন ঘন ও অসাড়ে মলত্যাগ এবং বাতকর্ম্ম হয়। রোগীর উত্তেজিতাবস্থা; মাংসপেশী সমূহের আক্ষেপ, শ্বাস-কৃচ্ছ, রক্তবর্ণ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বহুমূত্র, সংজ্ঞাহীনতা; চক্ষুমণির বিস্তৃতি, চোখের কোঠরগত অবস্থা এবং সমস্ত অঙ্গের অশাড়তা ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হয়।

চিকিৎসা।—আফিংএর চিকিৎসা দেখ।

সীসা।

সীসা।—গৃহস্থের ভুলক্রমে কিম্বা দৈবক্রমে খাদ্যের সহিত সফেদা, অঞ্জন ও সুর্ম্মা ইত্যাদি খাইয়া গোরু সকল বিষাক্ত হয়। সীসা সুস্বাদু ও মুখরোচক, এজন্য গোরু সকল ইহা খাইতে ভাল বাসে। সচরাচর জল কিম্বা ঘাসের সহিত সীসা গোরুর উদরস্থ হয়। কলাই করা বালতি, চিত্র, রং, গোলাগুলি ও জল কলের নল ইত্যাদিতে সীসা থাকে, এবং ইহা সহজে জলে দ্রব হয়। রং বা চিত্রকরা নূতন জিনিষ কিম্বা যে স্থানে রং বা চিত্র করা হয়, সেই স্থানের ঘাস চাটিয়া গোরু বিষাক্ত হয়। পুরাতন বালতি কিম্বা জল কলের পুরাতন নলে যে সীসা থাকে, তাহা জলে দ্রব হইয়া উদরস্থ হইলে গোরু বিষাক্ত হয়। অনেকে ক্ষেত্রে সাররূপে সীসা ব্যবহার করে এবং ইহাতেও সীসা পাইয়া গোরুর বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বিষ লক্ষণ প্রকাশকারী ঔষধের মাত্রা।

১॥০ দেড় আউন্স অর্থাৎ তিন কাঁচ্চা হইতে ৩ তিন আউন্স অর্থাৎ ছয় কাঁচ্চা পর্য্যন্ত।

লক্ষণ।—অগ্নিমান্দ্য, শূলবেদনা, পেটফাঁপা, নিস্তেজতা; পিছনের পায়ের অবশতা, পক্ষাঘাত, বিকার, অল্প অল্প জ্বর, কাশি, আক্ষেপ, মূর্চ্ছা, কম্পন, মাংসপেশী সমূহের খেচনী (আক্ষেপ) এবং সংজ্ঞাহীনতা। মাড়িস্থ আবরক ঈষৎ নীলাভ হয়, জাওর কাটে না, দুগ্ধক্ষরণ কমিয়া যায়, মুখ দিয়া ফেণা বাহির হয়, গাঁ গাঁ শব্দ করে, দাঁত কিড় মিড় করে, কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে; পা গুলি একত্র গুটাইয়া মাথা নীচু করিয়া ও শিরদাঁড়া উঁচু করিয়া রোগী দাঁড়ায়। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে; চোখে কম দেখিতে পায়। বিষ খাইবার ৭।৮ দিন পরে লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হয়। এই রোগে গায়ের লোম খাড়া হয়।

চিকিৎসা।—রোগীকে প্রথমে /১ এক সের তিলের কিম্বা মসিনার তৈল খাওয়াইবে; পরে ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ ৩।৪ তিন চার বারে সারাদিনে ১ এক তোলা সালফিউরিক এসিড (Acidum Sulphuricum dilutum) কিম্বা ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া ম্যাগনেসিয়াম সাল্‌ফ (Magnesium Sulphas) পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল, ছাতু, ফেণ কিম্বা তিসির

মাড়ের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে। রোগীকে ৮।১০টী ডিম্ব, দুই তিন সের দুগ্ধ ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছাতুর গ্রুয়েল প্রত্যহ খাওয়াইবে। রোগীর শরীর উত্তমরূপে মার্জ্জন ও মর্দ্দন করিয়া দিবে। লক্ষণানুসারে অন্যান্য চিকিৎসা করিবে।

থুনো।

থুনো।—ইহার অন্যান্য দেশীয় নাম—বিরসি, গেলি ও লুষ্ট। ইহার ইংরাজী নাম (Taxus baccata)। এই গাছ বাগানে হয় এবং সকল সময়ে সবুজাবস্থায় থাকে। শীতকালেও গাছ সবুজ রংএর থাকে এবং যখন অন্যান্য গাছের পাতা পড়িয়া যায়, ইহার পাতা থাকে। ইহার পাতা গুলি সবুজ রংএর; ফলগুলি মাংসল ও গোল এবং দেখিতে লাল। ফলে একটী মাত্র শক্ত বীজ থাকে। ঘাসাভাব হইলে গোরু সকল ইহার পাতা খাইয়া বিষাক্ত হয়।

লক্ষণ।—অধিক মাত্রায় খাইলে পশুটী ২।৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করে; অল্প মাত্রায় খাইলে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হয় যথা;—অস্থিরতা, উত্তেজতা, শূলবেদনা; পেট ফাঁপা; উদরাময়; দুর্গন্ধযুক্ত মল। পরে গাত্রোত্তাপ হ্রাস পায়। নিস্তেজতা, সংজ্ঞাহীনতা, অজ্ঞানতা ও মূর্চ্ছা। হঠাৎ রোগী মরিয়া যায়।

চিকিৎসা।—"কাঠ বিষের" চিকিৎসা দেখ। রোগীকে নিম্নলিখিত ঔষধের যে কোনটী শীঘ্র শীঘ্র খাওয়াইয়া দিবে।

১ নং।	লবণ	...	।৵০ দেড় পোয়া।
	শুঁঠ চূর্ণ	...	৲১০ দুই কাঁচ্চা।
	চিটা গুড়	...	।১০ এক পোয়া।
	গরম জল	...	।১ এক সের।

এক বারের ঔষধ। গরমাবস্থায় খাওয়াইয়া দিবে।

২ নং।	তিসির তৈল	...	।৵০ দেড় পোয়া।
	মিঠা তৈল	...	ঐ
	গোলমরিচ চূর্ণ	...	৲৫ এক কাঁচ্চা।
	চিটা গুড়	...	৲ সিকি কাঁচ্চা।

এক বারের ঔষধ।

২।৩ ঘণ্টা পরে ১ তোলা ভাঙ্গ বাঁটিয়া জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিবে। বারম্বার মদ প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ ও ফেণ, ছাতুর গ্রুয়েল, তিসির মাড়, ডিম্ব ইত্যাদি লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইবে।

শরৎকালীন জাফরাণ।

শরৎকালীন জাফরাণ।—এই গাছ ভয়ানক বিষাক্ত এবং ইহা কর্দ্দমাক্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছ কন্দযুক্ত এবং দেখিতে পদ্মের মত। ইহার ফুলগুলি বেগুণে রং বিশিষ্ট। শরৎ কালে ফুল খাইয়া এবং বসন্তকালে পুষ্প ও ফল খাইয়া গোরু সকল বিষাক্ত হয়। ইহার ইংরাজী নাম Colchicum autumnale।

লক্ষণ।—ধীরে ধীরে লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। মুখ হইতে অধিক পরিমাণে লালা নিঃসৃত হয়; গিলিতে কষ্ট অনুভব করে। ভয়ানক শূলবেদনা, পেট ফাঁপা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, উদরাময়, পরে আমরক্ত। তরল ও দুর্গন্ধযুক্ত মল। ভয়ানক কোঁৎ পাড়িতে থাকে। সমস্ত শরীর শীতল হয়। প্রথমে বহুমূত্র পরে মূত্রাভাব হয়। অশাড়তা রোগের শেষাবস্থায় পরিলক্ষিত হয় এবং অবশেষে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া রোগী প্রাণত্যাগ করে।

চিকিৎসা।—।২॥০ সের গরম জলে ।০ এক ছটাক চার কাথ বা পাঁচন তৈয়ারী করিয়া রোগীকে প্রথমে খাওয়াইবে ও পরে ১ তোলা ট্যানিক এসিড

(Acidum tannicum), ১ আউন্স খদির কিম্বা ১ আউন্স পলাশ গঁদ ।৸৵০ আড়াই পোয়া জলে মিশাইয়া রোগীকে খাওয়াইবে। অত্যন্ত পেট বেদনা থাকিলে ।৵০ আনা আফিং অথবা ১ তোলা ভাঙ্গ খাওইয়া দিবে। জলের পরিবর্ত্তে চাউল ধোয়া জল, ফেণ ও গ্রুয়েল ইত্যাদি খাইতে দিবে। রোগী ভয়ানক নিস্তেজ হইলে দেশী মদ বারম্বার খাইয়াইবে। এই সময়ে লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য রোগীর আহার হইবে।

বিষাক্ত গাছ গাছড়া।

বিষাক্ত গাছ গাছড়া।—ঘাসের অনাটন হইলে কাকমাছি, কাকুরমাছি ও অন্যান্য বিষাক্ত গাছ গাছড়া গোরু সকল খাইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে বিষাক্ত গাছ গাছড়া উদরস্থ হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায় যথা;—নিস্তেজ হয়, অল্প অল্প করিয়া আহার করে; অল্প ক্ষুধা থাকে, জাওর কাটে না; দুধাল গাভীর দুধ কমিয়া যায়; পেট কাঁপিয়া যায়। প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকে; পরে উদরাময় হয়। নিদ্রালুতা, নিকটবর্ত্তী কোন জিনিষ দেখিতে পায় না। চর্ম্মে গুটী বাহির হয়। রোগী অত্যন্ত কৃশ হয় এবং ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। কিন্তু অধিক মাত্রায় গাছ গাছড়া খাইলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে রোগী মারা যায়।

চিকিৎসা।—শরৎকালীন জাফরাণের চিকিৎসা দেখ।

আরগট।

আরগট।—(Ergot of Rye) সরিষা, গোধূম, যব, মকাই ইত্যাদি নানাবিধ শস্য ও নানাজাতীয় ঘাসের খোসার উপর ছাতা পড়িয়া কাল ও স্থূল পিণ্ড জন্মে এবং শস্যের ও ঘাসের এই পিণ্ডকে আরগট (Ergot) কহে। আরগট দেখিতে বক্র ও গোলাকার; ⅙ হইতে ১৷০ দেড় ইঞ্চি লম্বা। ইহার বাহিরের রং বেগুনে ও মধ্যে শাদা ও বেগুনে রংএ চিত্র বিচিত্র। আরগট ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত। অনেক শস্য আরগট দ্বারা আক্রান্ত হয়, কিন্তু সচরাচর সরিষা অধিক আক্রান্ত হয়, এবং এজন্য আরগট বলিলে সরিষার আরগট বুঝায়। সরিষা যখন প্রস্ফুটিত হয়, ঐ সময়ে সরিষা ক্ষেত্রে গেলে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সরিষার খোসার উপর কাল ও স্থূল পিণ্ড আছে। ঐ পিণ্ডটাই সরিষার রোগ। বর্ষাকালে এবং যখন সরিষা প্রস্ফুটিত হয় ঐ সময়ে গোরু সকল রোগাক্রান্ত সরিষা ও অন্যান্য শস্যাদি খাইয়া রোগা হয় এবং অল্প মাত্রায় অনেক দিন আরগট খাইলেও গোরু রোগাক্রান্ত হইতে পারে। ৴১ এক সের পরিমাণ আরগট উদরস্থ হইলে বিষ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

লক্ষণ।—আরগটের লক্ষণ গুলি গো-বসন্ত রোগের পেটের পীড়ার লক্ষণ সমূহের ন্যায়। লালা নিঃসরণ, শূলবেদনা, উদরাময়, মাংস পেশীর আক্ষেপ, সংজ্ঞাহীনতা, পিছনের পায়ের অশাড়তা, গর্ভবতী গাভীর গর্ভস্রাব ইত্যাদি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন চক্ষুমণি দুটী বড় দেখায়, জরায়ু বাহির হইয়া পড়ে এবং সময়ে সময়ে উল্টাইয়া যায়।

লক্ষণ।। রোগ বহুদিন স্থায়ী হইলে ক্ষত, লেজ ও পা পচিয়া যায় এবং পচিয়া পচিয়া পড়িয়া যায়।

চিকিৎসা।—লবণ /১/০ দেড় পোয়া, ইক্ষু গুড় /।০ এক পোয়া, পুরাতন তেঁতুলের শাঁস /০ এক ছটাক ও শুঁঠ চূর্ণ ৲১০ দুই কাঁচ্চা, একত্রে মিশাইয়া /১৷০ দেড় সের কুসুম কুসুম গরম জলে দ্রব করিয়া খাওয়াইবে। ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দিবসে ৩।৪ বার করিয়া একবারে ৲২৷০ অর্দ্ধ তোলা কর্পূর ও ৵০ অর্দ্ধ পোয়া দেশী মদ ; ৲৫ এক কাঁচ্চা লাইকার এমোনিয়া (Liqr. ammonia) অর্দ্ধ কাঁচ্চা কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া (Ammon Carbonas) পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ফেণ, ভাতের মাড় কিম্বা তিসির মাড়ের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে। বেদনা নিবারণের জন্য ।৵০ ছয় আনা আফিং, ১ তোলা ভাঙ্গ কিম্বা অর্দ্ধ তোলা ক্লোরেল হাইড্রাস (Chloral Hydras) পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ফেণের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে। পায়ে তার্পিণ ও সরিষার তৈলের মালিশ লাগাইবে।

মরিচা পড়া ও ছাতা পড়া শস্য খাইয়া রোগ।

মরিচা পড়া ও ছাতা পড় শস্য খাইয়া রোগ।—মরিচা পড়া, ছাতা পড়া এবং পচা শস্য ও ঘাস খাইয়া গোরু সকল রোগগ্রস্ত হয় এবং নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ প্রকাশ করে, যথা ;—অগ্নিমান্দ্য, লালা নিঃসরণ, পেট বেদনা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, রক্তমিশ্রিত মল, উদরাময়, বহুমূত্র, মাথাঘূর্ণন, মাংস পেশীর আক্ষেপ ও কঠোরতা, মুখের অসাড়তা, জ্বর ও শ্বাসকৃচ্ছ।

চিকিৎসা।—প্রায় আরগটের চিকিৎসার ন্যায়। প্রথমে লবণাক্ত বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পরে উত্তেজক ঔষধ, যথা—চার কাথ, কর্পূর, দেশী মদ ইত্যাদি। পেটবেদনায় আফিং কিম্বা ভাঙ্গ এবং উদরাময় ও আমাশায়াবস্থায়ক ঔষধ, যথা—খদির, পলাশ গঁদ, খড়িমাটি ইত্যাদি খাওয়াইবে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীকুঞ্জবিহারী দে। চুঁচুড়া।

বর্দ্ধমান অঞ্চলে তিলের চাষ।

মানবকুল ঘোর অসভ্যাবস্থায় অযত্নসম্ভূত অনায়াস-লভ্য আম মাংস ও বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকিয়া কাল যাপন করিতেন। লজ্জা নিবারণ কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। ক্রমে বল্কল বা বৃক্ষপত্র দ্বারা কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিতেন মাত্র। তৎপরে যতই তাঁহারা সভ্যতা সোপানে আরূঢ় হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের নানাবিষয়ের অভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সেই অভাব পরিপূরণের জন্য তাঁহারা ক্রমশঃ কৃষি শিল্প বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তৈলের অভাব তাঁহাদের বিশেষরূপে অনুভূত হইলে, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে তিল হইতে সেই অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। এজন্য নানাবিধ তৈল, তিলের নির্য্যাস না হইলেও "তৈল" এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত নানাবৃক্ষের বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু এখনও সে গুলি "তৈল" নামেই অভিহিত হয়। সচরাচর যে সকল বৃক্ষের বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে তদ্ব্যতীত আরো অনেক বৃক্ষের বীজের নির্য্যাস হইতেও তৈল

উৎপন্ন হইতে পারে। যদিও তাহাদের সকল নির্য্যাস রন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত না হউক, প্রদীপ জালিবার ও অন্যান্য নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। অদ্য এ বিষয়ের আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তিলের চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

তিল দুই প্রকার, কাট তিল ও কৃষ্ণ তিল। কাট তিল পাট কিলে, কৃষ্ণ তিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কাট তিল সচরাচর তৈল জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ইহা আমাদের এ প্রদেশে পোস্ত দানার ন্যায় ব্যঞ্জনাদিতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ তিল হইতে তিলের উপরকার সূক্ষ্ম খোসাগুলি পৃথক করিতে হয়। তিলের খোসা পৃথক করিবার জন্য মৃণ্ময় যাঁতা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইটে ঘর্ষণ করিয়া তিলের খোসা পৃথক করিয়া কুলা দ্বারা খোসা গুলি ফেলিয়া দেয়। পরে তিল গুলি বাটিয়া পোস্তের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। তিলের তরকারীও পোস্তের ন্যায় সুমিষ্ট। আস্ত তিল কলাই ভাজার ন্যায় ব্যবহৃত হয়। গুড় সহযোগে তিলের এক প্রকার লাড়ু প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেল্ল লাড়ুর ন্যায় তিলের লাড়ু সুমিষ্ট। কৃষ্ণ তিলও সচরাচর তৈল জন্যই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইহা ব্যতীত শ্রাদ্ধাদি দৈব কার্য্যে কৃষ্ণ তিল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয়। তিল তৈল ঔষধাদি নানাকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই দুই প্রকার তিলের চাষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে করিতে হয়। আমাদের এ প্রদেশে কৃষ্ণ তিলের চাষ মোটেই হয় না। কাট তিলের চাষ সময়ে সময়ে প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। আমাদের এ প্রদেশে যে প্রণালীতে কাট তিলের চাষ হইয়া থাকে, আমরা এই প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় জল সেচনের সুবিধা না থাকায়, প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে তিল চাষ হয় না। কাট তিল বপনের মুখ্য সময় ফাল্গুন মাস। চৈত্র মাসের প্রথমে বপন করিলেও চলিতে পারে। ফাল্গুন মাসে তিল বীজ বপন করাই ভাল, কারণ ফাল্গুন মাসে তিল বীজ উপ্ত হইলে, জ্যৈষ্ঠ মাস মধ্যেই তিল পাকিয়া উঠে। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিল পাকায় ফল বেশ পুষ্ট হয়। আষাঢ় মাসে অধিক বৃষ্টি হইয়া জমিতে সামান্যরূপ জল দাঁড়াইলেও গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া যায়, এমন কি একটু বেশী জল দাঁড়াইলে তিল গাছ গুলি মরিয়া যায়। সেই সঙ্গে সঙ্গে গাছের বীজ গুলিও নিস্তেজ হয়, বীজের ভিতরের শাঁসগুলি নিতান্ত অপুষ্ট অবস্থাতেই ফল পাকিয়া যায় অথবা ফলগুলি শুষ্ক হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাস মধ্যে তিল না পাকিলে, আষাঢ় মাসে পাকিলে অধিক বৃষ্টি জন্য প্রায়ই অধিকাংশ তিল বীজ ভুয়া (শাঁসশূন্য) হয়। গত বৎসর এ প্রদেশের অনেক তীলই এইরূপে ভুয়া হইয়া গিয়াছিল। তিল অনেক সময়েই ভুয়া হইয়া থাকে। একারণ এ প্রদেশে কৃষকদের মধ্যে "হয় তিল, নয় তিল, ধোকড়ায় ভরিলে তিল" এই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ এই যে, তিল গাছ

প্রচুর পরিমাণে জন্মিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিল বীজ গুলি শুষ্ক করিয়া থলিয়ায় পূর্ণ করা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তিলের সম্পূর্ণ আশা করা যায় না।

তিল পক্ক হইলে গাছগুলিও প্রায় মৃতবৎ হয়। সেই সময়ে গাছ উপড়াইয়া আনিয়া গোড়ার মূলগুলি কাটিয়া বেশ গুছাইয়া এক স্থানে গাদা দিতে হয়। গাদার উপরিভাগে বিচালী বিছাইয়া তাহার উপর গাদার তারতম্যানুসারে ২।৪ কলসী জল ছড়াইয়া দিতে হয়। ২।১ দিন অন্তর গাদার উপর ২।১ কলসী জল ছড়াইয়া দিয়া ৫।৬ দিন পরে যখন গাছের পাতা গুলি ও শুঁটীর খোলা গুলি পচিয়া গিয়াছে, তখন গাদা ভাঙ্গিয়া গাছগুলি ছড়াইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দেওয়া হইয়া থাকে। শুষ্ক হইলেই তিলগুলি আপনা হইতে ঝরিয়া যায়। যদি সামান্য ঝরিতে বাকী থাকে, তবে কোন ভারি বস্তু দ্বারা আঘাত করিলেই ঝরিয়া যাইবে। গাদা ভাঙ্গিবার সময় বাদল হইয়া বৃষ্টি হইতে থাকিলে, তিল বীজ পচিয়া ভুয়া হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। গাদা ভাঙ্গিবার সময় যদি বাদল হইয়া বৃষ্টি হইতে থাকে, তবে আচ্ছাদিত স্থানে ছড়াইয়া রাখিতে হয়; যে স্থানে রাখা হইবে, সে স্থানে যেন অবাধে বায়ু সঞ্চালিত হয়। তিল পক্ক হইলে গাদা দিয়া গাছগুলি সামান্যরূপ না পচাইলে তিল ভাল ঝরে না।

তিল গাছগুলি সাধারণতঃ দেড় হাত দুই হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। গাছগুলি পাতলা হইলে বহু শাখাপ্রশাখা বিস্তারিত হইয়া থাকে। তিলের শুঁটি গুলি এক সময়ে ধরে না এবং পাকে না। তিল গাছগুলি অর্দ্ধহস্ত বা পৌনে এক হাত উচ্চ হইলেই ফুল ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। গাছ গুলির শাখাপ্রশাখা যেমন উর্দ্ধে ও চতুর্দ্দিকে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তেমনি ফুল ফলও ধরিতে থাকে। গাছের গোড়ার শুঁটীগুলি অগ্রে পাকিয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, গোড়ার শুঁটীগুলি পাকিয়া তাহা হইতে তিল বীজ ঝরিয়া পড়িতেছে। গাছের উপরিভাগে তখনও শুঁটীগুলি কাঁচা থাকে, এমন কি অনেক সময়ে তখনও গাছের অগ্রভাগে নূতন ফুল ফল ধরিতেছে। এরূপ অবস্থায় গাছের অগ্রভাগের ফলের প্রত্যাশা না করিয়া গাছগুলি উপড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। কারণ গোড়ার ফল গুলি প্রায়ই ভুয়া (শস্যহীন) হয় না। ডগের ফলগুলি প্রায়ই ভুয়া হইয়া থাকে। ডগের ফল গুলির প্রত্যাশা করিতে গেলে গোড়ার ফলগুলি হইতে তিল বীজ ঝরিয়া ভূমিতে পতিত হইয়া নষ্ট হয়।

ফাল্গুন মাসে তিল বীজ উপ্ত হইলে প্রায়ই চৈত্র মাসের শেষে ফুল ধরিতে আরম্ভ হয়। বৈশাখ মাস হইতে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। দেড় মাস দুই মাস কাল ফুল ফল ধরিতে ধরিতে উর্দ্ধদিকে ও চারিদিকে বাড়িতে থাকে। বৈশাখ মাসে যখন তিল গাছগুলিতে শ্বেতবর্ণের ফুল ধরিতে থাকে, তখন এক অনির্ব্বচনীয় শোভায় ক্ষেত্রগুলি সুশোভিত হয়। প্রকৃতি সেই সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া ভাবুকমাত্রেই মুগ্ধ হন। তিল ফুলগুলির এক দিক নাসিকার অগ্রভাগের ন্যায় উচ্চ হইয়া থাকে, একারণ প্রাচীন কবিগণ "তিল ফুল জিনি নাসা" প্রভৃতি কবিতা দ্বারা তিল ফুলের সহিত নাসিকার তুলনা করিয়া গিয়াছেন।

কৃষক মাত্রেরই তিল ও সর্ষপের চাষ থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তিল চাষ থাকিলে তৈল জন্য আর অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। আমাদের এখানকার কৃষকেরা তিল পাইলে, সেই তিল কলুকে দিয়া তৈল লইয়া থাকে। পুষ্ট সুপক্ক এক মণ তিলে ১৩।১৪ সের পর্য্যন্ত তৈল হইয়া থাকে।

সচরাচর এক মণ তিল দিয়া কলুদের নিকট হইতে ।২ বার সের তৈল লইয়া থাকে। খইল ও ২।১ সের তৈল কলুর লাভ থাকে। কেহ কেহ কলুকে ঘানির ভাড়া দিয়া সমস্ত তৈল ও খৈল লইয়া থাকে। তিলের খইল সর্ষপের খইলের মত গোরুর প্রিয় নহে। সর্ষপের খইল গোরুতে যেরূপ আগ্রহের সহিত খায়, তিলের খইল সেরূপ খায় না। কলুরা কৃষকের নিকট তিল লইয়া, তিলের সহিত সর্ষপ মিশ্রিত করিয়া তৈল বাহির করিয়া থাকে। সরিষার তৈল খইলের ন্যায় তিলের তৈল ও খইলের ঝাঁজ থাকে না।

এ প্রদেশের যে জমিতে তিল চাষ হইয়া থাকে, সে জমিতে প্রথমতঃ আউস বা কেলেস ধান, তৎপরে সরিষা মসুর দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার পর ফাল্গুন মাসে তিল দেওয়া হয়। এ জমিগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চ। এই সকল জমিতে আউস বা কেলেস ধান দিবার পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণ সার দেওয়া হইয়া থাকে।. তৎপরে সরিষা, মসুর বা তিল চাষের পূর্ব্বে আর সার দেওয়া হয় না। তিল গাছের শিকড় নিম্নদিকে ও চারি পার্শ্বে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, ভূমিতে উদ্ভিদের যে পোষণোপযোগী পদার্থ থাকে, তাহার প্রায় সমস্তই তুলিয়া লয়; একারণ সে জমিতে প্রচুর সার না দিলে, আর অন্য কোনরূপ ফসল ভালরূপ জন্মে না। সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই তিল চাষ হইতে পারে।

আবাদ প্রণালী;—মাঘ মাসের শেষে অথবা ফাল্গুন মাসের প্রথমে বৃষ্টি হইলে, ভূমিতে ৩।৪টা খুব গভীর করিয়া চাষ দিতে হয়। তিলের জমিতে গভীর চাষ দেওয়া আবশ্যক, কারণ তিলের মূল বহুদূর পর্য্যন্ত নিম্নদিকে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। যদি মাঘ মাসের শেষে অথবা ফাল্গুন মাসের প্রথমে বৃষ্টি না হয়, তবে জমিতে জল সেচন করিয়া চাষ দেওয়া আবশ্যক। ফাল্গুন মাসের শেষে জল হইলেও তাহার পর চৈত্র মাসের প্রথমে তিল বীজ বপন করিলেও চলিতে পারে। যে জমিতে জল সেচনের সুবিধা আছে, সেই জমিতেই তিল চাষ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের এখানে অনেক জমিতেই বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া তিল চাষ করিয়া থাকে। আবশ্যক মত বৃষ্টি না হওয়ায় সকল বৎসর তিল ভাল জন্মে না। বৃষ্টির জলে ভূমি কর্ষণ করিয়া তিল বীজ বপন করা হইল, তাহার পর আর মোটেই বৃষ্টি হইল না; আর্দ্র ভূমিতে বীজ বপন জন্য কতক চারা বাহির হইল, কতক চারা বাহির হইল না। এরূপ স্থলে তিল গাছ ভাল জন্মে না। তিলের চারা বাহির হইলে সে চারা সহজে নষ্ট হয় না। জল না পাইলেও নিস্তেজ অবস্থায় জীবিত থাকে বটে, কিন্তু মোটেই প্রায় বর্দ্ধিত হয় না। বৈশাখ মাসে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই নিস্তেজ চারা বৈশাখ মাসে বৃষ্টির জল পাইয়া তেজস্কর হইয়া, কিয়ৎপরিমাণে ফল প্রসব করে মাত্র। সে ফলও নাবি হওয়া প্রযুক্ত অনেক তিল ভুয়া হইয়া থাকে। ফাল্গুন মাসেই তিল বীজ বপনের মুখ্য সময় এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিল বীজ একটু সরস মৃত্তিকাতেই বপন করা উচিত। তাহা হইলে অনেক বীজই অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হইয়া থাকে। তিল বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় না। একারণ বীজ বপন করিবার ২।৩ দিন পূর্ব্বে বীজগুলি জলে ভিজাইয়া রাখা আবশ্যক। তাহা হইলে সরস মৃত্তিকায় এই ভিজা বীজ বপন করিলে সহজেই অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হইয়া থাকে। বপন করিবার পূর্ব্বে

ভিজা বীজগুলি কোন সছিদ্র পাত্রে রাখিয়া জল ছাঁকিয়া, ফেলিতে হয়। তৎপরে বীজ গুলিতে ঘুঁটের ছাই গুড়াইয়া মাখাইতে হয়। অনেকগুলি করিয়া ভিজা বীজ একত্র সংলগ্ন হইয়া থাকে, ঘুঁটের ছাই মাখাইলে বীজ গুলি পৃথক পৃথক হইয়া যায়। নচেৎ ভিজা বীজ বপন করিলে এক এক স্থানে বহুসংখ্যক বীজ পতিত হইয়া ঘন চারা বাহির হইয়া থাকে, কোন কোন স্থানে ফাঁক ফাঁক ও কোন স্থানে বা মোটেই চারা বাহির হয় না। এক বিঘা জমিতে তিন পোয়া বীজ বপন করিলেই চলিতে পারে। বীজ বপনের পুর্ব্বে একবার মই দিয়া পুনরায় চাষ দিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজ বপনের পর পুনরায় মই দেওয়া আবশ্যক। মই দিলে জমির মৃত্তিকা চূর্ণ ও সমতল হয় এবং জমিতে যে ঘাস আগাছা থাকে, তাহা উপড়াইয়া যায়। তিল বীজ ৮।১০ দিনের কমে অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয় না। তিল বীজ বপনের ৫।৭ দিন মধ্যে বৃষ্টি হইলে শীঘ্রই (১০।১২ দিনের মধ্যে) চারা বাহির হয়। বৃষ্টি না হইলেও ১০।১২ দিন মধ্যে সরস মৃত্তিকায় তিল বীজ বপন জন্য কতক চারা বাহির হইয়া থাকে। তিল বীজ বপন করিবার পর ১৫।২০ দিন বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি ঐ সময় বৃষ্টি না হয়, তবে একবার জল সেচন করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

জল সেচন করিয়া চারা বাহির হওয়া অপেক্ষা বৃষ্টির জলে চারা বাহির হইলে, সে চারা বেশ সবল হয়। তাহার কারণ জল সেচন করিয়া জমির সকল মৃত্তিকা জলমগ্ন হইয়া সেই জল শুষ্ক হইলে জমির মাটি বসিয়া যায় এবং কঠিন হয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে প্রায়ই অধিক বৃষ্টি হয় না, যদি কখন হয়, তাহা সামান্য বা পরিমিত মত। সুতরাং জমির মাটি বসিয়া যাওয়া বা কঠিন হওয়া দোষ ঘটে না।

বৃষ্টির জলে বা সেচন করা জলে সমস্ত চারা গুলি বাহির হইয়া গেলে কোদালী দ্বারা ঘাস আগাছা প্রভৃতি নিড়াইয়া দিতে হয় এবং জমির মাটি বসিয়া গেলে চারার গোড়ার নিকট মৃত্তিকা গুলি কোদালীর কোন দ্বারা সামান্য রূপ খনন করিয়া দিতে হয়। যদি কোন স্থানে খুব ঘন চারা বাহির হয়, তবে আবশ্যক মত সবল চারা গুলি রাখিয়া অবশিষ্ট চারা গুলি নষ্ট করিয়া দিতে হয়। ঘন চারা হইলে চারা গুলি সবল বা বহু শাখা বিশিষ্ট হয় না। সরু সরু চারা গুলি অতি ক্ষীণ অবস্থায় উর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়। সেরূপ এক শত চারায় যে ফল প্রসব করে, একটী সবল ও বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট গাছে তদপেক্ষা অধিক ফল প্রসব করে। সেরূপ তেজস্কর বৃক্ষের ফলের বীজ বেশ পুষ্ট ও পক্ব হয়। এরূপ বৃক্ষের তিল প্রায়ই ভুয়া হয় না। ক্ষীণ দুর্ব্বল গাছের বীজ অপুষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং তাহার বীজ ভুয়া হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব তিলের চারা কখনই ঘন রাখা উচিত নহে। শুদ্ধ তিল কেন কোন গাছের চারাই ঘন রাখা উচিত নহে। একটী চারার স্থানে ১০।১৫ চারা থাকিলে, চারা গুলি খাদ্যাভাব বশতঃ ক্ষীণ দুর্ব্বল হয়। রৌদ্র ও আলোক বৃক্ষ মাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ। ঘন হইলে চারা গুলি রৌদ্র ও আলোক পাইবার জন্য ক্ষীণ অবস্থাতেই উর্দ্ধদিকে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

একবার নিড়াইয়া দিবার পর ১৫।২০ দিন বৃষ্টি না হইলে আর একবার জল সেচন করিলে ভাল হয়। জল সেচনের পর জমির মৃত্তিকা খননোপযোগী হইলে আর একবার ঘাস ও আগাছা

জন্মিলে কোদালীদ্বারা নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। ইহার পর তিলের আর কোনরূপ পাইট করিবার প্রয়োজন হয় না। ইহার পর বৈশাখ মাসে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়া থাকে, তজ্জন্য আর জল সেচনের আবশ্যক হয় না। বৃষ্টি না হইলেও জল সেচনের তত আবশ্যক থাকে না, কারণ বৈশাখ মাসে চারা গুলি অনেক বড় হয় এবং তাহাদের মূল গুলিও অনেক নিম্নে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। বৃষ্টি না হইলেও ভূমির নিম্নের মৃত্তিকা সতত সরস থাকে। তিল গাছগুলি সেই সরস মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া আপনাদের পুষ্টি সাধন করে। জল সেচনের সুবিধা থাকিলে বৈশাখ মাসে অনাবৃষ্টি হইলে, জল সেচনে বিশেষ ইষ্ট হইয়া থাকে।

তিল ভাল জন্মিলে প্রতি বিঘায় ৬/ মণ হইতে ৮/ মণ পর্য্যন্ত তিল হইতে পারে। এক বিঘা জমির তিলে দুই মণ আড়াই মণ পর্য্যন্ত তৈল হইয়া থাকে। ইহা কৃষকের পক্ষে সামান্য লাভজনক ফসল নহে। তিল চাষের প্রতি মনোযোগী হওয়া কৃষক মাত্রেরই অতীব কর্ত্তব্য। তিল চাষ থাকিলে তৈলের জন্য আর অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। অধিক চাষ থাকিলে তাহা বিক্রয় করিয়াও প্রচুর লাভ করিতে পারা যায়। সন ১৩১৪ সাল। তারিখ ১৫ই চৈত্র। শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস.

শিরীষ।

শিরীষ অনেকেই চক্ষে দেখিয়াছেন। গলাইলেই ইহা আঠার ন্যায় একটী চট্‌চটে পদার্থ হয়। দুই খণ্ড কাষ্ঠকে একত্র জুড়িবার জন্য সচরাচর ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু শিরীষের অন্য প্রকারও ব্যবহার আছে। মুদ্রাযন্ত্রে কালী দিবার জন্য যে রোলার থাকে, তাহা এই শিরীষের সাহায্যেই প্রস্তুত হয়।

শিরীষের বর্ণ দেখিতে ধূসর-পীতাভ। ইহা ঈষৎ স্বচ্ছ, কঠিন ও চিক্কণ। ইহার ভঙ্গপ্রবণতাও আছে। বাতাস লাগিয়া ইহা নরম হয় না; শীতল জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলেও ইহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু উত্তপ্ত হইলে গলিয়া যায়, ও শীতল হইলে চট্‌চটে পদার্থে পরিণত হয়; তখন ইহা দেখিতে ঠিক মণ্ডের মত হয়।

এই শিরীষ কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহার উল্লেখ করিব।

বৃষ-চর্ম্মের ছাঁট বা টুক্‌রা হইতেই উৎকৃষ্ট শিরীষ প্রস্তুত হয়। বৃষ-চর্ম্ম যত পুরাতন হয়, শিরীষও তত উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু বৃষ-চর্ম্ম ব্যতীত মেষ, মহিষ, গাভী, গোবৎস, ছাগ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির চর্ম্ম, চর্ম্ম কস্‌ করিবার কারখানাতে যে সকল ছাঁট পড়িয়া থাকে, তৎসমুদায়, পুরাতন চর্ম্মময় দস্তানা, এবং পশ্বাদির নাড়ী ভুঁড়ি প্রভৃতি জান্তব পদার্থ হইতেও শিরীষ প্রস্তুত হয়। কিন্তু কস্‌ করা চাম্‌ড়া হইতে শিরীষ প্রস্তুত হয় না। চর্ম্মের মধ্যে একটী চট্‌চটে পদার্থ থাকে, তাহা হইতেই শিরীষের উৎপত্তি। প্রথমতঃ চর্ম্ম খণ্ডগুলিকে 'মিল্ক অফ লাইমে' ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তদ্দ্বারা চর্ম্মের সহিত সংলগ্ন মেদ, মাংস, শোণিত নষ্ট হয়। তৎপরে, খণ্ডগুলিকে জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া বাতাসে বিশুষ্ক করিয়া লইতে হয়। বিশুষ্ক হইলে, জালে সেগুলিকে সিদ্ধ করিতে হয়।

সিদ্ধ হইতে হইতে, চর্ম্মখণ্ড সমূহ হইতে একটী চট্‌চটে, পদার্থ নিঃসৃত হয়। এই পদার্থটিই শিরীষ।

এই পদার্থটিকে বাহির করিয়া লইবার জন্ত, ডেগ্‌চীর নিম্নভাগে ছিদ্রময় একটি আবরণ থাকে। ডেগ্‌চীর তলদেশ এরূপ কৌশলে গঠিত যে, ইচ্ছা-মত তাহা সরাইয়া লইতে পারা যায়। তখন সেই ছিদ্রময় আবরণের মধ্য দিয়া ডেগ্‌চীর মধ্যগত তরল পদার্থটি আপনাপনিই ঝরিয়া পড়ে। তৎ-পরে এই তরল পদার্থটিকে নলের সাহায্যে পাত্রা-ন্তরে লইয়া যাওয়া হয়। এই পাত্রগুলি কাষ্ঠময়; কিন্তু অভ্যন্তরভাগ সীসকের পাত দিয়া মোড়া। তরল পদার্থটি পাত্রে ঈষৎ শীতল হইবামাত্র জমিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহা জমিয়া কঠিন হইবার পুর্ব্বেই, কাষ্ঠময় বা ধাতুময় ছাঁচের মধ্যে নীত হয়,। ছাঁচের মধ্যে তাহা জমিয়া কঠিন হইলে, তাহাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হয়। এইরূপে শিরীষ প্রস্তুত হয়।

আমাদের হিন্দু ও উচ্চ জাতীয় পাঠকবর্গ হয়ত বলিবেন যে, শিরীষ যখন এইরূপ নিকৃষ্ট দ্রব্য হইতে প্রস্তুত হয়, তখন তৎসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার আবশুকতা কি? ভদ্রলোকে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, এইরূপ কার্য্যেরই কথা লিখিত হওয়া উচিত। এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের উক্তি যে অনেক পরিমাণে সত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে যে কারণে আমরা সর্ব্ববিধ শিল্পের আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ আমাদের বিশ্বাস এই যে, কি উচ্চজাতীয়, আর কি নিম্নজাতীয় সকল ব্যক্তিরই সকল বিষয়ের জ্ঞান থাকা উচিত। কোন্ দ্রব্য কোন্ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা জানিতে সকলেরই কৌতুহল হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক আছেন। শিরীষ প্রস্তুত করিতে আপত্তি নাই, এরূপ পাঠকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। তাঁহারা এই বিষয় পাঠ করিয়া, সম্ভবতঃ শিরীষ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সচেষ্টও হইতে পারেন। আমাদের অভিপ্রায় এই যে, শিল্পকার্য্যে যে যে দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদয় আমাদের দেশেই উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাঁহার দ্বারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়, তিনি সেই কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন। শিরীষের ব্যবহার আমাদের দেশে নিতান্ত অল্প নহে। শিরীষ না থাকিলে, সূত্রধরেরা কাষ্ঠময় অনেক দ্রব্যের গঠন করিতে পারিত না। এতদ্ব্যতীত সকল মুদ্রা-যন্ত্রেই প্রভূত পরিমাণ শিরীষের প্রয়োজন হয়। যদি এদেশেই শিরীষ প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে তজ্জন্য ভিন্ন দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। এইরূপ না করিলে, আমরা কদাপি শৈল্পিক স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইব না। কোনও ব্যক্তি শিরীষ প্রস্তুত করিয়া কিম্বা কোনও অত্যাবশুক দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া অনায়াসে তাহা কোনও শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিতে পারেন। তদ্দ্বারা সেই দ্রব্যের শীঘ্র প্রচার হইয়া যাইবে।



কৃষক। আশ্বিন, ১৩১৫।

বৈদ্যুতিক চাষ।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির কতকগুলি রহস্য রহিয়াছে। সকলগুলি এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। যতই জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ততই আমরা উদ্ভিদ্ জীবনের গূঢ় রহস্য সমূহের মীমাংসায় অগ্রসর হইতেছি। বৈদ্যুতিক প্রবাহের সহিত উদ্ভিদ্ জীবনের সম্বন্ধ এই সমস্ত রহস্যের অন্যতম।

উদ্ভিদের শরীরতত্ব আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক। উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যের মধ্যে কার্ব্বন, নাইট্রোজেন অন্যতম। কার্ব্বন বায়ুমণ্ডলে কার্ব্বন ডাইঅকসাইডরূপে বিদ্যমান। উদ্ভিদ্ পত্রহরিতের সাহায্যে উহা শোষণ করিয়া লয়। পক্ষান্তরে মৃত্তিকায় নাইট্রেট্‌রূপে অবস্থিত নাইট্রোজেন উদ্ভিদ্ মূল দ্বারা শোষিত হয়। নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার ভৌমিক লবণ ও জল উদ্ভিদের দেহ পরিপুষ্ট করে। পত্রহরিত কেবল সূর্য্যালোকের সাহায্যেই বায়ুমণ্ডলস্থিত কার্ব্বন শোষণ করিতে পারে। সুতরাং সূর্য্যালোক উদ্ভিদের সমস্ত দৈহিক কার্য্যের মূল। আবার সূর্য্যালোকে তাড়িত প্রবাহ বিদ্যমান রহিয়াছে। সূর্য্যের আলোকে যেরূপ কার্য্য হয় বৈদ্যুতিক আলোকেও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। এস্থলে আরও বলা উচিত যে শৈত্য অভাবে কার্ব্বন শোষণ কার্য্য চলিতে পারে না। বৃক্ষ পত্রস্থিত ছিদ্র সমূহ শৈত্য অভাবে সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং তদবস্থায় সূর্য্যালোকও শৈত্য নিহিত তাড়িত শক্তি উহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। বৃক্ষের অবয়ব কোটি কোটি কোষের সমষ্টি। এই সমস্ত কোষের প্রাচীর ঝিল্লীবৎ পদার্থ দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট বাষ্প ঝিল্লীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে, কিন্তু শৈত্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন শৈত্যের আরও উপকারিতা এই যে জলের উপাদানের সাহায্যে পত্র হরিৎযুক্ত কোষে কার্ব্বো-হাইড্রেট নামক এক শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত হয়; যেমন শ্বেত সার। সূর্য্য কিরণ নিহিত বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ অসীম। বৃষ্টিপাতের সহিত প্রত্যেক জল কনা বায়ুমণ্ডল হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করিয়া আনে। ভূপৃষ্ঠে পতিত বারিবিন্দুর কতক তাড়িত শক্তি পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকা দ্বারা শোষিত হয়। অবশিষ্টাংশ ভূগর্ভস্থিত জলস্রোতে সঞ্চিত থাকে। এই বৈদ্যুতিক সঞ্চয়াগার হইতে সঞ্চিত বৈদ্যুতিক শক্তি আবশ্যক মত ভূপৃষ্ঠে প্রেরিত হয়। মৃত্তিকাভ্যন্তরে যেমন বৈদ্যুতিক সঞ্চয়াগার আছে, বায়ুমণ্ডলস্থিত জলীয় বাষ্পেও তেমনিই সঞ্চয়াগার আছে। বস্তুতঃ যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি সূর্য্য বিকীরণ করিয়া থাকে, তাহা আবশ্যকীয় পরিমাণ অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক। যে সময় সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন থাকে সে সময়ে আমরা এই সঞ্চিত বৈদ্যুতিক শক্তি হইতেই শক্তি পাইয়া থাকি। অনাদি কাল হইতে সঞ্চিত শক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাথুরে কয়লা। এক সময়ে পৃথিবীতে যে দিগন্তব্যাপী অরণ্য ছিল তাহা নিম্মিত

হইতে যে অসীম শক্তি ব্যয় হইয়াছিল তাহা এক্ষণে পাথুরে কয়লায় বিদ্যমান। বর্ত্তমান সময়ে সেই কয়লার সাহায্যে আমরা নানারূপ কলকব্জা চালাইয়া সঞ্চিত শক্তির সদ্ব্যবহার করিতেছি।

আজ পর্য্যন্ত দুই শ্রেণীর পণ্ডিতমণ্ডলী বৈদ্যুতিক চাষ প্রসারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। প্রথম দল ইলেক্ট্রোষ্টাটিক প্রবাহের ফলাফল অধ্যয়নে ব্যাপৃত আছেন ও দ্বিতীয় দল বৈদ্যুতিক আলোক কিরণের ফলাফল অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। যতদুর জানিতে পারা যায় তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম বৈদ্যুতিক চাষের চেষ্টা হয়। এই সময়ে আবি নোলে' নামক জনৈক ফরাসী রেশম সূত্র দ্বারা লৌহপাত্র ঝুলাইয়া তাহাতে কতিপয় গাছ রাখেন। একটি পুরাতন ধরণের বৈদ্যুতিক কল হইতে উক্ত পাত্রে তাড়িত সঞ্চার করা হয়। তাহার পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই স্বদেশবাসী আবি বারথেলে'। বৈদ্যুতিক চাষের চেষ্টা করেন। উভয়ের চেষ্টাই কিয়ৎ পরিমাণে ফলবতী হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে রুসীয় পণ্ডিত স্পেনস্ক্ষেত্রের দুই প্রান্তে দুইটি তামা ও দস্তার পাত বসাইয়া তাড়িৎ প্রবাহ সঞ্চার করেন। এই প্রথা মাসাচুসেটস্ দেশে পরীক্ষিত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে লেটুস যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জগদ্বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত বারথেলোট্ মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে হইতে বৈদ্যুতিক চাষ সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা করেন। তিনি ইলেক্ট্রোষ্টাটিক প্রবাহ সঞ্চার দ্বারা যে গাজর উৎপাদন করেন তাহা ফ্রান্স দেশে সুপরিচিত। কিন্তু ইলেক্ট্রোষ্টাটিক প্রবাহ ক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি লেমষ্ট্রোম্। তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। অপরাপর ফসলের মধ্যে যব ও গম তাঁহার দ্বারা পরীক্ষিত হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে অবৈদ্যুতিক ফসল হইতে বৈদ্যুতিক ফসল শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহা প্রতীয়মান হয় যে বৈদ্যুতিক শক্তি যে প্রকারের হউক না কেন কিম্বা রাত্রি অথবা দিন যে সময়েই প্রয়োগ করা হউক না কেন, ফসলের ওজন উভয় প্রথাতেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পরীক্ষায় আরও জানিতে পারা যায় যে মৃত্তিকার যে সমস্ত জীবাণুর সাহায্যে নাইট্রোজন নাইট্রেটে পরিণত হয় বৈদ্যুতিক প্রবাহে তাহারা আরও শক্তিশালী হয়। এতভিন্ন উদ্ভিদ্-রসের প্রবাহও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

লেমষ্ট্রোমের পর অন্যান্য পণ্ডিত সমূহ তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছেন। এই সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে মিঃ নিউম্যানের পরীক্ষাবলীর দ্বারা কৃষি-কার্য্যের উপকার হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সরল ভাষায় নিউম্যানের প্রণালীর এইরূপে বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। নিউম্যান উপর হইতে প্রবাহ সঞ্চার করেন। ২ অশ্বশক্তি পরিমিত কল দ্বারা তাড়িৎ প্রবাহ উৎপাদিত হয়। একটী দণ্ডের সাহায্যে উপরিস্থিত তাঁরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত এবং অন্য দণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়। ইনসুলেটার যুক্ত পাঁচ গজ লম্বা দণ্ড ১০২ গজ অন্তর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্থাপিত হয়। ইহাদের সাহায্যে প্রবাহ ১২ গজ অন্তর স্থাপিত তারের ভিতর দিয়া পারাপার হয়। প্রবাহ এত জোরে পরিচালিত হয় যে, প্রত্যেক জোড়ের স্থানেই তাড়িৎ বিকীর্ণ হয়। গমের চাষে এই প্রথা প্রয়োগ করিয়া দেখা যায় যে, শতকরা ২০ হইতে ৩৯ ভাগ অধিক শস্য উৎপাদিত হয় এবং বৈদ্যুতিক ফসলের উৎকর্ষতা অবৈদ্যুতিক ফসল অপেক্ষা অধিক। সিমের চাষেও ঐরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

আমরা এতক্ষণ ইলেক্ট্রোষ্টাটিক প্রবাহের আলোচনা করিলাম। এক্ষণে ভল্টা বৈদ্যুতিক আলো-

কের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ফারাদের পর অনেকেই ফারাদের আবিষ্কৃত কলের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সিনেম্সই সর্ব্বপ্রধান। তিনিই প্রথমে ফল ও ফুলের চাষের জন্য ব্যবসার হিসাবে বৈদ্যুতিক আলোক প্রয়োগ করেন। তিনি কাচের ঘরে মটর, আঙ্গুর, ফুটি, কলা প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া দেখান যে বিদ্যুতের সাহায্যে সুস্বাদু ও বৃহদাকার ফল জন্মান আদৌ অসম্ভব নহে। কেহ কেহ বলেন, নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত বৈদ্যুতিক আলোক-রশ্মি বড়ই প্রখর এবং ইহাতে গাছ জ্বলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু কর্ণেল পরীক্ষাক্ষেত্রের বিবরণীতে দেখা যায় যে, বৈদ্যুতিক আলোকের প্রবাহে উদ্ভিদ্ শীঘ্র শীঘ্র রস পরিপাক করিতে পারে ও শীঘ্র পরিপুষ্ট হয়। ফসলও সত্বরে পাকিয়া থাকে। উত্তেজনা দ্বারা যেখানে অল্প দিবসের মধ্যে ফসল জন্মান আবশুক সেরূপ স্থলে বৈদ্যুতিক আলোক প্রয়োগ করিয়া লাভবান হইতে পারা যায়। শীত প্রধান দেশে সময়ে সময়ে সূর্য্যালোক পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা সূর্য্যালোকের অভাব পরিপূরণ করিতে পারা যায়। এ বিষয়ে অনেক গবেষনার পর ১৯০৫ সালে থোয়েট প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইয়র্ক সায়ারে এই প্রণালী দ্বারা কাচগৃহবদ্ধ উদ্ভিদ্ সমূহ ভ্রাম্যমান তাড়িৎ আলোক দ্বারা আলোকিত হয়। তাড়িৎ আলোক সাক্ষাৎভাবে গাছের উপর না পড়িয়া দ্বিপ্রাচীর কাচের পর্দার ভিতর দিয়া পতিত হয়। এই প্রথা এখনও নূতন। অধিক দিবস ব্যাপী পরীক্ষা না হইলে ইহার ফলাফল সঠিক বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আজকাল সভ্যজগতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে ফসলোৎপাদনের যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে অচিরেই যে চঞ্চলা চপলা স্থির ভাবে কৃষিকার্য্যের উন্নতিতে মনঃ সংযোগ করিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

বীজধান রোপণ প্রণালী।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের পুষা এবং অন্যান্য কৃষি-ক্ষেত্রে পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বীজ ধান গাছ (যাহাকে সাধারণতঃ সকলেই ধানের বীজ বলিয়াই জানে এবং উল্লেখ করে) এক একটী বা দুইটী হিসাবে রোপণ করিলেই ফসল ভাল হয়। কুচবেহারে শ্রীযুক্ত জি, নারায়ণ এই বিষয়ের পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনিও প্রতি গর্ত্তে একটী অথবা দুইটী বীজ রোপণ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, এদেশের চাষিরা বড়ই পুরাতনের পক্ষ-পাতি, নূতন কিছুই করিতে চাহে না, পুরাতন প্রথানুযায়ী বীজ নষ্ট করিবে, তবু নূতন নিয়মে রোপণ করিয়া ⅔ ভাগ বীজ ধান বাঁচাইবে না! "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রে এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা মানি গভর্ণমেণ্টের পরীক্ষা সত্য এবং কুমারের সিদ্ধান্ত সত্যও হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের কথায় আমরা আমাদের চাষীদিগকে নিতান্ত অজ্ঞ এবং ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে পারি না। বিভিন্ন স্থানে বৎসরের জল হাওয়া অনুযায়ী তাহারা বীজ রোপণের ভিন্ন ভিন্ন প্রথা অবলম্বন করে। বর্দ্ধমান জেলায় এক প্রথায় এবং বরিশাল বাখরগঞ্জে অন্য প্রথায় ধান রোপণ করা হয়। নদীর ধারে পলিপড়া জমিতে এক প্রকার এবং দূরবর্ত্তী দেবমাতৃক স্থানে অন্য

প্রকার প্রথা অবলম্বিত হইতে পারে। জমির সারবত্তা ও সময়ের গতি বুঝিয়া চাষিরা দুইটী বা তেতোধিক বীজ বসায় বা দুই সারি ধানের ব্যবধান কমায় বা বাড়ায়। কারণ কোন জমিতে একটী বীজ হইতে ১৬।১৮।২০টী তেউড় বাহির হয়. আবার কোন জমিতে ৪টী বা ছয়টী বীজ রোপণ করিয়াও ১২।১৪টীর অধিক তেউড় বাহির হইল না। সুবৃষ্টি হইলে শ্রাবণ মাসের প্রথমে যদি বীজ বসাইতে পারে, তবে একটী অথবা দুইটী বীজ ধান হইতেই দুই মুষ্টিতে ধরা যায় না এমন বড় গোছ হয়, কিন্তু অনাবৃষ্টি হইলে বা সময়ে ধান্য রোপণ না হইলে গোছা গোছা বীজ রোপণ করিয়াও কোন ফল হয় না। সেই জন্য চাষিরা যত সময় অতীত করিয়া ধান রোপণ করে, ততই প্রতি গর্ত্তে চারি, ছয় বা ততোধিক বীজ বসায়, কারণ অসময়ে অধিক তেউড় বাহির হইবে না, তাহারা জানে, তখন যত অধিক বীজ রোপণ করা যায়, ততই মঙ্গল।

প্রত্যেক ভাল চাষি এক মাদায় দুইটী আলু, কুমড়া, লাউ বীজ বসাইয়া থাকে। একটী বসাইলে যে ফসল হইত, দুইটী বা তিনটী বীজ হইতে ফসল কখন দ্বিগুণ ত্রিগুণ হয় না। তবে তাহারা এইরূপে বীজ নষ্ট করে কেন? একটী বীজ বসাইয়া মিতব্যয়ী হইতে গেলে বীজটী কোন কারণে নষ্ট হইলে ভবিষ্যতে লাভের পরিবর্ত্তে লোকসান হইবে, ইহা তাহারা বিশেষরূপ জানে। নষ্ট হইবার কারণও সর্ব্বদা বিদ্যমান—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও পোকার উপদ্রব ত লাগিয়াই আছে। শুধু এদেশে কেন অন্য দেশেও এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। একটী ইংরাজি গ্রাম্যভাষা তাহার প্রমাণ,—তাহারা প্রত্যেক মাদায় তিনটী করিয়া সীম বীজ বসায় এবং বলে, "One for the worm, one for the crow and one to make the plant to grow." অর্থ এই যে, একটী পোকায় কাটিবে, একটী কাকে নষ্ট করিবে, বাকী একটী হইতে ফসল উৎপন্ন হইবে।

গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা-ক্ষেত্রে, চাষিরা যাহা করে, তাহাই করিয়া অনেক সময় ঢাক ঢোল বাজাইয়া প্রচার করা হয় যে, ইহা নূতন, চাষিরা ইহা জানে না বা কোন কালে করিত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী কথা এখানে বলিলেই যথেষ্ট হইবে। চাষিরা, পাট কাটিয়া অনেক সময় আমন ধান বুনিয়া থাকে এবং সুবিধা বুঝিয়া আবহমানকাল ঐ কার্য্য করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট বিবরণীতে "পাট কাটিয়া আমন ধান" এই বিষয় লইয়া মহাসমারোহে লেখনি চালনা হইতেছে শুধু ধান ও পাটের পরিবর্ত্ত চাষ কেন পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ যথেষ্ট জমি আছে, যাহাতে এক বৎসরে যথাক্রমে আউস ধান, পাট ও আমন ধানের আবাদ হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু চাষিরা নূতন আবিষ্কার বলিয়া প্রচার করিতে জানে না।

আর একটী কথা ভাবিবার আছে। চাষিদের উপদেশ দিবার সময় আমাদের একটু সতর্কতা অবলম্বন করা কি উচিত নহে? সরকারী পরীক্ষা ক্ষেত্রে সারের অভাব নাই, সেচন জলের অভাব নাই, কৃষাণ বা হলবাহী বলদের অভাব নাই, সেখানে কোন একটী অত্যুৎকর্ষ সাধিত হইলে সকল কৃষকের পক্ষে কি তাহা সম্ভব!

পত্রাদি।

রুদ্রপুর।

২৪ পরগণা।

কৃষকের মধ্যে আপনার প্রবন্ধ কখন কখন বাহির হয়, উহা অতীব মূলবান বটে। ইতিমধ্যে ঘুঁটে সম্বন্ধে একটী বাহির হইয়াছে, উহা সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর সন্দেহ নাই। ঘুটে ঢেঁকিদ্বারা গুঁড়া করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া, এ বৎসর আমি পাট করিয়াছি, এমন পাট আমি আর কখন উৎপন্ন করিতে পারি নাই। আপনি বলিয়াছেন ধান্য ও পাট ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে ফলন বেশী হয়, সেই জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, পাটক্ষেত্রে কত মণ ঘুঁটে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং ধান্যক্ষেত্রে কত মণ ঘুঁটে ব্যবহার করা যাইতে পারে, অর্থাৎ বিঘাপ্রতি কত মণ ঘুঁটে ছড়াইতে হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইতে আজ্ঞা হয়।

শ্রীসুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষকের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত রুদ্রপুরের শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র আপনাদিগের নিকট পাঠাইতেছি। তিনি পাট ও ধান্যে বিঘা প্রতি কত মণ ঘুঁটে ব্যবহার করিতে হইবে জানিতে চান। তাঁহার এবং কৃষকের অন্যান্য পাঠকের বিদিতার্থ লিখিতেছি যে, পাটের পক্ষে বিঘা প্রতি ৮ হইতে ৯ মণ এবং ধান্যের পক্ষে ৫ হইতে ৬ মণ ঘুঁটে ঢেঁকিতে গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ। আপনারা বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের চিঠি খানিও প্রকাশ করিতে পারেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ঘুঁটে ব্যবহার করায় তাঁহার পাট অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

নিবেদক
শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী,
বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের ইনস্পেক্টর।

বরাণ আমন ধান।

কলিকাতা নিবাসী জনৈক ভদ্র লোক, গভীর বিল জমি, যাহা প্রতি বৎসর প্রায় জলপ্লাবিত হইয়া যায়. সেরূপ জমিতে কি প্রকার ধান্যের আবাদ করা যাইতে পারে, এই প্রশ্ন করিতেছেন।

[বরাণ জাতীয় এক প্রকার আমন ধান আছে, যাহা খুব গভীর বিল জমিতে জন্মিতে পারে। ঐ বরাণ ধানের জাতি বিশেষ জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন ১৫ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই ধানের চারা হঠাৎ জলে ডুবিয়া জলের মধ্যেই পাতা ফলিয়া দুই দিনের মধ্যেই জলের উপর জাগিয়া উঠে।

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এই ধান বোনা হয়। বিঘা প্রতি প্রায় দশ সের বীজ বোনা হয়, ইহার ফলন বিঘা প্রতি প্রায় ছয় মণ। মেদিনীপুর অঞ্চলে যেখানে জলপ্লাবনের আশঙ্কা আছে তথায় এই ধানের আবাদ করা হয়। কৃঃ সঃ।]

জহরী চাঁপা গাছ।

কুমার শ্রীরমণীমোহন রায়, লেবারী (চট্টগ্রাম)

জহরী চাঁপা গাছ লাউ কুমড়ার মত লতাইয়া যায় না বটে কিন্তু উহার ডালগুলি লতানিয়া ধরণের এবং বাগান কিম্বা বাটীর গেটের উপর বাঁশের ভারা বা তারের জালের উপর উঠাইয়া দেওয়া যায়। ফুলের বর্ণ প্রথমাবস্থায় হরিৎবর্ণ শেষে হরিদ্রাবর্ণ হয়।

কনক চাঁপা গাছ।

কনকচাঁপা গাছ, সেফালিকা গাছ অপেক্ষা বড়; ফুলের রঙ্গ হরিদ্রাবর্ণ; গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুটে। কদম ফুলের রঙ্গ হরিদ্রাবর্ণ; বর্ষাকালে ফুটে। বকুল ফুল গ্রীষ্মকালে ফুটে। ব্রনফেলসিয়া, গন্ধরাজ, টগর, হোসেনা হেনা এবং দুই এক জাতীয় গোলাপের প্রায় বারমাস ফুল ফুটে। এই গাছ গুলি খুব বড় হয় না, উঠানে বসান যাইতে পারে। মহুয়ার ফুল ফাল্গুন, চৈত্র মাসে ফুটিতে আরম্ভ হয়।

বেগুনে পোকা।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য, কানিশালী (শ্রীহট্ট)।

বেগুন গাছ সাধারণতঃ তিন প্রকার কীট দ্বারা আক্রান্ত হয়। কীড়া অবস্থায় তাহাদিগকে সহজে পৃথক করা যায় না। তিন জাতীয় পোকা বেগুন গাছের তিন অংশ আক্রমণ করে। প্রথম,—ইহার কীড়া শ্বেতবর্ণ, মস্তক পিঙ্গলবর্ণ, পতঙ্গ ধূসরবর্ণ, সম্মুখের পক্ষ কাল দন্তিত রেখাবিশিষ্ট। নাম ইউজোফেরা পার্টিসেলা (Euzophora perticella, Rag)। ইহা গাছের কাণ্ডে ছিদ্র করে। কাণ্ডের নিম্ন ভাগেই কীড়া অবস্থিতি করে। যে স্থলে অধিক দিবস ধরিয়া বেগুন চাষ হয়, সে স্থলে ইহার উপদ্রব অধিক। গাছ হঠাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। ২য়—ইহার কীড়ার রং চর্ম্মের ন্যায়, মস্তক পাটলবর্ণ, পতঙ্গ শ্বেতবর্ণ। ইহা ফলে ছিদ্র করে, এবং কখন কখন গাছের ডগায়ও ছিদ্র করিয়া থাকে। ইহার নাম লিউসিনোডস্ অরবোন্যালিস্ (Leucinodes orbonalis, Guen)। ৩য়—ইহার পতঙ্গ সবুজবর্ণ দাগযুক্ত শ্বেত পক্ষবিশিষ্ট। ইহা কাণ্ডের উপরাংশ, ডালের ডগা প্রভৃতি আক্রমণ করে। নাম ইউব্লেমা অলিভেসিয়া (Eublemma Olivacea Wlk)। এই সকল পতঙ্গ যে ডিম্ব হইতে সম্ভূত হয় তৎসমুদয় একটী একটী করিয়া পাতার উপর থাকে। কীড়া অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াই কাণ্ডে প্রবেশ করে। কীড়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে গাছে, নিকটস্থিত মৃত্তিকায় কিম্বা কদাচিৎ ছিদ্রের ভিতরেই গুটি তৈয়ারী করে। গরমের সময় কীট বাহির হইতে ৮—১২ দিন লাগে। ইহাদের জীবন চক্র সমাপ্ত হইতে গ্রীষ্মকালে ১ মাস এবং শীতকালে ৩ মাস পর্য্যন্তও সময় লাগিয়া থাকে। প্রতিকারের উপায় আক্রান্ত ফল অথবা বৃক্ষাংশ পোড়াইয়া ফেলা। এতদ্ভিন্ন ক্ষেত্রের নিকট যদি বেগুন জাতীয় অপর গাছ থাকে, সেগুলি নষ্ট করা। কারণ সে গাছগুলিও এই পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

উই পোকা।

শ্রীযুক্ত ধীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।—

নারিকেল গাছের কাণ্ডে কেরোসিন তৈল, কেরোসিন ও দধির মিশ্রণ, তামাকের জল, সাবান দ্রাবণ প্রভৃতি প্রয়োগে উই নিবারিত হইতে পারে। আমগাছে উই নিবারণের জন্য কোন কোন স্থলে কাণ্ডগাত্রে গেরি মাটির প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। আপনিও সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন। স্যানিটারি ফ্লুইড নামক ঔষধ প্রয়োগেও বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। আস্তাবলের কিম্বা ক্ষেত্রজ সার অসম্পূর্ণভাবে বিগলিত হইলে কিম্বা শুষ্ক থাকিলে প্রয়োগ করা উচিত নহে।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে পাট।

ভাদ্র মাসের শেষ।

ঢাকা।—পাট কাচা শেষ হয় নাই; জল হাওয়া অনুকূল।

মৈমনসিংহ।—পাট পচাইবার জন্য বৃষ্টির আবশ্যক। পাট কাচা হইতেছে; ফসল আশাপ্রদ হইয়াছে।

ফরিদপুর।—পাট কাটা ও কাচা হইতেছে। এখানে আরও বৃষ্টির আবশ্যক হইয়াছে।

বাখরগঞ্জ।—আবহাওয়া অনুকূল; পাট কাটা ও কাচা প্রায় শেষ হইয়াছে।

ত্রিপুরা।—প্রায় বার আনা পাট গৃহজাত হইয়াছে। ফসল ভাল জন্মিয়াছে। অবশিষ্ট পাট ভিজাইবার জন্য আরও বৃষ্টির আবশ্যক হইতেছে।

নোয়াখালি।—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং গ্রীষ্ম অনুভূত হইতেছে। পাট সংগ্রহ হইতেছে। পাট ভালরূপ জন্মিয়াছে।

রাজসাহী।—অধিক বৃষ্টি আবশ্যক, বৃষ্টির অভাবে পাট কাচা হইতেছে না।

দিনাজপুর।—এখানেও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও গরম অনুভব হইতেছে এবং জলের অভাবে পাট কাচা হইতেছে না।

জলপাইগুড়ি।—পাট সংগ্রহ হইতেছে।

রঙ্গপুর।—সম্প্রতি বৃষ্টি হইয়া পাট ভিজান ও কাচার সুবিধা হইয়াছে—আকাশে মেঘ আছে।

বগুড়া।—পাট ভিজাইবার জন্য জলের বড় অভাব হইয়াছে, ফসল ভাল রকম আশা করা যায় না।

পাবনা।—অতি সামান্য সামান্য বৃষ্টি হইতেছে। নদীর জল প্লাবনে কিছু সুবিধা হইয়াছে। পাট সংগ্রহ কার্য্য চলিতেছে।

মালদহ।—এখানেও জলের অভাব, পাট কাচা কোনরূপে চলিতেছে।

সিলেট।—পাট সংগ্রহ হইতেছে।

গোয়ালপাড়া।—পাটের অবস্থা ভাল নহে। পাট সংগ্রহ হইতেছে।

কামরূপ।—গরম, গুমট করিয়া আছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। পাট সংগ্রহ হইতেছে।

গারো পর্ব্বত।—আশু পাট সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে। আমন পাট সংগ্রহ চলিতেছে।

বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা।

বিগত ১২ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ গিয়াছে, তাহাতে শুনা যায় যে, পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং কাশ্মিরে বৃষ্টির অভাব দূর হইয়াছে। বেহারেও বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু এখনও বৃষ্টির অভাব। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় প্রায় শতকরা ২০ ভাগ বৃষ্টি কম হইয়াছে। দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ ও মান্দ্রাজেও ঐরূপ অবস্থা। পূর্ব্ববঙ্গে ও বঙ্গের স্থানে স্থানে এই সময় বৃষ্টির অভাব অনুভূত হইতেছে, এবং অনেক স্থানে হৈমন্তিক ধান্য রোপণের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। দুর্ভিক্ষ পূর্ত্তকার্য্যে সর্ব্বত্র লোক সংখ্যা বাড়িতেছে; কিন্তু মান্দ্রাজে কিছু কমিয়াছে।

সীমান্তপ্রদেশ এবং পঞ্জাবে ভাদ্র মাসের শেষে শস্যের অবস্থা।

প্রায় সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়াছে; খালি সেচনজলের সুবিধা সুযোগ আছে। অত্রস্থ অধিকাংশ নদীই

পূর্ণ ও প্লাবিত হইয়াছিল, এখন জল কমিয়া গিয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে ইক্ষুর আবাদ।

ভাদ্র মাস।

প্রায় ১২ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা জমির পরিমাণ প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ কম; সর্ব্বত্র চাষের অবস্থা মন্দ নহে, কোথাও কোথাও খুব ভালই বলিতে হইবে। কিন্তু এখনও অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য ভয় আছে, তাহাতে শেষে কি দাঁড়াইবে বলা যায় না।

যুক্তপ্রদেশে তুলার আবাদ।

অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার অনেক অধিক জমিতে তুলা চাষ হইয়াছে। চাষের কোন বিঘ্ন বিপদ শুনা যায় নাই।

মৈমনসিংহে জলাভাব।

গত পূর্ব্ব সপ্তাহ হইতে নদীতে জল বৃদ্ধি পাইপাইতেছিল। সাধারণে ভরসা করিয়াছিল, শেষ সময়ে বর্ষা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সকল আশাই নিষ্ফল হইল। নদীতে মাত্র ১—২ হাত জল বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু এখন নদীর জল কমিয়া যাইতেছে। বৃষ্টিপাতও অতি সামান্যরূপ হইয়াছে। এ জেলায় বহু স্থানে লোকে জলাভাবে রোপা ধান্য বপন করিতে পারে নাই, এখন বপনের সময় এক প্রকার অতীত হইয়াছে। লোকে যে সকল ধান্য বপন করিয়াছিল জলাভাবে তাহাও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। নিম্নস্থানে এবার সামান্য পরিমাণে ধান্য জন্মিয়াছে। এবার আশু ধান্য আশানুরূপ জন্মিয়াছিল, বহু কৃষকের আশু ধান্য এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। কিন্তু আর এক মাস সময়ও এই ধান্য ব্যবহার করিয়া লোকে আহারের সংস্থান করিতে পারিবে না। জল হ্রাস হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। মফঃস্বলে অনেক স্থলে এখন ৭—৭।৹ টাকা দরে প্রতি মণ চাউল বিক্রয় হইতেছে। এ বৎসর উচ্চ মূল্যে চাউল খরিদ করিবার শক্তি অনেকেরই থাকিবে না। পাট বিক্রয় করিয়া এ দেশের কৃষক রজতমুদ্রা দর্শন করে। কিন্তু জলাভাবে এখনও কৃষক অধিকাংশ স্থলের পাট কাটিতে পারে নাই, ক্ষেত্রে কৃষকের শেষ আশা পাট শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে পাটের মূল্য বৃদ্ধি হইয়য়াছিল। এখন দর ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।—চারুমিহির।

মেদিনীপুরে সুবৃষ্টি।

মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলটী সংপ্রতি দুর্ভিক্ষের কবলমুক্ত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট এ অঞ্চলে ততটা কৃপাকটাক্ষ না করিলেও, কয়েকজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তির কার্য্যকুশলতায় এদিকে দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রকোপ অনুভূত হয় নাই। সম্প্রতি উত্তম বৃষ্টি হইয়া ফসলের অবস্থা অত্যন্ত আশাপ্রদ হইয়াছে। আশু ধান্য আশাতীত উৎপন্ন হইয়াছে। হৈমন্তিক ধান্যের আদিম অবস্থাও অত্যন্ত আনন্দবর্দ্ধক। মধ্যে শ্রমজীবিগণ কার্য্য না পাইয়া উদরান্নের জন্য ইতঃস্তত করিতেছিল; তাহাদের সে দুরাবস্থা কাটিয়াছে, সম্প্রতি তাঁহারা দুবেলা দুমুঠা পেট পুরিয়া খাইতেছে। কিন্তু গ্রামে ভীষণ বিসূচিকা দেখা দিয়াছে। দুই তিনটী গ্রাম একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে।

সার-সংগ্রহ।

বঙ্গীয় রেশম ব্যবসায়ের অবনতি।

বঙ্গদেশ হইতে বেলজিয়ম, ফ্রান্স এবং যুক্ত রাজ্যে রেশম সূত্র, রেশমী দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়।

বেলজিয়েম কৃত্রিম রেশম সূত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহা এত সুন্দর হইতেছে যে, কালে আসল নীলের পরিবর্ত্তে নকল নীলের ন্যায় তথায় কৃত্রিম রেশমেরই চলন হইবে। ১৯০৭—৮ সালে তথায় বঙ্গদেশ হইতে ৪৬,৯৫,০০০ টাকা মূল্যের ১,২৪৭,৬৪৭ পাউণ্ড রেশম রপ্তানি হইয়াছে। পূর্ব্বের অনুপাতে রপ্তানির মাত্রা শতকরা পঞ্চমাংশ এবং মূল্যে পনর অংশ কমিয়া গিয়াছে। ১৯০৬—৭ সালে এক পাউণ্ড রেশম ৪৸৫ আনা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষের দর ৩৸৫ মাত্র। ১৯০৭—৮ সালে ২৮,৮৩,০০০৲ টাকা মূল্যের ৮৬০,৪০৫ পাউণ্ড রেশম বঙ্গদেশ হইতে ফ্রান্সে রপ্তানি হইয়াছে। যুক্তরাজ্যে (United Kingdom) ১৪,৮৩,০০০৲ টাকা মূল্যের ৩১৯,১৭৯ পাউণ্ড, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ (United States) ২,৬৪,০০৲ মূল্যের ২৯,৪০০ পাউণ্ড রেশম সূত্র রপ্তানি হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে রেশমীবস্ত্রাদি রপ্তানির পরিমাণ কিছু অধিক,—৫,৪৯,৩০২৲ টাকা। ১৯০৬—৭ সালে ৪,৫৯,৪৯৬৲ টাকা মাত্র। শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ রেশমবস্ত্র যুক্তরাজ্যে গিয়াছে।

আলু চাষের উন্নতি-চেষ্টা।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ আলু চাষের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ের উদ্যোক্তা। ইংলণ্ড, ব্রহ্মদেশ এবং পঞ্জাব হইতে বীজ-আলু আনাইয়া নৈনিতাল পার্ব্বত্য অঞ্চলে চাষ করিয়া আলুর জাতীয় উন্নতির সুবিধা করা হইতেছে। ইংলণ্ড হইতে যে বীজ আলু আনা হইয়াছে, তাহার প্রধান গুণ এই যে, তাহা সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে আলুতে ভিপি রোগ (Phytop thora infestans) দেখা যায়। সেই জন্য এই আলুর চাষ সেখানে প্রবর্ত্তন করা ভাল। উহার নাম Solanum Commersoni। তথা হইতে বীজ আলু সংগ্রহ করিয়া বঙ্গের নানাস্থানে ঐ জাতীয় আলুর চাষ চলিতে পারিবে। এখন প্রায় সর্ব্বত্র বীজ আলু বসাইয়া আলুর ফসল তৈয়ারি করা হয়। ইহাতে রোগাক্রমণের সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু যথার্থ বীজ হইতে আলুর চাষ করিলে রোগাক্রমণের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। সম্প্রতি কোথাও কোথাও আলু গাছের ফুল ও ফল উৎপাদন করিয়া সেই বীজ হইতে কিম্বা ইংলণ্ড হইতে আলুর বীজ আনাইয়া আলু চাষের চেষ্টা হইতেছে।

জমিদারের বদান্যতা।

মেদিনীপুরের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত জমিদার শ্রীযুত চৌধুরী কৃষ্ণচন্দ্র গ্রহরাজ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার কার্য্যকুশলতায় ইঁহার নিজের অধিকৃত রাজ্য বেলেবেড়া পরগণা আদৌ দুর্ভিক্ষ বলিয়া বোধ করিতে পারে নাই। অধিকন্তু বেলা-বেড়া সংশ্লিষ্ট নয়াবসান, চিয়াড়া, মল্লভূম, দিনপারুই ইত্যাদি কয়েকটী পরগণাও বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছে। যখন প্রথমে গত কার্ত্তিকে অনাবৃষ্টির দরুণ অজন্মার সূত্রপাত হয়, তখন ইনি স্বীয় রাজ্য-মধ্যে রাজ্যস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তি লইয়া একটি সভা আহ্বান করিয়া ব্যবস্থা করেন যে কোনও প্রজা আজ হইতে বিদেশে ধান রপ্তানি করিতে পারিবে না; তদনুসারে কার্য্য হওয়ায় বেলেবেড়া পরগণায় ধান জমিয়া যায়। প্রকাশ্য সভায় ইনি আরও বলেন যে এ বৎসর প্রজাদের নিকট সমস্ত খাজনা মহকুব রাখা হইল এবং যে যে প্রজা ধান বা টাকা কর্জ্জ লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা ষ্টেট হইতে নামমাত্র ব্যাজে আবশ্যক মত টাকা ও ধান পাইবে। এইরূপ প্রকার খাজনা মহকুবে প্রায় দশ হাজার টাকা

অনাদায় হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থায় কৃষকগণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ জানিতে পারে নাই। জমিদার মহাশয়কেও কম টাকা ও ধান কর্জ্জ দিতে হয় নাই। তাঁহাকে প্রায় ২৫ হাজার টাকার ধানই দিতে হইয়াছে। শ্রমজীবী ধাঙ্গড় আদির জন্য ইনি রিলিফের কার্য্য খুলেন তাহাতে মাঘ মাসের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া জৈষ্ঠ্যের ১৫ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রায় ৮৷৯ শত লোক খাটিয়া বাঁচে। অবশিষ্ট অন্ধ, খঞ্জ, অকর্ম্মণ্য ও অসহায় ব্যক্তির জন্য সদাব্রত খোলা হয়, তাহাতে প্রায় প্রত্যহ আড়াই শত তিন শত লোক অন্ন পায়। দেশ ইঁহার নিকট চিরঋণী। সকল জমিদারগণ যদি এইরূপ পরার্থপরতার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে দেশ যে কি শান্তিময় হইত তাহা ভাবিলেও সুখবোধ হয়।

পটাশ সারের উপকারিতা।

পটাশ প্রধান অথবা পটাশ সারের উপকারিতা অনেকটা জমির উপর নির্ভর করে। কাদা জমিতে প্রায়ই পটাশ থাকে এবং এরূপ জমিতে পটাশ দিয়া বড় একটা উপকার দর্শে না। এরূপ জমিতে বরং পটাশ বিহীন সার দিলে জমির অপরাপর উপাদান উদ্ভিদের শোষণ যোগ্য হয়। ক্ষারযুক্ত সার (যেমন সোড়া, চুণ প্রভৃতি) অদ্রবনীয় সিলিকেট সমূহকে বিশ্লেষণ করিয়া পটাশকে মুক্ত করিয়া দেয়। নাইট্রেট সমুহ ব্যবহার করিলে উদ্ভিদের শিকড় মৃত্তিকায় অনেক দুর প্রবেশ করে এবং তজ্জন্য আবশ্যকীয় রস শোষণ করিবার অনেক স্থান প্রাপ্ত হয়।

নাইট্রোজেন ব্যবহারে উদ্ভিদের আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ফস্‌ফেটে শীঘ্র শীঘ্র ফসল পাকে। পক্ষান্তরে পটাশ উদ্ভিদের উৎকর্ষতা সাধন করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোধুমের কথা বলা যাইতে পারে। এস্থলে নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফেটে শস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পটাশ দ্বারা শস্য মোটা ও উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত হয়। শুঁটির জন্য যে সকল ফসল চাষ হয়, যেমন চিনের বাদাম, ছোলা প্রভৃতি কিম্বা পাতা ফসল (তামাক, বাঁধাকপি প্রভৃতি) অথবা মূল ফসল যাহা খেত সারের জন্য চাষ হয় (আলু, মেটে আলু প্রভৃতি) এই সমস্ত ফসলে পটাশ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ফলের গাছে পটাশ সার দিলে ফলের রং এবং স্বাদ উভয়ই ভাল হয়, টক্ স্বাদযুক্ত ফলে পটাশের উপকারিতা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গদেশের কৃষকেরা কদলীর জন্য কাঠের ছাই উৎকৃষ্ট সার বলিয়া বিবেচনা করে। চুরুটের তামাকে যে পটাশ প্রয়োগে তামাক পাতা ভাল হয় তাহা অনেকেই জানেন। ধান, গম প্রভৃতি গাছের পটাশ সারে ডাঁটা শক্ত হয়; ইহাতে শস্য ভাল হয় এবং পশু খাদ্য হিসাবে ডাঁটার মূল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পটাশ সারের আর একটি উপকারিতা এই যে ইহা প্রয়োগে গাছের ছত্রক রোগ কম হয়। গমের রষ্ট নামক রোগ পটাশ সারে উপশম হইতে দেখা গিয়াছে। তিন প্রকারের পটাশ সার সাধারণতঃ পাওয়া যায়; কাইনাইট, সলফেট অব্ পটাশ ও পটাশ ক্লোরাইড্। প্রথমোক্ত জর্ম্মণি দেশ হইতে আমদানি হয়। কিন্তু এপর্য্যন্ত এ সকল সারের এতদ্দেশে অধিক চলন নাই। এস্থানে ছাইই পটাশ সাররূপে সমধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। সোরা ও পশু মূত্র কিন্তু মূল্যবান পটাশ সার এবং উহাদের অধিক প্রচলন হওয়া আবশ্যক।

ভারতীয় গবাদির রপ্তানি।

আমেরিকার দক্ষিণ টেক্সাসে ভারতীয় পশুর আদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এতদ্দেশীয় গবাদি টিক নামক পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

মার্কিনী গবাদির সহিত উহাদের সন্তান উৎপাদন হয় এবং তাহারা যথেষ্ট শ্রমসহিষ্ণু। এই সমস্ত কারণে কয়েক বৎসর হইতে উচ্চ শ্রেণীর দেশীয় গবাদি ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে। নেলোর ও গুজরাটের গাভী ও ষাঁড় রপ্তানির জন্য অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে এবং উক্ত গবাদি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ ও দক্ষিণ আমেরিকায় যাইতেছে। এক্ষণে ভারতীয় কৃষকবৃন্দের গো বংশের উন্নতির চেষ্টা করার সময় আসিয়াছে। গো বংশের উন্নতি সাধন করিলে কেবল যে রপ্তানির সুবিধা হইবে তাহা নহে ভারতীয় কৃষিরও যে ইহাতে মঙ্গল হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

সিন্ধু-মিশরীয় তুলা।

করাচির সিন্ধু কলেজের অধ্যাপক মিঃ সাহানি ব্রিটিশ এম্পায়ার লিগের একটি অধিবেশনে সিন্ধু মিশরীয় তুলা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে জনৈক জমিদার কৃত তুলা পরীক্ষার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পরীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে—(১) চাষ যতই মিশর দেশে প্রচলিত চাষের মত হয় ততই ফসল উৎকৃষ্টতর হয়। সিন্ধু দেশের অধিকাংশ জমি ক্ষারযুক্ত হওয়ায় সামান্য চাষে কোন ফল হয় না। (২) আব্বাসি অপেক্ষা মেটাফিফি অধিক ফলশালী জাতি। কিন্তু উহার তুলা পাটল বর্ণ বলিয়া ক্রেতাগণ উহা বড় একটা পছন্দ করেন না। তজ্জন্য ইহার যাহা আসল দর তদপেক্ষা কম দর প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৩) উৎপাদনের মাত্রা কম; সুতরাং দেশীয় সিন্ধু তুলা অপেক্ষা ইহার চাষে লাভ কম। মিশর তুলা দ্বারা লাভ করিতে হইলে একর প্রতি অন্ততঃ দশ মণ তুলা উৎপাদিত হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্ববঙ্গে খদির বৃক্ষ।

খদির বৃক্ষের ছাল হইতে যে নির্য্যাস বাহির হয়, তাহাতে ক্যাটিচিন (Catechin) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে বলিয়া তাহা হইতে ক্বাথ (খদির) এবং কচ (Cutch) রঙ্গ প্রস্তুত হয়। এতাবৎকাল সকলের বিশ্বাস ছিল যে, যেস্থানের জলবায়ু আর্দ্র এবং নদীতীরে যে সকল খদির বৃক্ষ জন্মে, তাহাতে ক্যাটিচিন নামক পদার্থ নাই সুতরাং ঐ সকল বৃক্ষত্বকের নির্য্যাস হইতে খয়ের বা খয়ের রঙ্গ কিছুই হয় না। এক্ষণে অরণ্য বিভাগের রসায়ন তত্ত্ববিদ মিঃ পুরাণ সিং, এফ, সি, এস, সে ভ্রম দূর করিয়াছেন। তিনি গোয়ালপাড়া বিভাগস্থিত খয়ের গাছ হইতে (Acacia Catechu) ক্বাথ এবং খয়ের রঙ্গ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই খয়ের এবং খয়ের রঙ্গ অন্যান্য স্থানের খয়ের এবং খয়ের রঙ্গ হইতে কোন অংশে খারাপ নহে।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

কলিকাতার যাদুঘর।—কলিকাতায় যাদুঘর অনেকেই দেখিয়াছেন। যাদুঘরের অন্যতম অংশ শ্রম-শিল্প বিভাগ। সম্প্রতি এই বিভাগের যে বিবরণী বাহির হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বিগত বৎসর উহার অনেক উন্নতি হইয়াছে। শ্রম-শিল্প বিভাগের যন্ত্রাগারে (Laboratory) গত বৎসর ১৪০ প্রকারের পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইয়াছিল। এই সমুদয় পদার্থ নানা শ্রেণীভুক্ত:—স্বাভাবিক নির্য্যাস, তৈল ও তৈলবীজ, রং ও রঞ্জক পদার্থ, তন্তু, ঔষধ দ্রব্য, খাদ্যদ্রব্য ও খনিজ দ্রব্য। ভারতীয় তৈল সমূহের যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইতেছে উহা সমাপ্ত হইলে আমরা নানাবিধ তৈল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। ইহাতে মিশাল হইতে খাঁটি

তৈল বাছিয়া লওয়ারও সুবিধা হইবে। শসা জাতীয় উদ্ভিদের—সাদা কুমড়া, বিলাতী কুমড়া, ধুঁধুল ও মাকাল—রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহাদের বীজে তৈলজ অম্লের পরিমাণ যথাক্রমে ২৪.৯, ২৪.৩, ২৪.২, ২৩.৫ ও ২২.২। মেদীর বীজেও ১০.৫ অংশ তৈল পাওয়া গিয়াছে। তুলা বীজ পরীক্ষায় প্রতীয়মান হইয়াছে যে, তুলা বাহির করিয়া লইবার পরও ভারতীয় তুলা বীজে শতকরা ৫-৭ অংশ তুলা থাকিয়া যায়। আমাদের দেশের লোকের দারিদ্র্যের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত এই যে সীতাপুর জেলায় নিস্বঃ লোকে শিমূল ছালের চাপাটি তৈয়ারী করিয়া খায়। রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে যে ইহার কিঞ্চিৎ পুষ্টিকর গুণ আছে। কিন্তু ইহা ভাত অপেক্ষা ২৭ গুণ কম পুষ্টিকর। এস্থলে ভাতের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দিলে অসঙ্গত হইবে না। ভাতে শতকরা ৫২.৭ জল, ১ বসা, ৫.৭ অ্যালবুমিনইড, ৪১.৯ শ্বেতসার ৪.৩ খনিজ পদার্থ বর্ত্তমান। ইহার পুষ্টিকর গুণের পরিমাণ ৪৭। গত বৎসর শ্রমশিল্প বিভাগের কর্ত্তা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে সমস্ত লোক যাদুঘরে যায় তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন ব্যবহারিক বিভাগ, ৯২ জন শিল্প বিভাগ ও ৯০ জন মানবজাতিতত্ত্ব বিভাগ দেখিয়া থাকে। অপরাপর হিসাবে জানা যায় যে নানা জাতীয় মনুষ্যের চেহারা, উহাদের জাতীয় ব্যবসায় প্রভৃতির চিত্রাদি সাধারণ দর্শককে যেরূপ আকর্ষণ করে সেরূপ আর কিছুতেই করে না।

ভারতীয় শিল্পোপযোগী কল কব্জা।—ভারতীয় শিল্পোন্নতির জন্য বিবিধপ্রকার কল কব্জার আবশ্যক হইয়াছে। সেগুলি কোথায় পাওয়া যায় জানিতে এক্ষণে অনেকে উৎসুক। এই বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য লণ্ডনে ১৪৭ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড W.C. এই ঠিকানায় একটী ভারতীয় ও ইউরোপীয় ব্যবসায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইণ্ডিয়া" নামক পত্রিকার সত্বাধিকারী মিঃ কে, এন, দাস গুপ্ত ইহার একজন অধ্যক্ষ। এই সমিতি কলকব্জার একটী বিবরণী প্রকাশ করিবেন। ইহাতে ভারতে ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় কল কব্জার বিবরণ সন্নিবেশিত হইবে। এই পুস্তক প্রণয়নের আবশ্যকতা আছে। এই সমিতি ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বিলাতে বিক্রয় করিতেছেন এবং ইহার কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। উক্ত সমিতির সম্পাদকের ঠিকানা—৫, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিশেষ খবর জানা যায়।

মান্দ্রাজে শিল্প-সম্মিলন।—বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর মান্দ্রাজে উতকামন্দে শিল্প-সম্মিলনীর একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজের গভর্ণর প্রথম দিনে এই সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, এদেশবাসীগণ যদি নিজে নিজে চেষ্টা না করেন বা তাঁহারা এক যোগে বা স্বতন্ত্র ব্যবসা বাণিজ্যে মন না দেন তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট কি করিতে পারেন? শ্রম-শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার সময় আছে, কিন্তু যাহাতে ব্যবসা বাণিজ্য প্রবর্ত্তন হয়, সেই চেষ্টা গভর্ণমেণ্টের আগে। আমরা মানি যে ব্যবসায়ে এদেশবাসীর যত্ন, অধ্যবসায় এবং ইচ্ছা আবশ্যক কিন্তু রাজার সহায়তা ব্যতীত এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু শুধু কৃষিকার্য্যে মন দিলে চলিবে না—বাণিজ্যের প্রসার বাড়াইতে হইবে এবং ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষাই এক্ষণে মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

কার্ত্তিক—অক্টোবর নবেম্বর।

আশ্বিন মাস গত হইল, বিলাতী সব্জী বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, শালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা এবং নাবী জাতীয় সীম, টর্ণিপ (সালগম) বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপন কার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষেরও এই সময়। আশ্বিন মাসের প্রথমার্দ্ধ গত হইলেই রবি শস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মুসুরী, মুগ, তিল, খেসারি প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবি ফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে।—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলেই যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে।

সুল্পাদি।—সুল্প, মেথি, কালজিরে, মৌরি, রাঁধুনি ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়।

কার্পাস।—গাছ কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে দিয়া রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে।

তরমুজাদি।—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। তরমুজ মাটি চাপা দিলে বড় হয়।

উচ্ছে।—৪।৪ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪টার অধিক পুঁতিবে না।

পটোল।—পটোলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুঁতিবে। পুনঃ পুনঃ খুসিয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট।

পলাণ্ডু।—কলসমেত এক একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুঁতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির "যো" হইলে খুঁড়িয়া দিবে।

মটরাদি।—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেত্রের পাইট।—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান।—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ।—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে, এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশির পাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বীজ বপনের কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট।—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ২।৪ দিন এই রূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে।

REGISTERED No C. 10

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

নবম খণ্ড,—৭ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,

সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।



কার্ত্তিক, ১৩২৮।

মিন্নার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত;

১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।



ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন

এই সময়ের সব্জী বীজ।

অ্যাস্পারেগস, সেলেরি, টমাটো, আর্টিচোক, বিলাতী সীম, বীট, গাজর, জলদি বাঁধাকপি, পাটনাই ফুলকপি, জলদি বিলাতি ফুলকপি, লেটুস্ বা ছালাদ পাটনাই সালগম, জলদি বিলাতি সালগম, ওলকপি, স্কোয়াস বা বিলাতি কদু, লাউ প্রত্যেকের প্যাকেট ।০ ; নমুনা বাক্স ৮ রকম ১৷৷০ ১ নং বাক্স ১২ রকম বীজ ২৷৷০।

নূতন সব্জী ও ফুল বীজ।

বাঁধাকপি—গোবিন্দপুর স্যাটিস্‌ফাক্‌সন (এদেশে-জাত বীজ, সুতরাং এদেশের জলহাওয়ায় ভাল জন্মিবে) খুব বড়, সন্তোষজনক তোলা ১৲

ফুলকপি—এসোসিয়েসন্স পারফেকসন্ (দেশী বীজ) উৎকৃষ্ট ও নিখুঁৎ তোলা ১৲

„ এসিয়াটিক „ ৸০

কাঁটাশূন্য বেগুন—(দেশজাত বীজ) এক একটা ছয় সের পর্য্যন্ত হয় তোলা ১৲

শসা—মনোহর সবুজ বর্ণ। এক একটা ৩ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয় প্যাকেট ।০

„ চীনা নূতন জিনিষ „ ।০

„ ডোরাকাটা „ ।০

স্কোয়াস বা বিলাতী কদু—ওজনে এক একটা ২০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হয় প্যাকেট ।০

টমাটো—বর্ষাতি (এদেশী বীজ) জলদি ফসলের উপযুক্ত তোলা ১৲

তরমুজ—ট্রায়াম্ফ ওজনে এক মণ পর্য্যন্ত হয় প্যাকেট ।০ তোলা ৷৷০

বীট—সুগার রং সাদা উপরের দিকে লাল প্যাকেট ।০

[illegible] তোলা ১৲

[illegible] খাইতে সুস্বাদু [illegible] ওজনের তোলা [illegible]

লাউ লম্বা—(শীতের) এক একটা ৫।৬ ফিট লম্বা হয় তোলা ।০

মূলা—সিলেশ্চিয়াল গোল সাদা এবং খুব বড় এক একটা ⁄২৷৷ পর্য্যন্ত হয় (বারাসাত প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চ মেডেল প্রাপ্ত) তোলা ।০

মূলা—ব্লাকস্পানিস—লম্বা কাল রঙ্গের „ ।০

সটনের খুব বড় চমৎকার মটর—

টেলিগ্রাফ পাউণ্ড ২৲

টেলিফোঁ „ ২৷৷০

ল্যাণ্ড্রেথের এমেরিকান ওয়াণ্ডার মটর „ ১৷৷০

ওলগু মটর বিলাতি মটর অপেক্ষা কিছুতেই খারাপ নহে পাউণ্ড ৸০

সুগার বীন—শুঁটীর মধ্যস্থ বীজগুলি সিদ্ধ খাইতে অতি সুস্বাদু প্যাকেট ।০

নূতন ফুল বীজ।

উৎকৃষ্ট ডবল জিনিয়া নানা বর্ণের এমন সংমিশ্রণ অন্যত্র মিলিবে না প্রতি প্যাকেট ।০

বালসাম বা দোপাটী দুগ্ধের ন্যায় সাদা বর্ণের এমেরিকান দোপাটী „ ।০

ক্যামেলিয়ার ন্যায় ফুল জাপানি „ ।০

সাদা ও লাল গোলাপের ন্যায় দোপাটী „ ।০

শ্রাবণ, ভাদ্র মাসের বপনোপযোগী বালসাম, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, কনভলভিউলাস, জিনিয়া, সনফ্লাউয়ার প্রভৃতি ফুল বীজ ১০ রকম মায় মাশুল ১

আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে বপনোপযোগী এষ্টার, প্যান্সি, ফ্লক্স, ভর্বিনা, মিগোনেট প্রভৃতি ফুল বীজ নমুনা বাক্স ৮ রকমের বাছাই [illegible] মায় মাশুল ১৷৷০

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

কৃষক।

৯ম খণ্ড। কার্ত্তিক, ১৩১৫ সাল। ৭ম সংখ্যা।

বৃক্ষ-চিকিৎসা।

"কৃষকে" ইতিপূর্ব্বে নানাবিধ কীট-জাত বৃক্ষ-রোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

গাছের শত্রু কীট পতঙ্গ দিগকে মোটামুটী দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর পোকা বৃক্ষের ত্বক, পত্র, ফুল, ফল প্রভৃতি চর্ব্বন করিয়া উদরসাৎ করে (ক চিত্র); অন্য শ্রেণীর পোকা শুণ্ডের দ্বারা উহা হইতে রস শোষণ করিয়া আক্রান্ত গাছকে বিপদাপন্ন বা বিনষ্ট করে (খ চিত্র)। এই দুই শ্রেণীর পোকার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার ঔষধের প্রয়োজন হয়।



প্রথম শ্রেণীর পোকার জন্ম আর্সেনিক প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করিতে হয়। আক্রমণকারী পোকা গাছের ত্বক, পত্র, ফুল বা ফলের সহিত বিষাক্ত ঔষধি উদরসাৎ করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বৃক্ষের যে অংশ মনুষ্য বা গবাদি পশু আহার করিবে তাহাতে আর্সেনিক প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ শোষণকারী পোকা আর্সেনিক প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য বৃক্ষের ত্বকের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশ করিতে পারে, তৎসমুদয়ের দ্বারাও বিনষ্ট হয় না। এই শ্রেণীর পোকার নিমিত্ত এমন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে যাহা ইহাদের শরীরে প্রবেশ করে; অথবা এমন আঠাযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহা প্রয়োগ করিলে ইহাদের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয় কিম্বা এমন বিষাক্ত ধূম প্রয়োগ করিতে হইবে যাহা গ্রহণ করিলে এই সব কীট বিনষ্ট হইতে পারে। এই দুই শ্রেণীর পোকার মধ্যে কোন কোন পোকা মৃত্তিকার নিম্নে বৃক্ষের মূল বা শিকড় আক্রমণ করে, কোন কোন পোকা কেবল বীজ বা ফল আক্রমণ করিয়া থাকে।

উল্লিখিত পোকা ভিন্ন কতকগুলি পোকা বৃক্ষের অভ্যন্তর কিম্বা ফলের অভ্যন্তর বিনষ্ট করে, কোন কোন পোকা সঞ্চিত শস্য ধ্বংশ করে, কোন কোন পোকা, যেমন মাছী, গৃহস্থের ঘরে অবস্থান করিয়া—অন্ন ব্যঞ্জনাদি খাদ্য বস্তু অশুদ্ধ করে। অন্য অনেক প্রকার পোকা জীব জন্তুর রক্তমাংস দ্বারা উদর পূরণ করে। এই সমস্ত নানা শ্রেণীর পোকার নিমিত্ত বিভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন হয়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি গৃহস্থের বস্ত্র-পোকাও আছে। তাহাদিগকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পোকার শ্রেণী বিভাগ অনুসারে ঔষধের শ্রেণী বিভাগ করা যায়, যথা :—

১। চর্ব্বণকারী পোকার নিমিত্ত
২। শোষণকারী পোকার „
৩। অভ্যন্তরস্থ পোকার „
৪। গৃহচারী পোকার „
৫। জীবদংশনকারী পোকার „

চর্ব্বণকারী পোকার ঔষধ।

এই শ্রেণীর পোকার নিমিত্ত আর্সেনিক ঘটিত ঔষধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্যারিস-গ্রীন (Paris green) ও লণ্ডন-পারপ্ল (London purple) নামক প্যাটেণ্ট ঔষধ প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত। সিলস্ গ্রীন (Scheele's green) ও লেড্-আর্সিনেট্ (arseniate of lead) নামক ঔষধ পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার ঔষধ অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। সিলস্ গ্রীন লণ্ডন পারপ্লের ন্যায় প্রযুক্ত হয়। ৪ ভাগ আর্সিনেট্-অব-সোডা (arseniate of soda) ও ১০ ভাগ এসিটেট্-অব-লেড (acetate of lead) পৃথক ভাবে জলে দ্রব করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে, যেন কাদার ন্যায় পদার্থ হয়। এইরূপে লেড-আর্সিনেট্ প্রস্তুত হয়। এই কাদার ন্যায় এক সের ঔষধ ৬৬০ সের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। লেড্-আর্সিনেট্ শুষ্ক থাকিলে ১ সেরে ১,০০০ সের জল মিশ্রিত করিতে হইবে। প্রত্যেক ১০০ সের জলে ১ সের চিটা বা মাত গুড় ও অর্দ্ধ সের চূণ মিশ্রিত করিলে ইহার গুণের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়।* অন্যান্য পূর্ব্বোল্লিখিত এক সের

* পূর্ব্বোক্ত লেড আর্সিনেট কাদা প্রয়োগ করিবার সময় উল্লিখিত পরিমাণ জলের (৬৬০ সের) সহিত ৩ সের চূণ ও ৬ সের চিটা মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। কৃঃ সঃ।

প্যাটেন্ট ঔষধের সহিত ১৫০০ হইতে ২৫০০ সের জল মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে—প্রথমতঃ যত পরিমাণ ঔষধ তত পরিমাণ চুণ (পানে খাওয়া চুণ) একত্র করিয়া অল্প জলে ঘুঁটিয়া কাদার ন্যায় পদার্থ করিতে হইবে। তাহার পর, পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত রূপে, জল যোগ করিয়া ভালরূপ নাড়িয়া গাছে প্রয়োগ করিবে। এক বিঘায় ১৫০ সের জল মিশ্রিত ঔষধ প্রয়োগ হয়। এক সের শুষ্ক ঔষধের সহিত ১০ সের শুষ্ক চুণ একত্র করিয়া পাতলা কাপড়ের থলিয়ায় বান্ধিয়া আলু কপি প্রভৃতি সবজিতে প্রয়োগ করা যায়। এক বিঘায় অর্দ্ধ সের শুষ্ক ঔষধ প্রয়োজন হয়। যে সবজী অনতি-বিলম্বে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবে, তাহাতে আর্সেনিক ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নয়; অর্থাৎ ঔষধ প্রয়োগের ২০ দিনের মধ্যে ইহা খাওয়া উচিত নয়। পঙ্গপাল উপস্থিত হইলে ১ ভাগ সেঁকোবিষ (white arsenic) ও ১ ভাগ গুড় ১০ ভাগ ময়দা বা ছাতুর সহিত জলে মাখিয়া স্থানে স্থানে, ২ বা ৩ হাত অন্তর, পাতায় পাতায় রাখিয়া দিলে পঙ্গপাল আগ্রহের সহিত বিষ খাইয়া ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে।

আর্সেনিক ঘটিত ঔষধ বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে বালক বালিকাগণ না খাইয়া ফেলে তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শোষণকারী পোকার নিমিত্ত।

এই শ্রেণীর পোকার নিমিত্ত, সাবান, গন্ধক, তামাকের জল, কেরোসিন তৈল, চুণ, লবণ, রজন, বাই-সালফাইড-অব-কার্ব্বন বিশেষ ফলপ্রদ। আমরা নিম্নে এই সকল ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি :—

সাবান।—কোমল দেহ বিশিষ্ট সকল প্রকার ক্ষুদ্র পোকা নষ্ট করিতে সাবান-জল বিশেষ উপকারী। মৎস্য তৈল দ্বারা প্রস্তুত সাবান সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, কষ্টিক সোডা অপেক্ষা কষ্টিক পটাস দ্বারা যে সাবান প্রস্তুত হয় তাহাই বৃক্ষ রোগে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে আমাদের উষ্ণ প্রধান দেশে কষ্টিক সোডার সাবান ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। মৎস্য তৈলের সাবান অভাবে সাধারণ বার-সোপ দ্বারা সাবান জল প্রস্তুত করিলেই চলিবে। পাঁচ সের জলে এক পোয়া সাবান কাটিয়া দিয়া উত্তপ্ত করিলেই সাবান জল প্রস্তুত হয়। তৎপরে ঈষৎ উষ্ণ বা শীতল হইলে সাবান জল সূক্ষ্মছিদ্র-বিশিষ্ট পিচকারী দ্বারা আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করিতে হইবে।

গন্ধক।—মাকড়শা জাতীয় পোকার নিমিত্ত গন্ধক-চুর অতি উত্তম ঔষধ। গন্ধক-খণ্ড অপেক্ষা গন্ধক-চুর অতি সস্তা। খণ্ড থাকিলে গন্ধক ধুলাবৎ চূর্ণ করিয়া পাতলা কাপড়ের থলিতে করিয়া ঝাঁড়িয়া ঝাড়িয়া আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করা যায়। এক প্রকার পিচকারী দ্বারাও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। গন্ধক-চুর সাবান জল, কেরোসিন জল, রজন জল প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়াও প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এই সকল ঔষধের সহিত ইহা মিশ্রিত করিতে হইলে ২৫০

সের ঔষধ জলের সহিত এক পোয়া বা অর্দ্ধ সের গন্ধক-চুর আবশ্যক হয়। গন্ধক-চুরের সহিত চুণ বা কষ্টিক ক্ষারের জল (lye) মিশ্রিত করিয়া ফুটন্ত তাপে উত্তপ্ত করিলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধজলের সহিত ইহা ভালরূপে মিশ্রিত হয়।

ক্ষার-গন্ধক-জল প্রস্তুত করিতে হইলে, অর্দ্ধ সের গন্ধক-চুর অল্প জলে মিশ্রিত করিয়া কাদার ন্যায় পদার্থ করিবে, তৎপরে এক পোয়া কষ্টিক সোডা চূর্ণ করিয়া ইহার সহিত মিশ্রিত করিবে। যতক্ষণ গন্ধক জলে গলিয়া না যায় ততক্ষণ জাল দিবে। গন্ধকে আগুণ না লাগে এই জন্য সময়ে সময়ে অল্প অল্প জল যোগ করিতে হইবে। পরে এই ঔষধ ১২৫ সের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা যায়।

গন্ধক চুণের সহিত যোগ করিতে হইলে, সম-পরিমাণ গন্ধক চূর্ণ ও পাথুরে চূর্ণ উভয় বস্তু জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অন্তত এক ঘণ্টা জাল দিয়া সংমিলিত করিতে হইবে। পরে ইহার এক সের ঔষধের সহিত ২৫ সের জল যোগ করিয়া ব্যবহার করিবে।

কেরোসিন তৈল।—কেরোসিন তৈল সাবান বা দধির সহিত মিশ্রিত করিলে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ প্রস্তুত হয়।

কেরোসিন তৈল সাবানের সহিত নিম্নলিখিত উপায়ে মিলিত হয়ঃ—

বার-সোপ	...	এক পোয়া।
জল	...	৫ সের।

সাবান প্রথমতঃ কাটিয়া জলে ফেলিয়া জাল দিবে। যখন সাবান জলের সহিত মিলিত হইয়া যাইবে তখন ঐ জল নামাইয়া কেরোসিন ১০ সের যোগ করিবে এবং দেশী মাখম তোলা চরকী দ্বারা মন্থন করিবে। পাঁচ মিনিট মন্থন করিলে ঔষধ প্রস্তুত হয়। এক ভাগ মিশ্রণের সহিত ৬—১০ ভাগ জল যোগ করিয়া আক্রান্ত বৃক্ষে প্রয়োগ করিবে। যে স্থানে জলে লবণ আছে তথায় কেরোসিন সাবান মিশ্রণ উত্তমরূপে প্রস্তুত হয় না। তথায় কেরোসিন তৈল দধির সহিত মিশ্রিত করাই কর্ত্তব্য।

কেরোসিন দুগ্ধ মিশ্রণ।

দধি	...	...	১ ভাগ।
কেরোসিন	...	...	২ ভাগ।

মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চরকী দ্বারা পাঁচ মিনিট মন্থন করিলে উভয় পদার্থ মিলিত হয়। পরে ৮—১৫ ভাগজল মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করিতে হইবে। ঔষধ এমন অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিবে না যাহাতে ঔষধ গাছ হইতে গড়াইয়া পড়ে। কোন কোন পোকার নিমিত্ত এক সের ঔষধে ১৫ হইতে ২০ সের জল মিশ্রিত করিয়াও ব্যবহার করা যায়।

রজন মিশ্রণ।—পত্র পোকার নিমিত্ত রজন-মিশ্রণ উত্তম ঔষধ। নিম্নলিখিত উপায়ে ইহা প্রস্তুত হয়ঃ—

রজন চূর্ণ	...	...	১ সের।
সোডা	...	...	অর্দ্ধ সের।

একত্রে কেরোসিন তৈলের টিনে উহা ডুবিয়া যায় এরূপ পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া জাল দিবে। যতক্ষণ জলের সহিত উক্ত ঔষধ মিশ্রিত না হয় ততক্ষণ জাল দিতে হইবে। পরে ক্রমে ক্রমে জল মিশ্রিত করিবে এবং ফুটাইবে। এইরূপে মোট ১০ সের পরিমাণ জল মিশ্রিত হইলে সাবানের ন্যায় পদার্থ হইবে। প্রায় দুই ঘণ্টা জাল দিলে ঔষধ প্রস্তুত হয়। কোন পাত্রে কিঞ্চিৎ জলের সহিত দুই বা তিন ফোঁটা ঔষধ দিলে যদি ঐ জল ক্ষণকাল পরে নির্ম্মল থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে ঔষধ প্রস্তুত হইল। উক্ত রজন মিশ্রণের সহিত ৩০ সের জল

মিশাইলে উগ্র মিশ্রণ হইল এবং ৫০ সের জল মিশাইলে স্বাভাবিক মিশ্রণ হইল।

তামাকু-মিশ্রণ।

তামাক	...	...	১ সের
জল	...	...	১০ সের

একত্রে অর্দ্ধ ঘণ্টা জ্বাল দিলে তামাকু-মিশ্রণ প্রস্তুত হয়। ইহার সহিত এক পোয়া বার-সাবান যোগ করিলে ইহা আরও অধিক উপকারী হয়। তৎপর এক ভাগ মিশ্রণের সহিত ৭ ভাগ জল যোগ করিয়া বৃক্ষে প্রয়োগ করিবে।

কার্ব্বন বাই-সাল্‌ফাইড্‌।—কার্ব্বন-বাই সাল্‌ফাইড্‌ ব্যবহার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে "কৃষকে" বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী।

গাঁদা ফুলের উপকারিতা।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী ১৩১৪ সালের ১লা চৈত্র তারিখের 'বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটী বিশেষ উপকারী ও প্রয়োজনীয় বলিয়া কোন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া প্রবন্ধটী অবিকল উদ্ধৃত করিয়া 'কৃষক' পত্রে মুদ্রিত হইবার জন্য প্রেরণ করিলাম।

বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে গাঁদা ফুল অনেক রোগের মহোপকারী ঔষধ। ইহার ন্যায় সুলভ অথচ এরূপ উপকারী ঔষধ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। গাঁদার পত্র ও পুষ্প উভয়ই যার পর নাই উপকারী। ফুলের বীজ (ফুলের যে কৃষ্ণাংশ পুতিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়) যাবতীয় শুক্র দোষ দূর করে। আকবর বাদসাহ আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসা শাস্ত্রে মিশাইয়া এক অপূর্ব্ব পুস্তক রচনা করাইয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে গাঁদা ফুলের বীজ শুক্র স্তম্ভনের জন্য ব্যবহার বিধি আছে। একটী গাঁদা ফুলের সমুদয় বীজগুলি প্রতিদিন চিনির সহিত সেবনে শুক্র মেহের (অজ্ঞাত সারে শুক্র স্খলন রোগের, বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায়) আশ্চর্য্য উপকার হয়।

দেহের সার শুক্র ধাতু। এই ধাতু যে পরিমাণে দেহে রক্ষিত হইবে, মানবের সেই পরিমাণে দেহ মন সুস্থ এবং সতেজ থাকিবে। শুক্র ধাতুতে জীবনশক্তি বিশেষরূপে নিহিত থাকে বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন "শুক্র ধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ।" তাহার অর্থ শুক্র ধাতুই প্রাণ স্বরূপ। আজকাল মার্কিন দেশে এক অদ্ভুত ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার নাম 'রবার্ট হিউলি লিঙ্ক কোতি' এই ঔষধ দেহাভ্যন্তরে রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে রাজ যক্ষা (ক্ষয়কাশ), পক্ষাঘাত, মৃগী, শূল, জরা প্রভৃতি রোগে সমধিক ফল হয়। শুক্র ধাতু ত্বকাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলে এ সকল দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

উপকার ব্যতীত কোন দোষের হইতে পারে না বিবেচনায় এই প্রসঙ্গে ২।১টী জন্তুর কথাও উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর মুষ্কের ভূয়োভূয়ঃ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত—ডাক্তার ব্রাউন সেফার্ড সাহেব শশক মুষ্কের নির্য্যাস ব্যবহার করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় যুবকের ন্যায় বলশালী হইয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ মতেও পাঁটার মুষ্ক দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ ঘৃতে ভাজিয়া ব্যবহার করিলে উত্তমরূপ সুফল লাভ করা যায়। এতদ্ব্যতীত গন্ধ মার্জ্জার অর্থাৎ খটাস প্রভৃতি জন্তুর মুষ্কেও সমফল দর্শে। এইরূপ অনেক জন্তুর শুক্র ধাতু ও

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিধি চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে।

এক্ষণে ফলকথা এই,—যাঁহারা শুক্র ধাতু রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা এই গাঁদা বীজে অশেষ ফল পাইবেন। মেধ, আয়ু, বল সমস্তই এই ধাতুর উপর নির্ভর করে। অনিচ্ছা সত্তে শুক্র ধারণ বন্ধ করিতে ইহা একটী বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

দেখিয়া দুঃখ হয়, আজকাল অনেক যুবা পুরুষ ক্ষয় রোগ প্রাপ্ত হইতেছেন, ইহার কারণ আর কিছু নহে। পক্ষান্তরে আবার ইহাও দেখা যায়, অনেকেরই বীর হইবার চেষ্টা হইতেছে; ইহা অতি সুখের বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, "ধীরো জিতেন্দ্রিয়ো বীরঃ।" ধীর ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষই বীর। অতএব এস্থলে দেখা উচিত যে, সেই বীরভাব রূপ কঠোর ব্রত পালন করিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে শুক্র ধাতু রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। আমার বিশ্বাস, এই সামান্য ও সুলভ গাঁদা ফুলের বীজ ঐ মহাব্রতের অনেক সহায়তা করিতে পারে।

মূত্র যন্ত্রের উপর গাঁদা ফুলের ক্রিয়া,—মূত্র পরিষ্কার না হইলে ৪।৫টী গাঁদা ফুল, বিশেষতঃ লাল ছোট, পাঁচনের ন্যায় জলে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে প্রস্রাব পরিষ্কার এবং যন্ত্রণা দূর হইবে। শোধিত শিলাজতুর সহিত গাঁদা ফুলের রস সেবন করিলে প্রস্রাব রোধ অর্থাৎ মূত্র কৃচ্ছ্র রোগ অচিরে আরোগ্য হয়।

ক্ষত রোগে গাঁদা পাতা,—পৃষ্ঠব্রণ এবং অন্যান্য দুষ্ট ক্ষতে গাঁদা পাতা বাঁটিয়া অল্প ময়দা বা সুজির সহিত মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করতঃ পুলটিস দিলে ব্রণের সমস্ত দোষ দূর হয়। এই পুলটিস দিতে দিতে পৃষ্ঠব্রণ ক্রমশঃ নরম হইয়া আইসে এবং পরে উহা হইতে সমস্ত দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া গিয়া শীঘ্রই আরাম হয়। ছোট গোয়ালে পাতার প্রলেপেও বিশেষ উপকার দর্শে বটে, কিন্তু উহাতে ব্রণ স্থান চুলকায়, গাঁদা পাতায় তাহা হয় না। যে কার্ব্বাঙ্কলে অর্থাৎ পৃষ্ঠ ব্রণে পিত্ত প্রকোপ অধিক থাকে, তাহাতে গুলঞ্চ বাটিয়া তাহার পুলটিস দিয়া, পরে গাঁদা পাতার পুলটিস দিলে অতি চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

এইরূপ দেহের কোন স্থানে কোন কারণ বশতঃ বিশেষ আঘাত লাগিয়া যদি ঐ স্থান অতিশয় ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, কিম্বা ক্ষত হইয়া শোথ হয়, সহজে আরাম হওয়া অসম্ভব বোধ হয়; এমন কি উহা সন্ধি স্থল হইলেও কতিপয় গাঁদা পাতা সিদ্ধির জলে বাটিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করতঃ সেই ক্ষতে, অথবা বেদনাযুক্ত স্থানে প্রলেপ দিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্রই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষত না হইলে ঘৃতের প্রয়োজন হয় না। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার প্রলেপ দিলেই যথেষ্ট হয়।

ক্ষতের জন্য গাঁদা পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া বা উহার টিংচার জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত ধৌত করিলে অতি শীঘ্র উপকার দর্শে। যাঁহাদের আইডোফরম প্রভৃতি উগ্র ঔষধ সহ্য হয় না, তাঁহাদের পক্ষে এই গাঁদা পাতা প্রয়োগ অতীব হিতকর।

অনেক দিনহীন ক্ষত রোগী এই সুলভ ঔষধের উপকারিতা ও ব্যবহার জানিতে পারিলে উপকৃত হইবেন এই আশায়, আমি এই প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহসী হইলাম। অনেক ব্যয়সাধ্য ড্রেসিং যাঁহাদের ক্রয় করিবার সামর্থ নাই, তাঁহাদের এই ঔষধের গুণ জানাইয়া দিয়া উপকার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে ক্ষতাদি সারিয়া যায় এবং পুঁযাদি জমিতে পায় না।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন,



কৃষক। কার্ত্তিক, ১৩১৫।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কার্য্য তালিকা।

বঙ্গদেশে আপাততঃ পাঁচটি কৃষিক্ষেত্র রহিয়াছে:—বর্দ্ধমান, ডুমরাঁও, বাঁকিপুর, সবর ও কটক। এতদ্ভিন্ন হুগলি জেলায় চুচুঁড়ার নিকট একটি নূতন কৃষিক্ষেত্র করিবার জন্য ৬৩০/০ বিঘা জমি লওয়া হইয়াছে। নিম্ন বঙ্গের ব-দ্বীপ সম্ভূত মৃত্তিকার ইহা প্রতিনিধি স্বরূপ হইবে। ছোট নাগপুর অঞ্চলের কাঁকুরে মাটির প্রতিনিধিরূপ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের জন্যও আবশ্যকীয় অনুসন্ধান চলিতেছে। এই সমস্ত সাধারণ কৃষি পরীক্ষার জন্য ক্ষেত্র ব্যতীত বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যেও কয়েকটি ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে যথা:—বহরমপুর ও পুর্ণিয়ায় পাট বীজ ক্ষেত্র, চক্রধরপুর তুলা ক্ষেত্র ও চাঁইবাসা তসর ক্ষেত্র।

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পুষায় যে ভারতীয় কৃষি সমিতির অধিবেশন হয় তাহার বিবরণীতে প্রকাশ যে বর্ত্তমান বৎসর পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্র সমূহে নিম্নলিখিত কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইবে।

বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্র:—পাট সম্বন্ধীয় পরীক্ষা:—(১) সার, (২) বিভিন্ন সময় ফসল কর্ত্তন, (৩) জাতি, (৪) গাছের ব্যবধান, (৫) বপন ও ছিটান, (৬) ধান্যের সহিত পর্য্যায়, (৭) আলুর সহিত পর্য্যায়।

ধান্য সম্বন্ধীয় পরীক্ষা:—ক। সার ১ম শ্রেণী পরিমাণ-মূলক; ২য় শ্রেণী, গুণ-মূলক; ৩য় শ্রেণী, হরিৎ সার। খ। জাতি। গ। চাষ;—(১) ঘন ও পাতলা ছিটান, (২) রোপণের সময় গাছের ব্যবধান, (৩) রোপণের সময় প্রত্যেক গর্ত্তে চারার সংখ্যা।

আলু সম্বন্ধীয় পরীক্ষা:—(১) সার, (২) জাতি। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা সমূহ ব্যতীত বীজ বিতরণের জন্য ধান্য, পাট ও ইক্ষুর নির্ব্বাচিত জাতি উৎপাদিত করা হইবে ও সিমুল আলুর চাষ করা হইবে।

বাঁকিপুর কৃষিক্ষেত্র:—এক্ষণে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে। পরীক্ষা সমূহ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যাহাতে সমস্ত ক্ষেত্রের অবস্থা এক প্রকার হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। বীজ বিতরণের জন্য ইক্ষু, ধান, ছোলা, জোয়ার ও শাক সব্জী উৎপাদিত হইবে।

ডুমরাঁও কৃষিক্ষেত্র:—পূর্ব্ব বৎসরের ইক্ষু ও সরিষা সম্বন্ধীয় পরীক্ষা বর্ত্তমান বৎসরেও চলিবে:—ইক্ষু:—(১) সার, (২) জাতি, (৩) রোপণ প্রণালী, (৪) পর্য্যায় প্রণালী।

সরিষা:—(১) জাতি।

বীজ বিতরণের জন্য ইক্ষু সরিষা ও অরহরের নির্ব্বাচিত জাতি উৎপাদিত হইবে।

সবর কৃষিক্ষেত্র:—কৃষি কলেজ নির্ম্মাণের কার্য্য ও ক্ষেত্র পত্তনের কার্য্য চলিবে। বীজ বিতরণের জন্য ভুট্টা, অরহর এবং জোয়ার উৎপাদিত হইবে।

কটক কৃষিক্ষেত্র:—পূর্ব্ব বৎসরের পরীক্ষা সমূহ চলিবে:—

পাট:—(১) সার, (২) বিভিন্ন সময়ে কর্ত্তন,

(৩) জাতি, (৪) আমন ধান্যের সহিত পর্য্যায়, (৫) আলুর সহিত পর্য্যায়।

ধান্য ঃ—(১) সার, (২) জাতি, (৩) চাষ প্রণালী—

(ক) রোপণের সময় প্রত্যেক গর্ত্তে চারার সংখ্যা ১, ২, ৪ ও ৮। (খ) একার প্রতি ছিটান বীজের পরিমাণ ২৫, ৩০ ও মধ্যমাকৃতি শস্যের ৪০ সের। (গ) বিভিন্ন প্রকার লাঙ্গল ঃ—কটক, বর্দ্ধমান, শিবপুর, মেস্তন ও হিন্দুস্থান।

জল সেচন প্রণালী ঃ—(১) সাধারণ (২) ১৫ দিবস অন্তর বিভিন্ন মাত্রায় (৩ ও ৬ ইঞ্চি) জল প্রয়োগ।

আলু ঃ—(১) সার, (২) জাতি।

চিনের বাদাম ঃ—(১) সার, (২) জাতি, (৩) পর্য্যায়।

ইক্ষু ঃ—জাতি। হরিদ্রা।

বীজ বিতরণের জন্য পাট, ধান্য, ইক্ষু, চিনার বাদাম, হরিদ্রা ও পেঁপের চাষ হইবে।

চুঁচুড়া ক্ষেত্র ঃ—এই কৃষিক্ষেত্র পত্তনের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

বহরমপুর ও পূর্ণিয়া পাটবীজ ক্ষেত্র ঃ—এই দুইটী ক্ষেত্রের কার্য্য চলিতে থাকিবে।

চক্রধরপুর তুলা ক্ষেত্র ঃ—বীজ বিতরণের জন্য বুড়ী কার্পাসের গাছ প্রতি বীজ নির্ব্বাচন কার্য্য চলিবে ও একটি সার সম্বন্ধীয় পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

চাঁইবাসা তসর ক্ষেত্র ঃ—বীজের জন্য এক বৎসরের গুটি বিতরিত হইবে।

প্রত্যেক ক্ষেত্রান্তর্গত কার্য্য ব্যতিরেকে কূপ খনন সম্বন্ধে পরীক্ষা হইবে ও শ্রীপুরে গবাদি পশুর বংশোন্নতি সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতে থাকিবে। রেশম চাষের উন্নতির জন্য কতকগুলি প্রস্তাব হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাব অনুসারে বর্ত্তমান বৎসর কার্য্য হইবার আশা আছে।

পূর্ব্বোক্ত কার্য্য তালিকা হইতে প্রকাশ পাইবে যে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ অনেকগুলি গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সকল গুলি সমাধা করিয়া উঠিতে পারিবেন কি না এবং সকল গুলি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের লোক বল আছে কি না সে সম্বন্ধে সমিতিতে কতিপয় সভ্য প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আমাদের অনেক ইংরাজ সমালোচক আমাদিগকে এই বলিয়া দোষ দিয়া থাকেন যে আমাদের আকাঙ্ক্ষা অধিক, আমরা পূর্ব্ব পশ্চাৎ না ভাবিয়া আয়ত্তের বহির্ভূত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি এবং তজ্জন্য সফলতা লাভ করা আমাদের ভাগ্যে যুটিয়া উঠে না। কৃষি বিভাগের বর্ত্তমান তালিকা দেশীয় ব্যক্তি দ্বারা প্রস্তুত না হইলেও ইহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টার মিঃ গোরলে বলেন যে মার্কিন দেশে কৃষিশিক্ষা-প্রাপ্ত তিনটি ছাত্র আপাততঃ তাঁহার বিভাগে যোগদান করিয়াছে এবং অনতি বিলম্বে আরও পূর্ব্বোক্ত প্রকার চারি জন ছাত্র পাওয়া যাইবে। এই সমস্ত ছাত্রকে কৃষি ক্ষেত্র সমূহের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করা হইবে। ইহার উত্তরে মিঃ শ্লাই মত প্রকাশ করেন যে 'এই সমস্ত ব্যক্তিকে একেবারে স্বাধীনভাবে কৃষি ক্ষেত্রের অধ্যক্ষরূপে কার্য্য করিতে দেওয়া অত্যন্ত অবিবেচনার কার্য্য। নূতন কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োগের পূর্ব্বে পুরাতন কৃষি ক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত কিছু দিন কার্য্য না করিলে দেশের পক্ষে কোন প্রকার কৃষি প্রণালী উপযুক্ত অথবা অনুপযুক্ত সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মান অসম্ভব। সমিতির বিবরণীতে এই অকাট্য যুক্তির কোন প্রত্যুত্তর

দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষি বিষয়ে আমরা রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধি নহি। তথাপি ইহা স্থির যে, দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কৃষি প্রণালী প্রচলিত আছে সেগুলি বহুকালব্যাপী পরীক্ষার ফল। ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় তৎসমুদয় অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত প্রণালী হইতে পারে না। সেই জন্য এতদ্দেশে কৃষি বিষয়ক উন্নতি সাধন করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য করিতে হয়। পক্ষান্তরে বৈদেশিক অভিজ্ঞগণ ও বিদেশ প্রত্যাগত দেশীয় কৃষিতত্ত্ববিদগণ অনেক সময় কেবল পরীক্ষার খাতিরেই পরীক্ষা করেন। ইহাতে অকারণ দেশের অর্থক্ষয় হইয়া থাকে। যদি উপরোক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যক্তিকে কিয়দ্দিবস দেশ প্রচলিত প্রথা সমূহ অধ্যয়ন করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

ডাক্তার ম্যান্ বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কার্য্য তালিকা সম্বন্ধে আরও একটি আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কার্য্য তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইতেছে। উত্তরে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের মিঃ স্মিথ বলেন যে যখনই কোন কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপিত হয়, তখনই তাহার কোন উদ্দেশ্য আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। অবশ্য উদ্দেশ্য না থাকিলে কোন কার্য্য হয় না। কিন্তু উদ্দেশ্য গুরুতর ও অকিঞ্চিৎকর উভয়ই হইতে পারে। কোন কৃষি ক্ষেত্র স্থাপনের উদ্দেশ্য কেবল আড়ম্বর-প্রিয়তা চরিতার্থ করণ কিম্বা কোন জটিল কৃষি-বিষয়ক তথ্য নির্ণয় কার্য্য সমাধান জন্য হইতে পারে। বঙ্গীয় কৃষি ক্ষেত্র সমূহের প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য কি, তাহা যদি কর্ত্তাগণ সাধারণকে বুঝাইয়া দেন তাহা হইলে লোকের মনে দ্বিধা থাকে না। প্রত্যেক কৃষি ক্ষেত্রটিই কি নির্দ্দিষ্ট প্রকার ভূখণ্ডের প্রতিনিধি? অথবা উক্ত ক্ষেত্র সমূহে যে সমস্ত পরীক্ষা হইতেছে, সেগুলি দেশের অবস্থা ও অভাব পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়াছে? কৃষি বিভাগ স্থাপনের সময় হইতে এপর্য্যন্ত এমন অনেক পরীক্ষা হইয়াছে, যে সমুদয় অনুষ্ঠিত না হইলেও দেশের কোন ক্ষতি হইত না। কেবল কর্ম্ম-গৃহে অথবা যন্ত্রাগারে বসিয়া পরীক্ষার উদ্ভাবনা করিলে দেশীয় কৃষির উন্নতি সাধন করা হইল না। প্রকৃত পক্ষে কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইলে দেশীয় কৃষকবর্গের সহিত ঘনিষ্টতা স্থাপন করিয়া তাহাদের অভাব ও কার্য্য প্রণালী বুঝিতে হইবে এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থ পরীক্ষা সমূহের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অনেক অভিজ্ঞ, সাধারণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অভিজ্ঞ, হইলেও দেশীয় অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। তাঁহাদের পক্ষে প্রথম আবশ্যকীয় কার্য্য দেশীয় কৃষি পদ্ধতি সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম করণ এবং তৎপরে যে উন্নতি কৃষকের সাধ্যায়ত্ত হয়, সেই রূপ উন্নতি প্রবর্ত্তন উদ্দেশ্যে পরীক্ষার অনুষ্ঠান করণ। নতুবা দেশীয় কৃষক ও কৃষি প্রণালীর উপর একবারে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বিদেশীয়

প্রণালীর প্রবর্ত্তনের চেষ্টা ও কৃষি কিম্বা কৃষিজীবির প্রকৃত উন্নতির পন্থা বিবেচনা না করিয়া কৃষি পরীক্ষা আরম্ভ করা কেবল বাতুলতার কার্য্য।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কার্য্য বিবরণী।

আমরা এতক্ষণ বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কার্য্য তালিকার কথা বলিলাম। তালিকাভুক্ত কার্য্যাদি কেবল মাত্র আরদ্ধ হইয়াছে। উহাদের ফলাফল ভবিষৎ গর্ভে নিহিত। এক্ষণে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ এপর্য্যন্ত কি কি উল্লেখ যোগ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহার আলোচনা করা যাউক। সম্প্রতি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের সহকারী ডাইরেক্টার মিঃ স্মিথ এতৎসম্বন্ধে আমাদের নিকট একটি বিবরণী প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তাহাকেই ভিত্তি করিয়া আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

মিঃ স্মিথ প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন—বীজ, সার ও কৃষি যন্ত্রাদি। বীজের সম্বন্ধে তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন যে অনেক বিদেশীয় বীজই ভারতীয় বীজের সমতুল্য নহে। যখন কৃষি সংস্কারের আন্দোলনের প্রথম বন্যা প্রবাহিত হয়,তখন কোন কোন সরকারী কৃষি কর্ম্মচারীই মত প্রকাশ করিতেন, যে বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় বীজ আমদানি ভিন্ন আমাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত কৃষির উন্নতির আর উপায় নাই। সুখের বিষয় যে সে বন্যা চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার দ্বারা আনীত মূলহীন মত সমূহও তাহার সহিত অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। দেশে নির্ব্বাচনের অভাবে সাধারণ বীজের গুণ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে এখনও স্থানে স্থানে প্রত্যেক ফসলেরই দুই এক জাতীয় উৎকৃষ্ট বীজ পাওয়া যায়। যত্ন ও সংরক্ষণের অভাবে এগুলিও কালে লয় প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে আবশ্যক এই যে, এই সমস্ত উৎকৃষ্ট জাতীয় বীজগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা ও বিস্তৃত ভাবে উহাদের চাষ আরম্ভ করা। জল, বায়ু, মৃত্তিকা ও স্থানীয় অবস্থা হিসাবে দেশীয় বীজকে বিদেশীয় বীজ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইবার আশা করা সম্পূর্ণরূপ বিজ্ঞান সম্মত। কার্য্যতঃও তাহাই দেখা যাইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্মিথ সাহেবের উৎকৃষ্ট বীজের তালিকা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। সরকারী কৃষি ক্ষেত্র সমূহে নানারূপ দেশীয় ও বিদেশীয় বীজ সমূহ পরীক্ষিত হওয়ার পর নিম্নলিখিত জাতিগুলি উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে ঃ—গোধূম—মজঃফরনগর (শুষ্ক ও জল সেচনের সুবিধাযুক্ত স্থানের জন্য), লাল দেশী (অপেক্ষাকৃত আর্দ্র মৃত্তিকার জন্য); আলু—নইনিতাল ও পাটনা জাতীয়; যই—দুমরাঁও; জোয়ার—সারণ; অরহর—সারণ; ভূট্টা—জৌনপুর; ছোলা—পাটনা; ধান্য – মধ্য প্রদেশীয় আউস ও ব্যক্তিগত আবশ্যক ও সুক্ষ্মতা হিসাবে কতিপয় জাতীয় আমন ধান্য; ইক্ষু—খেড়ী ও জল জমা জমির জন্য—ইকরি; পাট—সিরাজগঞ্জের দেশওয়াল, মৈমনসিংহের বড় পাট ও রঙ্গপুরের হাউতি; সরিষা—জব্বলপুর ও রায়পুর। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক উল্লিখিত বীজগুলির মধ্যে অনেক গুলিই বহু পূর্ব্ব হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া জানা ছিল। এক্ষণে কৃষি বিভাগের পরীক্ষায় যে তাহাই সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাতে অবশ্য অনেকেই আশ্বস্ত হইবেন।

শস্য উৎপাদনে বীজের পরেই সার প্রধান দ্রব্য। নানা কারণে আমাদের দেশে যে সারের পরিমাণ কমিয়া আসিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। জমিতে সার কমিতে কমিতে জমি এরূপ অবস্থায় আসে যে তদপেক্ষা জমি আর কম সারযুক্ত হইতে পারে না। আমাদের দেশে অনেক স্থলে মৃত্তিকা এইরূপ "হ্রাসহীন নিম্ন মাত্রার" (irreducible minimum) অবস্থায় আসিবার আর অধিক বিলম্ব নাই—ইহা মিঃ স্মিথের উক্তি। যখন ফসল যে পরিমাণ সার গ্রহণ করে, তাহা জমিতে যে পরিমাণ ব্যবহার্য্য সার বিশ্লেষণ দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহার সমতুল্য দাঁড়ায়, তখন কৃষিকার্য্য যে নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এক্ষণে উপায় কি? অপরাপর দেশের ন্যায় আমরা সারের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে পারি না। আমাদের কৃষকেরা দশ মণ খৈল ক্রয় করিতে হইলেই কষ্ট বোধ করে। পক্ষান্তরে সার না হইলেও কৃষিকার্য্য চলিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় দেশ কাল ও পাত্র হিসাবে কিরূপ সার চলিতে পারে তাহাই আলোচ্য বিষয়।

বঙ্গদেশের মৃত্তিকা এক প্রকার নহে। স্থান বিশেষে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। সকল প্রকার মৃত্তিকার জন্য এক প্রকার সারের ব্যবস্থা হইতে পারে না এবং সকল প্রকার ফসলেও এক প্রকার সার চলে না। দাউল জাতীয় উদ্ভিদ চূণ ও পটাশ সাহায্যে সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ধান্য প্রভৃতির পরিপুষ্টির জন্য নাইট্রোজেন ও ফস্ফরিক এসিড্ আবশ্যক। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার ফসলে বিভিন্ন প্রকার সার আবশ্যক। কিন্তু সার সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম আছে। উদ্ভিদের যে কয় প্রকার খাদ্য আবশ্যক হয় তন্মধ্যে মৃত্তিকায় যেটির সর্ব্বাপেক্ষা কম অংশ থাকে, তদ্দারাই উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়। অর্থাৎ যদি ৩০ মণ ধান্য উৎপাদন করিতে ২০ সের নাইট্রোজেন, ১৫ সের ফস্ফরিক অম্ল, ১৫ সের চূণ ও ১৭৷৷০ সের পটাশ আবশ্যক হয় এবং জমিতে সমস্ত উপাদান উপযুক্ত মাত্রায় থাকে, কেবল নাইট্রোজেন ১০ সের থাকে, তাহা হইলে অপরাপর উপাদান যথেষ্ট মাত্রায় থাকিলেও কেবল ১০ সের নাইট্রোজেনের সমতুল্য (অর্থাৎ ১৫ মণ) ধান্য উৎপাদিত হইবে। ইহার দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, সকল জমিতে একহারে সার দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু বঙ্গের সর্ব্ব স্থলেই একটা অভাব,—সাধারণ অঙ্গারক পদার্থের অভাব। সার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার সময় বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। স্মিথ সাহেব বলিয়াছেন,—"To recomend a manurial application that would cost money to a poor cultivator and that application to have no effect on the crop can only end in bringing discredit on the Department and a feeling of distrust that would not be eradicated for a generation." অর্থাৎ কৃষকের অর্থব্যয় হইবে এরূপ কোন সার প্রয়োগ অনুমোদন করিলে এবং তদ্দারা ফসলের কোন উপকার না হইলে কৃষি বিভাগের কেবল অখ্যাতি হইবে, এবং বিভাগের উপর জনসাধারণের এরূপ অবিশ্বাস জন্মিবে যে তাহা এক পুরুষ সময়েও দূরীভূত হইবে না। আমরা ইহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। স্মিথ সাহেব সরকারী লোক। সরকারের বদনাম হইবে ইহা অবশ্য তাঁহার বিশেষ ভাবনা।

কিন্তু ইহাতে দেশের আরও অমঙ্গল আছে। বার বার এই প্রকার নূতন প্রথায় বিফল প্রয়াস হইলে লোকের আর বৈজ্ঞানিক প্রথার উপর আস্থা থাকিবে না এবং যথার্থ উপকারী সংস্কার প্রবর্তন করা দুরূহ হইবে।

ফসল উৎপাদনের জন্য চারিটি প্রধান উপাদান আবশ্যক (১) নাইট্রোজেন, (২) পটাশ, (৩) ফসফরিক অম্ল ও (৪) চুণ। যে সকল সারে এই সমস্ত উপাদান অল্প বিস্তর মাত্রায় বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সাধারণ সার বলে যথা গোবর সার, রেড়ী, সর্ষপ ও তিলের খৈল এবং সবুজ সার। পক্ষান্তরে যে সমস্ত সার বিশেষ উপাদান প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে তৎ তৎ উপাদান প্রধান সার বলে—যেমন নাইট্রোজেন প্রধান—সোরা, সলফেট্ অব্ অ্যামোনিয়া; ফস্‌ফরিক অম্ল প্রধান—হাড়ের গুঁড়া, সুপার ফস্‌ফেট; পটাশ প্রধান—কাষ্ঠের ছাই, সোরা; চুণ প্রধান—হাড় গুঁড়া, কাঁকর ও চুণ। এই সকল সারের মধ্যে সবুজ সার, খৈল ও গোবর সারে বিশেষ অপচয়ের সম্ভাবনা নাই। খনিজ সার এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে ধুইয়া যাইতে পারে। কৃষি বিভাগ কয়েক বৎসর পরীক্ষার ফলে নিম্নলিখিত সার অনুমোদন করেন:—ধান্য—৫০ মণ গোবর সার+ ধইঞ্চার সবুজ সার; আলু—২০০ মণ গোবর সার+ ২০ মণ রেড়ীর খৈল; পাট—১০০ মণ গোবর সার+৭ মণ রেড়ীর খৈল; ইক্ষু—২০০ মণ গোবর সার+৮ মণ রেড়ীর খৈল। কিন্তু কি পরিমাণ জমিতে উক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ ১ একর (তিন বিঘা) জমির জন্য উক্ত পরিমাণ সারের ব্যবস্থা হইয়াছে। কৃত্রিম সারের প্রচলন বর্তমান অবস্থায় আশা করা একবারেই অসঙ্গত। সুতরাং যাহা সহজ প্রাপ্য ও সুলভ যেমন গোবর সার, খৈল, ছাই, সবুজ সার প্রভৃতি তাহাদেরই প্রচলন অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কৃষি যন্ত্রাদি সম্বন্ধে স্মিথ সাহেবের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। এতদ্দেশে এখনও মজুরের পারিশ্রমিক অধিক নহে। যে সকল স্থানে শ্রমিকের সংখ্যা কম এবং উহাদের বেতন অধিক সেই সকল স্থলেই কৃষিকার্য্যে কল কব্জা প্রবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। এখনও আমাদের দেশীয় যন্ত্রপাতি ও সুলভ মূল্যের দুই চারিটি নব উদ্ভাবিত কৃষিযন্ত্র দ্বারা কার্য্য বেশ চলিতেছে। সুতরাং এ সময়ে নূতন যন্ত্রাদিতে অর্থ ব্যয় না করিয়া সেই অর্থ সার বীজ প্রভৃতিতে ব্যয় করিলে অধিক উপকার হওয়ার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণীর আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, যে কৃষি বিভাগ কোন নব তথ্যের আবিষ্কার করেন নাই। কতকগুলি পুরাতন বিষয়ের সারবর্ত্তা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহাও অবশ্য সামান্য কার্য্য নহে। ইহার জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। কারণ কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির মনে এই ধারণা বদ্ধ মূল রহিয়াছে যাহা বহুকাল প্রচলিত ও প্রাচীন তাহাই অবৈজ্ঞানিক এবং যাহা নব প্রবর্ত্তিত তাহাই বৈজ্ঞানিক। পুরাতন প্রথা যে বহুকাল লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে ইহাও সত্য যে কালক্রমে ঐ সকল প্রথা নানা প্রকার কুসংস্কার জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের কার্য্য এখন উক্ত কুসংস্কার জাল হইতে আদিম সত্যকে বিমুক্ত করিয়া আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের সাহায্যে উক্ত ভিত্তির উপর আমাদের কৃষিকার্য্য পুনর্গঠন করা। দেশে যতই অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি প্রবল হইবে ততই ভ্রান্ত বিশ্বাস সমূহ দূরীকৃত হইবে। আমরা এস্থলে স্মিথ সাহেবের একটি উক্তির খণ্ডন

না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলেন যে, দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ কৃষি বিষয়ে মৌলিক অনুসন্ধানের ভার কৃষি বিভাগের উপর অর্পণ করিয়া তাঁহারা প্রামাণিক তথ্যের প্রদর্শন ক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকুন। ইহা কিন্তু আদৌ সমিচীন নহে। যাঁহাদের শিক্ষার ইচ্ছা ও উপায় আছে তাঁহারা মৌলিক কৃষি-তত্ত্ব অনুসন্ধান না করিবেন কেন? দুই একবার তাঁহারা বিফল মনোরথ হইবেন সত্য, কিন্তু তাহাতে অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি আরও জাগিয়া উঠিবে। দেশের মঙ্গলের জন্যও তাহাই আবশ্যক। কোন বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নহে। আমরা অনেক দিবস এই ভাবেই কালযাপন করিয়াই বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি।

ধূমবিহীন কেরোসিন ল্যাম্প।

উপহার স্বরূপ আমরা একটী ল্যাম্প প্রাপ্ত হইয়াছি। চিম্‌নি ব্যতীত ইহাতে বেশ উচ্চ আলো হয়। আলোটী গৃহস্থের ব্যবহার উপযোগী করিয়া সুকৌশলে গঠিত। আবশ্যক হইলে দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখা যায়, টেবিলে জ্বালা চলে, হাত ল্যাম্পের কার্য্য করে, অধিকন্তু ইহার সাহায্যে ছেলেদের জন্য দুগ্ধ বা চা গরম করা চলে। মূল্যও অধিক নহে ১৷৹ টাকা মাত্র। দেশী উপাদানে দেশী কারিগরদিগের দ্বারা প্রস্তুত, এরূপ জিনিষের আদর হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা কলিকাতা নিবাসী মেঃ এস্, সি, রায় এবং কোম্পানী।

চিংড়ি মৎস্যের বাণিজ্য।

(ব্যবসায় নহে)

মৎস্য বহু জাতীয় তন্মধ্যে সুন্দরবনের নদনদীতে এরূপ বিবিধ বিভিন্ন প্রকারের মীনের আবাস যে তাহার সংখ্যা গণনায় স্থির করা অসাধ্য বা কষ্ট-সাধ্য। একই জাতীয় মৎস্য আবার বহু শ্রেণীর দৃষ্ট হয় যথা—"ট্যাংরা, চিংড়ি প্রভৃতি" এই চিংড়ি মৎস্য এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর যে, এক শ্রেণীর চিংড়ির অপর শ্রেণীর সহিত আকৃতি, বর্ণ, অবয়ব কিছুতে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। চিংড়িকে যদিও আমরা মৎস্যের পর্য্যায়ে চিরকাল গণনা করিয়া থাকি, কিন্তু বোধ হয় কোন না কোন চিংড়িকে জলজ কীট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা জীবতত্ত্ববিদ্ নহি। জীব তত্ত্ববিদগণ এই সকল চিংড়িকে কোন শ্রেণীতে নির্ব্বাচন করেন, তাহাও আমরা অবগত নহি। আমরা কেবল মাত্র ভাতে পোড়ায়, ঝোলে, অম্লে প্রভৃতি বিবিধ ব্যঞ্জন ও গোল আলু, পটল ইত্যাদি নানাবিধ তরকারী সহযোগে অন্নসহ গলাধঃকরণেই চিংড়ি মৎসের সহিত পরিচিত। সুতরাং এবম্প্রকারের যে চিংড়ি মৎস্য তন্মধ্যে আমরা যে কয় শ্রেণীর নাম অবগত আছি পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক, পশ্চাতে নগণ্য হেয় ও অশ্রদ্ধেয় যে চিংড়ি ও যদ্দ্বারা যে রূপে বাণিজ্য কার্য্য সাধন হইতেছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিব। যথা—

গল্দা বা মোচা চিংড়ি ইনি কেবল চিংড়ি বলিয়াই নহে ইহাঁকে মৎস্য রাজ্যের রাজা বলিলেও দোষ হয় না, ধানবুনে চিংড়ি ইহার মহিষী বা পাটরাণী। ছাটনা ও মুটে রাজপুত্র এবং যুবরাজ উহারা সকলেই এক গল্দা বংশের সন্তান কেবল মাত্র অবস্থা ভেদে নামের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উহার পরেই দেহের আয়তনানুসারে গণনা করিতে হইলে বাগদা চিংড়িকে ধরিতে হয় তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে কড়ে, ছটকা, গোগা, চামনে, হন্নে, পট্‌পটে, চাপড়া এবং ঘুশো বা বাদা-চিংড়ি; ইত্যাদি ইত্যাদি। যে ত্রয়োদশ বিভিন্ন শ্রেণীর চিংড়ি মৎস্যের নাম উল্লেখ

করা গেল উহাদিগের অপেক্ষা অধিক চিংড়ি মৎস্যের নাম আমরা অবগত নহি, অন্ততঃ এসময়ে স্মরণ করিতে অক্ষম। স্থান ভেদে চিংড়ি মৎস্যকে ইছা মাছ নামে অবিহিত করা হয় এবং আমরা যাহাকে গল্‌দা চিংড়ি বলি তাহাকে কৃষ্ণনগরাঞ্চলে গল্‌দা এবং কলিকাতাবাসীগণ মোচা চিংড়ি বলেন, হিন্দুস্থানবাসীগণ উহাকে চাংড়ি বলে। ফলে চিংড়ি চাংড়ি একই শব্দ।

এবম্বিধ চিংড়ি মৎস্যের সর্ব্বাপেক্ষা হেয় দুষ্পাচ্য (ও প্রায় অভক্ষ্য বলিলেও ক্ষতি নাই) যে ঘুশো চিংড়ি বা বাদা চিংড়ি তাহারই ব্যবহারের কথা আমরা নিম্নে বলিব।

লবণাম্বুময় নদ নদীতে ইহাদিগের জন্ম, কেহ কেহ অনুমান করেন যে মশকাদির ন্যায় ইহারা স্বেদজ অর্থাৎ নোনা জলে কেওড়ার পত্র পচিয়া সেই গলিত পত্র হইতে ইহারা জন্ম গ্রহণ করে সত্য মিথ্যা অবগত হইবার সুবিধা আমাদিগের নাই। জালিকগণ "বেঁউতী জাল" নামক প্রকাণ্ড অথচ সূক্ষ্ম জালে, ছোট বড় সর্ব্বপ্রকার লবণ জল পূর্ণ খাল বিল ও নদ নদীতে ইহাদিগকে ধৃত করে ও স্বীয় গৃহে বা কর্ম্ম স্থলে বড় বড় ঝুড়ি বোঝাই দিয়া লইয়া যায়, তথায় একদল কর্ম্মী যাহারা রাত্রি দিবা কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, তাঁহাদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া এইদল বিশ্রামার্থ অবসর গ্রহণ করে।

চিংড়ি মৎস্য ব্যবসাই ক্ষেতোয়াল (১) ধীবরকুল শ্রম বিভাগ (Division of labour) রীতিতেই কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং এক এক দলে পঁচিশ ত্রিশ জন ভাগী হইয়া বা ততোধিক অংশী গ্রহণ করিয়া এক যোগে এক একটা যৌথ কারবার খুলিয়া এক হাজার দুই হাজার টাকা সাময়িক (for season) কর প্রদান পূর্ব্বক গভর্ণমেণ্ট, জমিদার, গাঁতিদার ও আবাদকারদিগের নিকট হইতে খাল, বিল প্রভৃতি জলাশয় ইজারা বন্দোবস্ত লয়।

এতদ্ব্যতীত মাসিক বেতনে ভৃত্যও নিযুক্ত করে সুতরাং বড় বড় খটীতে (১) দুই তিন হাজার মুদ্রার অন্যান্য ব্যয় অর্থাৎ কর্ম্মকার ও কর্ম্মচারিবর্গের আহারীয়, গৃহ নির্ম্মাণাদি, ভৃত্যের বেতন, জ্বালানী কাষ্ঠ, দরমা ও থলে প্রভৃতি ক্রয় করিতে ব্যয় হয়।

এই ব্যবসায়ের মৎস্য ধৃত করিবার প্রশস্ত কাল জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এই কয় মাসে মৎস্যও যথেষ্ট প্রাপ্ত হয় এবং জলাশয় ইজারা বা জমা ঐ কয় মাসের জন্যই লওয়া হয় এইটিই প্রকৃত (season) অগ্রহায়ণ হইতে কয় মাস কার্য্য বন্ধ থাকে।

খাল বিল জমা লওয়া হইলেই কারখানার উপযোগী অস্থায়ী, অথচ বর্ষাকালে রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণোপযোগী গোল পাতার চালা গৃহাদি, সুবিধা মত স্থানে অথবা স্বীয় বাস ভবনেই নির্ম্মাণ করিয়া, পূর্ব্বানুষ্ঠানীক ক্রিয়া সমূহ সমাধা করিয়া লইয়া অংশীগণের মধ্যে যাহারা কর্ত্তা, (Managing partner) তাহারা সমুদয় ভাগীগণকে একত্র করিয়া তাহাদিগের মধ্যে কার্য্যের উপযুক্ততা ও সক্ষমতা বিচার করিয়া, পরস্পরের সম্মতি ক্রমে উহাদিগকে পৃথক পৃথক সাত দলে বিভক্ত করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করে, এবং ঐ সকল দলের চতুর ও কর্ম্মিষ্ঠ লোকগণের আবার স্বীয় স্বীয় দলের লোকের উপর কর্তৃত্ব করিয়া কার্য্য পরিচালন করিতে হয়।

যে সকল ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করা হয় তাহার মধ্যে মৎস্য ধৃতকারী জলাশয়ের কার্য্যেই অধিক লোক নিযুক্ত থাকে। এক এক ডিঙ্গি নৌকায়

(১) ক্ষেতোয়াল, অর্থে যাহার ক্ষেত্রে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকেই বুঝায় এস্থলে যদিও ক্ষেত্র নাই তথাপি ধীবরকেই ক্ষেতোয়াল বলা হইল।

(১) খটী অর্থে মৎস্য প্রস্তুতের কারখানা বাটি।

তিন জন করিয়া লোক নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দল ও অনেক গুলি ধীবর এই প্রথম দলের কার্য্য ভার গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় দলে বাহকগণ। ইহারা এক স্থান হইতে মাল অন্য স্থানে বহন করা ও যথা স্থানে স্থাপনাদি কার্য্য এবং প্রত্যেক কর্ম্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সেবা শুশ্রূষা করা, তামাকু সাজা প্রভৃতি হীন কার্য্যে দুই তিন জন নিযুক্ত থাকে এই দলটীই সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণী।

তৃতীয় দলে যাহারা নিযুক্ত থাকে তাহারা অগ্নি গৃহের কার্য্যেই ব্যাপৃত।

চতুর্থ দল রৌদ্রের কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

পঞ্চম দল গৃহের মধ্যে ছায়ায় বসিয়া কার্য্য করে।

ষষ্ঠ দলে স্ত্রীলোক হইলেই ভাল হয় অভাবে পুরুষের দ্বারাই কার্য্য সরবরাহ করা হয়। দুরন্ত বিজন মাঠে বিলের ধারে কারখানা করিলে স্ত্রীলোক মিলে না।

সপ্তম দল বা কর্ত্তৃপক্ষের দল ইহারা মালের তালিকা, পরিমাণ, বিক্রয় ও বিক্রয় লব্ধ অর্থাদি আহরণ, খাল, বিল বন্দোবস্ত লওয়া এবং তাহার অনুসন্ধান করা ভৃতিভূকদিগের বেতনাদি প্রদান, আহার্য্যীয় সংগ্রহ তাহার ক্রয় বিক্রয় ও হিসাবাদি রক্ষা এবং সর্ব্বকার্য্যের পরিদর্শন প্রভৃতি কর্ত্তৃত্ব করে। ক্রমশঃ।

কার্পাস চাষ।

(সচিত্র)

শিবপুর কলেজ হইতে উচ্চশ্রেণীর কৃষি-পরীক্ষোত্তীর্ণ
বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী
শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত।

তুলা চাষ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। দাম ৷৹ বার আনা।

পত্রাদি।

পাট ও শণের চাষের আধিক্যই অন্নকষ্ট ও রোগের কারণ।

(শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।)

মাননীয় কৃষক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

ভারতবর্ষ দেবমাতৃকদেশ, বৃষ্টিবারির উপরই ইহার কৃষিকার্য্য নির্ভর করে, সুতরাং এক বৎসর বৃষ্টি না হইলেই আশানুরূপ ধান্য উৎপন্ন হয় না. সেই অভাব যব, গমাদি রবি শস্য দ্বারা অনেকাংশে পূরণ হইতে পারে। পূর্ব্বে যে সকল জমিতে আশু ধান্য বপন করা হইত, সেই জমিতেই কার্ত্তিক মাসে আবার রবি শস্যের বপন হইত, কিন্তু এক্ষণে তাহাতে রবি শস্যের পরিবর্ত্তে শণের আবাদ হইতেছে। আশু ধান্য কমই হয়। পূর্ব্বে প্রায় অধিকাংশ গৃহস্থের ঘরেই কিছু কিছু ধান্য সঞ্চিত থাকিত, যদি কোন বৎসর দৈব দুর্বিপাকে ফসল ভাল না হয়, তবে সেই সঞ্চিত শস্য দ্বারাই অনায়াসে ২।১ বৎসর চলিয়া যাইত। কিন্তু এক্ষণে ১০।২০ খানি গ্রাম অনুসন্ধান করিলেও হয়ত ২।১ জনের বাটিতে যৎসামান্য ধান্য সঞ্চিত দেখা যায়। আর পাট ও শণও যে প্রতিবৎসর সমান জন্মিবে, তাহারও কোন নিশ্চয় নাই। হয়ত কোন কোন বৎসর বিঘা প্রতি অর্দ্ধমণ হওয়াও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

পূর্ব্বে যে এত পাট ও শণ উৎপন্ন হইত না, তাহাতে লোকের কিরূপে চলিত। বরং তখন লোকে সুখ স্বচ্ছন্দেই কাল কাটাইয়াছে। এই ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথাই ধরুন না কেন,

তখন টাকায় ১/১॥৹ মণ চাউল, /৮ সের তৈল, /৪ সের ঘৃত বিক্রয় হইতেছিল, মুদ্রার ব্যবহারও খুব কম ছিল। বিনিময় প্রথা ও কড়ি দ্বারা ক্রয় বিক্রয়াদি নির্ব্বাহ হইত। এক্ষণে পাট ও শণ বিক্রয় করিয়া লোকে বিস্তর টাকা পাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার ফলে খাদ্য শস্যের অপ্রতুল ঘটিয়া দেশে ঘন ঘন ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইতেছে। অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতাও দেশে চুড়ান্ত বাড়িয়া গিয়াছে। চাষার বিলাসিতা ভদ্র লোক অপেক্ষা এক্ষণে পাঁচশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটের অর্থাগমই ইহার মূল কারণ। তাহারা মনে করে, এ সকল জিনিস দু এক মণ পাটের মূল্য বইত নয়? তদুপরি একটী সুযোগ ঘটিয়াছে, প্রত্যেক সনেই শীতকালে কাবুলীগণ ঐ সকল বিলাতী বস্ত্র ঘাড়ে করিয়া পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইয়া নিরক্ষর অপরিনামদর্শী নিরীহ কৃষককুলকে ভুলাইয়া চতুর্গুণ মূল্যে ধারে বিক্রয় করিয়া যায় ও পর বৎসর আসিয়া আদায় করে ও পুনরায় দিয়া যায়। অজ্ঞ কৃষকেরাও এই প্রলোভনে ভুলিয়া প্রতি পল্লীতে এক শত দুই শত টাকার কাপড় লইয়া ফেলে, এইরূপে ক্রমশঃ বিলাস দ্রব্য ক্রয় করিয়া চাষার বিলাসিতা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রে কোন স্থানে যাইতে হইলেও অনেককে কম্ফটার, কাশ্মীরা, সার্জ্জ প্রভৃতি কাপড় গায়ে দিয়া "বাবু" সাজিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এদিকে গৃহে "তণ্ডুল নাস্তি" তৎপ্রতি কাহারও দৃক্‌পাত নাই। পাট ও শণের আবাদাধিক্য হওয়া অবধিই লোক কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়াছে যে তাহাদের শস্য মহার্ঘতা ও শত অন্ন কষ্টের দিকে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত নাই। বরং আরও শত গুণ উৎসাহের সহিত লক্ষ্মী দেবীকে অপসারিত করিয়া অলক্ষ্মীকে ক্রোড়ে স্থান দিতেছে। এই পাট ও শণের হুজুগের নেশা এখনও ভরপুর আছে। যে দিন টাকায় ২।৩ মণ পাট বিক্রয় করিতে হইবে, সেই দিনই দেশের লোক এই রাক্ষসী মায়ার পরিণাম বুঝিতে পারিবে। আমরা এই ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বেই একবার দেখিয়াছি ৸৹ আনা মণ পাট বিক্রয় হইয়াছে। সে বৎসর কৃষককে মাথায় হাত দিয়া হাহারবে ক্রন্দন করিতে হইয়াছিল ও তাহার ফলে পর বৎসর বিস্তর পাটের চাষের হ্রাস হইয়া ধান্যের আবাদ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর হইতেই পুনরায় ক্রমশঃ দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবাদ এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে দশ আনার অধিকই পাটের জমি, অবশিষ্ট ছয় আনা রকম জমির ফসলে আর কত লোকের জীবন রক্ষা করিবে।

পাট ধরিয়া রাখিবার জিনিস নহে, বৎসরের উৎপন্ন বৎসরেই বিক্রয় করিতে হইবেক। নচেৎ পুরাতন পাটের আর দর পাওয়া যায় না। পাটের বর্ণ খারাপ হইয়া যায়। রাখিতে হইলেও বিস্তৃত স্থানের আবশ্যক, এবং এরূপ সতকতার সহিত রাখিতে হয় যে, কোন রূপে যেন সে স্থানে আগুনের কারবার না হয়। নতুবা গৃহস্থের সর্ব্বনাশ সাধন করে। কিন্তু ধান্য দশ বিশ হাজার কি লক্ষ মণ অনায়াসে রাখা যায় ও দশ বৎসর পরে কি যখন ইচ্ছা তখনই সাদরে বাজার দরে বিক্রয় হইয়া যায়। "ধন ধান্যের অধীশ্বর" যে একটী প্রাচীন কথা প্রচলিত আছে, উহার সাপক্ষে বলিতে গেলে বাস্তবিক ধান্যই যথার্থ ধন। যাঁহার গৃহে সঞ্চিত ধান্য আছে, তাঁহার গৃহেই 'কমলা' বিরাজমান আছেন, যখন ক্রেতাগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার প্রাঙ্গণ সুশোভিত করে, সেই সময়কার দৃশ্য দেখিলে অন্তঃকরণ কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হয়, তাহা বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্র লেখনীর অসাধ্য।

ইতিপূর্ব্বে গত ১৩১৪ সালে পাটের বাজার চড়িয়া ১৪৲ টাকা মণ বিক্রয় হইয়াছিল, এ বৎসর দেখা যায় উৎপন্ন পূর্ব্বাপেক্ষা কমই হইয়াছে, কিন্তু বাজার ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া এক্ষণে ক্রমশঃ নামিতে নামিতে ৫৲।৬৲ টাকায় আসিয়াছে, পরে আরও যে কি হইবেক তাহারাই জানে।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

[পাট চাষে যে অর্থাগম হয় তাহাতে অবশ্য কাহারও আপত্য হওয়া উচিত নয়; আপত্য কেবল উক্ত ধানের অপব্যবহার লইয়া; সুতরাং অধিক অর্থাগম হয় বলিয়া পাট চাষ দূষনীয় হইতে পারে না। লেখক ব্যবহার নীতি মূলক যুক্তি তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়—কৃঃ সঃ]

মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষক সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

ভাদ্র সংখ্যার কৃষকে দেখিলাম খুলনা কালীগঞ্জ হইতে শ্রীযুত রাজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুয়া পোকার কাঁটার বিষের ঔষধ জানিতে চাহিয়াছেন। আমি একটী ঔষধ জানি, ইহা সুয়া পোকার বিষে কিরূপ ফল করে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

জিনিসটী আপনাদের ও অঞ্চলে কি বলে জানি না, বোধ করি কাঁটানটে হইবে। আমাদের শ্রীহট্ট অঞ্চলে ইহাকে কাঁটাডুগী বা কাঁটাক্ষুদ্রিয়া বলে। কুমিল্লা ও তদ্দক্ষিণাঞ্চলে ইহাকে কাঁটা মারিয়া বা কাঁটা মারিসা বলে। আয়ুর্ব্বেদ মতে মূলের রসে শরীরের বিষ ক্রিয়া নিবারিত হয়। ইহার কচিপাতা ও ডগা শাক ও তরকারী রূপে ব্যবহার হয়। গাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা আছে। ইহার তাজা পাতা হাতে রগড়াইলে রস বাহির হয়। এই রস দংশিত স্থানে প্রলেপ করিলে জ্বালা ও বেদনা আশু নিবারিত হয়।

বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছি, বিছা, চেলা প্রভৃতি বিষ দুষ্ট কীট পতঙ্গের দংশনে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ইহার প্রলেপ দেওয়ায় ৫ মিনিট মধ্যেই জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়। সুয়া পোকার কাঁটার বিষে কিরূপ ফল হয় তাহা জানিতে বাসনা।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সংবাদটী আপনার "কৃষক" পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। নিবেদন ইতি।

নিবেদক শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী, নায়েব
আসাম পাড়া কাছারী (শ্রীহট্ট)।

মৎস্য চাষ।

মাননীয় কৃষক সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

আমাদের দেশে যে সর্ব্বত্রই মৎস্যর অভাব হইয়া পড়িয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যেমন চাউলের দুর্ভিক্ষ,—সর্ব্বত্র চড়া দর; মাছেও তার কিছু কম নয়। যে যে স্থানে পূর্ব্বে পর্য্যাপ্ত মাছ জন্মিত আজ কাল সে সমস্ত স্থানের অধিবাসীগণকে গাড়ীর আমদানী মাছের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। এই ময়মনসিংহে আগে কত মাছ ছিল, এখন লোকে ক্রিয়া কলাপ ও উৎসবে কেমনে আত্মীয়দের মুখে দেওয়ার একটু মাছের যোগাড় করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল হন। শুনিয়াছি চাঁদপুরে আগে এত ইলিস্ মাছ ধরিত যে লোকে খরিদ করিত না বলিয়া জেলেরা ফসলের গোড়ায় পচা মাছের সার দিত। এখন চাঁদপুরে তিন আনার কমে

সহসা একটা ইলিস্ মাছ পাওয়া কঠিন। সহরে নগরে ত ভাল মাছ সোণার দামে বিকায়। মৎস্যের এই মহার্ঘতায় গরীবদিগের অযত্ন সুলভ শাক পাত খাইয়া দিন পাত করিতে হইতেছে। এমন একটা বলকারক খাদ্যের সর্ব্বত্র অভাব হইয়া উঠিয়াছে। শুনা যায় মাছের বংশ বৃদ্ধি করিতে আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট মনন করিয়াছেন, যদি গভর্ণমেণ্ট নিঃস্বার্থ প্রণোদিত হইয়া একার্য্যে বাস্তবিকই মনোযোগদান করেন, তবে প্রকৃতই গরীবদের একটা বলকারক-খাদ্যের পুঁজি হইবার আশা করা যায়। মাছের চাষ আমাদের দেশে কেহ করা আবশ্যক মনে করেন না। ভদ্রলোকেরা ইহাতে লজ্জা ও অপমানের ভয়ও করিয়া থাকেন, বিক্রয়োদ্দেশ্যে মাছের আবাদ করা সকলেই খুব অপমানসূচক মনে করেন। দরিদ্রতা ও খাদ্যাভাব ভোগ করিতে অনেকেই রাজি আছি, অথচ এমন একটা লাভজনক ও স্বাস্থ্য রক্ষক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে মনে কতইনা অপমানের ভয় পোষণ করি। ব্যবসায় বিষয়ে এই অমূলক কুসংস্কার জাতীয় জীবনকে বহুলাংশে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে। অপরাপর চাষে এক চাষে একমাত্র ফসলই পাওয়া যায়। কিন্তু মাছের চাষে তিন চারি উপায়ে লাভ হইতে পারে। একটা দিঘী খোদাইয়া তার তীরে আম, কাঁটালের বাগান হয়। এগুলি পুরুষানুক্রমে সুখাদ্য ফল যোগায়। গাছগুলি ফল ধারণক্ষম হইলে কাঠ বিক্রিতে কত অর্থলাভ হয়। আর মাছ খাওয়া হয় ও বিক্রয় করিয়া অর্থ লাভ ত আছেই। আমাদের এখানে কয়েক ঘর জমিদার আছেন, তাঁহারা মাছের বিল বিক্রয় করিয়া প্রতি বৎসরে সাত আট শত টাকা পাইয়া থাকেন। একটা দিঘীর মাছে বৎসরে অন্ততঃ ষাট সত্তর টাকা পাওয়া যাইতে পারে। আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া চাকুরী করিতেই জানি, স্বাধীন ব্যবসায়ে অর্থলাভের পথ খুঁজিয়া পাই না। পাইলেও একাজে মন যায় না।

শ্রীগিরীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
ইটা, মহাস্র, শ্রীহট্ট।

[মৎস্য চাষ যে বাস্তবিকই অত্যন্ত লাভের পন্থা তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। গভর্ণমেণ্ট মৎস্য কুলের বংশ বৃদ্ধি, মৎস্য-সংরক্ষণ, পালন ও সামুদ্রিক মৎস্য ধরণ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন। মিঃ কে, জি, গুপ্ত বঙ্গীয় মৎস্য ক্ষেত্র সমূহ সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জ্ঞাতব্য বিষয়ের ক্রমশঃ সমালোচনা করিব। সম্প্রতি মৎস্য বিষয়ক অনুসন্ধান প্রভৃতির জন্য মিঃ আমেদ (Fishery commissioner) নিযুক্ত হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মৎস্যতত্ত্ববিৎ মিঃ বি, এল, চৌধুরী মৎস্য বিভাগ গঠন সম্বন্ধে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন ও মৎস্যতত্ত্ব অধ্যয়ন করিবার জন্য দুই জন শিক্ষিত যুবককে গভর্ণমেণ্ট ইউরোপে পাঠাইয়াছেন। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে মৎস্য সম্বন্ধে কেহ কোন সংবাদ প্রেরণ করিলে তাহা সাদরে "কৃষকে" মুদ্রিত হইবে। কোন্ কোন্ স্থানে কি জাতীয় মৎস্য পাওয়া যায়, তাহাদের ডিম্ব প্রসবের সময় কখন, তাহাদের হ্রাসের কোন স্থানীয় কারণ আছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে যত অধিক আলোচনা হইবে ততই ভারতীয় মীনতত্ত্বের পরিপুষ্টি সাধিত হইবে। কৃঃ সঃ]

শ্রীপূর্ণচন্দ্র হালদার--বারুইপাড়া, খুলনা

(১) সিরাজগঞ্জের কাকিয়া বোম্বাই ও দেশওয়াল পাট কর্কোরস ক্যাপসুলারেস্ (Corchorus Capsularis)—ফল গোল জাতীয়। সিরাজগঞ্জ পাটের বীজ গার্ডেনিং সমিতির আফিস হইতে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য পাটের সময়ে আবেদন

করিলে জানিতে পারিবেন। (২) জল বায়ু ও জাতির প্রকৃতি গত ধর্ম্মই সিরাজগঞ্জ পাটের উৎকৃষ্টতার কারণ। (৩) বিঘা প্রতি ৩৩ মণ গোবর সার ও ২ মণ ১০ সের রেড়ীর খৈল উৎকৃষ্ট সার। (৪) জিপসমের দর। ৫৲।৬৲ টাকা মণ (৬) আলু বসাইবার সময় আশ্বিন মাস; ফলন বিঘা প্রতি গড়ে ৫০—৬০মণ। (৬—৮) যে স্থলে খালের জল সেচনের সুবিধা আছে সেরূপ স্থলে ফাল্গুন ও অপেক্ষাকৃত জল সেচনের অসুবিধাযুক্ত স্থলে শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে নীল বুনানি হয়; বিঘা প্রতি ৪-৫ সের বীজ লাগে; বিঘা প্রতি যে নীল গাছ উৎপন্ন হয় তাহা হইতে ২-৩ সের রং পাওয়া যায়।

কৃঃ সঃ।

শ্রীকনকেশ্বর বড় গোঁসাই—গোলাঘাট, আসাম।

হোরাইজণ্টাল রোলার মিলের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট এবং প্রত্যেক রোলারের ব্যাস প্রায় ৩০ ইঞ্চি। ৪০ অশ্ব শক্তি এঞ্জিনে চালাইলে এই রোলার মিল দ্বারা প্রত্যহ ৩০০০ মণ ইক্ষু হইতে ৩০০ মণ গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। ১৫০ বিঘার ইক্ষু মাড়াই করিয়া উহার রস জ্বাল দিয়া উহা হইতে গুড় প্রস্তুত করিতে ১৫ দিবস লাগিতে পারে। ষ্টীম এঞ্জিনের দর ১২০০০৲—১৫০০০৲ টাকা অপরাপর সরঞ্জমেরও মূল্য ৫০০০৲ টাকার কম হইবে না।

কৃঃ সঃ।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় রেঁইয়া—গোদলপাড়া।

আম্র গাছের কলমের গোড়া যদি চতুর্দ্দিকে খুঁড়িয়া সজিনার শিকড় পরিষ্কার করিয়া দিয়া থাকেন তাহা হইলে সজিনা হইতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। সম্ভবতঃ আপনার আম্র বৃক্ষ সমুদয়ের মূলে কোন প্রকার ছত্রক অথবা কীট রোগ জন্মিয়াছে। তাহা বিশেষ রূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবেন। মূলের অবস্থা সঠিক না অবগত হইয়া বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না।

কৃঃ সঃ।

শ্রীত্বিষাম্পতি চট্টোপাধ্যায়—কাটোয়া।

আপনার গোলাপ গাছের কীট পাওয়া যায় নাই। দেশালাই অথবা ছোট টিনের বাক্সে গোলাপ পাতা সমেত পোকা পাঠাইলে, পোকা নির্দ্ধারিত করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ।

বঙ্গদেশ ১৯০৮।

বর্ত্তমান বর্ষে ১৭,৫৪৭,৭০০ একর জমিতে হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। বিগত বর্ষে ১৯,৮৩৬,৩০০ একর জমিতে হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ হইয়াছিল। সাধারণতঃ প্রায় ২০,৮৩২,০০০ একর জমিতে হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ হয়। বর্ত্তমান বর্ষে ধান্য রোপণের সময় বৃষ্টির অভাবে বিহার অঞ্চলে অতি অল্প মাত্র জমিতে আবাদ হইয়াছে।

এ বৎসর আষাঢ় এমন কি শ্রাবণের প্রথম প্রথম পর্য্যন্ত বৃষ্টির অভাব অনুভূত হইয়াছিল। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বঙ্গদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ও উড়িষ্যায় প্রচুর বৃষ্টি হয়। স্থানে স্থানে অধিক বৃষ্টিতেও ক্ষতি হইয়াছে। বিহার অঞ্চলে সারা বর্ষাই বৃষ্টির অভাবে আবাদের বিঘ্ন হইয়াছে এবং যেখানে সেচন জলের সুবিধা নাই তথায় ধান রোপণ হয় নাই। মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা এবং যশোহরে কীট পতঙ্গের উপদ্রবেও কিছু শস্যহানি হইয়াছে। মোটের উপর হৈমন্তিক ধান্যের ফসল আশাপ্রদ হইয়াছে।

বর্দ্ধমান, রাঁচি, মানভূম ও সিংহভূমে ষোল আনা ফসল জন্মিয়াছে। অন্য পাঁচটী জেলায় পনর আনা, অপর চারিটী জেলায় চৌদ্দ আনা, ছয়টী জেলায় বার আনা এবং কোথাও কোথাও বা আট আনা মাত্র ফসল জন্মিয়াছে। বিহার অঞ্চলে আশ্বিনের শেষে বৃষ্টি হওয়ায় ধানের বড় উপকার হইয়াছে। সর্ব্বত্র ঐরূপ বৃষ্টি হইলে এবার আশাতীত ফল হইত।

বঙ্গদেশে তিলের আবাদ।—১৯০৮। সম্বলপুরে প্রচুর পরিমাণে তিলের আবাদ হইয়া থাকে। পালামাউ, খুলনা, সাঁওতাল পরগণা এবং নদীয়ায় ইহার চাষ মন্দ হয় না। এবৎসর তিল চাষের পক্ষে জল হাওয়া অনুকূল ছিল এবং শস্যের অবস্থা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভাল। তবে বাঁকুড়ায় অধিক বৃষ্টিতে এবং জলপ্লাবনে কোন কোন জমিতে তিলের আবাদের কিছু ক্ষতি করিয়াছে। এ বৎসর মোটে ১২৬,১০০ একর পরিমাণ জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে। সাধারণতঃ ১৮১,০০০ একর জমিতে তিলের আবাদ হয়। আবহাওয়ার অবস্থা শেষে অনুকূল থাকিলেও তিল বুনিবার সময় জমিতে রসাভাব হওয়ায় সকল জমিতে তিল বোনা চলে নাই।

বঙ্গদেশে তুলার আবাদ।—আশ্বিন, কার্ত্তিক। ১৯০৮। সাঁওতাল পরগণা, সম্বলপুর ছোটনাগপুরে প্রধানতঃ জলদী জাতীয় তুলার আবাদ হয়। বর্ত্তমান বর্ষে বৃষ্টির অভাবে সাঁওতাল পরগণায়, পক্ষান্তরে অতিবৃষ্টিতে সম্বলপুর এবং অঙ্গুলে জলদী জাতীয় তুলার আবাদের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। উত্তর বিহার, সিংহভূম ও কটকে নাবী জাতীয় তুলার আবাদ সমধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে কোন কোন জমিতে বর্ষার পূর্ব্বে কোথাও বা বর্ষার পরে তুলার বীজ বোনা হয়। বাঁকুড়া এবং কটকে এখন পর্য্যন্ত তুলার আবাদ আরম্ভ হয় নাই। প্রায় ৩৪,০৭২ একর জমিতে জলদী তুলার এবং ২৮,০২০ একর জমিতে নাবী তুলার আবাদ হইয়াছে। নাবী তুলার আবাদী জমির পরিমাণ আরও বাড়িতে পারে।

সার-সংগ্রহ।

সেলুলয়েড্।

গ্রীক দেশের অতি প্রাচীন রসায়ন-বিজ্ঞান শাস্ত্রে সেলুলয়োডোকশ্ নামে একটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, লাটিন ভাষায় ইহার নাম সেলীলয়িডম্, ইংরাজীতে ইহাকে সেলুলয়েড্ (Celluloid) কহে। ইহা এক প্রকার প্রয়োজনীয় কৃত্রিম ধাতু; ইহার সহায়তায় থালা, ঘটি, গেলাস, চুড়ি, অঙ্গুরী, গলার হার, বোতাম, ছুরির বাঁট, ছাতার বাঁট, বিবিধ অলঙ্কার প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। জাপান দেশে এই কৃত্রিম ধাতুর কারখানা আছে। সেখানে শত সহস্র লোক ইহার দ্বারা বহু প্রকার দ্রব্য নির্ম্মান করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে এবং অনেকে ইহাতে ধনবান পুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আমাদের দেশে "আলুর চুড়ি" নামে এক প্রকার চুড়ি প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়, তাহাও এক রকম সেলুলয়েড্। চীনদেশে সেলুলয়েডের খুব প্রচলন। এই ধাতুর নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ঠিক হাতীর দাঁতের নির্ম্মিত দ্রব্যাদির ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অস্থি ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া ইহাকে সহজে বোধ করা যায় না। কর্পূর, মদিরা, আলু, প্রভৃতি কয়েক প্রকার দ্রব্য মিলাইয়া ইহা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহা উজ্জ্বল, পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং সুরম্য। সেলুলয়েড দ্বারা পোষাকে রং দেওয়া যাইতে পারে, এই রং অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হয়। মদিরা, গ্লিশিরিন এবং বালুকাগজ (Sand Paper) দ্বারা সেলুলয়েড্ ধাতু নির্ম্মিত জিনিষ সমূহকে পরিষ্কার করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা পেন্সিল ও খেলানা অতি সহজেই প্রস্তুত হয়।

কোন্ দেশে সেলুলয়েড্ নামক কৃত্রিম ধাতুর সহায়তায় কোন্ প্রকার দ্রব্য তৈয়ার হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল।
জাপানে পেন্সলি, কলম ও ছুরির বাঁট, সাবানের বাক্স, চুরটের বাক্স, ছড়ি, ছড়ির উপরের বর্ত্তুল, মাথার কাঁটা, চুড়ি, চাপদানী, তাবিজ, অঙ্গুরী, কৃত্রিম পুষ্প, ফটোর ফ্রেম, গাণিতিক বিদ্যালয়ের যন্ত্রাদি।

চীনদেশে—ছত্রের বাঁট, চা খাইবার পেয়ালা, খেলানা, ছবি, বোতাম, হার, অঙ্গুরী ইত্যাদি।

আমেরিকা—বহু প্রকার দ্রব্য; বিশেষতঃ ফটোগ্রাফের কারখানার প্রায় সমুদয় জিনিষ। অতি সুন্দর নেগেটিভ্ প্লেট্ প্রস্তুত হয়।

ইংলণ্ড—অসংখ্য প্রকার ছোট বড় জিনিষ। গরম জলে রাখিলে সেলুলয়েড্ নরম হইয়া

যায়। নরম হইলেই ছাঁচে ঢালিয়া দিতে হয় এবং তদনন্তর চাপিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঐ ছাঁচের আকারে ধাতুজ দ্রব্য তৈয়ার হইয়া থাকে এবং নরম অবস্থায় ইহার উপরে লেখা যাইতে পারে অথবা অক্ষর বসাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, উহা খোদাই করা অক্ষরের ন্যায় স্থায়ী হইয়া যায়। তাহার পরে পাতলা করাত (Saw) কিম্বা সূক্ষ্ম উকা (File) দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে। অনন্তর শুষ্ক স্থানে ও শুষ্ক বায়ুতে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে ঐ জিনিষ খুব কঠিন ও শক্ত হইয়া যায়। কাঁচা এক মণ সেলুলয়েড্ শুকাইয়া গেলে, শুষ্কাবস্থায় দেখা যায় যে উহা ওজনে প্রতি মণে গড়ে সাড়ে ছয় সের কম হইয়া গিয়াছে।

চীনদেশে বিগত ১৯০৪ এবং ১৯০৫ এই দুই বৎসরে ঐ ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত জিনিষ সমূহ দ্বারা তথাকার লোকেরা কি পরিমাণে লাভ করিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত হিসাবে বুঝিতে পারা যায়। ১৯০৪ অব্দে ৩৬ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া যে সকল দ্রব্য প্রস্তত করা হইয়াছিল, তাহা এক লক্ষাধিক টাকায় বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল, অর্থাৎ ব্যয়াদি বাদে ৩৬ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ৫৬ সহস্র টাকা লাভ হইয়াছিল। ১৯০৫ অব্দে ৬৪ হাজার টাকার দ্রব্য প্রায় দুই লক্ষ টাকায় স্বদেশ ও বিদেশে বিক্রীত হয়, ইহাতে ১ লক্ষ ২৪ সহস্র টাকা লাভ ছিল। বাবু শৈলেন্দ্র দত্ত গুপ্ত নামে এক প্রতিভাশালী বঙ্গ যুবক জাপান দেশ হইতে সেলুলয়েড্ ধাতুর কাজ শিখিয়া আসিয়াছেন। ইনি এক্ষণে বেঙ্গল বোতাম কুঠির কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইহাঁর ঠিকানা ১৩০ নম্বর বাগমারী রোড, মাণিকতলা, কলিকাতা।

সেলুলয়েডের দ্রব্যকে পালিশ করিতে হইলে প্রথমে একটু বালুকাগজ (Fine sand paper) লইয়া ইহাকে মাজিয়া বা ঘসিয়া, তাহার পরে একটু শুদ্ধ গ্লিশিরিন্ (Glycerine) লইয়া পাখির পালকে অথবা উষ্ট্রের লোমের বুরুশে কিম্বা মখমলে মাখাইয়া ঘসিলেই ঐ দ্রব্য খুব উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যদি অত্যন্ত উজ্জ্বল করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অগ্নিতে মদিরা ফেলিয়া দিয়া ধূম উঠিতে আরম্ভ হইলে ঐ ধূম লাগাইলে অবিলম্বে সেলুলয়েড ধাতুর দ্রব্য হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। যদি এই ধাতুর কোন জিনিষকে রঙ্গীন করিতে চাও অর্থাৎ বিশেষ বর্ণশালী করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে করা উচিত। লোহিতবর্ণের নিয়ম এই— কিঞ্চিৎ পরিষ্কার জলে কয়েক বিন্দু নাইট্রিক এসিড ফেলিয়া দাও। তাহার পরে এমোনিয়ার সহিত কোচিনাল (Cochineal) মিলাইয়া ঐ জলে মিশাও। তাহার পরে ঐ জলে ধাতুদ্রব্য ডুবাইয়া লইলে উহা লোহিতবর্ণ ধারণ করিবে। যদি খুব লালবর্ণের রং করাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ পরিষ্কার জলে পোটাশীয়ম ব্রোমাইড ফেলিয়া দিয়া তাহাতে নাইট্রেট অব্ সিল্ভার (caustic lotion) মিলাও। ইহাতে ধাতুর জিনিষ কিয়ৎক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া তাহার পরে মাজিলে অতীব সুরম্য এবং আশ্চর্য্য প্রকারের গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করিবে। দ্রব্য গুলি ব্যবহার করিবার সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। সাধারণতঃ লোহিত বর্ণের সেলুলয়েড জিনিষের কাট্তী সর্ব্বদেশের বাজারে প্রবল দেখা যায়।

আমেরিকা হইতে প্রকাশিত দুই এক খানা পুস্তক পাঠ করিয়া, কয়েকজন জাপানী বন্ধুর মৌখিক উপদেশ হইতে আমি দুই একবার সেলুলয়েড্ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। ইহার সাফল্য ও বৈফল্য, বহু দর্শনের উপরে নির্ভর করে, কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় কোন কাজ হয় না। অতএব যাহারা ইহা জানে তাহাদের কাছে বসিয়া ইহা শিক্ষা করিতে হয়। আমাদের দেশে যাহারা আলুর চুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে সেলুলয়েড্ প্রস্তুতের প্রণালী ভালরূপে শিখাইয়া দিলে বিশেষ কল্যাণ হইতে পারে, কারণ তাহারা সিদ্ধ হস্ত, আমরা তাহা নহি। বাঙ্গলা ১৩১৫ সালের ভাদ্র মাসে আমি শোণপুর, বৌধ, বোলাংগীর প্রভৃতি করদ রাজ্য সমূহ পরিব্রজন করিয়া অমর কণ্টক পর্ব্বতে গিয়াছিলাম; এই পর্ব্বত সুপ্রসিদ্ধা নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তিস্থান। ইহা মহাবিশাল ও মহাভীষণ অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। এই মহাবনে অসংখ্যাসংখ্য প্রকার তরু, লতা, গুল্ম প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাকার প্রাচীন

অধিবাসীদিগের উপদেশানুসারে এই পার্ব্বত্য প্রদেশের কয়েক প্রকার বনস্পতির রসের সহায়তায় আমি সম্প্রতি এক প্রকার নূতন কৃত্রিম ধাতু প্রস্তুত করিতে সচেষ্ট আছি, তাহা তৈয়ার হইয়া গেলে সেলুলয়েডের মত আর একটি ধাতু হইতে পারে। এখনও ইহাতে আমি হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হই নাই, কিন্তু ভরসা করি সত্বরে ইহার প্রাথমিক ক্রিয়া সম্পাদনে আশা ও সাফল্য লাভ করিতে পারিব।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

তৈলপ্রদ ঘাস।

'কিউ' হইতে একজন বিশেষজ্ঞ তৈলপ্রদ ঘাস সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে ১২ রকম ঘাসের উল্লেখ আছে। এই ১২টী ঘাসের মধ্যে ১১টী ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লেবুঘাস (Cymbopagon flexuosus) একটী, যাহা হইতে কোচিন ও মালাবার উপকূলে লেবুঘাস তৈল উৎপন্ন হয়। অপর একটী, উহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতীয় লেবুঘাস আছে (C. Citratus)। এই ঘাসটীই ভারতবর্ষে অনেক বাগবাগিচায় চাষ করা হয়। খান্দেশে যাহা হইতে রসা তৈল (Rusa) প্রস্তুত হয়। অপর একটী লেবুঘাস আছে তাহার নাম (C. Martini)। খস্‌খস্‌ও একটী তৈলপ্রদ ঘাস (Andropagon Muricatus)। ইহার মূল হইতে ভারতবর্ষে আতর ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য তৈয়ারি হয় এবং উহা ইউরোপে তৈল উৎপাদনের জন্য রপ্তানি করা হয়।

নূতন প্রথায় গমের চাষ।

রুসিয়াতে এই নূতন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কোণ আকারে* ১ ফুট ১॥০ দেড় ফুট গভীর এক একটী গর্ত্তে একটীর হিসাবে গম বপন করা হয়। গমটী অঙ্কুরিত হইয়া অঙ্কুর যত বড় হইতে ও পাতা বাহির হইতে থাকে প্রত্যেক পাতা বাহির হইবার সময়েই গোড়ায় মাটী চাপা দেওয়া হয়। এই প্রকারে পাঁচ ছয় বার মাটি দিবার পর গর্ত্তটী ক্ষেত্রের সহিত সমতল হয়। এই রূপ করিলে প্রত্যেক পাতার ও ডাঁটার সন্ধি স্থল হইতে অসংখ্য তেউড় বাহির হয় এবং দেখা গিয়াছে যে, এই প্রথায় বপন করিলে একটী গমের বীজ হইতে ১৯,৬৮৩টী তেউড় বাহির হইতে পারে। জেনারল লেভিট্‌সৃকি ইহার প্রবর্ত্তক। তিনি "নভো-ভ্রম্য" নামক রুসীয় পত্রিকায় এই কথা প্রচার করিয়াছেন।

* অর্থাৎ গর্ত্তটীর উপর মুখ চওড়া এবং ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া ক্রমে একটী বিন্দুতে পর্য্যবসিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

যুক্ত প্রদেশে কৃষি যন্ত্রের অভাব।—উক্ত প্রদেশের চাষীরা অনেক সময় লৌহ নির্ম্মিত উন্নত প্রণালীর লাঙ্গল এবং চেনপাম্প নামক কূপ হইতে জলোত্তলন যন্ত্রের অভাব অনুভব করে। তাহাদের এমন পয়সা নাই যে তাহারা এককালে ঐ সকল যন্ত্র খরিদ করিতে পারে। যদি তাহাদিগকে ঐ সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় এবং পরে কিছু কিছু করিয়া দাম উশুল করা যায় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সহজ হয়। কিম্বা যদি ঐ সমস্ত কৃষি যন্ত্র স্থানে স্থানে চাষীদিগকে ভাড়া দিবার জন্য রাখা হয়, এবং খারাপ হইয়া গেলে ঐ যন্ত্র গুলি মেরামত করিয়া দিবার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হয়। গভর্ণমেণ্ট এই রূপ বন্দোবস্ত অনায়াসে করিতে পারেন। অপর কোন ব্যবসায়ীরাও এই রূপ কৃষি যন্ত্রের আড্ডা স্থাপন করিলে তাঁহাদের এবং চাষীদের উভয়েরই লাভ হয়। স্থানীয় কৃষি বিভাগের ডেপুটী ও সহকারি ডাইরেক্টরগণ অত্রস্থ জমিদারগণকে ঐ সকল কৃষি যন্ত্র রক্ষার জন্য উপদেশ দিতেছেন। তাঁহারা ঐ যন্ত্রগুলি রাখিবার এবং মধ্যে মধ্যে মেরামতের ভার লইলে, গভর্ণমেণ্ট হইতে উক্ত কৃষি যন্ত্রগুলি সরবরাহ করা যাইতে পারে এই রূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল যুক্ত প্রদেশ কেন, যদি সর্ব্বত্র জমিদারগণ প্রজার সাহায্যার্থে এই প্রকার সুবন্দোবস্ত করেন তাহা হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গল হয়।

কাণপুর কৃষি-বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা।—কাণপুর কৃষি-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক সাধারণকে জানাইতেছেন যে, উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা

নিয়মাতিরিক্ত হওয়ায় এবৎসরের মত ছাত্র লইবার আর কোন আবেদন লওয়া হইবে না।

ছত্রকতত্ত্ব।—রাজকীয় ছত্রকতত্ত্ববিৎ, মিঃ বট্‌লার ইক্ষুর ধসা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে ইহা দুই প্রকারের। প্রথম প্রকারের আক্রমণ অনেকটা মৃদু। ইহার বীজ (spore) বাতাসে উড়িয়া কীটাক্রান্ত ইক্ষুর ভিতর প্রবেশ করে। ইহাতে এক একটি ইক্ষু আক্রান্ত হইতে পারে কিন্তু সমস্ত ঝাড় আক্রান্ত হয় না। এইরূপ আক্রান্ত ইক্ষু হইতে কলম দ্বারা যে গাছ উৎপন্ন হয় তাহাতে ব্যাধির প্রকোপ বিশেষ পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহাই দ্বিতীয় প্রকারের লাল ধসা। কাল ধসার প্রকোপ এখনও পর্য্যন্ত এদেশে অধিক হয় নাই। মালদহে ছত্রক রোগে অনেক মূল্যবান বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কৃষি বিভাগ এই রোগ অনুসন্ধানের জন্য মিঃ বট্‌লারকে মালদহে পাঠান। পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে ইহা এক প্রকার শৈবালজনিত রোগ। এই শৈবাল (algæ) চা চাষের সমূহ ক্ষতি সাধন করিয়াছে। যদিও এই শৈবাল ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়, তথাপি বিশেষ বিশেষ স্থানেই ইহা গুরুতর ক্ষতি সাধন করে। ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে হইলে স্থানীয় অবস্থা সমূহের বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। অনিষ্টকারী কীটের ছত্রক রোগ একটি জানিবার বিষয়। অনেক অনিষ্টকারী কীট আণুবীক্ষণিক ছত্রক দ্বারা আক্রান্ত হইলে মরিয়া যায়। অধিকন্তু এই ছত্রক রোগ মড়কের ন্যায় আবির্ভাব হয়। এক প্রকার ছত্রক দ্বারা পঙ্গপাল বিনাশ করিতে পারা যায়। বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিমের পঙ্গপাল ধরিয়া এই ছত্রক দ্বারা টিকা দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই। ছত্রক বীজ প্রস্তত সম্বন্ধে কিম্বা বিশেষ জাতীয় ছত্রক নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে ভ্রম থাকায় এইরূপ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

অগ্রহায়ণ মাস।

সব্জী বাগান।—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম, মটর, মূলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মূলা, বিলাতি সীম বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীত প্রধান দেশে কিম্বা যথায় জমিতে রস অধিক দিন থাকে— যথা উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে কপি চারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী।—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র, বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আঁশ জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়।

ফুলের বাগান।—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্বিনা, ক্রিসান্থিমম ফ্লক্স, পিটুনিয়া, অ্যাষ্টারসম, সুইটপী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ, বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নুতন মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না। পাঁক-মাটি চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে।

কৃষি-ক্ষেত্র।—মুগ, মশুর, গম, যই, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা ফসল না হউক কতক পরিমাণে হইবেই। পশু খাদ্যের মধ্যে মাঙ্গোল্‌ড বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়া খোঁড়া, নব রোপিত বৃক্ষের নিয়ে আইল বান্ধিয়া দেওয়া এমাসেও চলিতে পারে। যব, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতি সব্জীর বীজ লাগান এমাসেও চলিতে পারে; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শসা, ধনে, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে, ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালীর দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্গা করিয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিলাতি সব্জীর ভাঁটীতে জল সিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যার সময় আবরণ উঠাইয়া লওয়া; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয়; কচু, সাদা ও রাঙ্গা আলু উঠান ও বিক্রয়; ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট।—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটী লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয় সেই গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টী-গোলাপ, খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটিতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানিয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরান ডাল বা শুষ্ক প্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটার সঙ্গে সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় গোময়, সরিষার খৈল, গোমুত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সার জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার এক ভাগ, পোড়া মাটী এক ভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এ সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভুসা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভুসা কলিকাতায় কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি ২০ পাউণ্ড মিশ্র সারে এক পেকেট ভুসা যথেষ্ট, ভুসা দিলে গোলাপের রঙ্গ বেশ ভাল হয়।

REGISTERED No C.192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



নবম খণ্ড,—৮ম সংখ্যা।

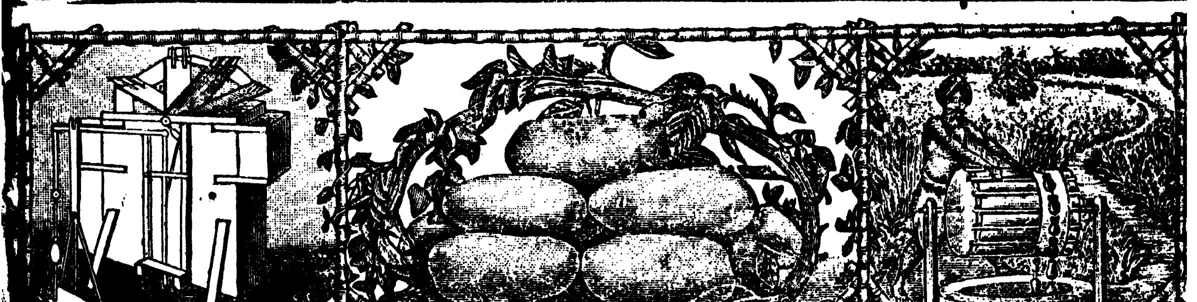
সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,

সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

মিলার প্রিণ্টিং ওয়াকস্ হইতে এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত;
১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।



ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন

এই সময়ের সব্জী বীজ।

আস্পারেগস্, সেলেরি, টমাটো, আর্টিচোক, বিলাতী সীম, বীট, গাজর, জলদি বাঁধাকপি, পাটনাই ফুলকপি, জলদি বিলাতি ফুলকপি, লেটুস্ বা ছালাদ পাটনাই সালগম, জলদি বিলাতি সালগম, ওলকপি, স্কোয়াস বা বিলাতি কদু, লাউ প্রত্যেকের প্যাকেট।০; নমুনা বাক্স ৮ রকম ১৸০ ১ নং বাক্স ১২ রকম বীজ ২৸০।

নূতন সব্জী ও ফুল বীজ।

বাঁধাকপি—গোবিন্দপুর স্যাটিস্‌ফাক্‌সন (এদেশেজাত বীজ, সুতরাং এদেশের জলহাওয়ায় ভাল জন্মিবে) খুব বড়, সন্তোষজনক তোলা ১৲

ফুলকপি—এসোসিয়েসন্স পারফেকসন্ (দেশী বীজ) উৎকৃষ্ট ও নিখুঁৎ তোলা ১৲

,, এসিয়াটিক ,, ৸০

কাঁটাশূন্য বেগুন—(দেশজাত বীজ) এক একটা ছয় সের পর্য্যন্ত হয় তোলা ১৲

শসা—মনোহর সবুজ বর্ণ। এক একটা ৩ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয় প্যাকেট।০

,, চীনা নূতন জিনিষ ,, ।০

,, ডোরাকাটা ,, ।০

স্কোয়াস বা বিলাতী কদু—ওজনে এক একটা ১০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হয় প্যাকেট।০

টমাটো—বর্ষাতি (এদেশী বীজ) জলদি ফসলের উপযুক্ত তোলা ১৲

তরমুজ—ট্রায়াম্ফ ওজনে এক মণ পর্য্যন্ত হয় প্যাকেট।০ তোলা ॥০

বীট—সুগার রং সাদা উপরের দিকে লাল প্যাকেট।০

পিঁয়াজ—সাদা সর্ব্বাপেক্ষা বড় তোলা ১৲

চীনামূলা—গোল টকটকে লাল খাইতে সুস্বাদু এক একটা ⁄১ সের পর্য্যন্ত ওজনে হয় তোলা ।৵০

লাউ লম্বা—(শীতের) এক একটা ৫।৬ ফিট লম্বা হয় তোলা।০

মুলা—সিলেশ্‌চিয়াল গোল সাদা এবং খুব বড় এক একটা ⁄২॥ পর্য্যন্ত হয় (বারাসাত প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চ মেডেল প্রাপ্ত) তোলা।০

মুলা—ব্লাকস্পানিস—লম্বা কাল রঙ্গের ,, ।০

সটনের খুব বড় চমৎকার মটর—

টেলিগ্রাফ পাউণ্ড ২৲

টেলিফোঁ ,, ২॥০

ল্যাণ্ড্রেথের এমেরিকান ওয়াণ্ডার মটর ,, ১॥০

ওলণ্ডা মটর বিলাতি মটর অপেক্ষা কিছুতেই খারাপ নহে পাউণ্ড ৸০

সুগার বীন—শুঁটীর মধ্যস্থ বীজগুলি সিদ্ধ খাইতে অতি সুস্বাদু প্যাকেট।০

নূতন ফুল বীজ।

উৎকৃষ্ট ডবল জিনিয়া নানা বর্ণের এমন সংমিশ্রণ অন্যত্র মিলিবে না প্রতি প্যাকেট।০

বালসাম বা দোপাটী দুগ্ধের ন্যায় সাদা বর্ণের এমেরিকান দোপাটী ,, ।০

ক্যামেলিয়ার ন্যায় ফুল জাপানি ,, ।০

সাদা ও লাল গোলাপের ন্যায় দোপাটী ,, ।০

শ্রাবণ, ভাদ্র মাসের বপনোপযোগী বালসাম, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, কনভলভিউলাস, জিনিয়া, সনফ্লাউয়ার প্রভৃতি ফুল বীজ ১০ রকম মায় মাশুল ১৷৵০

আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে বপনোপযোগী এষ্টার, প্যান্সি, ফ্লক্স, ভর্বিনা, মিগ্নোনেট প্রভৃতি ফুল বীজ নমুনা বাক্স ৮ রকমের বায়ুবদ্ধ টীন বাক্স মায় মাশুল ১॥০

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

কৃষক।

৯ম খণ্ড। অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ সাল। ৮ম সংখ্যা।

লবণ ও লোণা জল।

বাল্যকাল হইতে আমরা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া আসিতেছি যে, জল ও বায়ু বিনা জীবের প্রাণ রক্ষা হয় না। ফরাসী দেশের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সম্প্রতি বহু যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যয়ন, চিন্তা ও অনুসন্ধান দ্বারা স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন যে, জল ও বায়ু বিনা প্রাণীর প্রাণ তিষ্ঠিতে পারে, কিন্তু লবণ ভিন্ন জীবের আদৌ রক্ষা হওয়া অসম্ভব। তিনি বলেন, লবণ বিনা চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ—ইহাদের মধ্যে কোনটিরই রক্ষা ও বৃদ্ধি হওয়া সম্ভবাতীত। তাঁহার মতে জীব, ধাতু ও উদ্ভিদের হ্রাসবৃদ্ধি অথবা উন্নতি এবং অবনতি লবণের শুদ্ধাশুদ্ধতা ও পরিমাণের স্বল্পাধিক্যের উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। এই অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ফরাসী পণ্ডিত আবিষ্কার করিয়াছেন যে, লবণের সংযোগ বিনা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির দেহস্থ শোণিত, শুক্র, মেদ, মজ্জা, অস্থি, শীরা, প্রশীরা, রস, ধাতু, ইন্দ্রিয় সমূহের বর্ণ বা উজ্জ্বলতা এবং তরু, লতা, গুল্ম ইত্যাদির তেজ, গুণ, রস ও সুগন্ধ কোন প্রকারেই সংরক্ষিত হইতে পারে না। তিনি বলেন, সৃষ্টির আদিতে সমুদয় বিশ্ব জলময় এবং সমুদয় জল লবণাক্ত ছিল। পৃথিবী লবণময়ী ছিল বলিয়া সমুদয় জলই লবণময় হইয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর চারি ভাগের তিন ভাগ এখনও লবণাক্ত সলিলে পরিপূর্ণ। এই বিদেশীয় পণ্ডিতের মতে সমুদয় বিশ্বটাই লবণ বা লোণা জল অথবা লবণাক্ত রসে পরিপূর্ণ। তিনি ইহাও স্থির করিয়াছেন যে বায়ুও লবণে ভরা; বায়ুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে, তাঁহার মতে লবণ পাওয়া যায়। তিনি আরও কহেন, বৃক্ষাদির রস যতই সুমিষ্ট হউক না কেন তাহাতেও লবণ আছে। মনুষ্যের দেহ পোষণকারী শোণিতকে জিহ্বা মধ্যে রাখিয়া আস্বাদন করিলে লবণের আস্বাদ পাওয়া যায়; মানুষ মরিয়া গেলে তাহার রক্তে লবণের স্বাদ অতি অল্প থাকে অথবা একেবারে থাকে না। মৃত্তিকা পুরাতন হইলে লবণরূপে পরিণত হয়; কাষ্ঠ অতিশয় পুরাতন হইলে তাহা হইতে লবণ সংগ্রহ করিয়া লইতে পারা যায়; পুরাতন অস্থিও লবণময়, ইত্যাদি। তাঁহার মতে লবণ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিলে বহু প্রকারের দ্রব্য এবং মৃত নরদেহ প্রভৃতি বহুকাল পর্য্যন্ত অপচ্য বা অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে। সুতরাং লবণের উৎপাদিকা ও সংরক্ষিকা শক্তি আছে ইহা ধ্রুব সত্য। এই রূপে এই প্রতিভা-শালী ফরাসী পণ্ডিত মহাশয় লবণের শ্রেষ্ঠত্ব

প্রতিপন্ন করিয়া বলিতেছেন, লবণ ভিন্ন পৃথিবীর রক্ষা নাই; লবণ ভিন্ন প্রাণ ধারণ, কৃষিকার্য্য, খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। এই বিদেশীয় মহাপণ্ডিতের নবাবিষ্কৃত তত্ত্বের আলোচনা করিয়া দেখা ভাল। আমাদের শাস্ত্রেও লবণের বহুবিধ গুণের বর্ণনা আছে. লবণ যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক প্রাজ্ঞপ্রবর বলেন, পশুদিগের মধ্যে এমন অনেক পীড়া হয়, যাহা কেবল লবণের প্রয়োগ বা ব্যবহার দ্বারা একেবারে আরোগ্য করা যাইতে পারে। মনুষ্য সম্বন্ধেও তিনি তাহাই বলেন। তাঁহার মতে পৃথিবীর বহুদেশে কেবল লবণের সার দিয়া কৃষিকার্য্য চলিয়া থাকে। প্রধান প্রধান মূল্যবান ধাতু লবণ ভিন্ন পরিষ্কৃত হয় না এবং দুগ্ধ, চিনি, মাটি, ফল, ফুল, হীরা, রৌপ্য, সুবর্ণ, জল, ঔদ্ভিদিক রস, তুলা, রেশম, পশম প্রভৃতিতেও লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুলনায় নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার লবণের গুণ ও শক্তির তারতম্য দেখা যায়। ইার মধ্যে ফলজ লবণ সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতম।

১। ফলজ লবণ (ঔদ্ভিদিক)।
২। পত্রজ লবণ (ঔদ্ভিদিক)।
৩। মূলজ লবণ ঐ
৪। শুষ্ক কাষ্ঠজ লবণ ঐ
৫। খনিজ লবণ।
৬। মনুষ্যের হাড় জাত লবণ।
৭। সমুদ্রজলজ লবণ।
৮। পশ্বাস্থিজ লবণ।
৯। পুরাতন বা শুষ্ক মাটি হইতে নিঃসৃত লবণ।

লোণা জলে সকল প্রকারের রোগ আরোগ্য হইতে পারে, ফরাসী পণ্ডিত মহাশয় তাহারও নিরাকরণ করিয়াছেন। লবণ দ্বারা ক্ষুধা ও পিপাসার দমন করা যাইতে পারে, ইহাও তিনি লিখিয়াছেন। লবণ প্রয়োগে বহুপ্রকারের ক্ষত ও চর্ম্মরোগাদি যে আরোগ্য হইয়া যায়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগে লবণ শ্রেষ্ঠ ঔষধ। খনিজ পদার্থের আকরের নিকট লোণাজল পাওয়া গেলে তদ্দ্বারা প্রস্তুত ঔষধি অত্যন্ত ফলদায়ক হয়, এবম্প্রকার লোণা জল নানারোগে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে, ইহা শূলরোগের মহৌষধি। ফরাসী সাহেবের মতে সমুদ্রের লবণাক্ত জল সর্ব্বরোগ নাশক। লোণা জলের রোগ নাশক সামর্থ্য সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে তৎসমুদয় এস্থলে আলোচনা করিতে প্রস্তাব করি।

সমুদ্র জলের ব্যবহার দ্বারা রোগারোগ্যের কথা বহু প্রাচীনকাল হইতে শ্রবণ ও পাঠ করা যাইতেছে। সমুদ্র জলে স্নান করিয়া অনেকে অনেক প্রকার কঠিন রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিতেছেন, ইহা সর্ব্বজন বিদিত। সাগর জলের বায়ুও যে অতীব স্বাস্থ্যকর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রীস দেশীয় পণ্ডিত হিপ্পোক্রেটীশের মতে সমুদ্রে ভ্রমণ করিলে ক্ষয়কাশ রোগ এককালে নিরাময় হইয়া যায়। উক্ত দেশের সুবিখ্যাত বিদ্বান প্লিনি সাহেবের মতে সমুদ্রতীরে বাস করিলে উন্মাদ এবং কুষ্ঠ রোগেরও প্রতীকার হইয়া থাকে। পণ্ডিত ও বাগ্মী সিসিরো একদা নানাবিধ পীড়ায় জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি অত বড় প্রসিদ্ধ বাগ্মী হইয়াও জিহ্বার জড়তা রোগে আক্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন, পরিশেষে গ্রীস

দেশীয় সমুদ্রের জলে আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়া পুনরায় সতেজ হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজযক্ষ্মা, গলগণ্ড, হৃদরোগ, বিস্ফোটক প্রভৃতি বহু রোগ সমুদ্রজলে আরোগ্য হইয়া গিয়াছে, ইহার লক্ষ লক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরাজিতে সমুদ্রজলের এই শক্তিকে Promenades এবং Therapeutic Power বলিয়া থাকে। ফরাসী দেশের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মুশো রেণে কুইন্‌তোঁ অনুমান করেন, জীবের প্রথম প্রাণবায়ু সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, মানবশরীর যদি এক মণ ওজনের হয়, তাহা হইলে ১০সের পরিমিত রক্ত একপ্রকার "সীরম্"(Serum) পদার্থে পরিপূরিত থাকে, যাহার প্রকৃতি সাগর সলিলের সমতুল্য। এই রক্ত জীবের দেহ ও প্রাণ রক্ষার প্রধান উপাদান। ডাক্তার রবার্ট সাইমন লিখিয়াছেন,—We see this sea which is a formidable cauldron of cultures and where all the life of the globe has originated, peopled, at every depth, with living creatures. শিশু রোগের চিকিৎসায় সমুদ্র জল বিশেষ উপকারী। চর্ম্মরোগের পক্ষে ইহা মহৌষধ। পশু ও পক্ষীর চিকিৎসায় সাগর জল অমৃত তুল্য হিতকর। স্ফোটক রোগে সমুদ্রের লবণাক্ত নীর একেবারে অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া গণ্য। পণ্ডিতেরা বলেন, সাগর সলিলের অভ্যন্তরে জীবের প্রথমে জন্ম হওয়ায়, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৎস্য, কীটাদির দেহে চিরদিন সাগর জলের প্রকৃতি (ধাতু) বাঁধা থাকে। আমাদের দেশের শাস্ত্র মতে সাগর জলোপরে ভগবান বটপত্রে ভাসিয়াছিলেন এবং বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাইবেল মতেও তাহাই। ফ্রান্স দেশে ৮০ সহস্র রোগীর মধ্যে ৬৫ সহস্র রোগী সমুদ্র জল প্রয়োগে আরোগ্যলাভ করিতেছে। সাইমন নামক সুবিখ্যাত সুচিকিৎসক লিখিয়াছেন,—

Such being the case, there need be no surprise that sea water is possessed of high curative properties. Having been impressed by this fact, M. Quinton began to turn it to account for the benefit of humanity deprived of its original watery bed and languishing for want of those marine salts which are now known to have so powerful an influence on health. Fort seven years M. Quinton laboured and then produced his salt water serum called officially " plasma de Quinton."

Remarkable results have flowed from the use of the sea-water plasm. Nearly all diseases seem amenable to it, but principally skin diseases and infantile disorders.

শুনা যায় পারস্যোপসাগরের বেরীং দ্বীপ (Bahrein) পৃথিবীর সকল স্থানাপেক্ষা উচ্চতম। এখানকার সমুদ্র জল গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ চব্বিশ ঘণ্টা ভয়ানক এমন লবণাক্ত থাকে যে, তাহা জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করা যায় না। হস্তে স্পর্শ করিলে অঙ্গুলির অগ্রভাগে বোধ হয় যেন লবণ লাগিয়া গিয়াছে। এই জলকে ফরাসী দেশের পণ্ডিতেরা লবণে পরিণত করিয়া ঐ লবণ দ্বারা বহু প্রকার রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকেন। এই দ্বীপ হইতে তাঁহারা অতি সুস্বাদু ও নির্ম্মল এবং শীতল জলেরও আবিষ্কার করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাঁহারা সাগরের ভিতর হইতে নির্ম্মল ও সুস্বাদু জল তুলিয়া দিতেছেন। ন্যাণ্টিস, বোর্ডো এবং স্পেন দেশের সম্মুখভাগস্থ সমুদ্রতট

হইতে সাহেবেরা যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে লোণা জল আনিতেছেন, তাহার লক্ষ লক্ষ মণ ইউরোপের নানাদেশ প্রদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে এবং হাঁসপাতাল প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। এইরূপে লবণ ও লোণা জল দ্বারা অসংখ্যাসংখ্য মনুষ্য কেবল রোগমুক্ত হইতেছেন তাহা নহে, পরন্তু কৃষিকার্য্য, বাগানের কার্য্য, পশুপক্ষীর চিকিৎসার ও নূতন নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার হইতেছে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

চিংড়ি মৎস্যের বাণিজ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইক্ষণে ঐ সকল পৃথক পৃথক দলের কর্ম্মের কথা বলিব যথা—

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এক দলের লোকে দিবসে ভাঁটার সময় "বেঁউতী" * জালে মৎস্য ধৃত করে এই দলেই অধিক লোক নিযুক্ত থাকে, ইহারা ভাঁটার সময় মৎস্য ধৃত করিয়া দিয়া বিশ্রাম, নিদ্রা ও আহারাদির অবসর কালে ছিন্ন জাল পুনর্গঠন, সংশোধন, নৌকায় কালাবাতী প্রভৃতি কার্য্যও করে। যখন অপর কার্য্য হস্তে না থাকে তখনও ভ্রমণ অবসরেও জালের সূত্র পাকাইতে থাকে।

প্রথম দলের লোকেরা মৎস্য ধরিতে থাকে ও এক একবার যেই জাল ঝাড়িয়া মৎস্য বাহির করিবে, দ্বিতীয় দলের অকর্ম্মণ্য বলবান ষণ্ডাগণ অমনি তৎক্ষণাৎ ঐ সকল মৎস্য মস্তকে বহন করিয়া কারখানায় পৌঁছিয়া দিবে, ও এরূপে পর্য্যায়ক্রমে মৎস্য ধৃতকারী পৃথক পৃথক নৌকা সমূহের নিকট তাহারা বার বার পদচারণে অসুবিধা হইলে অপর একখানি ডিঙ্গি লইয়া যাতায়াত করিবে, এবং ধৃত মৎস্য যথা স্থানে পৌঁছিয়া দিবে ও মৎস্য ধৃতকারী-গণের আহারীয়, পানীয় যোগাইবে ও অন্যান্য কার্য্য করিবে।

তৃতীয় বা অগ্নি গৃহের দল, এই দল ধৃত মৎস্য কারখানায় পৌঁছিয়া দিবামাত্র দ্বিতীয় দলের বাহক-গণ দ্বারা নদীর জল উত্তোলন করাইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিংড়ি মৎস্যকে ধৌত করিয়া অমল ধবল শুক্তির ন্যায় চাকচিক্যশালী ও মলাংশ বিধৌত পরিষ্কৃত করিয়া লইয়া, সুবৃহৎ তাম্র নির্ম্মিত পাত্রে, (তামার ডেক্‌ এক মণ, সওয়া মণ এক একটা) যে সকল পাত্র কয় মাস অবিরাম চুল্লিতে স্থাপিতই থাকিবে, তন্মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ দ্বিতীয় দলস্থ লোকের উত্তোলিত নদীর লবণ জলেই ঐ মৎস্য রাশি সিদ্ধ করিয়া, গাঢ় হরিদ্রা বা ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলেই ঐ মৎস্য ডেক্‌ হইতে উঠাইয়া, উচ্চ মঞ্চে অথবা কাষ্ঠ ও বংশ নির্ম্মিত ত্রিপদীর উপর ঝুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ঝুড়ি সমূহ বংশ বা বেত্র নির্ম্মিত, সুতরাং জলসহ চিংড়ি ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হইলে ঝুড়ির বয়ন অবসর অর্থাৎ সন্ধি দিয়া মৎস্যের ক্লেদ ও জল প্রভৃতি

* বেঁউতীজাল, এক জাতীয় বৃহৎ জাল। ইহা জলে নিক্ষেপ করিয়া ভাঁটার সম্পূর্ণ ছয় ঘণ্টা অবস্থিতিকাল। নদীতে জোয়ার আসিলেই জাল তুলিয়া লওয়া হয়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মৎস্য বাহির করিয়া লইতে পারে।

তরল পদার্থ নিম্নে পতিত ও খনিত ক্ষুদ্র প্রণালী দিয়া ঐ উত্তপ্ত জল নদীর জলে যাইয়া মিশ্রিত হয়; মৎস্য পক্ক বা সিদ্ধ করিয়া দিলেই সাগ্নিকের দলের অগ্নি গৃহের কার্য্য সমাধা হইল। তখন পুনরায় দ্বিতীয় দলের বাহকগণ উহা বহন করিয়া কারখানা গৃহের চতুঃস্পার্শ্বের মাঠে বিস্তৃত দরমার উপর ঐ সকল মৎস্য বিস্তৃত করিয়া দিবে।

চতুর্থ দলের লোকেরা তখন ঐ সকল মৎস্য বার বার রৌদ্রে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শুষ্ক করিবে, কিন্তু বর্ষাকালে প্রায়ই আকাশমণ্ডল ঘন ঘটাচ্ছাদিত ও রৌদ্রের অভাব এবং সূর্য্যদেব অপ্রকাশিত থাকেন, এজন্য যখন উহা রৌদ্রে শুষ্ক করা অসম্ভব বোধ হয়, তখন সপ্তম দলের কর্ত্তাগণের অনুমতি অনুসারে কারখানার সুবৃহৎ অতি দীর্ঘ গৃহের মধ্যে, দুই তিন হস্ত বংশ দণ্ড বা লৌহ মণ্ডিত পুরাতন রেল খণ্ড অথবা কাষ্ঠের খুঁটী নির্ম্মিত ও লৌহ জাল বা তারের ঝাঁঝরী বিস্তৃত যে মঞ্চ পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকে, (সেই গৃহকে উহারা জাল গৃহ কহে) ঐ জাল গৃহের কথিত লৌহ মঞ্চোপরি মৎস্য সমূহ বিস্তৃত করিয়া দিয়া নিম্নে কাষ্ঠের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত মৃদু জালে সমুদয় মৎস্য শুষ্ক বা ভর্জ্জিত করিয়া লইবে; অর্থাৎ ঐ উভয় প্রকারের (সূর্য্যোত্তাপেই বা অগ্নির উত্তাপেই হউক) মৎস্য সমূহ শুষ্ক বা ভর্জ্জিত করিয়া বাহকগণ এইবার অপর আর এক গৃহে বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

পঞ্চম দলের কর্ম্মকারগণ মোটা মোটা কাষ্ঠের বা বংশের স্থূল দণ্ডের দ্বারা পিটিয়া মৎস্য রাশির শুষ্ক ত্বক বা শল্ক ভাঙ্গিয়া পৃথক করিয়া ফেলিবে এইরূপে মৎস্য পিটানর কার্য্য সমাধা হইল।

ষষ্ঠ দলের স্ত্রী বা পুরুষেরা উহা প্রথমে চালুনিতে ছেঁকিয়া পরে কুলায় ঝাড়িয়া মৎস্যের সারভাগ অর্থাৎ মৎস্য (মাংস) পৃথক ও "রাবিস" ত্বক বা শল্কচূর্ণ সমূহ পৃথক করিয়া লইবে, এবং ঐ চূর্ণ আমিষ বা অকর্ম্মণ্য ত্বকাংশ জলে নিক্ষেপ অথবা মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত করিয়া মৎস্যের শাঁসগুলি ওজন (তৌল) ও বস্তাবন্দী করিবে।

এবং এইরূপে কারখানার আয় ব্যয় ও কার্য্যের বিস্তৃতি অনুসারে যখন পঞ্চাশ একশত বা দুই শত মণ মাল মজুত হইবে, তখন সপ্তম দলস্থ প্রধান কর্ত্তৃপক্ষগণ উহা মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ আহরণ করিবে। খুলনা জেলার কালীগঞ্জ থানার এলাকার কয়েকটি স্থানে ইহুদী ও বোম্বাই-বাসী মুসলমান সওদাগরগণ এই সকল চিংড়ি মৎস্য ক্রয়ের জন্য কয়েকটি ফারম (Farm) খুলিয়াছেন, তন্মধ্যে বোধ হয় সলোমন্ কোম্পানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী। ইঁহারা ঐ সকল মৎস্যের সারাংশ বার, তের ও চৌদ্দ টাকায় মণ ক্রয় করেন। কিন্তু প্রথম প্রথম আঠার, কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত দর দিয়াছিলেন। শুনিতে পাই ঐ সকল সওদাগর মধ্য ভাগ টীন মণ্ডিত দেবদারু কাষ্ঠের বাক্সে ঐ প্রকারের সূর্য্য পক্ক বা অগ্নি পক্ক সিদ্ধ শুষ্ক চূর্ণ মৎস্য ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করিয়া বহুমূল্যে বিক্রয় করেন; এবং ব্রহ্মবাসী ধনবান নর নারী ঐ দুর্গন্ধময় শুষ্ক মৎস্য পরমাদরে ও পরমানন্দে আহার করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন।

এই মূল্যহীন বাদাচিংড়ি পূর্ব্বে সময় সময় চারি পাঁচ সের পর্য্যন্তও এক পয়সায় মিলিত ও পূর্ব্বেই

বলা হইয়াছে যে, অবিক্রেয় হওয়ার শেষে রাশি রাশি মৎস্য মানব কর্ত্তৃক ঘৃণায় পরিত্যক্ত এবং মৃত্তিকায় পরিণত অথবা পশু, পক্ষী ও কীটের উদর পুরণ করিত। কিন্তু এক্ষণে এক পোয়া ও সময় সময় অর্দ্ধ পোয়াও এক আনা পয়সার বিনিময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধৃত মৎস্য প্রায় সমুদয়ই শুষ্ক হইতেছে ও জাহাজে চড়িয়া বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, ক্ষীণবপু যাহার শল্ক মাত্র সার, মৎস্য অংশ অতি সূক্ষ্ম কেবল মাত্র তাহাই এদেশে মানবের আহার্য্যরূপে বিক্রয়ার্থ রহিয়া যায়। পূর্ব্বতন সময়ে অপরাহ্ণ ও প্রথম যাম নিশিতে ধৃত মৎস্য ধীবরগণ ছিপ নৌকার ন্যায় স্বল্প পরিসর সুদীর্ঘ নৌকায় অধিক সংখ্যক বহিত্র সাহায্যে, সূর্য্যকর প্রখর হওয়ার পূর্ব্বেই অথবা নিশীথের শৈত্য থাকিতে থাকিতেই, কলিকাতার বেলেঘাটার মৎস্য বিক্রয়ের আড়তে উপস্থিত করিয়া অবিলম্বে মৎস্য ব্যবসায়ী স্ত্রী, ও পুরুষগণের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিত। অপর সময়েও দিবসে ধৃত মৎস্য কলিকাতা অথবা বসুরহাট, বাদুড়িয়া ও গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দূরতর স্থানে প্রেরণে সুবিধাজনক হইত না, কারণ দিবসের আলোক ও প্রখর মার্ত্তণ্ডতাপে মৎস্য পচিয়া অব্যবহার্য্য ও অবিক্রেয় হইয়া পড়িত, সুতরাং বাধ্য হইয়াই জালিকগণ উহা স্থানীয় ব্যবহারের জন্য বাজারে, হাটে প্রেরণ করিত।

আমরা কথা প্রসঙ্গে মূল আখ্যায়িকা ত্যাগ করিয়া পাঠক মহাশয়ের যথেষ্ট সময় ক্ষতি করিয়াছি এক্ষণে আমাদিগের মন্তব্য আর দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। আমরা উপরে অতি অকিঞ্চিৎকর বাদাচিংড়ি সম্বন্ধে "প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান সত্য" একটু সামান্য প্রকার পরিবর্ত্তনে যে রূপ মূল্য বৃদ্ধি, আদর বৃদ্ধি ও বাণিজ্য পণ্য রূপে ব্যবহারের কথা লিখিলাম তাহাতে পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্ব্বে সযতনে আহরিত ও সদ্য টাটকা মৎস্য যাহা দুই আনা বা তৎপরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত, তাহারই টাটকা বা পচা সর্ব্ব প্রকারের দ্রব্য প্রকার ভেদে একটু পরিশ্রম করিয়া সিদ্ধ ও ত্বক বিমুক্ত করিয়া কুড়ি, বাইশ মুদ্রা পর্য্যন্ত মূল্যে প্রথম প্রথম বিক্রয় হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে চৌদ্দ, পনর টাকা মূল্যে মণ বিক্রয় হইতেছে ইহাও একটা কম লাভের পণ্য নহে। বিশেষতঃ ইহা বৈদেশিক বাণিজ্য দ্রব্য মধ্যে গণ্য হওয়ায় ধীবরগণ এককালে একই সময়ে কেবল মাত্র খাতায় রসিদ লিখিয়া দিয়া পাঁচ সাত শত টাকাও অগ্রিম দাদন গ্রহণ করিতেছে। উহা ব্যতীত যে তাম্র স্থালীর (ডেকের) কথা বলা হইয়াছে, যাহাতে মৎস্য সিদ্ধ করা হয় ঐ সকল পাত্র বণিকগণ বিনামূল্যেই প্রদান করিয়া থাকেন। তবে চুক্তি থাকে যে উহা অকর্ম্মণ্য ও অব্যবহার্য্য হইলে ফারমের দ্রব্য ফারমে ফেরত দিয়া নূতন আর একটি গ্রহণ করিবে, আমাদিগের বিশ্বাস যে এই পণ্য দ্রব্যের গ্রাহক সংখ্যা অল্প প্রযুক্ত এবং সওদাগরগণের মধ্যে পরস্পর একতা থাকায়, ও ধীবরগণ অগ্রিম দাদন গ্রহণ করিয়া একই ফারমে আবদ্ধ হওয়ার, এবং জমিদারগণ নানা কারণে সওদাগরগণের বাধ্য থাকায় মৎস্যজীবীগণকে ফারমের নির্দ্দিষ্ট দরেই দ্রব্য সরবরাহ করিতে হয়. তাহাতেই ইহারা ঠকিতেছে। যদি এই ব্যবসায়ের গ্রাহক বৃদ্ধি হয় ও নানা জনে চীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে মাল প্রেরণ আরম্ভ করেন, তাহা

হইলে মূল্য বৃদ্ধি হইয়া ধীবরগণ অধিক লাভবান হইতে পারেন এবং মালও অধিক উৎপন্ন হইতে পারে।

যথা স্থানে বলিতে ভ্রম হওয়ায় আমরা উপসংহারে পাঠকগণকে অবগত করিতেছি যে পূর্ব্বোক্ত চিংড়িশুষ্ক ব্যবসায়ে বর্ত্তমান সময়ে সহস্র সহস্র মৎস্যজীবী সচ্ছন্দে স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ এবং সাত টাকা দরে তণ্ডুল ক্রয়দ্বারা অনায়াসে দিন যাপন করিতেছে। যাহারা লোকবল শূন্য ও অর্থ সংগ্রহে অক্ষম, তাহারাও দশ সের পাঁচ সের প্রস্তুত মাল স্বয়ং সওদাগরদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া, অথবা ত্বক সহ ধৃত কাঁচা মৎস্য খটির মালিক ধীবরগণের নিকট বিক্রয় করিয়াও, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অন্ন বস্ত্রের সংস্থান ও বিলাতি ছাতি, জুতা ক্রয় করিতেছে এবং অনায়াসে ইন্‌কম্ টেক্স ও জমিদারের রাজস্ব পরিশোধ করিতে সক্ষম হইতেছে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রসায়ন বিদ্যা ও ধনাগমের উপায়।

পাথুরে কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তুতের কৌশল অনেক দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলিকাতা সহর যে গ্যাসের দ্বারা আলোকিত হয়, তাহা কয়লা হইতেই তৈয়ার করা হইয়া থাকে। যখন রসায়ন বিদ্যার তেমন উন্নতি হয় নাই, তখন কলিকাতার গ্যাসঘরে কয়লা হইতে গাস তৈয়ার করিয়া আর সব ফেলিয়া দেওয়া হইত। সে সব আবর্জ্জনা ফেলিয়া দিতে অনেক পয়সা ব্যয় করিতে হইত। এখন কয়লা হইতে গ্যাস বাহির করিয়া লইলে পর যে কোক থাকে, তাহা রন্ধন কার্য্যে ব্যবহার হয় এবং তাহা মণ করা আট আনা দরে বিক্রয় হয়। কয়লা হইতে গ্যাস বাহির করিবার সময় যে আল্‌কাতরা বাহির হয়, পূর্ব্বে তাহা প্রায় কোন কার্য্যে লাগিত না। রসায়ন বিদ্যার উন্নতি হওয়াতে আল্‌কাতরা হইতে কত প্রকার মূল্যবান দ্রব্য যে প্রস্তুত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন।

রসায়নবিদেরা আল্‌কাতরা হইতে তরল এমোনিয়া ও কার্ব্বলিক এসিড প্রস্তুত করিতেছেন। যে আল্‌কাতরার পূর্ব্বে প্রায় কোন মূল্য ছিল না, তাহা হইতে এখন লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হইতেছে।

পেচোলি, গোলাপী আতর, ভারবিনা, হেলিওট্রোপ প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য কাহার না প্রাণ হরণ করে? কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, আল্‌কাতরাই সে সকল সুগন্ধি দ্রব্যের এক প্রধান উপাদান। আল্‌কাতরার সঙ্গে পুষ্পসার মিশাইয়া রসায়নবিদেরা কত প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য যে প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা বলা যায় না। অনেকে সোডাওয়াটারের সঙ্গে এক প্রকার সুন্দর বর্ণের ফল নির্য্যাস পান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কি জানেন যে সে ফল-নির্য্যাসে কোন ফলের রস নাই কিন্তু তাহা প্রধানতঃ আল্‌কাতরা হইতেই প্রস্তুত করা হইয়া থাকে?

আল্‌কাতরা হইতে প্রায় ৩ শত রকম ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। জ্বরঘ্ন অনেক ঔষধ যথা ফেনাসিটিন, এণ্টিপাইরিন, এণ্টিফাইব্রিন, এসেটানেলিড প্রভৃতি আল্‌কাতরা হইতেই প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

আজকাল এনিলাইন রংএর আদর সর্ব্বত্র হইয়াছে। এক সময়ে ভারতবর্ষে নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ দ্রব্যে রং প্রস্তুত হইত; দেশ বিদেশে তাহার প্রচুর

কাট্‌তি ছিল কিন্তু রসায়নবিদেরা যেদিন এনিলাইন রং প্রস্তুত করিয়াছেন, সেদিন হইতেই উদ্ভিজ্জ রংএর কাট্‌তি কমিয়া গিয়াছে। এই এনিলাইন রংএর প্রায় ১০ ভাগের ৯ ভাগ আল্‌কাতরা হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

এনিলাইন রংএর আবিষ্কারের ইতিহাস এই—এক যুবক রংএর ব্যবসা শিক্ষা করিবার জন্য এক কারখানায় শিক্ষানবীস হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর সেখানে রং প্রস্তুতের কৌশল শিক্ষা করিয়া সেই যুবক রসায়ন বিদ্যা শিখিবার জন্য এক রসায়নাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এক দিন তিনি নীল এনেল নামক দ্রব্য লইয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতেছিলেন। এনেলের সঙ্গে একবার অন্য একটা দ্রব্য মিশাইয়াছিলেন। মিশাইবামাত্র ঘোর লালবর্ণ হইল। এমন লাল রং তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখিতে পান নাই। তিনি উদ্ভিদ হইতে যত প্রকার লাল রং হয়, তাহা নিজে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন লাল রং কখনও তৈয়ার করিতে পারেন নাই। পশমে সে লাল রং ধরে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, পশম সে রংএ অত্যুজ্জ্বল লাল হইয়া গেল। রেশমে সে রং লাগাইয়া দেখিলেন যে, রেশমেও তাহা বেশ ধরিয়াছে। সেই দিন হইতে এনিলাইন রংএর আবিষ্কার হয়—সেই দিন হইতে রং প্রস্তুত প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

আমেরিকায় প্রচুর তুলা জন্মে। তুলার ব্যবসায়িগণ তুলার বীজ লইয়া মহা মুস্কিলে পড়িয়াছিল। রাশীকৃত তুলার বীজ ফেলিয়া দিবার স্থান পাইত না। রসায়নশাস্ত্র এখন সেই আবর্জ্জনা হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করিতেছে। রসায়ন বিদ্যার বলে তুলার বীজ হইতে তৈল হইতেছে, সেই তৈল রাসায়নিক কৌশলে পরিষ্কার করিয়া বাজারে "অলিভ অয়েল" রূপে বিক্রীত হইতেছে। ইহার তৈল হইতে "কটলীন" নামক পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। বীজের খৈল পশুর খাদ্যে ব্যবহৃত হইতেছে, বীজের তুষ হইতে কাগজ ও সার ও ইন্ধন তৈয়ার হইতেছে, অপরিষ্কৃত তৈল সাবান নির্ম্মাণে লাগিতেছে।

পূর্ব্বে আঙ্গুরের রস হইতে মদ তৈয়ার করিয়া আঙ্গুরের শাঁস, বিচি প্রভৃতি লোকে ফেলিয়া দিত। এক্ষণে আঙ্গুরের পরিত্যক্ত শাঁস হইতে রসায়নবিদেরা এক রকম নীরস ব্রাণ্ডি তৈয়ার করিতেছেন। তাহার সঙ্গে তামা মিশাইয়া এক রকম রং প্রস্তুত করিতেছেন বা তাহা হইতে ভিনিগার তৈয়ার করিতেছেন—তারপর যাহা অবশিষ্ট থাকিতেছে, তদ্দারা পশুর খাদ্য, সার বা ইন্ধন করিতেছেন। রসায়নবিদেরা আঙ্গুরের বীজ হইতে এক রকম তৈল ও ট্যানিক এসিড বাহির করিতেছেন। বীজ হইতে "আরগল" নামক এক পদার্থ প্রস্তুত করিতেছেন, সেই আর্গল পরিষ্কার করিয়া "ক্রিম অব টার্টার" তৈয়ার করিতেছেন। এই "ক্রিম অব টার্টার" হইতে কত রকম ঔষধ হইতেছে।

পূর্ব্বে জলপাই ফল হইতে তৈল বাহির করিয়া তাহার শস্য ফেলিয়া দেওয়া হইত। রসায়নশাস্ত্র বলেন, কোন জিনিসই নষ্ট হইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। পৃথিবীতে যত পদার্থ আছে, তাহার সমস্ত পদার্থ দ্বারাই জগতের হিতসাধন হইতে পারে। রসায়নবিদেরা জলপাইর পরিত্যক্ত শস্য হইতে এক রকম আরক ও এসেটোন বাহির করিয়াছেন। তাহা হইতে আল্‌কাতরা ও জ্বালানি দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে কত লক্ষ মণ ভুট্টা হয়। দরিদ্রের আহার্য্য সামগ্রী রূপে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার রাসায়নিকেরা ভুট্টার ময়দা, ভুট্টার তৈল, ভুট্টার চিনি, ভুট্টার খৈল ও ভুট্টার তৈল নির্ম্মিত রবার তৈয়ার করিতেছেন।

রসায়নশাস্ত্র দ্বারা জগতের শিল্প বাণিজ্যের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইতেছে! যে জাতি বিজ্ঞানের যত উন্নতি করিবে, বিদ্যার সেবা যত করিবে, জগতে তাহারাই তত ধনৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইবে। হা! অভাগিনি জন্মভূমি! কবে তোমার সন্তানগণ এই সকল অর্থকরী বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া তোমাকে দরিদ্রতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবে।

কার্পাস চাষ।

(সচিত্র)

তুলা।*

মনুসংহিতায় তুলার প্রথম উল্লেখ দেখা গেলেও তৎপূর্ব্বেও যে তুলা ভারতে ছিল না তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। হেরোডোটস ও থিয়োফ্রেষ্টাস ভারতে তুলার গাছ দেখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত এরিয়ানের সময়ে তুলা বিদেশীয় বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল। আরবেরা ইহা আমদানি করিত। ভারত হইতে তুলার চাষ দক্ষিণ ইউরোপে বিস্তৃত হয়। চীনদেশে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর সম্ভবতঃ ভারত হইতেই তুলার চাষ প্রবর্ত্তিত হয়। ক্রমশঃ বস্ত্রবয়ন-প্রণালীও ভারত হইতে বিস্তৃত হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে পরিজ্ঞাত হয়। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিক তুলা মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় তুলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করেন।

ভড়োচ অঞ্চলের ভাল তুলা প্রায় আমেরিকার তুলার সমান। কিন্তু ভারতের পরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়ায় তুলা বেশ পরিষ্কার করিয়া তুলা যায় না; তুলা তুলিতে ভারতে শতকরা ২½ হইতে ৭ ভাগ পর্য্যন্ত খারাপ হয়; আর আমেরিকায় মাত্র ২ ভাগ নষ্ট হয়।

ভারতীয় তুলার আঁশ বীজে দৃঢ় সম্বদ্ধ থাকে; এজন্য মিশরী বা মার্কিন তুলা অপেক্ষা ভারতীয় তুলা ধুনিতে সময় অধিক নষ্ট হয়।

ভারত-উৎপন্ন তুলা গুণানুক্রমে নিম্নে লিখিত হইল :—হিঙ্গনঘাট (মধ্যপ্রদেশ,) ভড়োচ (গুজরাট,) ধুলিয়া ভাওনগর (গুজরাট,) অমরাবতী, কামতা, ধারওয়ার, সিন্ধু, বাঙ্গাল (মধ্যভারত,

* শিল্প-সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ,) পশ্চিম বাঙ্গাল (শোলাপুর ও উত্তর মান্দ্রাজ,) সালেম, কোকনাদা, তিনেভিল্লী প্রভৃতি।

ভারতোৎপন্ন তুলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য শ্রেষ্ঠ মিশরী ও মার্কিনী তুলা এ দেশে উৎপন্ন করিবার চেষ্টা যথেষ্ট সফলতা লাভ করে নাই। সযত্ন নির্ব্বাচন দ্বারা উত্তম তুলার বংশবৃদ্ধি এদেশে অসম্ভব নহে, তবে তৎপক্ষে চাষী ও ব্যাপারী উভয়েরই সততা ও চেষ্টা থাকা আবশ্যক। চাষীরা ক্রমশঃ ভাল বীজের পক্ষপাতী হইয়া তল্লাভে সচেষ্ট হইতেছে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন তুলা চাষের যন্ত্রাদি যাহা এখন ব্যবহৃত হইতেছে তাহা নিতান্তই অনুপযোগী নহে, কেবল দূষিত প্রক্রিয়াই উত্তম তুলা উৎপাদনের অন্তরায়।

তুলা উৎপাদনের পক্ষে কালো মাটি খুব উপযোগী। লালমাটি কদাচ ব্যবহৃত হয়। কালো মাটির স্তর গভীর ও খুব আঠালো হয়, এজন্য তাহা অনেকক্ষণ ভিজা থাকিতে পারে।

গুজরাট, খান্দেশ, বেরার ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশে আমেরিক ধরণে সারি বাঁধিয়া সমান্তরে তুলার গাছ লাগানো হয়। মান্দ্রাজ প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশে বীজ যথেচ্ছ ছড়াইয়া ফেলা হয়। প্রথমোক্ত প্রথায় জমি নিড়ান যথেষ্ট সুবিধায় ও সস্তায় হয়, চারাগুলিও বেশ ভাল হয়।

তুলা ফসলের শেষ অবস্থায় ক্ষেত্রে জল সেচন ফসলের পক্ষে ক্ষতিজনক। তুলার আঁশ তাহাতে কম মজবুত হয়।

জমির উর্ব্বরতা রক্ষার জন্য যে শস্য পর্য্যায় আবশ্যক তাহা ভারতীয় চাষা খুব ভালই জানে। এক্ষণে নির্ব্বাচন দ্বারা শ্রেষ্ঠতা ও শঙ্কর উৎপাদন দ্বারা তুলার উৎকর্ষ বিধান করিতে হইবে।

বেরারের প্রাচীন নাম বিদর্ভ। ইহা চিরদিনই তুলা চাষের জন্য বিখ্যাত। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ১৯০৭ সালে ৫৮২১০৪১ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। ধানের চাষ অপেক্ষাও তুলার চাষ পসার লাভ করিয়াছে। বর্ষার অল্পতা হেতু অন্যান্য ফসল অপেক্ষা তুলা অধিক উৎপন্ন হয়; এই জন্য চাষারা সকল ফসল ছাড়িয়া তুলাকে আশ্রয় করিয়া সচ্ছল হইতেছে।

এই প্রদেশের কালো মাটির স্তর ২ হইতে ১২ ফুট পর্য্যন্ত গভীর। বর্ষার অল্পতা তুলার পক্ষে উপকারী। কিন্তু নভেম্বর মাস হইতেই জমি ফাটিতে আরম্ভ করে এবং বর্ষার জল সেই ফাটায় ঢুকিয়া অনেক চারার শিকড় আল্‌গা করিয়া দেয়। ইহা নিবারণের জন্য চারাতে ফুল হওয়া পর্য্যন্ত জমিতে ঘন ঘন পাইট করিতে হয়। ইহাতে জমির উপরিতল সমান ও খনিত হইয়া অন্তররস রক্ষা করে, জমি আর ফাটে না। তুলা প্রায় পাঁচ মাসে পাকে। মধ্যপ্রদেশের প্রধান তুলা জরি (কাটি বিলায়তী) ও বানী (হিন্দনঘাট বা ঘাটকাপাস)। জরি তুলার আদর ইংলণ্ডে নাই। ইহার আঁশ মোটা ও ছোট। ইহা জাপান ও জর্ম্মানীতে রপ্তানি হয়, এবং মোটা পশমী বস্ত্র তৈয়ারী করিতে পশমের সহিত ভেজাল দেওয়া হয়। ইহার আঁশ শক্ত বলিয়া আবহ পরিবর্ত্তনে ইহার কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু গত শতাব্দীতে যখন ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে তুলা পাইত না, তখন এই তুলাই ইংলণ্ডকে রক্ষা করিত।

বানী তুলার আঁশ লম্বা ও রেশম চিক্কন। জরির আঁশ অর্দ্ধ ইঞ্চি, বানীর আঁশ এক ইঞ্চি লম্বা হয়। বানী তুলার বীজও কম থাকে। জরি হইতে ১০ নম্বর সূতা ও বানী হইতে ৪০ নম্বর সূতা হয়। কিন্তু তথাপি জরি ক্রমশঃ বানীকে

বিতাড়িত করিতেছে। বানীর দাম জরি অপেক্ষা দুই তিন টাকা বেশী হইলেও জরি অধিক উৎপন্ন হয়; এই জন্য বানীর আদর ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে।

এতদ্ভিন্ন একজাতীয় মার্কিনী তুলা উৎপন্ন হয়। তাহাও প্রায় বানীর মত। তাহা হইতে ৪০ নম্বর সূতা তৈয়ারি হয়। অন্যান্য বিদেশীয় তুলার ফসল এ দেশে ভাল হয় না।

বুড়ি নামক এক প্রকার বিদেশী তুলা সাঁওতাল পরগণা হইতে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। ইহা মধ্যপ্রদেশের উপযোগী। যে ওজনের জরির দাম ৯০৲, বানীর দাম ১৩০৲, সেই ওজনের বুড়ির দাম ১৫০৲ টাকা। বুড়ি হইতে চল্লিশের সূতা হইতে পারে।

তুলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায় অনুসৃত হইতে পারেঃ—(১) বীজ নির্ব্বাচন, ইহার জন্য নীরোগ সুস্থ সবল শ্রেষ্ঠ চারার বীজ সংগ্রহ। (২) শঙ্কর উৎপাদন। (৩) সার নির্ব্বাচন। বর্ত্তমানে গোবর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহা প্রচুর পাওয়া যায় না। চোনাও উত্তম সার; তাহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা হইতেছে। নাইট্রোজেন-যুক্ত সার (যথা সোডা নাইট্রেট ও সলফেট এমোনিয়া) সস্তায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এই প্রদেশের জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব আছে। তাহা পূরণের পক্ষে সোডা নাইট্রেট সস্তা সার। পটাশ প্রয়োগে তুলার কিছু সুবিধা হয় না। তাতা কোম্পানির লোহার কারখানায় আনুষঙ্গিক ভাবে সোডা নাইট্রেট প্রস্তুত হইতেছে; যদি তাহা সস্তায় তৈয়ারি হয় তবে ঐ প্রদেশে তুলার চাষের খুব সুবিধা হইবে।

কৃষিবিভাগ হইতেও বীজসংগ্রহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার অনুষ্ঠান হইয়াছে। (ক্রমশঃ)।



কৃষক। অগ্রহায়ণ, ১৩১৫।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী।

গত সংখ্যার কৃষকে আমরা কৃষি বিভাগের কার্য্য-তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। ১৯০৭-৮ সালে কৃষি বিভাগ যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার বিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে তালিকা-উল্লিখিত কার্য্যাদির সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পন্ন কার্য্যাদি তুলনা করিয়া দেখিবার অবসর আসিয়াছে। আমরা এক্ষণে একে একে বঙ্গদেশস্থ কয়েকটি সরকারী কৃষি ক্ষেত্রের কার্য্যাবলী আলোচনা করিব।

বর্দ্ধমান কৃষি-ক্ষেত্র।—এখানে পাট, ধান ও আলু সম্বন্ধীয় পরীক্ষা হইবার কথা ছিল এবং কার্য্যতঃও তাহাই হইয়াছিল। পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে যে এক জমিতে একই বৎসরে ধান এবং পাট কিম্বা আলু জন্মান যাইতে পারে। দুইটি ফসল জন্মাইলে কেবল একটিতেই সার দিলে চলে। এই রূপ পর্য্যায়ে পাটের পক্ষে উত্তম সার বিঘা প্রতি ৪৫ মণ গোবর সার, এবং আলুর পক্ষে ৮০ মণ গোবর + ৭৷৷০ মণ রেড়ীর খৈল কিম্বা ৬৬ মণ গোবর সার + ১ মণ সুপার ফসফেট + ১ মণ সোরা উৎকৃষ্ট সার। শেষোক্ত সারে

বিঘা প্রতি ৬৭ মণ ৩০ সের আলু পাওয়া যায় কিন্তু রেড়ীর খৈলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলন হয়। এই সার গুলি স্থানীয় লোকের ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে। ধান্যের গর্ত্ত প্রতি চারার সংখ্যা সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে ১২ ইঞ্চ অন্তর প্রত্যেক গর্ত্তে একটি করিয়া চারা বসাইয়াই সর্ব্বাধিক ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমন ধানে পাট অথবা ধঞ্চের হরিৎ সার প্রয়োগ বেশ লাভ জনক।

ডুমরাঁও কৃষি-ক্ষেত্র।—এস্থানে ইক্ষু, সরিষা, গোধূম ও যই পরীক্ষাধীন ছিল। ইক্ষু সম্বন্ধীয় পরীক্ষার ফল সংক্ষেপতঃ নিম্নরূপ। স্থানীয় সঙ্গো জাতি অপেক্ষা ঘাড়ী উৎকৃষ্টতর। ইহার ফলনও অধিক। বিহারের শ্বেতাঙ্গ চাষীদিগের অবলম্বিত দাঁড়ী ও নালা প্রণালী স্থানীয় লাঙ্গল দ্বারা কৃত আইল অন্তরে রোপণ প্রথা অপেক্ষা ভাল। বিঘা প্রতি ৬৬ মণ গোবর সার ও ২ মণ ৩৩ সের রেড়ীর খৈল প্রয়োগে যথেষ্ট লাভ আছে। গোধূম সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় দেখা যায় যে মজঃফরনগরের "কোমল সফেদ" এবং লাল "দেশী" জাতির ফলন স্থানীয় গোধূম সমূহ অপেক্ষা অনেক অধিক। কৃষকের এক বৎসর অন্তর বীজ পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়। বিঘা প্রতি ২৬ মণ ২৬ সের মনুষ্যমলজ সার এবং তন্নিম্নে ২১ মণ ২৬ সের গোবর সার প্রয়োগে গম প্রচুর পরিমাণে ফলিয়া থাকে। তৎপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিগত বৎসরেও জব্বলপুর ও রায়পুর জাতীয় সরিষাই ফলনে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। স্থানীয় যই অপরাপর জাতীয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে দেখান হইয়াছে যে, উপযুক্ত পরিমাণ জল সেচন করিতে পারিলে এতদঞ্চলে পাট জন্মান যাইতে পারে।

কটক পরীক্ষা ক্ষেত্র।—এ স্থানে ধান, পাট, আলু ও চিনার বাদাম সম্বন্ধে পরীক্ষা হয়। ধান্য সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় বর্দ্ধমানের ন্যায় ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে অর্থাৎ বিঘা প্রতি ১৬ মণ ২৬ সের গোবর সার কিম্বা ১ মণ হাড়ের গুঁড়া ও দশ সের সোরাই সুলভ অথচ উৎকৃষ্ট সার বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রোপণ সম্বন্ধেও ১২ ইঞ্চি অন্তর গর্ত্তে এক একটি চারা রোপণ অনেকগুলি চারা রোপণ অপেক্ষা ভাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এক জমিতে শীতকালে ধান তুলিয়া লওয়ার পর পাট দেওয়ার পরীক্ষায় দেখা যায় যে, এরূপ অবস্থায় গড়ে বিঘা প্রতি ৫ মণ ১৮ সের পাট ও ৬ মণ ধান এবং ১১৷৷০ মণ খড় পাওয়া যায়। এই প্রথায় পাট জন্মাইতে হইলে কটক জেলায় চৈত্রের প্রথমে পাট বুনিয়া শ্রাবণের প্রথমে কাটিতে হয়। ধান ও পাটের পরিবর্ত্তে পাট ও আলু এই উভয়-বিধ পর্য্যায় উক্ত দেশে চলিতে পারে। কিন্তু উৎকল দেশের জমি অনেকটা নিস্তেজ বলিয়া প্রত্যেক ফসলে সার দেওয়া আবশ্যক। পাটনা জাতীয় গোল আলু উত্তমরূপ জন্মিয়াছে এবং আলুর চাষের আগ্রহ ও সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে কতিপয় বৃত্তিভোগী ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

বাঁকিপুর পরীক্ষা-ক্ষেত্র প্রস্তুতের কার্য্য চলি-তেছে। বীজ বিতরণের জন্য যে সকল ফসল উৎপাদিত হইবার কথা ছিল, সে গুলি প্রায়ই উৎপাদিত হয় নাই।

সবর পরীক্ষা-ক্ষেত্র।—ইহা বঙ্গীয় কৃষি কলে-জের খাস পরীক্ষা-ক্ষেত্র হইবে। এ স্থানে কতি-পয় গৃহ নির্ম্মাণের কার্য্য চলিতেছে। একতা ও সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এই ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব এক প্রথার ফসল উৎপাদিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রে

যে কয়েকটি আম্রকুঞ্জ আছে সে গুলির রীতিমত কারকিৎ হইতেছে। কর্ম্মচারীর সংখ্যাও বাড়ান হইয়াছে, কিন্তু ফল সম্বন্ধে পরীক্ষার কার্য্যে এখন হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

চুঁচুড়া পরীক্ষা-ক্ষেত্রে গৃহ নির্ম্মাণের কার্য্য চলিতেছে।

চাঁইবাসা পরীক্ষা-ক্ষেত্র।—১৯০৬ সালে তসর চাষের জন্য স্থাপিত হয়। এক্ষণে ইহাতে উক্ত কার্য্য পুরাদমে চলিতেছে। বঙ্গীয় তসর ব্যবসায়ের অধোগতির অন্যতম কারণ এই যে, বহুকাল ধরিয়া একই বীজ হইতে গুটি উৎপাদিত হইতেছে। পোকার আদি বাসস্থান অরণ্য হইতে নূতন বীজ আনিবার চেষ্টা হয় নাই। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক বৎসর জঙ্গল হইতে মুগার বীজ আনিয়া এক বৎসর পালনের পর, উহার ডিম্ব বিতরিত হয়। ইহাতে পোকার উন্নতি সম্ভব।

ফ্রেজারগঞ্জে ২২৪ বিঘা জমি পরীক্ষা-ক্ষেত্রের জন্য লওয়া হইয়াছে। ফ্রেজারগঞ্জ নিম্নবঙ্গে আসমুদ্র-ব্যাপী বন মধ্যস্থিত একটি দ্বীপ, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এ স্থানের মৃত্তিকা লবণাক্ত এবং তজ্জন্য এস্থানে পাট পরীক্ষার প্রয়াস বিফল হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে লবণ কমিয়া গিয়া মৃত্তিকা পাট ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনোপযোগী হইবে।

কালিমপং ক্ষেত্র।—ইহা উত্তরবঙ্গে পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত। আয়তন ২২৫ বিঘা। কালিমপং হোমস্ নামক সমিতির কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইলেও ইহা কৃষি বিভাগ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশস্থ কৃষিক্ষেত্রসমূহ দ্বারা সম্পাদিত কার্য্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এক্ষণে লাভ লোকসানের হিসাবে উহারা কিরূপ ফল প্রদান করিতেছে তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতুহল হইতে পারে। আমরা তাঁহাদিগের জন্য নিম্নে উক্ত ক্ষেত্র সমুদয়ের আয় ব্যয়ের একটি মোটামুটি তালিকা দিলাম। ইহাতে আনা পাই পরিত্যক্ত হইল।

পরীক্ষা-ক্ষেত্রের নাম।	আয়।	ব্যয়।
বৰ্দ্ধমান	১,৫৮৭৲	৫.১১৬৲
ডুমরাঁও	৭০২৲	৩,১২৫৲
কটক	২,৯৬৮৲	৯,৭৪৭৲
বাঁকিপুর	১৫২৲	৩০,৩৩৭৲
সবর	১,৬৩০৲	১৬,০৯৮৲
চুঁচুড়া	......	৯,৫৮০৲
চাঁইবাসা	২২৫৲	৩,৫০৫৲
কালিমপং	......	৫০০০৲
মোট	৭,২৬৪৲	৮২,৫০৮৲

অবশ্য এস্থলে বলা আবশ্যক যে, গভর্ণমেণ্ট কোন ক্ষেত্রই লাভের আশায় পরিচালন করেন না। কিন্তু যেরূপ অর্থ ব্যয় হয়, সেই পরিমাণে কার্য্য হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বোল্লিখিত সকলগুলি পরীক্ষা ক্ষেত্রে যে আশানুরূপ কার্য্য হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। এতদ্ভিন্ন কার্য্যতালিকা এবং সম্পাদিত কার্য্যের মধ্যে যদিও অনেকটা সামঞ্জস্য আছে, তথাপি কতিপয় স্থলে বোধ হয় যে, কাজগুলি কেবল তালিকায় আছে বলিয়াই আরব্ধ হইয়াছে। তাদৃশ পরীক্ষা সমূহের উদ্দেশ্য তেমন গভীর অথবা পরিচালন প্রণালী তেমন সুচারু বলিয়া বোধ হয় না।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ কেবল পরীক্ষা-ক্ষেত্রে পরীক্ষার অনুষ্ঠান করিয়া ক্ষান্ত নহেন। কৃষি-বিষয়ক অন্যান্য স্থলে পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্যও যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। বিগত বৎসরে এতদুদ্দেশ্যে সর্ব্ব সমেত ১,৪৩,৩৩৬৲ টাকা খরচ

হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা-ক্ষেত্র সমূহে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৮৩,৫০৮৲ টাকা। সুতরাং উভয় প্রকারে বিগত বৎসর বঙ্গদেশে সরকার হইতে কৃষির উন্নতি কল্পে ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৪৪৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমাদের ন্যায় দেশের পক্ষে ইহা সামান্য অর্থ নহে। বর্ত্তমান সময়ে এই অর্থের অনুপাতে কোন কৃষির উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় না। আশা করা যায় যে সময়ে ইহা হইতে সুফল ফলিবে।

পত্রাদি।

মহাশয়,

ভাদ্র মাসের কৃষকে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'সুয়া' পোকার ঔষধ জানিতে চাহিয়াছিলেন। আমি অদ্য তাহার ঔষধ আপনার নিকট জানাইতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কৃষকে স্থান দান দিয়া বাধিত করিবেন।

সুয়া পোকা গায়ে লাগিলে কাঁটা তুলিয়া ফেলাই প্রধান কার্য্য। ডুম্বুর পাতা বা অপর খস্‌খসে পাতার দ্বারা ক্ষত স্থানে আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করিলে কাঁটা উঠিয়া যাইবে এবং ভাল চূণ প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। ইহাতেও যদি আরাম না হয় ক্ষত বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কদম্ব ফুল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে আশু উপকার হয়। কদম্বের ন্যায় ঔষধ অতি বিরল।

জল কামড়ানির ঔষধ।—প্রথম যখন অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে তখন সরিষার তৈলের সহিত কর্প্পূর বা কুইনাইন মিশাইয়া গরম করিয়া ৩।৪ বার মালিশ করিলে উপকার হয়। যদি ক্ষত হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে "গাঁজার তৈল" বা "শৃগাল কণ্টক" (শিয়ালকাঁটা) বীজের তৈল ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়।

আমি উক্ত প্রকার ঔষধ ব্যবহার করাইয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি, তাই আপনাকে জ্ঞাত করিলাম, কৃষকে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

উর্ব্বর জমি বা অনুর্ব্বর জমি।—যে স্থানে তৃণ প্রভৃতি জন্মায় নাই সেই স্থানে চূণ মিশাইলে কিরূপ উপকার বা অপকার হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বিশেষ উপকার হয়। এইরূপ জমি সুন্দরবনে প্রায় দৃষ্ট হয়। যদি কোন প্রকার প্রতিকার হয়, তাহা হইলে অনেক গরীব প্রজা দারিদ্রের হাত হইতে উদ্ধার পায়। ইতি

শুভার্থী শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য,
ডায়মণ্ডহারবার নিবাসী, ২৪ পরগণা।

মান্যবর "কৃষক" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আমার ৩।৪টী ভাল আম্র কলমের গাছ আছে। ঐ গাছ সকলের গোড়ায় সজিনা গাছের শিকড় আসায়, তাহাদের অবস্থা দুর্ব্বল, এবং পাতা ও ডাল পালা শুষ্ক হইতেছে দেখিয়া গাছগুলির গোড়া হইতে কিছু দূরে, গোল ও গভীর খনন করিয়া, সজিনার শিকড় পরিষ্কার করিয়া, মধ্যে মধ্যে ঐ সকল গাছের গোড়ায় খোল্‌ ও পচানাদি সার দিলাম। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও একটী গাছ মরিয়া গিয়াছে ও অবশিষ্ট গুলিও মৃতপ্রায় অবস্থায় আছে। যদি ইহার উপায় থাকে, অনুগ্রহ করিয়া লিখিলে বাধিত হইব, নিবেদন ইতি।

একান্ত বশম্বদ, শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়,
রেঁইয়া বোসপাড়া, গোঁদলপাড়া, চন্দননগর।

[সজিনা গাছ গুলি কি নষ্ট করিবার সুবিধা হয় না? সজিনার শিকড় মৃত্তিকার মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় সুতরাং খানা একটু সুগভীর ও কিছু প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। গাছগুলিতে কোন প্রকার আওতা হইয়াছে কি না, অর্থাৎ সকালে, দুপুরে রৌদ্র পায় কি না—গাছ গুলিতে পুরাতন গোময় সার ও পাঁক মাটি সমভাবে মিশ্রিত করিয়া দিবেন এবং ছোট গাছ হইলে গাছ প্রতি এক সের, বড় হইলে আড়াই সের হিসাবে হাড়ের গুঁড়া দিয়া এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দিবেন ও মধ্যে মধ্যে জল দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কৃঃ সঃ।]

শ্রীযুক্ত আবদুল আজিদ্, চট্টগ্রাম।

মহাশয়,

যদি হালকা লাঙ্গল আপনার আবশ্যক হয় তাহা হইলে সমিতির প্রস্তত গোবিন্দপুর লাঙ্গল অর্ডার দিলে পাইতে পারেন। মূল্য চারি টাকা। ইহাতে আমন ধান্যের চাষ উত্তমরূপ চলিতে পারে।

কৃঃ সঃ।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়, রেঁইয়া, চন্দননগর।

মহাশয়,

আপনার বৃক্ষ যেরূপ ভাবে ছত্রক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাতে মুক্তি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। আপনি যদি নমুনা পাঠান তাহা হইলে ছত্রকের নাম ও প্রকৃতি অবগত হইতে পারা যায়। সাধারণতঃ বৃক্ষের মূল অনাবৃত করিয়া তুঁতের জল প্রয়োগে অনেকটা উপকার দর্শিতে পারে। কিন্তু বৃক্ষ যদি এরূপ ভাবে আক্রান্ত হইয়া থাকে যে মূল কাণ্ডের অংশ ও মজ্জা উভয়েই কৃষ্ণবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয় তাহা হইলে বৃক্ষের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কেবল মাত্র সময়ের কিছু অগ্র পশ্চাৎ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ ভাবে আক্রান্ত বৃক্ষের উপর মমতা করিয়া না রাখাই ভাল। তাহাতে পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষও আক্রান্ত হইতে পারে এবং পরিশেষে সমূহ ক্ষতি হইতে পারে।

কৃঃ সঃ

জলোত্তলন যন্ত্র।

শ্রীবুদ্ধি নাথ ঝা, নারায়ণপুর (ভগলপুর)।

মহাশয়,

আপনার পত্রের উত্তরে জানান যাইতেছে যে জলোত্তলন যন্ত্র নানা প্রকারের আছে। ছোট একটী যন্ত্রের দাম ৫০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা। দুই জন লোকে চালাইতে পারে। ইহাতে ঘণ্টায় ১৫০।২০০ শত গ্যালন জল উঠে। ভাল চাকা ওয়ালা একটী যন্ত্রের দাম ২৫০৲ টাকার কম নহে। ইহা একজনে অথবা দুইজনে চালাইতে পারে। ঘণ্টায় ৪০০ শত গ্যালন জল উঠে। যন্ত্রটীর মূল্য ব্যতীত পাইপ এবং বসাইবার সাজ সরঞ্জমের মূল্য আছে। আরও কল মেরামত খরচ আছে। আমরা এই জন্য দোন, ডোঙ্গা অথবা বাল্তি কল বা সাধারণ সিউনির দ্বারা জল সেচনের পক্ষপাতী।

কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

পঞ্জাবে তিলের আবাদ। ১৯০৮।

পঞ্জাবে প্রায় ২২টী জেলায় তিলের আবাদ হয়। বর্ত্তমান বর্ষে পঞ্জাবে তিলের আবাদী জমির পরিমাণ ১০১,০০০ একর। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা একর অধিক জমিতে তিলের আবাদ হইয়াছে। বিগত জুলাই মাসে সুবৃষ্টি হওয়ায়

হিসার, মণ্টগোমারি ও মুলতানে নূতন নূতন জমিতে তিলের আবাদ হইয়াছে। আবার অধিক বারিপাত হেতু গুরগাঁও, সিয়ালকোট, গুজরাট, রাওলপিণ্ডি, আটক, মিলওয়ালি, ঝাঙ্গ এবং মুজাফরগড়ের নিম্নভূমিতে তিলের আবাদের ক্ষতি হইয়াছে। মোটের উপর পঞ্জাবে এবার তিল চাষের অবস্থা ভাল।

পঞ্জাবে ইক্ষুর আবাদ। ১৯০৮।

এ বৎসর পঞ্জাবে ৩৬৬,১০০ একর পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর আবাদ হইয়াছে। গত বৎসরের সহিত তুলনায় প্রায় সমান। জল হাওয়া ইক্ষু চাষের অনুকূল ছিল। কোথাও কোথাও নিচু জমিতে যথা—রোটাক, গুরগাঁও, কর্ণাল, ফেরোজ-পুর, অমৃতসহর, গুরুদাসপুর এবং সিয়ালকোটে জল বসিয়া ইক্ষুর হানি করিয়াছে। অতিবৃষ্টি হেতু কোথাও ইক্ষুক্ষেত নিড়ান হয় নাই।

বঙ্গদেশে নীলের আবাদ। ১৯০৮।

উত্তর বিহারে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরিমাণে নিলের আবাদ হইয়া থাকে, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে জাভা জাতীয় নীল গাছ ভাল রূপ জন্মায় নাই। সুমাত্রা জাতীয় নীল—চৈত্র-বৈশাখ মাসে যাহার বুনন করা হইয়াছিল, তাহাও ঐ কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতি অল্পমাত্র শস্য পাওয়া যাইবে। এ বৎসর ১২৯,২০০ একর জমিতে নীলের আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর ১৪৬,৮০০ একর জমিতে আবাদ হইয়াছিল।

পঞ্জাব কৃষি বিদ্যালয়।

অত্রস্থ কৃষি-বিদ্যালয়ে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য চলি-তেছে। কার্য্য শেষ হইতে আরও এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইবে। যন্ত্রাগার ও উদ্ভিদ-তত্ত্বাদির পরীক্ষা গৃহের সাজ সরঞ্জম এখনও ঠিক হয় নাই। মিঃ মিল্‌ন্ যাঁহার উপর এই কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে তিনি পুষায় কিরূপ ভাবে কার্য্য হয় দেখিয়া তবে এখানকার জন্য ব্যবস্থা করিবেন। সম্ভবতঃ আগামী জুলাই মাসের পুর্ব্বে এই বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র লওয়া সম্ভব হইবে না।

লায়ালপুর কৃষিক্ষেত্র।

এই ক্ষেত্রের পরিমাণ ৪৫০ একর। উহার মধ্যে ১৫০ একর মাত্র পরীক্ষার জন্য রাখিয়া বাকী জমি প্রজা বিলি করা হইয়াছে। সরকার হইতে চাষের জন্য তাহাদিগকে বীজ দেওয়া হইবে। তাহারা উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক খাজনা স্বরূপ দিবে এবং তাহাদের প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ যদি তাহারা বিক্রয় করে তবে সরকারকেই বিক্রয় করিবে। এই বন্দোবস্তের দ্বারা চাষীদিগকে হাতে হাতিয়ারে নূতন প্রথায় কৃষি প্রণালী শিখাইবার সুবিধা হইয়াছে এবং এই সকল ক্ষেত্রোৎপন্ন উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতে চারিদিকে বিতরণ করিলে কৃষির সমূহ উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

লায়ালপুর তুলার আবাদ।

ধারওয়ারে এমেরিকান তুলা ও ইজিপ্সিয়ান তুলার পরীক্ষা চলিতেছে। অধিকন্তু পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নানা জাতীয় তুলা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা হইতেছে।

বিগত বর্ষে এখানে পাট চাষ করিয়া দেখা হইয়াছে, যে সেচন জলের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে পাট জন্মিতে পারে। যদি ক্ষেত্রে ১৪ দিন অন্তর জল দিলে চলে, তাহা হইলে খাল হইতে সেচনের কোন প্রকারে সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা ঘন ঘন জল দিতে হইলে জলের অভাব হইবে। আরও এক অসুবিধা এই যে এই সকল স্থানে শীত ঋতু অতি প্রচণ্ড এবং শীঘ্রই আরম্ভ হয় সুতরাং শীতের পূর্ব্বেই পাট কাটিয়া লওয়া আবশ্যক।

সারা গোধা বীজ ক্ষেত্র।

বিগত বর্ষে পোকা লাগিয়া এবং এপ্রিল মাসে অত্যধিক বৃষ্টি হইয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় গমের বীজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুনরায় বীজ ক্রয় করিয়া তবে বর্ত্তমান বর্ষের চাষ চলিতেছে।

বোল পোকা।

তুলায় এবার এইখানে বোল পোকার উপদ্রব দৃষ্ট হয় নাই। শীত কম হওয়াই ইহার কারণ। মিঃ লেফ্রয় অনুমান করেন যে অধিক শীত হইলে তুলা গাছে যে এক প্রকার বেজী (পর গাছা) জন্মায় তাহা মরিয়া যায়। তুলা গাছে এই গুলি থাকিলে বোল পোকা ধরিতে পারে না। ইহা সত্য কি না প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহু চেষ্টা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ইক্ষু ও মটরের কীট, বেগুন প্রভৃতি ফসলে সুয়া পোকার উপদ্রব নিবারণের বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে।

এখানে গমে এক প্রকার নুতন রোগ দেখা গিয়াছে (Tylenchus scandens)। বহুকাল পূর্ব্বে কোন সময়ে এই রোগ দেখা দিয়াছিল। ইহাতে গমের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। মিঃ মিল্‌ন প্রতিকারের জন্য গমের বীজ ভাল করিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া ব্যবহার করিতে বলেন। যে প্রাঙ্গনে গম ঠাসা ঝাড়া হইবে তাহা পরিষ্কার রাখিতে উপদেশ দেন। সময় সময় কিছু কিছু গমের ভুসি পোড়াইয়া ফেলিলে মন্দ হয় না এবং অন্য ফসলের সহিত গমের পরিবর্ত্ত চাষ করিলে এই রোগ নিরাকৃত হইতে পারে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

পঞ্জাবে এবৎসর যে সমস্ত কৃষিযন্ত্র ব্যবহার হইয়াছে তাহার মধ্যে শস্য আহরণ যন্ত্র এবং অশ্ব চালিত প্লানেট জুনিয়ার হো বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। উক্ত অশ্ব চালিত কোদালির দ্বারা সব্জী ক্ষেত্র, ইক্ষু এবং তুলা ক্ষেত্রের কোপান ও দাঁড়া বাঁধার কার্য্য বেশ চলে। ইহার কার্য্য কুশলতা বুঝিয়া সাধারণ লোকে ১৭টী খরিদ করিয়াছে। এক একটীর দাম ৫০৲ টাকা। আহরণ যন্ত্রের দাম ২৫০৲ টাকা। পঞ্জাবে ৫৩টী ব্যবহৃত হইতেছে। উহার মধ্যে ২৩টী সাধারণ লোকে চালাইতেছে। নরম বা বেলে জমিতে ভাল চলে না। ইহার ব্যবহার সাধারণকে বেশ ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু যন্ত্রটী রক্ষা করিবার ও চালাইবার উপদেশ পুস্তিকা দেশী ভাষায় ছাপাইয়া ক্রেতাগণের মধ্যে বিলি॰ করা হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে এই যন্ত্রের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যন্ত্র গুলির দাম কম নহে। ঘন ঘন মেরামত করিতে হইলে বা তাহাতে খরচ অধিক হইলে বা মেরামতের সুবন্দোবস্ত না থাকিলে সাধারণে কিন্তু ইহা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

মান্দ্রাজে কৃষি উন্নতি।

কোইম্বাটুর কৃষি কলেজ। চারিদিকেই কৃষি উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে। গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগেই ইহা হইতেছে, এটুকু অবশ্য গভর্ণমেণ্টের দয়া বলিতে হইবে। কোইম্বাটুরে প্রায় ৪॥ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কৃষি কলেজ ও কৃষি তত্ত্বানুসন্ধানালয় স্থাপিত হইতেছে। ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। অদ্যাপিও গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় নাই।

তুলা চাষ। তুলা চাষ সম্বন্ধে নানা প্রকার তত্ত্বানুসন্ধান হইতেছে। এতদ প্রদেশে কারুণৎগনী তুলাই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। টিউটিকরিণ হইতে ১২ মাইল দুরবর্ত্তী ভাগ্যকুলম নামক স্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহে এই তুলা জন্মিয়া থাকে। ব্রীটিস তুলা-চাষ-সমিতি এই জাতীয় তুলা চাষের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য ৩০০০৲

টাকা প্রদান করিয়াছেন। অধিকন্তু ১,৭০০৲ টাকায় এই প্রকার তুলা সংগ্রহ ও বীজ শূন্য করিয়া বিক্রয়ার্থ উক্ত সমিতির নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বীজ, রায়তদের মধ্যে চাষের জন্য বিতরিত হইবে। সরকারি ক্ষেত্রের, তুলা বলদ বাহিত কোদালি দ্বারা নালা কাটিয়া বীজ বপন ও অন্যান্য প্রকার যত্ন সহকারে চাষ করিয়া সাধারণতঃ অপরাপর চাষের ক্ষেত্রের তুলা অপেক্ষা ভালই হইতেছে।

ধান চাষ। বাঁকু নামক এক প্রকার ধান্য পরীক্ষায় ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্যামলকোট, কোইম্বাটুর ও সৈদাপত কৃষি ক্ষেত্রে ইহার আবাদ করা হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই ফসল ভাল হইয়াছে। এই ধানের ১টা হিসাবে বীজ রোপণেও যথেষ্ট ফল হয়, সর্ব্বাগ্রে পাকে এবং বাজারে সাদরে বিক্রয় হয়।

পশু খাদ্য। মান্দ্রাজের তালিপারাম্বা কৃষিক্ষেত্রে জোয়ার এবং গিনিঘাস এই দুই প্রকার পশু খাদ্যের চাষ করা হইয়াছিল। জোয়ার ভাল জন্মায় নাই। গিনি ঘাস ছায়াযুক্ত স্থানে ও খোলা মাঠে চাষ করা হইয়াছিল। ইহা বরং উভয়ত্র আশাপ্রদ কিন্তু কিছু বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া বলিবার পূর্ব্বে আরও পরীক্ষা আবশ্যক।

সার-সংগ্রহ।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে পশু চিকিৎসা।

এখানে পশু চিকিৎসার প্রসার দিন দিন বাড়িতেছে। বিগত বর্ষে উক্ত প্রদেশে ২৩টী জেলায় ৬২,৭৬৫টী গবাদি পশু সংক্রামক রোগে মারা গিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ১৭টী জেলায় ৬৮,৭৪৬টী পশুর মৃত্যু হইয়াছিল। যে সকল পশুগণকে টীকা দেওয়া হইতেছে তাহাদের মধ্যে রোগাক্রমণের সংখ্যা খুবই কম। ২২টী জেলায় টীকা দেওয়া পশুর মধ্যে ২৪৯টী বসন্ত রোগে আক্রমিত হইয়াছিল। দুইটী নূতন পশু চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহ, বাখরগঞ্জ, শিবসাগর, শিলং এবং গৌহাটীতে পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। মোটের উপর ১৯০৮ সালের মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত ৭টী পশু চিকিৎসার হাঁসপাতাল এবং ৬টী ডাক্তারখানা সংস্থাপিত হয়। ইহাতে ৪০৫টী পশু হাঁসপাতালে রাখিয়া এবং ১৩,৫০০টী পশু কেবল ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইয়া খাওয়াইয়া চিকিৎসিত হইয়াছিল।

গবাদি পশুর উন্নতি কল্পে অত্র প্রদেশে নানা স্থানে লোকাল এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক ২৬টী ষাঁড় রক্ষিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ষাঁড়ের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

বঙ্গীয় পশু চিকিৎসা বিদ্যালয়।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। অনেকে এক্ষণে পশু-চিকিৎসায় মন দিতেছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বিগত বর্ষে ১৫১ জন, তৎপূর্ব্ব বর্ষে ১০৪ জন মাত্র ছিল। এই ছাত্রগণের ৬০ জন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ৭ জন বিহার, ৫ জন বর্ম্মা, ৪টী ছাত্র মান্দ্রাজ, ২টী ছাত্র পঞ্জাব প্রদেশ হইতে ১ জন উড়িষ্যা হইতে, ১ জন যুক্তপ্রদেশ হইতে আসিয়াছে, বাকী ৭১টী ছাত্রবঙ্গদেশের। এই বিদ্যালয় সংলগ্ন একটী ছাত্রাবাস আছে তাহাতে ১৫৬টী ছাত্র থাকিতে পারে। অধিকাংশ ছাত্রই গভর্ণমেণ্ট কিম্বা ডিষ্ট্রীক্ট জেলা বা স্থানীয় বোর্ডের খরচে তথায় থাকিয়া ঐ বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে। গত বৎসর ৩টী শ্রেণী

হইতে ১০২টী ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে গভর্ণমেণ্ট পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। সমগ্র বঙ্গদেশে ২৫টী পশু-চিকিৎসালয় আছে ঐ সকল চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত পশুর সংখ্যা ৩২,৭৩৬ হইতে ৬১,৫৫৭ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

নেলিকুপম কৃষিক্ষেত্র।

এই নামে কোন এক ব্যক্তির একটী ১৯৷৷০ একর পরিমিত ক্ষেত্র আছে। এই ক্ষেত্র হইতে তাঁহার নিম্নলিখিত প্রকার আয় হইয়াছে।

কলা	৫৷৷০ একরে	১,৫০০৲।
রাগি	১৷৷০ ,,	৩৬৲।
কুসুম	৫৷৷০ ,,	২১৪৲।
ধান	৭ ,,	৮২৲।

মান্দ্রাজে কলার আবাদ যথেষ্ট হইয়া থাকে। দেখা যাইতেছে কলা হইতেই আয় সমধিক। বঙ্গদেশের অনেক স্থানেও কলার আবাদ সুচারুরূপ হওয়া সম্ভব। শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী প্রভৃতি স্থান ব্যতীত এরূপ একটী লাভজনক আবাদ বিস্তৃতরূপ অন্যত্র প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।

লতা কস্তুরী।

লতা কস্তুরী পাট জাতীয় গাছ, এই গাছের বীজ গুলি মৃগনাভির তুল্য গন্ধপ্রদ। ইহার ইংরাজী নাম Vegetable musk। পাট যে প্রণালীতে চাষ আবাদ করিতে হয়, ইহার চাষও তদ্রূপ। কিন্তু পাট অপেক্ষা ইহার আঁইস অধিক সাদা, চিক্কণ এবং কোমল।

আমাদের দেশের যে সকল জমিতে পাট জন্মিয়া থাকে, সেই সকল জমিতেই এই লতা কস্তুরীর আবাদ হইয়া থাকে। পাটের ফসলে কেবল মাত্র আঁইস পাওয়া যায়, কিন্তু লতা কস্তুরীর আঁইস ও বীজ উভয়ই ব্যবসায়ের উপযোগী। এই লতা কস্তুরী পাট অতি উৎকৃষ্ট। নারায়ণগঞ্জের পাটের ন্যায় ইহা মূল্যবান ও ফলনশীল। ইহার গাছের বীজ রাখিলে প্রত্যেক বিঘায় অন্ততঃ ৫ মণ বীজ পাওয়া যায়।

এই লতা কস্তুরীর গাছে বীজ সুপক্ক হইলে পরে গাছ কাটিয়া তাহা হইতে আঁইস বাহির করিতে হয়। ইহার ফলন পাটের ফলনের তুল্য। বীজগুলি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই জন্য এই বীজ উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। গন্ধ বণিকেরা এই বীজ তিন চারি টাকা সের হিসাবে বিক্রয় করে। যখন ফরাসী দেশে পমেটম প্রভৃতির যথেষ্ট আদর ছিল, তখন এদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে লতা কস্তুরীর বীজ রপ্তানি হইত।

আমাদের দেশের কবিরাজেরা সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিতে এই বীজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তামাকের মশলা রূপেও এই বীজ ব্যবহৃত হয়। সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করণে বহুমূল্য মৃগনাভির অভাবে এই বীজ অনায়াসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যদি আমাদের দেশের কৃষকেরা পাটের পরিবর্ত্তে এই লতা কস্তুরীর আবাদ করেন, তাহা হইলে যে তাঁহারা বিশেষ লাভবান হইবেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সাধারণ পাটের মূল্য অপেক্ষা এই লতা কস্তুরী পাটের মূল্য সর্ব্বদা অধিক থাকায় বিশেষ লাভকর হইবে। বীজগুলি হইতেও যথেষ্ট ধনাগম হইবে, এক্ষণে আমাদের দেশে এই পাট আবাদের সময় যদি পরীক্ষার্থেও শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার অল্প পরিমাণে চাষ করেন, তাহা হইলে ইহার সত্য তথ্য অনায়াসে জানিতে

পারেন। এই চাষে কোন রূপে তাঁহাদের ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

জমি বিশেষে লতা কস্তুরী পাট প্রতি বিঘায় ৭।৮ মণ পর্য্যন্ত ফলিয়া থাকে, বীজ ও প্রতি বিঘায় ৭।৮ মণ উৎপন্ন হয়। সাধারণ পাট অপেক্ষা ইহা দুই টাকা অধিক মূল্যেই বিক্রয় হইতে পারে। আমাদের এই জীবন সংগ্রামের দিনে এই প্রকার নব নব কৃষি তথ্যানুসন্ধান ও তাহার পরীক্ষা যে বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে একথা বলাই বাহুল্য।

শ্রীগুরু চরণ রক্ষিত।

বঙ্গদেশে সরকারী বীজ গুদাম।

যাহাতে কৃষকেরা উৎকৃষ্ট বীজ প্রাপ্ত হইতে পারে তজ্জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট একটি বীজ গুদাম খুলিয়াছেন। নির্ব্বাচিত এবং সতেজ বীজের অভাবে যে ফসল সমূহ ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। কিন্তু যদি কেহ বিশেষ চেষ্টার সহিত বীজ নির্ব্বাচন করেন, এবং তাহা যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করিয়া কৃষকদিগকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে বাস্তবিকই কৃষকের উপকার করা হয়। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা প্রশংসা যোগ্য। কিন্তু যদি তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে তাঁহারাই সর্ব্ব প্রথমে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপন করিয়াছেন তাহা হইলে তাঁহাদের সে ধারণা ভ্রমমূলক। এতদ্দেশে কয়েক বৎসর হইতে কতিপয় কৃষক বীজের জন্য উৎকৃষ্ট ফলমূল ও ফসল সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যে সফলতা লাভ করার যেরূপ আশা আছে অন্য কাহারও তাহা নাই এবং সেই জন্যই আমরা ইহাতে আনন্দিত হইয়াছি। অনেক স্থানে ভাল বীজের আবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে কৃষককে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, এবং ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে মূল্য অধিক হইলে কৃষকেরা উৎকৃষ্ট বীজ লইতে স্বীকৃত হইবে না।

বিগত বৎসরের বীজ গুদামের হিসাবে দেখা যায় যে সর্ব্বাপেক্ষা পাটের বীজই অধিক বিক্রয় হইয়াছিল অর্থাৎ ২৬৬ মণ। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের মতে নিম্নলিখিত ফসল সমূহের নিম্নলিখিত জাতীয় বীজ গুলি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ঃ—

ধান্য ঃ—মধ্য প্রদেশ আউস (সরু); আমন—দাদখানি, বাঁকতুলসি, বাদসাভোগ, সমুদ্রবালি ও বালাম। পাট ঃ—দেশওয়াল, হেউতি, কাকিয়া বোম্বাই। ইক্ষু ঃ—সাধারণ চাষের জন্য খাড়ি; অধিক জলের জন্য ইকরি। ভুট্টা ঃ—জৌনপুর। জোয়ার ঃ—সারন। অড়হর ঃ—সারন। গোধূম ঃ—শ্বেত মজঃফরনগর। যই ঃ—ডুমরাওঁ। সরিষা ঃ—রায়পুর ও জব্বলপুর। ছোলা ঃ—পাটনা। চিনার বাদাম ঃ—কটক। আলু ঃ—পাটনা ও নৈনিতাল।

অরণ্যের অভাব।

অনেকেই অবগত আছেন দেশ মধ্যে ক্রমশঃ বন কমিয়া যাওয়াতে অনেক প্রকারে ক্ষতি হইতেছে। সম্প্রতি দার্জ্জিলিংএ যে কমিসনারদিগের একটি বৈঠক বসে, তাহাতে অপরাপর বিষয়ের মধ্যে একটি আলোচ্য বিষয় ছিল যে, অরণ্যসমূহ নির্ম্মূল হওয়াতে কি প্রকারে অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। উক্ত বৈঠক অনুমোদন করেন যে, ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যা বিভাগের জন্য একটি ও ভাগলপুর ও পাটনার জন্য একটি সমিতি বসিয়া এই বিষয় বিবেচনা করুন। ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যায় উক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান অধিকতর আবশ্যকীয় বোধ করিয়া ছোট লাট মহোদয় আপাততঃ

ঐ সকল স্থানের জন্য অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। উড়িষ্যায় সম্প্রতি বন্যায় বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং ছোট নাগপুরে নূতন বন্দোবস্তের সৃজনে অনেক স্থানে বন জঙ্গল কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই সমস্ত জমির স্বত্ব সাব্যস্ত না হওয়ায় লোকে বৃক্ষাদি ছেদন করিত না। কিন্তু এক্ষণে বন্দোবস্ত হইয়া যাওয়ায় সকলেই জঙ্গল কাটিয়া জমি আবাদে তৎপর হইয়াছে।

এক্ষণে অনুসন্ধানীয় বিষয় সমুদয় এই:— প্রত্যেক বিভাগে কি পরিমাণে জমি ক্ষয় হইতেছে ও হওয়া সম্ভব পর, উহার বর্ত্তমান ও ভাবী ব্যবহারিক ফল; কি উপায়ে ইহা নিবারণ করিতে পারা যায় এবং বর্ত্তমান অরণ্যসমূহের রক্ষণ ও উন্নতি সাধনের জন্য কি ব্যবস্থা আবশ্যক। বর্ত্তমান অরণ্য বিষয়ক আইনের সামান্য সংশোধন দ্বারা যে বিশেষ কিছু ফল হইবে, তাহা বোধ হয় না। বরং যে সমস্ত ব্যক্তির অরণ্য আছে, তাহাদিগকে আইন দ্বারা উহার অপব্যবহার করিতে নিরস্ত করিলে অনেক সুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে। ইহা অবশ্য উক্ত সমিতির আলোচ্য বিষয়। যদি সমিতি বিবেচনা করেন যে, এ বিষয়ে আইন আবশ্যক, তাহা হইলে তাঁহারা আইনের উদ্দেশ্য ও বিষয় লিপিবদ্ধ করিবেন। এই সমিতির সভ্যগণ মিঃ এচ, এল, ষ্টিভেনসন্ সভাপতি, মিঃ ই, বি, কবডেন র‍্যামসে, মিঃ জে, এ, গ্রিড। অবসর প্রাপ্ত মিঃ কবডেন র‍্যামসে ফিরিয়া আসিলে সমিতির রাঁচিতে অধিবেশন হইবে। সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করিতে ও স্থানীয় অনুসন্ধান করিতে সম্ভবতঃ এক মাসের অধিক হইবে না। তাহার পর সমিতি সভ্যদিগের অধিবেশন দ্বারা মন্তব্য স্থির করিতে পারিবেন। অপরাপর সুসভ্য পাশ্চাত্য প্রদেশে অরণ্য সংরক্ষণ করার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। অরণ্য অভাবে মৃত্তিকার জলীয় বাষ্প সূর্য্যের সাক্ষাত কিরণ সংযোগে সহজেই বহির্ভূত হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন অরণ্য থাকিলে, পার্ব্বতীয় নদীসমূহের জলস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকা কণা ধুইয়া লইয়া যাইতে পারে না। এই সমস্ত ও অন্যান্য কারণে অরণ্য সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত দুই স্থানে বলিয়া নহে বঙ্গের সর্ব্বত্রই অরণ্য অভাবে মৃত্তিকার ক্ষয় হইতেছে। এ বিষয়ে যাহাতে সুবন্দোবস্ত হয়, সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ প্রদান একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশে বেরার প্রদর্শনী।

বিগত নভেম্বর মাসের শেষার্দ্ধে নাগপুর মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। অনেকেই জানেন যে, বহুদিবস পূর্ব্ব হইতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন হইতেছিল। এক্ষণে প্রদর্শনী প্রায় এক মাস কাল খোলা থাকিয়া পুনরায় বন্ধ হইল। নানাস্থান হইতে বহুলোক সমাগম হইয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে নাগপুরে প্রথম প্রদর্শনী হয়। সে সময় মধ্যপ্রদেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। যাতায়াতের সুবিধা ত ছিলই না; তদ্ব্যতিরেকে শিক্ষাও এত অল্প পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছিল যে, প্রদর্শনী সম্বন্ধে কোন আগ্রহ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, লোকে প্রদর্শনীকে আবকারির কর আদায় করিবার ফন্দি মনে করিয়া প্রদর্শনীর সম্মুখীন হইতে চাহিত না। এখন মধ্যপ্রদেশের অবস্থা সে প্রকার নাই। বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯০৬ সালে ২৯ কোটী টাকার মাল আমদানী রপ্তানী হয়। এখন মধ্যপ্রদেশের ভিতরেই রেল

লাইনের পরিমাণ ১৬৫৭ মাইল। কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ৫১ কোটী বিঘা। তুলার কল এবং কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ পদার্থে আজকাল মধ্যপ্রদেশ প্রচুর ধনশালী।

১৮৬৪ হইতে ১৯০৮, এই ৪৩ বৎসর মধ্যে মধ্যপ্রদেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সুতরাং স্থানীয় দ্রব্যাদির হিসাবে এই প্রদর্শনীতে দেখিবার দ্রব্য অনেক ছিল। প্রদর্শনীকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিবার জন্য প্রদর্শনীর কর্ত্তারা ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে কৃষি ও শ্রমজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। (১) কৃষি (২) খরণ (৩) বস্ত্রাদি (৪) কাষ্ঠ ও ধাতু দ্রব্য (৫) খনিজ দ্রব্য ও (৬) বিবিধ এই কয় শ্রেণীতে প্রদর্শিত দ্রব্যসমূহ সজ্জিত হইয়াছিল। দেশীয় যাবতীয় দ্রব্য ও কল কজ্জাদি ব্যতিরেকে বিদেশীয় যে সমস্ত কল মধ্যপ্রদেশান্তর্গত বাণিজ্যাদি ও শ্রম-শিল্পে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেরূপ কল প্রভৃতিও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে (১) মৃত্তিকা ও সার (২) ফসল ও পশুখাদ্য (৩) কৃষিযন্ত্র (৪) ফল ও সজ্জী (৫) ফুল (৬) গবাদি। ইহাতে বৃক্ষরোগ ও কৃষি বিষয়ক পুস্তকাদির কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই দুইটি শ্রেণীর উল্লেখ করা উচিত ছিল। মধ্যপ্রদেশের কৃষিবিভাগ উক্ত প্রদর্শনীর ভার লইয়াছেন, কৃষি-বিভাগে ১১টি স্বর্ণপদক, ২১টি রৌপ্যপদক ও নগদ ৯৬২ টাকা পুরস্কার দিবার সঙ্কল্প ছিল।

বর্দ্ধমান ক্ষেত্রে সার পরীক্ষা।

সার পরীক্ষায় নূতনতত্ত্ব কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা দেখিতে পাই যে ধান্যক্ষেত্রে একর প্রতি ৫০ মণ গোময় সার, ৩ মণ হাড়ের গুঁড়া এবং ৩০ সের সোরা প্রয়োগ করিলে উপযুক্ত ফসল পাওয়া যায়। আর যদি একই ক্ষেত্রে ধান, পাট কিম্বা আলু, পাট এই রূপ পরিবর্ত্ত চাষ করা যায়, তাহা হইলে পাট চাষের পূর্ব্বে একর প্রতি ১৩৫ মণ গোময় সার প্রয়োগ করিলে পাট উপযুক্ত পরিমাণে জন্মায় এবং পাট কাটিয়া সেই ক্ষেত্রে ধান বুনিলে আর সার না দিলেও ধানও ভাল রূপ হয়। আলুর সহিত পরিবর্ত্ত চাষে আলু বসাইবার সময়ই সার দিতে হয়। আলু ক্ষেত্রে ২৪০ মণ গোময় এবং ২২॥০ মণ রেড়ীর খৈল কিম্বা ২০০ মণ গোময় সার, ৩ মণ সুপার ফসফেট, ৩ মণ সোরা প্রদান করিলে আলুর ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। তারপর সেই আলু ক্ষেতে পাট চাষ করিলে পাট সুন্দর জন্মায়। আমন ধানের জমিতে ধনিচা বুনিয়া চষিয়া সবুজ সার প্রয়োগ করিলে কম খরচে সারের কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে। অন্যত্র এই বিষয়টী বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

আমেরিকায় কৃষি ছাত্র।

শিবপুর কৃষি-বিদ্যালয় হইতে দুইটী ছাত্রকে কৃষি শিক্ষার্থ আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠান হইয়াছে। ১৯০৫ সালে যে চারিটী ছাত্র প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা সকলেই ১৯০৭ সালে ফিরিয়া আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন পূর্ব্ব-বঙ্গ এবং আসামে কৃষি-বিভাগে কার্য্য করিতেছে। অপর তিন জন প্রাদেশিক কৃষি-বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াছে ঃ—মিঃ এইচ, এল, দত্ত উক্ত বিদ্যালয় সংক্রান্ত পরীক্ষা ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধারক, মিঃ এ, সি, ঘোষ সহকারী উদ্ভিদতত্ত্ববিদ, এবং এস, এন, সিল সহকারী কৃষি অধ্যাপক হইয়াছেন। এখনও যে

ছারিটী ছাত্র আমেরিকায় আছে তাহাদের অধ্যয়ন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

বেহারে কূপ হইতে জল সেচন।

যাহাতে এই প্রদেশে ক্ষেত্রে জল সেচনের নিমিত্ত অধিক সংখ্যক কূপ খনন করা হয় গভর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। এই অভিপ্রায়ে পব্লিক ওয়ার্কসের একজন ওভারসিয়ার বাবু উপেন্দ্র নাথ সেনকে কূপ খনন কার্য্যের সুপারিটেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া, কূপ খননের বিশেষ তত্ত্ব শিখাইবার জন্য তাঁহাকে কানপুরে পাঠান হয়। তিনি ১৯০৮ সালের এপ্রেল মাসে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাঁকিপুরে তাঁহার প্রধান আড্ডা। তথায় তিনি ১২ জন ছাত্রকে কূপ খনন বিদ্যা শিখাইতেছেন। এই সকল লোক তৈয়ারি হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে উপযুক্ত যন্ত্রাদি দিয়া এক একটী জেলায় পাঠান হইবে। তথায় তাহারা কলেক্টারের পরামর্শানুসারে কূপ খনন কার্য্যে ব্যাপৃত হইবে। কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর ঐ কার্য্যের তত্বাবধান করিবেন। সম্প্রতি সাবুর, বাঁকিপুর ও পুষাতে পরীক্ষার্থ কূপ খোদিত হইয়াছে।

উন্নত প্রণালীর কৃষি যন্ত্র ব্যবহারে আগ্রহ।

বিগত বর্ষে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের গুদাম হইতে ৯৫টী কৃষি যন্ত্র সরবরাহ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মেঃ টমসন মিলন্ ৩৪৮টী আখমাড়া কল, মেঃ বরণ কোং ১২ সেট কূপ খনন যন্ত্র, ৯টা এবিসিনিয়ন টিউবওয়েল যন্ত্র, ২টী বলদে টানা কলের লাঙ্গল, ২টী ধানছাঁটা কল, কতকগুলি আঁশ বাহির করা কল, এবং পাটের গাঁইট বাঁধা প্রেস বিক্রয় করিয়াছেন। জেসপ কোম্পানি কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা অধিক যন্ত্র বিক্রয় করিয়াছেন। তাঁহারা ১২০টী হিন্দুস্থান লাঙ্গল, ৩৬টী বিচালি কাটা কল, ৪৩টী ভুট্টা মাড়া কল, ১২টী ডোনাল্ডসন তৈলের কল, ৬টী এপোরকেডোবস্ নামক লাঙ্গল, ৫টী হিন্দুস্থান কলটিভেটর নামক লাঙ্গল এবং ২টী চাউল ছাঁটা কল বিক্রয় করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

স্পঞ্জ।—পালিশাদি লাগাইতে কিম্বা প্যাড তৈয়ারি করিতে স্পঞ্জের ব্যবহার হইয়া থাকে। ইউরোপে স্ত্রীলোকেরা গাত্র সংমার্জ্জনা প্রভৃতির জন্য প্রায়ই স্পঞ্জ ব্যবহার করিয়া থাকেন এতদ্ব্যতীত যন্ত্রাগারাদিতে নানাকার্য্যে স্পঞ্জ ব্যবহার হয়। কিন্তু এই স্পঞ্জ জিনিষটা কি এই সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন ইহা এক প্রকার সমুদ্র গর্ভজাত উদ্ভিদ দেহ বিশেষ। কিন্তু বস্তুত ইহা উদ্ভিদ দেহ নহে। ইহা এক প্রকার সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কালমাত্র। ইহা অসংখ্য স্থুল ও সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট ও কোমল। কোন প্রকার তরল পদার্থে সহজে সিক্ত হয় ও উহা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। নানা জাতীয় স্পঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গুলি সাতিশয় স্থুল ছিদ্র বিশিষ্ট ও কোমলতাহীন। এই রূপ স্পঞ্জগুলি দেহ সংমার্জ্জনার উপযুক্ত নহে। সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট কোমল স্পঞ্জগুলিরই ব্যবহার অধিক। প্রশান্ত মহাসাগর ভারত মহাসাগর, গ্রীস, তুরস্ক ও গ্রেট ব্রিটনের চতুঃপার্শ্বস্থ সাগরে যথেষ্ট পাওয়া যায়, ভূমধ্যসাগরের বাঁধা জলে প্রচুর জন্মায়। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল স্পঞ্জ পাওয়া যায়।

কৃষি যন্ত্রের তালিকা।—এবার কৃষি বিবরণীতে একটী কৃষি যন্ত্রের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। লাঙ্গল প্রভৃতি অনেকগুলি যন্ত্রের নাম দেওয়া আছে, কিন্তু দাম কত, কার্য্যের উপযুক্ত কি না বা কোথায় পাওয়া যায় লেখা নাই। কতকগুলি নাম দিয়া তালিকার কলেবর বৃদ্ধি করায় লাভ কি? উক্ত তালিকা আমরা শিবপুর লাঙ্গলের উল্লেখ দেখিতে পাই, ইহা মাটি উল্টাইয়া চাষের পক্ষে উপযুক্ত বটে। লেখা আছে যে ইহা কৃষি-বিভাগের গুদামে পাওয়া যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা অনেকবার অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। হস্তচালিত উন্নত লাঙ্গল, ঘাস ও জঙ্গল নিড়াইবার উপযুক্ত কিন্তু ইহার দাম, প্রাপ্তি স্থান কিছুই নাই। ইক্ষু রস জ্বাল দিবার কটাহ,—অনেক রস ধরে, এবং কটাহ হইতে ময়লা গাঁজ সহজে উঠান যায়, দাম ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা। টম্‌সন মিলন্ বিহিয়া সাহাবাদ এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

রঙ্গপুর তামাক ক্ষেত্র।—সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর অনুচরবর্গের সহিত উক্ত ক্ষেত্র পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উক্ত ক্ষেত্রের পরিদর্শন করিয়া, তামাক প্রস্তুতের প্রণালী দেখিয়া এবং এতদর্থে বিদেশ হইতে আনীত যন্ত্রাদি দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছেন। রঙ্গপুর তামাক চাষের কেন্দ্র স্থল, তথায় যে তামাক চাষের ও প্রস্তুতের ক্রমশঃ উন্নতি হইবে এরূপ আশা করা যায়।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

পৌষ—ডিসেম্বর মাস।

সব্জী বাগান।—বিলাতী শাক-সব্জী বীজ বপন কার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এমাসেও পারস্‌লী (Parsley) বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। কেবল বীজ বোনা কেন কপি প্রভৃতি চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া হাওয়া লাগাইয়া পুনরায় সার মাটি দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। ইহাতে কপি বড় হয়।

কৃষি-ক্ষেত্র।—আলুর গাছে মাটি দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। এই সময় কিন্তু ফসল কোদালি দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলু গুলি রাখিয়া বাকী গুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। আলু তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছ গুলি পুনরায় সতেজে বাড়িতে থাকে। আলু ক্ষেত্রে এমাসে দুই একবার আবশ্যক মত জল দেওয়া আবশ্যক। মটর, মসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেঁপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শশা, লাউ, কুমড়া, উচ্ছে, চাষের এই উপযুক্ত সময়।

REGISTERED No C.192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



নবম খণ্ড,—৯ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,

সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

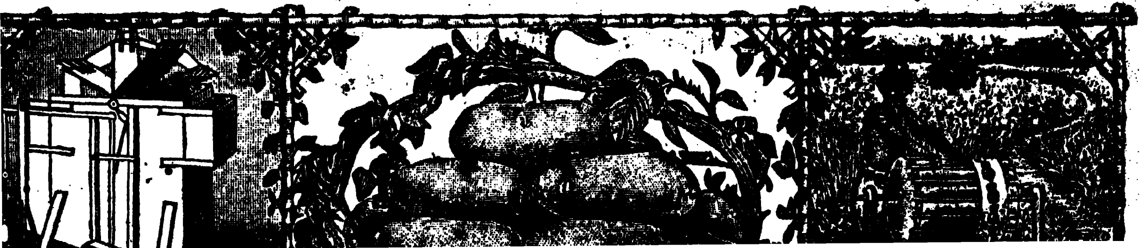
ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

পৌষ, ১৩১৫।

মিলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত;

১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।



কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

কৃষক।

৯ম খণ্ড। পৌষ, ১৩১৫ সাল। ৯ম সংখ্যা।

আমাদের কৃষক ও কৃষি-কার্য্য।

(পত্রান্তর হইতে সংগৃহিত)

যেমন নিশির শোভা শশী এবং শশীর শোভা তারা, তেমনি গ্রামের শোভা শস্যক্ষেত্র এবং শস্যক্ষেত্রের শোভা কৃষক। ধর্ম্মযাজক মহাশয় তাঁহার আধ্যাত্মিক উপদেশে যে প্রকারে আমাদের তৃপ্তি সাধন করেন, গ্রন্থকারেরা তাঁহাদের গ্রন্থাবলী দ্বারা যে প্রকারে আমাদের মানসিক উন্নতি সাধন করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন, কৃষকেরা তাহাদের অস্থি মাংসভেদী পরিশ্রম দ্বারা সেই প্রকারে আমাদের শরীরের রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে। পরিশ্রমী কৃষকের হস্তধূলিচিহ্নিত লাঙ্গল আমাদের সকলের অন্নদাতা, এই জন্য মহামতি এড্‌মন্ড্‌ বর্ক সাহেব বলিয়াছিলেন "পৃথিবীর যেদেশে কৃষকেরা পেট ভরিয়া খাইতে না পায়, সে দেশের তুল্য হতভাগ্য দেশ আর নাই।" কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃষক বা চাষা শব্দ একটী অপশব্দের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। যে দেশে চাষা বলিলে কটু গালি বুঝায়, সেদেশে কৃষিকার্য্যের প্রকৃত উন্নতি হইতে বোধ হয় এখনও অনেক বাকি আছে। বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোকেরা যতদিন পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা কৃষকের দুরবস্থার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে শিক্ষা না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বঙ্গের প্রকৃত উন্নতি কোথায়?

আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, এদেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, এদেশের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে কৃষকের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। এদেশে ধনাগমের পথ ক্রমশঃ কেন এত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, কেন দেশের লোক অন্নাভাবে দিনে দিনে এত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া উঠিতেছে, পুনঃপুনঃ শস্যাদির মূল্য অযথা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এ সকল গুরুতর অথচ প্রয়োজনীয় কথা বুঝিতে হইলে, শস্যক্ষেত্রের এবং কৃষকের অবস্থাবিষয়ে অনুসন্ধান করা অতীব আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশে কৃষিক্ষেত্র বা কৃষকের অবস্থা একরূপ নহে। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কৃষকের অবস্থা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে বুঝা ও বুঝান আবশ্যক। যাঁহারা ঘরের কোণে বসিয়া মনে মনে দেশের অবস্থা বুঝিতে বা বুঝাইতে চাহেন, তাঁহারা ভ্রান্ত; ঘরের বাহিরে আসিয়া বর্ষার জলে, গ্রীষ্মের রৌদ্রে, হেমন্তের হিম এবং বাঘের ন্যায়

মাঘের শীতে, শস্যক্ষেত্রে না বেড়াইলে এবং দরিদ্র কৃষকের পর্ণকুটিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদের সহিত না মিলিলে বা মিশিলে, প্রকৃত কথা কিছুই বুঝা যায় না। সৌখীন বাবুদের ইহা কাজ নহে; প্রবাদবাক্যে বলে—

আটে পিটে দড়
(তবে) ঘোড়ার উপর চড়।

তাহাতেই বলিতেছি অনেক কাঠ খড় পুড়াইলে, অনেক আটে পিটের বন্দোবস্ত করিলে, তবে কৃষিকার্য্য বুঝা যায়, কারণ কৃষিকার্য্য চিরকালই Practical ইহা কখন theoretical নহে; ইহা চিরকালই active, কখনও Passive নহে; এইজন্য বলিতেছি, একবার Practically কৃষি ও কৃষকে বুঝিয়া লওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে কি।

রাজনৈতিক সুবিধার জন্য বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর ভারতবর্ষকে বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল (মায় অযোধ্যা), পঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যদেশ এবং মধ্য-ভারতবর্ষ এই কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছেন; এদেশীয় রাজ্যসমূহ অবশ্য ইহাদের অন্তর্গত। এই সমুদয় প্রদেশে লাঙ্গল, কোদালি, খুর্পা প্রভৃতি প্রায় এক রূপই সুতরাং কৃষির প্রণালী প্রায় একপ্রকার, কিন্তু কৃষিক্ষেত্র এবং কৃষক একপ্রকার নহে। কোথাও হাজা মাটি, কোথাও শুকামাটি, কোথাও পাথুরে মাটি, কোথাও বালিমাটি ইত্যাদি। কোথাও উর্ব্বরতা অধিক, কোথাও বা অনুর্ব্বরতার পরিমাণ আশঙ্কাজনক। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, পঙ্গপাল, অসাময়িক বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাৎ, শিলাপাত, প্রভৃতি উপদ্রব না থাকিলে শস্যের অনিষ্ট হয় না। যে দেশে যেমন শস্য ফলে এবং যে দেশে শস্য যেমন বিক্রীত হয়, কৃষকের অবস্থাও সে দেশে তদ্রূপ হইয়া থাকে। যদি দৈব উপদ্রব এবং রাজা জমিদারের "জুলুম" না থাকে তাহা হইলে কৃষকেরা দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায়, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে জমিদারের জুলুম আছে, রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের স্বার্থাধিক্য আছে, এবং দৈব উৎপাতের ত কথাই নাই! তদ্ভিন্ন বন্দোবস্তের স্থিরতা কোথায়?

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কৃষকেরা কি পরিমাণ পরিশ্রম করিলে শস্যোৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহার তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কৃষি ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বা অনুর্ব্বরতা এবং কৃষকের শারীরিক শক্তি বা দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারা যায়। তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রদেশ।	কৃষকের পরিশ্রমের গড় পরিমাণ।
বোম্বাই	দিনে ৯ ঘণ্টা।
মান্দ্রাজ	৬ ঐ
বাঙ্গালা	৫ ঐ
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	৯৷৹ ঐ
পঞ্জাব	৮৷৷৹ ঐ
মধ্যভারত	৮ ঐ
মধ্যদেশ	৭ ঐ
রাজপুতানা	১০ ঐ

এইবারে আমি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের দরিদ্র কৃষকদিগের আয়ের পরিমাণ দেখাইতে ইচ্ছা করি।

প্রদেশ	আয়ের গড় পরিমাণ।
বোম্বাই	বার্ষিক আয় ৪৮৲
মান্দ্রাজ	৭২৲
বাঙ্গালা	৯৬৲
উত্তরপশ্চিমাঞ্চল	৪০৲
পঞ্জাব	৪২৲
মধ্যভারত	৪৩৲
মধ্যদেশ	৫০৲
রাজপুতানা	৩৮॥০

এই তালিকায় বাঙ্গালার কৃষকের আয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাঙ্গালী কৃষক কতদুর দরিদ্র এবং ঋণগ্রস্ত তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালার কৃষকগণ যদি পেট ভরিয়া খাইতে না পায় তাহা হইলে অন্যান্য প্রদেশের কৃষক কত অধিকতর দরিদ্র তাহা সহজেই বুঝা যায়।

বৎসরে কত মাস পরিশ্রম করিলে শস্য ক্ষেত্রের কার্য্য শেষ হয় তাহা এক্ষণে বুঝা উচিত। নিম্নলিখিত তালিকায় শস্য ক্ষেত্রের সহিত ঋতুর সম্বন্ধ এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, উর্ব্বরতা অথবা অনুর্ব্বরতা বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রদেশ	বৎসরে কয় মাস পরিশ্রম (গড়)	
বোম্বাই	৭॥০	মাস
মান্দ্রাজ	৫	,,
বাঙ্গালা	৪	,,
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	৮	,,
পঞ্জাব	৭৸০	,,
মধ্যভারত	৮	,,
মধ্যদেশ	৬	,,
রাজপুতানা	৮	,,

অতঃপর সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করিতেছি। জমির খাজনার হার কত তাহা বুঝান অতীব আবশ্যক। নিম্নলিখিত তালিকায় তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

প্রদেশ।	খাজানা। গড়ে।
বোম্বাই	প্রতি বিঘায় ৩৲
মান্দ্রাজ	২৸০
বাঙ্গালা	২৸০
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	৪॥০
পঞ্জাব	৩॥০
মধ্যভারত	৩।০
মধ্যদেশ	৩৸০
রাজপুতানা	২৸০

কোন্ প্রদেশে কি কি প্রকার শস্য প্রধানতঃ জন্মে, কোন্ প্রকার শস্যের জন্য কোন্ প্রদেশ সমধিক উপযুক্ত এবং কোন্ প্রদেশের প্রধান আহার্য্য শস্য কি, নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা দেখান গিয়াছে।

প্রদেশ।	প্রধান আহার্য্য। শস্য।
বোম্বাই	গোধূম ও চাউল।
মান্দ্রাজ	চাউল
বাঙ্গালা	চাউল
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	গোধূম, যব।
পঞ্জাব	গোধূম ও মকাই।
মধ্যভারতবর্ষ	গোধূম ও জনারী।
মধ্যদেশ	গোধূম ও চাউল।
রাজপুতানা	বাজরা ও গোধূম।

(দ্বিতীয় তালিকা)

প্রদেশ।	সাধারণ শস্য।
বোম্বাই	তামাক, সর্ষপ, তিল।

মান্দ্রাজ	রাই, তিল, তুলা, বিন্‌জী।
বাঙ্গালা	পাট, পোস্ত, কলাই, লঙ্কা।
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	কলাই, হরিদ্রা।
পঞ্জাব	অরহর, তামাক।
মধ্য ভারতবর্ষ	পোস্ত।
মধ্যদেশ	পোস্ত, রাই।
রাজপুতানা	সর্ষপ, হরিদ্রা।

এইবারে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের কৃষকের অবস্থার সহিত ভারতের কৃষকের অবস্থার একবার তুলনা করিয়া দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি এই তালিকা খুব প্রয়োজনীয়। ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে হিসাবের ভ্রম থাকা সম্ভব, কিন্তু তাহা হইলেও সাহস করিয়া বলা যায় এই তালিকা প্রায়ই ঠিক। একেবারে exact না হইলেও একেবারে approximate বটে।

কৃষকের দেশ।	(বার্ষিক গড়ে) আয়।
ফ্রান্স	২৫১৲
ইংলণ্ড	২৪১৲
আয়র্লণ্ড	২০১৲
পর্টুগাল	১৯৮৲
সিংহল	১১৮৲
স্পেন	১৫৩৲
ইটালী	১৪৯৲
মরক্কো	১৩৭৲
আমেরিকা	১৩৫৲
মিশর	১৭৬৲
য়িহুদী	১১৩৲
চীন	১৮২৲
ব্রহ্মদেশ	১১৫৲
জাপান	১২৯৲
অষ্ট্রেলিয়া	১৬১৲
পারস্য	১৫৫৲
আরব	১০২৲
তুরস্ক	১৩৬৲
ভারতবর্ষ	৫৩৷০

টাকা মাত্র। গত বত্রিশ বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কৃষকের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা একবার বুঝিয়া দেখিলে ভাল হয় না? অনেক কাগজ পত্র অনুসন্ধান করিয়া, অনেক প্রকার যত্ন স্বীকার করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করা গিয়াছে এই তালিকায় কৃষকের দুরবস্থা বুঝা যায়। ইহাতে Debt এবং Deficit উভয়ই জানা যাইবে।

প্রদেশ।	কৃষকের বাকি ঋণ অথবা অভাব।

বোম্বাই, তিন ভাগ অনাটন, এক ভাগ স্বচ্ছল। মান্দ্রাজ (কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর ব্যতীত) অর্দ্ধেক অনাটন, বাঙ্গালা (সমুদয় অনাটন)।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	ঐ
পঞ্জাব	ঐ
মধ্য ভারত	ঐ
মধ্যদেশ	ঐ
রাজপুতানা	ঐ

উপসংহারে বলিয়া রাখি যে সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন নামক দেশীয় রাজ্যের কৃষকেরা সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ও স্বচ্ছল। সেখানে বিদেশীয়ের প্রভুত্ব নাই এবং জলেরও প্রচুরতা আছে। সেতুবন্ধরামেশ্বরের নিকট অনেক স্থানের কৃষকেরা গত ৩২ বর্ষ মধ্যেও ঋণগ্রস্ত হয় নাই। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে "মধ্য মেদিনীপুর" এবং বরিশাল জেলার পূর্ব্বাংশ সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

তুলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জমির পাট।

কালো মাটীতে তুলার ফসলের জন্য প্রতি বৎসর লাঙ্গল দিতে হয় না। তিন বৎসর অন্তর একবার চাষ দিলেই যথেষ্ট হয়। এই মাটিতে লাঙ্গল দেওয়া অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমসাধ্য ও ব্যয়সঙ্কুল ব্যাপার। এক একরে লাঙ্গল দিতে ৪৲ টাকা খরচ পড়ে। কিন্তু প্রতি বৎসর জমিতে বিদে দেওয়ার দরকার হয়। তুলার একটা ফসল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গল দিলে খরচ ও কষ্ট কম হয়। নববর্ষারম্ভে বিদে দেওয়া সুরু করিয়া বর্ষা পর্য্যন্ত চালান হয়। যত অধিকবার বিদে দেওয়া যায়, চাষ তত ভাল হয়। বিদে দিবার খরচ ৪ একর জমিতে ৫৲ টাকা। ৪ একর জমিতে এক যোড়া বলদ ও একজন মানুষে তিন দিনে বিদে দিতে পারে।

সাধারণতঃ পচান গোবর ও চোনার সার জমিতে দেওয়া হয়। কেহ বা গোরু, মহিষ, ছাগ, মেষ প্রভৃতির পাল কিছু দিন ধরিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে রাখিয়া দেয় এবং তাহাদের মূত্রবিষ্ঠা জমিকে সারালো করে। মানুষের মলমূত্রও বাদ যায় না। এই সার খুব তেজালো। গ্রামসন্নিহিত যে সব ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা প্রাত্যহিক শৌচক্রিয়া করে, সে সব জমির উৎপাদন শক্তি অপরাপর জমির দ্বিগুণ ত' বটেই। অধুনা সার দিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে ঃ— লাঙ্গলে তিনটা ফলা থাকে, একটা ফলা চষে, দ্বিতীয় ফলার মধ্য দিয়া গুঁড়া গোবর সার পড়িতে পড়িতে যায় ও তৃতীয় ফলা হইতে বীজ পড়ে। ইহাতে ঠিক সারের উপর বীজ পড়িয়া ফসল ভাল হয়, এবং সারের মিতব্যয় হয়। কিন্তু এই প্রথায় প্রদত্ত সারের জোর এক বৎসরের বেশি থাকে না। এ সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা চলিতেছে। আর একটা নিখরচা সারের উপায়—বিভিন্ন প্রকারের ফসল পর পর উৎপাদন করা। এক জমিতে ক্রমান্বয়ে তুলা না বুনিয়া অন্য কোন ফসলের সহিত অদল বদল করিলে জমি বেশ উর্ব্বরা থাকে।

বীজ-নির্ব্বাচন ও বীজ প্রস্তুত।

বীজ সংগ্রহ করিয়া একটা চারপাই-এর উপর বীজ ছড়াইয়া ঘসিয়া ঘসিয়া চালুনিতে ছাঁকার মত করিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। তৎপরে কাল মাটি ও গোবর মিশ্রিত জলে সেই বীজ ধুইয়া লওয়া হয়। বীজ গুলি পাছে গায়ে গায়ে তুলার আঁশে লাগিয়া আটকাইয়া থাকে এবং লাঙ্গলের ফাঁপা ফলার মধ্য দিয়া অক্লেশে না পড়ে এই জন্য ঐরূপে ঘসা ও ধোয়া হয়। জুন মাসের প্রথমেই বর্ষণ হইলেই বীজ বুনিতে আরম্ভ করা হয়। কখন কখনও কেহ বা বৃষ্টির অপেক্ষা না করিয়া ধূলার মধ্যেই বীজ বপন করে; পরে বৃষ্টি পাইয়া অঙ্কুরোদ্গম খুব ভালই হয়; কিন্তু এ প্রথায় বীজ পাখী দ্বারা ও অন্যান্য কারণে অধিক নষ্ট হইবার ভয় থাকে।

উৎপন্ন।

চারি দিনেই অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং সপ্তাহ মধ্যে প্রথম দুটি পাতা দেখা দেয়। পনর দিন পরে চারার ধারে নূতন মাটি দেওয়া হয়। এক ফসলের সময়ের মধ্যে দুই হইতে চারি বার নূতন মাটি দেওয়া হয়; যত বেশিবার দেওয়া যায় গাছ ততই অধিক পরিপুষ্ট হয়। আশ্বিন মাসে গাছে ফুল হয়।

তুলার কোষ না হওয়া পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে জমি নিড়াইতে হয়। তুলার চারা, ফাঁক ফাঁক হইলে চারা সবল হয়, বেশি ঘেঁসা ঘেঁসি হইলে মাঝে মাঝে চারা উপড়াইয়া পাতলা করিয়া দেওয়া দরকার হয়।

চারি একর জমিতে গড়ে ৩০০ সের তুলা হয়, তাহার মূল্য ১০০৲ টাকা আন্দাজ। প্রতি একারের আয় ২৫৲ এবং গভর্ণমেণ্টের খাজনা ২৲ ও চাষের খরচ ৬৲। ঠিক আয় ১৭৲ টাকা। সাধারণ চাষেই এই হয়; ভাল সার ও উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিলে দ্বিগুণ লাভ হওয়া সম্ভব।

দীপালির পর স্ত্রীলোক ও শিশুরা তুলা তুলিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেকের সংগৃহীত তুলার কুড়ি ভাগের এক ভাগ তাহাকে মজুরী স্বরূপে দেওয়া হয়, ক্রমশঃ নগদ মজুরীর প্রচলন হইতেছে। নগদ মজুরী মণকরা তিন আনা। এক দিনে একজন মজুর দুই তিন মণ তুলা সংগ্রহ করিতে পারে।

পীড়া।

ফুলের সময় বৃষ্টি হইলে ফুল ঝরিয়া যায়। বেশি শীত পড়িলেও গাছ পীড়িত হয়। শীতের সময় জল হইলে গাছে পোকা হয়; ইহা ধ্বংসের কোন কৃত্রিম উপায় জানা নাই। গরম পড়িলে পোকা আপনি মরিয়া যায়। পাতার নীচে পিঠে এক প্রকার দানা দানা হলদে কাল ক্ষুদ্র কীট জন্মে। প্রত্যুষে পাতা শিশিরে ভিজা থাকিতেই গুঁড়া ছাই গাছে ছড়াইয়া দিলে পোকা মরে। গরম পড়িলে কৃত্রিম উপায়ের আবশ্যক হয় না। গাছের গোড়ার কাছে এক রকম লম্বা শাদা পোকা হয়, তাহা গাছ মারিয়া ফেলে, গাছ হলদে হইয়া শুকাইয়া যায়। এই পোকা ধ্বংস করিবার উপায় নাই। পীড়িত গাছগুলি উপড়াইয়া জ্বালাইয়া কীট নষ্ট করিয়া অপর গাছগুলিকে রক্ষা করা উচিত। গাছের ডগাতেও এক রকম সবুজ পোকা হয় এবং সে সব পাতাগুলো জড়ো করিয়া গাছ মারিয়া ফেলে। ইহাকেও ধ্বংস করিতে গাছ পুড়াইয়া ফেলিতে হয়। গাছে তুলার কোষ ধরিলেই মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত তাহাতে কীট লাগিয়াছে কি না। পোকা লাগিতে দেখিলেই সেই কোষ তুলিয়া দগ্ধ করা উচিত, কারণ ইহাদের অসম্ভব বংশবৃদ্ধিপটুতা আছে। দুটি কীট হইতে দুইশত কীট উৎপন্ন হয়। প্রথমেই সাবধান হইলে সামান্য ক্ষতিতেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

উন্নতির উপায়।

বীজ নির্ব্বাচনের উপর তুলার পরিমাণ ও গুণ নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রকারের শাঙ্কর্য্য বিধান ও বিদেশী তুলা এ দেশের ধাতসহা করিয়া ভাল তুলা উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে।

কালো মাটিতে নাইট্রোজেন বড় কম থাকে। উহা সার দিয়া বাড়ান দরকার। সোরার সার ভাল। তারপর গোবর। তারপর ঘুঁটের ছাই। গোবর সার সস্তা। সোডা নাইট্রেট ও এমোনিয়া সালফেট সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তুলার আঁশ ভাল করিতে পটাশ সার ভাল।

গোবরের সহিত চোনাও সঞ্চয় করিয়া পচাইয়া ক্ষেত্রে দেওয়া উচিত।

চাষের লাঙ্গল প্রভৃতির উন্নতি সাধন ও সস্তা সুদে চাষাদের মূলধনের সংস্থান করার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। কৃষি ব্যাঙ্ক প্রভৃতি দ্বারা অনেক উপকার হইতে পারে।

উড়ি ধান। *

উড়ি ধানের কথা কৃষকের পাঠকবর্গ সকলে বোধ হয় অবগত নহেন। উড়ি ধানের অপর নাম ঝরা ধান। চব্বিশ পরগণা ও যশোহর জেলায় অতি প্রাচীনকাল হইতে উড়ি ধান উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে। গভীর অনাবাদি বিলে পদ্মের ন্যায় উড়িধান আপনিই জন্মে, আপনিই পাকে আবার আপনা আপনিই ঝরিয়া পড়িয়া বিলের পঙ্কিল সলিলে সমাধি প্রাপ্ত হয়। এ ধানের আবাদ করিতে হয় না, জমি চষিতে হয় না. ভুঁই নিড়াইতে হয় না; এ ধান পাকিবার সময়, কাটিবারও আবশ্যক করে না। উড়ি ধান হৈমন্তিক ধান্যের সঙ্গে সঙ্গে আপনিই পাকিয়া উঠে। ইহা সরু, সুগন্ধি ও অতীব পবিত্র। দেব কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার ইহাই একমাত্র উপযোগী। উত্তর কালে মুনি ঋষিগণ উড়িধানই দেবতার কার্য্যে ব্যবহার করিতেন। উড়ি ধানের একটী অপরাধ, —উড়ি ধান বড় অভিমানী, বড় নিরীহ,—দলা মলা বড় সহ্য করিতে পারে না; পাকিয়া উঠিলে আর অলস অবিবেকী মানবের জন্য অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনিই ঝুর ঝুর করিয়া বিলের আবিল জলে ঝরিয়া পড়ে। ইহার আর এক দোষ—উড়ি ধানের গায়ে সরু সরু কাঁটার ন্যায় 'শুমো' আছে; সেই জন্য বাঙ্গালার অশিক্ষিত কৃষককুল উড়ি ধানকে এত হতাদর করে।

উড়ি ধান না কাটিতে পারিলেও উহাকে ঝরাইয়া লওয়া চলে। উড়ি ধান সঞ্চয় করিতে হইলে একমাত্র খরচ ও পরিশ্রম এই যে ধান পাকিবার অগ্রে ধানের শীষগুলি ৪।৫টী একত্র করিয়া, ধানের শীষের কোলে যে বড় বড় একটা করিয়া ধানের পাতা থাকে, তাহার দ্বারা জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়, তাহাকে এদেশে 'ঝরা বাঁধা' কহে। উড়ি ধান দুই প্রকার:—ছোটনা ও বড়ান। ছোটনা গুলি অগ্রহায়ণের প্রথমে পাকে, তাহাতে আর ঝরা বাঁধিতে হয় না। বড়ান ধান পৌষের প্রথমে পাকে, সেই সমস্ত ধানে সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ মাসে ঝরা বাঁধা হইয়া থাকে। ঝরা বাঁধা থাকিলে ছোট নৌকা বা ডোঙ্গা দ্বারা অনায়াসেই এই সমস্ত ধান ঝরাইয়া আনা যাইতে পারে।

কয়েক দিন পূর্ব্বে যশোহর জেলার একটী প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার জন্য আমি গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে চারঘাট গ্রামে হরি শুঁড়ির বাড়ির ধ্বংশাবশেষ দেখিতে গিয়াছিলাম। বন গ্রাম হইতে গোবরডাঙ্গা পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইনের দুই পার্শ্বস্থ বিলে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উড়ি ধান জন্মাইয়াছে দেখিতে পাইলাম। প্রত্যেক বিলের অভ্যন্তরে অন্ততঃ ৩।৪ হাজার বিঘা জলা অধিকার করিয়া ধানের আবাদ লাগিয়া গিয়াছে, যে বৎসরে বৃড়ি হয় সেই বৎসরেই উড়ি ধানটা কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে, আমরা ডাঙ্গার মাঠে দেখিতেছি বৃষ্টির অভাবে হৈমন্তিক ধান্যের শীষগুলি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, ধানগুলি জলাভাবে

* উড়ি ধান বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থলে বিল, ঝিল, দিঘী প্রভৃতির ধারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Oryza Sativa Var: bengalensis। সম্ভবতঃ এই উড়ি ধানই কয়েক জাতীয় আউস ও বড়ান আমন ধানের আদি পুরুষ। ইহা বেশ বড় এবং ঝাড়াল হইয়া থাকে। ইহার কাণ্ড ঠিক ঋজু নহে এবং পুষ্প দণ্ডের শাখা উপশাখার সংযোগ স্থলে পশমবৎ শল্ক দৃষ্ট হয়। শস্য সাধারণ কৃষিজাত ধান্যের শস্যের ন্যায়। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধান্যের সমতুল্য নহে। স্থানে স্থানে উড়ি ধান্যের প্রকোপ এত অধিক হয় যে ইহা নিকটবর্ত্তী আমন ধান্যকে মারিয়া ফেলে। তখন ইহাকে বাঁশ দ্বারা চাপিয়া জলে ডুবাইয়া দিয়া মারিয়া ফেলিতে হয়। ঢাকা জেলায় ইহাকে দাগা দেওয়া বলে। কৃঃ সঃ।

দাঁড়াইয়া মরিতেছে, আর বিলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি শীষভরে উড়ি ধান বাঁকিয়া পড়িয়াছে। ধানের শীষে বিলের জল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না।

ক্বচিৎ বা কোন স্থানে বাগ্‌দীগণ কেবল মাত্র ৩।৪ বিঘা জলা পর্য্যপ্ত ঝরা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আবার কোন বিলে দেখিতেছি জমিদার বাবুদিগের ২।৩টী হাতী বিলে নামিয়া এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে ধান্যগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে আর কতক কতক কাটিয়াও লইয়া যাইতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

আমাদের মফঃস্বলের ভ্রাতাগণের উৎসাহ উদ্যম দিন দিন লোপ পাইতেছে। দুর্ভিক্ষ ক্রমশঃ যতই মুখব্যাদন করিয়া করালগ্রাসে আমাদিগকে কবলিত করিতে আসিতেছে ততই আমরা যেন হতবুদ্ধি, অলস হইয়া পড়িতেছি। নূতন একটা কিছু করিতে গেলে আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, নূতন কথাটী সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া অনুমান হয়। যখন সায়েস্তা খাঁ ছিল, টাকায় আট মণ চাউল হইয়াছিল। ডাঙ্গার মাঠে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইত, তখন হয় ত উড়ি ধান বাগ্‌দী বা কোচদিগের খেয়ালের সামগ্রী ছিল। যার খেয়াল হইত সেই উড়ি ধান সঞ্চয় করিত। কিন্তু ভগবান যে এক্ষণে মুড়ি, মিছরীর সমান দর করিয়াছেন? বরঞ্চ কোচের ঘরে অন্ন পাইবে কিন্তু ভদ্রলোকের ঘরে অন্ন মিলিবে না। গ্রামবাসী যদি এই সমস্ত পতিত হাজার হাজার বিঘার ধান্য গুলি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন ত আমাদের বিশ্বাস তাঁহাদিগকে কখনও আশু ও আমন ধান্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় না।

উড়ি ধানের ডুবিবার ভয় নাই, উড়ি ধানের পুড়িবার ভয় নাই, উড়ি ধানে জমিদারের ও খাজনা নাই। বাঙ্গালা দেশের স্বভাবজাত এমন সোণার উড়ি ধানকে আমরা অশ্রদ্ধা করিতেছি, আমাদের ঘরে লক্ষ্মী থাকিবেন কেন? এদেশের মুসলমান চাষীদিগকে উড়ি ধানের কথা বলিলে তাহারা ঠিক এই কথা বলে—"মোরা ত ওসব করিনে, ওডা মশাই বাগ্‌দী, দুলের কাজ। শীত কালে জোঁকের মুখে যায় কেডা",—

আমাদের দেশের কৃষক অনাহারে আত্মহত্যা করিতে পারিবে তবু নূতন করিয়া একটা কিছু করিতে চাহিবে না, জনসাধারণের সামান্য চেষ্টাও উড়ি ধানের উপর পড়িলে আমাদের দেশে কখনও দুর্ভিক্ষ আসিতে পারে না। যে দেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিলের গভীর জলপূর্ণ তলা অনাবাদি থাকিবে সেইখানেই উড়ি ধান জন্মিবে, সে সমস্ত বিলে একবার উড়ির বীজ ছিটাইয়া দিলে আর তাহা নষ্ট হইবে না। প্রতি বৎসরে আপনা আপনিই ধানের বন বাঁধিয়া যাইবে, তখন কাটিয়া বা ঝরাইয়া লইতে পারিলেই হয়। প্রজার সর্ব্বনাশ হইলে জমিদারেরও সমূহ ক্ষতি। জমিদারদিগকে প্রজা বজায় রাখিবার জন্য যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। মূর্খ প্রজা অন্য কাহারও উপদেশ প্রতিপালন করুক আর না করুক জমিদারগণের কথা তাহারা অনেক সময় শুনিয়া থাকে। জমিদারগণ যদি তাঁহাদের মহালে পতিত বিলে

উড়ি ধান উৎপন্ন করিবার জন্য প্রজাদিগকে পরামর্শ দিতে পারেন, জবরদস্তি করিতে পারেন তাহা হইলে প্রজাগণ ক্রমশঃ তাহাদের ভবিষ্যতের মঙ্গল সহজেই বুঝিতে পারে। ইহাতে জমিদারদিগেরও একটী লাভ, ভবিষ্যতে এই সমস্ত পতিত বিল হইতে তাঁহাদের কিছু কিছু খাজনা আদায় হইতে পারে। প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক বিলে উড়ি ধানের আবাদ হওয়া বর্ত্তমান সময়ে একান্ত কর্ত্তব্য। একবার দুর্ভিক্ষের সময় কৃষকের শূন্য গোলা দেখিয়া লক্ষ্মী দেবী ক্রন্দন করিয়া এক কৃষক বুড়িকে স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন। সেই হইতে চলিত আছে—

দুঃখ দেখে লক্ষ্মী কেঁদে বলেন—"ওগো বুড়ি অন্ন পা'বে, ছেলেরে গিয়ে আন্‌তে বল উড়ি। সূর্য্যদেবের হাজার তেজে হয় না ধানের পুড়ি; সাত্ সাগরের জলে বাছা হবে না এ বুড়ি"।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

কৃষি ও হলবাহী বলদ।

বৎসরের প্রথম মাস অতীত, জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহও পৃষ্ঠ প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছে। গ্রীষ্মে জীবকুল আকুল, রৌদ্রের প্রখরতেজে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। এমন সময় পল্লিগ্রামে কৃষক ও কৃষক-নন্দনগণের আমোদ আহ্লাদ, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার ক্রয় বিক্রয় এবং অতীত বর্ষকাল মধ্যে যে সকল সম্পন্ন কৃষকের বৃদ্ধ পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে ও পুরোহিত অভাবে একাল মধ্যে শ্রাদ্ধ কার্য্য করা হয় নাই, তাহাদিগের আদ্যকৃত্য, বৃষোৎসর্গ, অরক্ষণীয় দুই একটি কন্যা পুত্রের বিবাহ(১), স্থানে স্থানে বারোয়ারী ও মেলার বাজার দর্শন, তাহার ভোরপুর আনন্দ উপভোগ, বিলাতী বার্ণিশ দেওয়া জুতা, কার্পাস সূত্রে বয়ন করা চক্‌চকে সিল্ক নামধেয় বস্ত্রে নির্ম্মিত পিরাণ, জর্ম্মাণ মেড ছত্র ক্রয়, বিড়ি ও সিগার অথবা সিগারেটের ধূম পান প্রভৃতি সকের কার্য্য সমস্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পক্ষান্তরে কৃষকের প্রথম সম্বল পাট, তাহাত আশ্বিন কার্ত্তিকেই বিক্রয় হইয়াছিল। পরে ধান্য এক মাত্র সম্বল যাহা ছিল, তাহার কিছু জমিদারের খাজনায় দিয়াছে, অবশিষ্টাংশ সমুদয় বিক্রয়ান্তে গোলা খালি করিয়া কতক মহাজন আসল ও সুদে লইয়াছে, কিছু বস্ত্র বিক্রেতাকে,—কাবুলী খাঁ সাহেব কাবুলী দুম্বার চর্ম্মনির্ম্মিত ব্যাগ (থলে) পূর্ণ করিয়া পঞ্জাব মেল ট্রেণে চড়িয়া সহাস্য মুখে সফলকাম হইয়া পবনবেগে স্বদেশাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে, অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ যাহা গৃহে সঞ্চিত ছিল, তাহা মেলার বাজার দেখিতে যাইয়া, প্রৌঢ় যুবক ও অপ্রাপ্ত যৌবন অথবা আগত প্রায় যৌবন,

(১) এ সময়ে কৃষক তনয় তনয়ার বিবাহ অল্পেই হয়। আষাঢ় মাসে তাগাবির টাকা লইয়া শ্রাবণ ভাদ্রেই অধিক বিবাদ হয়। পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ (আদ্য শ্রাদ্ধ) নীচ জাতীয়েরা যখন পুরোহিত পাইবে তখন সম্পন্ন করিবে, তাহাতে দশ দিন অগ্রে ও পরেও হয়।

কৃষককুলের পুত্র পৌত্রগণ পূর্ব্বকথিত দ্রব্যনিচয় ক্রয় ও কুপন তেতাস প্রভৃতি ক্রীড়ায় হারিয়া, কতক ক্রীড়কের, কতক মেলার অধিস্বামী জমিদারের ও কতক পুলিশের উদরে দিয়া বাটী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শূন্য ধান্যের গোলায় শক্ত করিয়া বাঁশের খুটী ও চালের সহিত কঞ্চি দিয়া খুব মজবুত করিয়া হেতে (১) টানা দিতেছে। ভয় পাছে শূন্যগর্ভ গোলাটী বাতাসে উড়িয়া ভূমিতে পড়িয়া নষ্ট হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সে যাহা হউক, সঞ্চিত অর্থ সমস্তই কর্পূরের মত উপিয়া গিয়াছে। এই ক্ষণে চাষের সময় যতই নিকট হইতেছে ততই শূন্যহস্ত কৃষকের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া, মাথায় মাথায় ভাবনা পড়িতেছে। এখন কি উপায়ে চাষের খরচ সঙ্কুলান, বলদ ক্রয় ও অগ্রিম বেতন দিয়া কৃষাণ নিযুক্ত করিবে, ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে সেই চির অভ্যস্থ পৈত্রিক মামুলি পন্থা অর্থাৎ যত উচ্চ হারেই হউক মহাজনের নিকট টাকা ধার লওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই। আর একটি উপায়েও যৎসামান্য সাহায্য হয়, সেটি এই যে দুই একটা ছাগল অথবা সায়া গোরু (২) বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করা। উহাতে অতি সামান্যই অর্থ সংগ্রহ হয়, সুতরাং মাসে প্রতি টাকায় এক আনা, অথবা সওয়াই সুদে (৩) টাকা ও দেড়া বাড়ি (১) প্রদানের অঙ্গীকারে ধান্য সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বশেষে কৃষাণ রাখার জন্য উক্ত পন্থারই অনুরূপ দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করা হয়, উহাকে চাকর বা কৃষাণ "পুর" রাখা কহে অর্থাৎ চাকরকে অগ্রিম দিলে পাঁচ সের পালির আট পালিতে আড়ি, কুড়ি আড়িতে যে বিশ, তাহার দুই বিশ আড়াই বিশ। আর অগ্রিম দিতে অসমর্থ পক্ষে ঐ ফসল প্রস্তুত হইলে পরে পৌষ মাঘ মাসে দিলে সাড়ে তিন বিশ চারি বিশ ধান্য দিতে হইবে। এইরূপ অঙ্গীকারে লোক নিযুক্ত করা হইয়া গেলে গৃহস্থ কথঞ্চিৎ সুস্থচিত্ত হইয়া যাহার জমি আছে, তাহার ভাবনা মিটিল, আর যাহার জমি নাই অথবা সম্পূর্ণ নাই, সে জমির সন্ধানে নিযুক্ত হইল। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন পাট ও আশু ধান্যের চাষের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। যাহার যেরূপ সম্বল সে সেইরূপ পাট ও আউশ বা আশু ধান্য বপন ও নিড়ান দেওয়া সম্পন্ন করিয়াছে।

বৈশাখ অতীত হইয়া গিয়াছে জ্যৈষ্ঠ মাসেরও প্রায় অর্দ্ধেক চলিয়া যায়। কৃষক কৃষিকার্য্যের অবস্থা ব্যবস্থা বুঝিয়াও নিজের যোত্র ও ক্ষমতানুরূপ জমি বন্দোবস্ত লওয়ার পরে অবিলম্বে কর্ম্মকারের কর্ম্মশালায় স্বীয় "কৃষি যন্ত্র" লাঙ্গল সমূহ গঠন ও সংশোধন জন্য প্রেরণ করিল। ঐ সকল কার্য্যের জন্য কর্ম্মকারের পারিশ্রমিক এক্ষণে কিছু মাত্র না দিলেও চলিবে। কেবল মাত্র প্রয়োজনানুরূপ লৌহ ও কাষ্ঠ প্রেরণ করিলেই উহা নূতন গঠন ও ভগ্ন সংশোধন হইয়া আসিবে। কর্ম্মকারের পারিশ্রমিক ঐ বৎসরের ফসল প্রস্তুত হইলে পৌষ মাস হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে দিতে হইবে।

(১) হেতে টানা, যাহা হস্তিতেও উপাড়িতে পারে না। অর্থাৎ একটা বাঁশের লম্বা কাঁচা কঞ্চির স্থূল অংশ এক কি সওয়া হস্ত মাটিতে পুতিয়া উহার অগ্রভাগ ছেঁচিয়া লইয়া ঘরের বা গোলার পাইড় অথবা চালের কুয়া কি বাতার সহিত ঐ ছেঁচা কঞ্চি জড়াইয়া বাঁধিয়া দিলে যখন কঞ্চি শুষ্ক হইবে, তখন আর খুলিয়া যাইবে না।

(২) সায়া গোরু, চাষের বলদ ব্যতীত সমস্ত গাভী, ষণ্ড ও বলদকে কৃষকেরা সায়া গোরু কহে।

(৩) সওয়াই সুদ, আষাঢ়ে টাকা লইয়া অগ্রহায়ণ পৌষে শোধ দিবে। প্রতি টাকায় চারি আনা সুদ দেওয়াকে সওয়াই সুদ কহে।

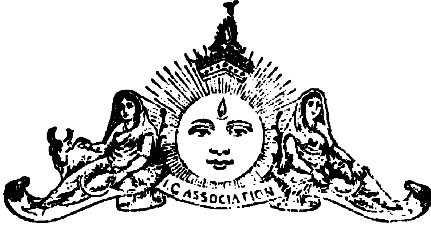
(১) যত ধান্য আষাঢ় মাসে লইবে তাহার দেড়া পৌষ মাসে দিবে তাহাকে দেড়া বাড়ি দেওয়া কহে।

শাখা পত্র ফল পুষ্প প্রভৃতির সমষ্টি লইয়া যেমন "বৃক্ষ" একটি নাম কথিত হয়। সেইরূপ কতকগুলি পৃথক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি লইয়া লাঙ্গল* অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলির পৃথক পৃথক নাম নিয়ে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে যথা—

যে হ্যাণ্ডেলটা (Handle) কৃষক বাম হস্ত দ্বারা ধারণ করে ঐ বক্র কাষ্ঠ খণ্ডের নাম "মুঠে"। মুষ্টিতে ধারণ করিতে হয় বলিয়াই বোধ হয় "মুঠে" নাম হইয়াছে। তন্নিয়ে যে আরও এক খণ্ড স্থুল বক্র কাষ্ঠ মুঠের সহিত লৌহ কিলক দ্বারা আবদ্ধ থাকে উহাকে লাঙ্গলের "মুড়" অথবা "গাদা কহে। ঐ গাদা কাষ্ঠের নিম্নার্দ্ধে যে লৌহ খণ্ড দ্বারা উপরের দিকের পৃষ্ঠ বাঁধান থাকে ঐ লৌহ খণ্ডকে "ফাল" কহে। ফাল ফলক শব্দের অপভ্রংশ। গাদা ও লৌহ ফাল যে একটী "সাধারণ কিলক হইতে বিভিন্ন গঠনের" কিলক দ্বারা আবদ্ধ থাকে ঐ ক্ষুদ্র লৌহ খণ্ডকে "পাশী কহে। মুঠের নিম্নে গাদা কাষ্ঠের বক্র অংশের উপরার্দ্ধের মধ্যে ছিদ্র করিয়া যে লম্বা সরল সার্দ্ধত্রি বা চতুর্হস্ত একটি ক্ষীণাগ্র দণ্ড সংবিদ্ধ থাকে উহাকে "ইশা" বা "ইশ" কহে। ইশের একেবারে মূল দেশে যে চারি ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ একটী কাষ্ঠ কিলক দ্বারা গাদা ও ইশ উভয়কে দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ রাখে (খুলিয়া পৃথক হইয়া যাইতে পারে না) ঐ কিলকটীর নাম "আটচাল" প্রদান করা হইয়াছে।

* লাঙ্গল খুব দৃঢ়, যথা শাল, সুন্দরী, বাবলা প্রভৃতি কাঠেরই নির্ম্মিত। ইশ (ইশাদণ্ড) তাল কাঠের অতি উত্তম হয়।

উভয় বলদ একত্রে যোজনা করার জন্য তাহাদিগের স্কন্ধে যে এক খণ্ড কাষ্ঠ ফলক স্থাপন করা হয় লাঙ্গল নামের ন্যায় উহারও সাধারণ ও সমষ্টি নাম জোল বা জইল। জইলের যে অংশ বলদের স্কন্ধে স্থাপন করা হয় তাহাকে "পাতা" কহে তৎপরে ছিদ্র মধ্যে সংযুক্ত যে দুইটি কাষ্ঠ সলাকা থাকে তাহাকে সোঁল বা সঁইল বলা হয় তারপরে মধ্য স্থলে যে অপ্রশস্ত উচ্চ অংশ তাহার নাম "মাধব" কাষ্ঠ। মাধব কাষ্ঠের মাঝখানে রজ্জু অথবা বেত্র নির্ম্মিত যে একটি আংটা দেওয়া থাকে, ও যে আংটার মধ্যে ইশাদণ্ডের অগ্রভাগ সংস্থাপিত হয়, তাহার নাম হিঁচড়া দড়ি, লাঙ্গল ও জইল পরস্পরে আবদ্ধ রাখার জন্য যে একটি বাঁশের বা কাষ্ঠের আঁকড়া "আকর্ষি" থাকে, তাহাকে আঁকড়া ও উহার সহিত লাঙ্গল আবদ্ধ করা অষ্ট হস্ত পরিমিত দীর্ঘ দুই ভাঁজ রজ্জুটির নাম হইতেছে নাংলা দড়া। উহা আঁকড়া দড়া নামেও কথিত হয়। সইলের নিম্নভাগে বলদের গলবদ্ধ যে দুই গাছি রজ্জু আছে, উহাকে যোত "যোত্র" কহে। উল্লিখিত নাম সমূহ লাঙ্গলের স্থান ও অংশ ভেদে কৃষক দ্বারা কথিত হইয়া থাকে।



কৃষক। পৌষ, ১৩১৫।

মৎস্য চাষ।

মৎস্য চাষের বিষয় ইতিপূর্ব্বে অনেকবার কৃষকে উল্লিখিত হইয়াছে। আজকাল মৎস্যের যে একটা অভাব সাধারণতঃ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কলিকাতার বাজারে পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় বর্ত্তমান সময় মৎস্যের আমদানির পরিমাণ ঠিক কম না হইলেও লোক সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে আমদানি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। মফঃস্বলেরও অনেক স্থানে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে মৎস্য কম হইয়া পড়িয়াছে। মৎস্য হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করিতে অধিক দুর যাইতে হয় না। অনাদরে খাল, বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতির দুরবস্থা, মৎস্য ডিম্বের অপব্যবহার, ছোট ছোট পোনা বিনাশ, মৎস্য-জীবন সম্বন্ধে সাধারণ অজ্ঞতা—এই সমস্তই মৎস্যের বংশ বৃদ্ধির অন্তরায়।

আমাদের দেশে ভাত ছাড়িয়া দিলে মাছই অন্যতম প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য। ঘৃত, দুগ্ধ অল্প লোকের ভাগ্যে যুটিয়া থাকে। মাংসের ত কথাই নাই। সুতরাং শরীর রক্ষার জন্য যে জীবজ খাদ্যের আবশ্যক, তাহা মৎস্যের দ্বারাই সাধিত হয়। নিরামিষ ভোজীর সংখ্যা অনেক কম। মিঃ কে, জি, গুপ্তের মৎস্য চাষ সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের ৫০৭ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ লোক অর্থাৎ শতকরা ১৪ ভাগ মৎস্য আহার করে না। অবশিষ্ট লোকে অবশ্য প্রতিদিনই মৎস্য পায় না এবং হিন্দুরা কোন কোন দিন মৎস্য আহার করে না। এইরূপ দিনের সংখ্যা ছাড়িয়া দিয়া বৎসরে যদি ৩২০ দিন ধরা যায় এবং প্রত্যহ আহার্য্য মৎস্যের পরিমাণ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া হিসাবে ধরা যায়, তাহা হইলে বঙ্গদেশে সমস্ত বৎসরে ৪ কোটী মণ মৎস্য ভক্ষিত হইবার কথা। কিন্তু মৎস্যাভাব এত অধিক যে, এই অনুমিত পরিমাণের দুইএর তৃতীয়াংশ মৎস্য ভক্ষিত হয় কিনা সন্দেহ।

বঙ্গদেশে মৎস্যাভাব এত অধিক, কিন্তু পাঠক শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, যে বঙ্গদেশের ন্যায় অল্প দেশেই এত অধিক মৎস্যক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। হিসাব করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পশ্চিম বঙ্গে করদ রাজ্য সমুদয় বাদ দিলে, নদীসমূহের দৈর্ঘ্য ৯০০০ হাজার মাইলের কম হইবে না; তন্মধ্যে গঙ্গা ও উহার শাখা প্রশাখা ৬৭০৩ মাইল এবং উড়িষ্যার নদী প্রভৃতি ২২১৭ মাইল। যদি গড়ে নদীসমূহের প্রস্থ ¼ মাইল ধরা যায় তাহা হইলে নদীর জল ভাগের পরিমাণ ২২৫০ বর্গ মাইল হয়। অবশ্য এই অনুমান গ্রীষ্ম কালের পক্ষে প্রজুয্য। বর্ষাকালে জল রাশি অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল, বিল, ঝিল ও দীঘি প্রভৃতির পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়ার কোন অভ্রান্ত উপায় নাই, তথাপি যদি ইহা অনুমান করা যায় যে, গ্রীষ্মকালে উহাদের আয়তন ৮০০০ বর্গ মাইলের কম নহে, তাহা হইলে উক্ত অনুমান অসঙ্গত হইবে না। এইত গেল দেশান্তর্গত মৎস্যক্ষেত্র সমূহের কথা। বঙ্গদেশের সামু-

দ্রিক মৎস্যক্ষেত্র সমূহও নিতান্ত অল্প নহে। পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্রোপকুল ৫৭০ মাইল দীর্ঘ এবং খুলনা, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, কটক, পুরী প্রভৃতি কয়েকটি জেলান্তর্গত। এই সমস্ত উপকুলের অনেক স্থলে মৎস্য ধরা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তীর হইতে উপকুল ক্রমশঃ ক্রমশঃ স্তরে স্তরে নামিয়া গিয়াছে এবং হরিণঘাটা হইতে মহানদী পর্য্যন্ত বেলাভূমি এত অধিক তরঙ্গসঙ্কুল ও বন্দর-বিরহিত যে, ঐ সকল স্থানে দেশীয় নৌকা কেবলমাত্র আকাশ পরিষ্কার থাকিলেই বহির্গত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন উক্ত স্থানসমূহ হইতে মৎস্য চালান দেওয়ার এত অসুবিধা যে, প্রায়ই ধৃত মৎস্য নষ্ট হইয়া যায়।

মৎস্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে মৎস্য জাতির বিবরণ কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। জীবতত্ত্ববিদেরা যাবতীয় জীবকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন—১ম সকশেরুক অর্থাৎ যাহাদের শিরদাঁড়া আছে এবং ২য় অকশেরুক অর্থাৎ যাহাদের শিরদাঁড়া নাই। মৎস্য, সরিসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জন্তুসমূহ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। স্পঞ্জ, প্রবাল, পতঙ্গ, কাঁকড়া, চিঙ্গড়ি, শম্বুক প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। মৎস্যের অবয়ব অঙ্গ প্রতঙ্গ প্রভৃতির বর্ণনা না করিয়া সাধারণ ভাবে বলিতে পারা যায় যে, ইহাদের মস্তক, চক্ষু, দন্ত, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে এবং ইহারা পুচ্ছ ও ডানার সাহায্যে গমনাগমন করে। মৎস্যসমূহের স্ত্রী পুরুষ আছে এবং অণ্ড হইতে সন্তান উৎপাদিত হয়। মৎস্য শ্রেণীর তিনটি উপশ্রেণী। ১ম উপশ্রেণী কণ্ড্রপটেরিগাইঃ—হাঙ্গর, শঙ্কর মৎস্য প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। ২য় উপশ্রেণী, ডিপনই ভুক্ত মৎস্য এতদ্দেশে নাই এবং তৃতীয় উপশ্রেণী, টিলিওষ্টোমাইর দুইটি বর্গের মধ্যে একটি বর্গ (গ্যানোইডিয়াই) ভারতবর্ষে বিরল। আমরা যে সমস্ত মৎস্য সাধারণতঃ ভক্ষণ করিয়া থাকি, তাহা উক্ত উপশ্রেণীর অন্য বর্গ টিলিওষ্টিয়াইর অন্তর্ভুক্ত।

টিলিওষ্টিয়াই বর্গে পাঁচটি উপবর্গ আছে। ১ম উপবর্গ ফাইসোষ্টোমাইঃ টেঙ্গরা, আড়, মাগুর, পাবদা, পাঙ্গাস, শিঙ্গি, শিলন্দ, বোয়াল, মৌরুল্লা, পুঁটী, মিরগেল, কাতলা, রুই, কালবোস, বাটা, তারুই, ইলিশ, খয়রা, চিতল, কুঁচে প্রভৃতি এই উপবর্গভুক্ত। ২য় উপবর্গ,—অ্যাক্যানথোটেরিগাইঃ—চাঁদা, ভেটকি, গড়ুই, ভাঙ্গন, ভোলা, রটা, বেলে, গুলে, বাণ, পাঁকাল প্রভৃতি এই উপবর্গের অন্যতম মৎস্য। ৩য় উপবর্গ অ্যান্যাক্যানথিনির মধ্যে অধিকাংশ মৎস্যই নাগরিকদিগের অপরিচিত। ইহারা সাধারণতঃ সমুদ্রচারী। বিখ্যাত কড্ মৎস্য ও এতদ্দেশীয় সামুদ্রিক কাঁটালপাতা, পান, কুকুরজিহ্বা, বাঁশপাতা, আরশি, নফেলা প্রভৃতি চেপ্টা আকারের মৎস্য এই উপবর্গের অন্তর্ভুক্ত। ৪র্থ উপবর্গের (লোফোব্রানকাই) কাঁকাল, কাঁরসী, দেওকাঁটা প্রভৃতি কয়েকটি সামুদ্রিক মৎস্য কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। ৫ম উপবর্গ (প্লেক্টেগনাথাই) ভুক্ত মাছ,—পটকা, কটকটিয়া, টেপা প্রভৃতি কেবল সমুদ্র তীরবর্ত্তী ব্যক্তিবর্গের নিকটই পরিচিত।

যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এতদ্দেশে মৎস্য জাতির বৈচিত্র কম নহে এবং স্থানে স্থানে এখনও মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু এইরূপ স্থানের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে অথবা নদীসমূহের মোহানা হইতে যদি আহারোপযুক্ত অবস্থায় মৎস্য আনিবার সুবিধা থাকিত, তাহা হইলে মৎস্য দেশ

মধ্যে অনেকটা সুলভ ও সহজ প্রাপ্য হইত। কিন্তু এক দিকে স্বাদুজলজাত মৎস্যের বংশ বৃদ্ধির অভাবে যেমন রুই, মিরগেল, কাতলা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতীয় মংস্যের অভাব হইয়া পড়িয়াছে, তেমনিই ভেটকি, ভাঙ্গন, ভোলা প্রভৃতি মৎস্যও সত্বর চালানের উপায় অভাবে সহরে আসিতে পারিতেছে না। উক্ত মৎস্যসমূহ দেশ মধ্যে আসিলে মৎস্যের অভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত। বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ খুলনা জেলায় ও উড়িষ্যা অঞ্চলে শুঁটকি মাছের কারবার আছে। কিন্তু শুঁটকি মাছু ভদ্রলোকের অখাদ্য। শুঁটকি মাছের কারবারও এতদ্দেশে কম। সমস্ত পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে খুলনা জেলায় এবং উড়িষ্যার অন্তর্গত চিলকা হ্রদে মৎস্য ধরিয়া শুষ্ক করা হয়। খুলনা জেলায় কতিপয় বড় বড় ধনী কেবল শুষ্ক চিংড়ি মৎস্যের কারবার করেন। চিলকা হ্রদে চিংড়ি ব্যতীত অপর মৎস্যও সামান্য পরিমাণে সংরক্ষিত হয়। শুষ্ক চিংড়ি মৎস্যের অধিকাংশই ব্রহ্মদেশে চালান যায়।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে মৎস্য ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে। মোটামুটি মৎস্যক্ষেত্র সমূহকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—সামুদ্রিক ও স্বাদু জলীয়। স্বাদু জলীয় মৎস্যক্ষেত্রের উন্নতি বিশেষ আয়াস ও সময় সাপেক্ষ, কিন্তু সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহ এক প্রকার অশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমুদ্রে পোনা ছাড়িতে হয় না, অপুষ্ট মৎস্য রক্ষা করিতে হয় না এবং সামুদ্রিক মৎস্যসমূহের বাসস্থান এত বহুবিস্তৃত যে, উহাদিগকে ধরিয়া নিঃশেষ করাও অনেকটা অসম্ভব। কিন্তু সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার ব্যবস্থা আমাদের দেশে তেমন নাই। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট একটি বাষ্পীয় পোত দ্বারা মৎস্য ধরাইতেছেন এবং ধৃত মৎস্য কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু এই সমুদয় মৎস্যের পরিমাণও কম এবং মৎস্যগুলিও উৎকৃষ্ট জাতীয় নহে। বাষ্পীয় পোত সাহায্যে সামুদ্রিক মৎস্যের ব্যবসায় এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে বাষ্পীয় পোতের সময় এখনও আসে নাই। এতৎসম্বন্ধে মান্দ্রাজ প্রদেশের প্রসিদ্ধ মৎস্যতত্ত্ববিৎ স্যর ফ্রেডারিক নিকলসন্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতীব সত্য এবং বঙ্গদেশের পক্ষে প্রযুয্য। তিনি বলেন:—একটি মৎস্য ধরার জন্য বাষ্পীয় পোতের মূল্য দেড় হইতে দুই লক্ষ টাকা এবং তাহাকে চালাইতেও বাৎসরিক অর্দ্ধ লক্ষ টাকা ব্যয়। আমাদের সেরূপ বাষ্পীয় ট্রলার অথবা তদ্রূপ মূল্যবান ড্রিফ্‌টার অথবা লাইনার শ্রেণীর পোতের আবশ্যক নাই। বর্ত্তমান মৎস্যক্ষেত্র সমূহের অবস্থা, সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার জন্য ভ্রমণের হ্রস্বতা, সমুদ্রের ও আকাশের সাধারণ অবস্থার মৃদুতা, স্বল্পমূল্য, ৩।৪ পয়সা মণ-করা দরে বরফ ব্যবহারের অসম্ভবতা, মূলধনের অভাব—এই সমস্ত ও অপরাপর কারণে বাষ্পীয় পোত চালান কেবল সৌখিনতার পরিচয় মাত্র। সামুদ্রিক মৎস্য বড় বড় বাষ্পীয় পোত সাহায্যে ধরিবার চেষ্টা অপেক্ষা যাহাতে নদী মোহানাজাত মৎস্য সদবস্থায় ও শীঘ্র দেশ মধ্যে আসিতে পারে তাহার চেষ্টা অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

আমাদের অধিকাংশ খাদ্য মৎস্যই স্বাদু জল অথবা সমুদ্রের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ক্ষারজল জাত। স্থূলতঃ বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে মৎস্য হ্রাস পাইবার পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ সমূহ ব্যতীত নিম্নলিখিত কারণগুলিও অন্যতমঃ:—যথা স্বাদু জলভাগের

পরিমাণের হ্রাস, প্রেসিডেন্সি বিভাগের নদী ও শাখানদী সমূহের তলদেশ পলি পড়িয়া উচ্চ হওয়ায় উহাদের জলাভাব, এবং তজ্জন্য উক্ত নদী সমূহ হইতে রোহিত জাতীয় মৎস্যের পলায়ন, মৎস্যের মূল্য বৃদ্ধি, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি, পুষ্করিণী, দীঘি প্রভৃতির অসংস্কার, অতিরিক্ত পরিমাণে মৎস্য ধৃত করণ, পোনা ও অপুষ্ট মৎস্য বিনাশ এবং সম্ভবতঃ বড় বড় জলনিকাশী খাল প্রভৃতির অবরোধ জনক ক্রিয়া। মৎস্য চাষ ও ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, এই সমস্ত বিষয়ের যথাসম্ভব প্রতিকার করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থানাভাব। এস্থলে আমরা কয়েকটি উন্নতির উপায়ের আভাস মাত্র প্রদান করিব।

প্রথমতঃ মৎস্যকুলের রক্ষণাবেক্ষণ ঃ—আইনের সাহায্যে রক্ষণাবেক্ষণ অনেক সময় আবশ্যকীয় হইয়া পড়ে। অপরাপর দেশে আইন দ্বারা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি সাধিত হয়; (১) নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট জাতীয় মৎস্য ধরা বন্ধ করা, (২) পোনা ধরা অথবা বিক্রয় করা নিষেধ, (৩) মাছের যাতায়াতের পথ না রাখিয়া খাল বিল প্রভৃতিতে বাঁধ দেওয়া বন্ধ করা, (৪) নির্দ্দিষ্ট ছিদ্রযুক্ত জাল প্রভৃতি মৎস্য ধরার যন্ত্র ব্যবহার ও (৫) জলাশয়ে ডিনামাইট কিম্বা কোন বিষাক্ত পদার্থ নিক্ষেপ করা নিষেধ। এই সমস্ত ধারার মধ্যে ৫মটি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ১ম ও ৪র্থ প্রবর্ত্তন করা অসম্ভব। সুতরাং ২য় ও ৩য়টি চালান একান্ত আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ—মৎস্যের বংশ বৃদ্ধিঃ—এতৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপায় গুলি অবলম্বন করিতে পারা যায়ঃ—(১) পোনা ধরিয়া বড় না হওয়া পর্য্যন্ত চৌবাচ্ছায় প্রতিপালন, (২) বস্ত্রের দ্বারা নদীবক্ষে ভাসমান ডিম্ব ধরিয়া পুকুরে ফোটান এবং যখন পোনা হইয়া বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন দল বাঁধিয়া বিচরণ করে, তখন তাহাদিগকে বিভিন্ন পুকুরে রাখিয়া প্রতিপালন, (৩) জাপানী ও ইউরোপীয় প্রথায় রোহিত জাতীয় মৎস্য প্রতিপালন, [উক্ত প্রথা নিম্নরূপ ঃ—কতকগুলি সন্তানোৎপাদনকারী পরিপুষ্ট মৎস্য সংগ্রহ করিয়া স্ত্রী ও পুং মৎস্য বিভিন্ন পুকুরে রাখ; ডিম্ব প্রসবের সময় উহাদিগকে তুলিয়া একটি পুকুরে ছাড়িয়া দাও, উক্ত পুকুরে ভাসমান জলজ উদ্ভিদ থাকা আবশ্যক। এই সমস্ত উদ্ভিদের উপরেই ডিম্ব সংরক্ষিত হইয়া পোনা উৎপাদন করে। এই সকল ধাড়ী মৎস্য অনেক বৎসর ক্রমান্বয়ে সন্তানোৎপাদন করিতে পারিবে এবং উক্ত মৎস্য সমূহের দ্বারা স্বল্প ব্যয়ে অনেক পোনা পাওয়া যাইবে। ছোট পোনা কিম্বা ১।২ ইঞ্চি পরিমিত পোনা আর্দ্র শৈবালে, বিচালীতে, কিম্বা ছোট ছোট টবে সহজেই অনেক দূর লইয়া যাইতে পারা যায়।]

(উ) কৃত্রিম পোনা উৎপাদনাগারে পোনা উৎপাদন ঃ—ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রতি বৎসর এই সমস্ত উৎপাদনাগার হইতে বহুসংখ্যক পোনা বিতরিত হয়, এবং আমেরিকায় যে সমস্ত নদীতে প্রায় মৎস্য নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, সে সকলও এই কৃত্রিম পোনা উৎপাদনাগারের সাহায্যে আজ কাল অপর্য্যাপ্ত মৎস্যশালী হইয়া পড়িয়াছে।

উল্লিখিত দুই শ্রেণীর উপায় ভিন্ন অন্য বহুবিধ উপায় রহিয়াছে কিন্তু এস্থলে সে সমস্ত বিবৃত না করিয়া প্রবন্ধান্তরে করা হইবে। বস্তুতঃ আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে সাধারণে মৎস্য ব্যবসায়ের কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করুন। মৎস্য যে কেবল অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য [illegible] খাদ্য ভিন্ন অপর হিসাবেও মৎস্য [illegible]

দ্রব্য। মৎস্য হইতে শিরিষ (Isinglass), শুষ্ক ডানা, চর্ম্ম, তৈল, চাবুক ও সার—এ সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কয়েক জাতীয় আড়, উড়িষ্যায় তপসী জাতীয় নাকোরা নামক মৎস্য ও সন্ ভেটকির পটকায় যথেষ্ট পরিমাণে শিরিষ প্রস্তুত হইতে পারে। হাঙ্গরের ডানা চীনদেশে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হয় এবং বোম্বাই ও করাচি হইতে উক্ত দ্রব্য রপ্তানি হয়। বঙ্গদেশে এই ব্যবসায় অনায়াসে চলিতে পারে। শঙ্কর মৎস্যের ও কুম্ভীরের চর্ম্মের বাজারে যথেষ্ট কাটতি আছে কিন্তু উহা প্রস্তুত করিবার প্রবৃত্তি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেরোসিন তৈল প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে অনেক স্থানে মৎস্যজ তৈল প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। এখনও শুশুক ও শঙ্কর মাছের তৈল জ্বালাইবার জন্য ও ঔষধের হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কয়েক জাতীয় শঙ্কর মৎস্যের পুচ্ছ চাবুক হিসাবে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। সর্ব্বশেষে মৎস্যজ সার। বঙ্গদেশে, দ্বারবঙ্গ ও মজঃফরপুর জেলায় ফল বৃক্ষে যথা আম্র, লিচু, আঙ্গুর ও লেবু গাছে সার দিবার জন্য ও সাহাবাদ জেলায় সাধারণ উদ্যানে সার দিবার জন্য মৎস্য সার ব্যবহৃত হয়। ১৯০৭-০৮ সালে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল হইতে ১৫,০০০ টন মৎস্য সার রপ্তানি হয় ও মালাবার উপকূল হইতে ১৭৫০০০ গ্যালন মৎস্য তৈল রপ্তানি হয়। সার রপ্তানি হওয়া দেশের পক্ষে যে বিশেষ অমঙ্গলকর তাহা অনেকেই অবগত আছেন। জাপানীরা বৎসরে অন্ততঃ ১,৫০০০ টন মৎস্য সার ব্যবহার করে, পক্ষান্তরে আমাদের মৎস্যজ ও অন্যান্য সার রপ্তানি হয়। ইহাপেক্ষা আর কষ্টকর বিষয় কি হইতে পারে। আমরা সময় থাকিতে থাকিতে যদি মৎস্য চাষ ও ব্যবসায়ের ব্যবস্থা করিতে না পারি তাহা হইলে অনতিকাল মধ্যে যে আমাদিগকে একটি প্রধান খাদ্য ও সার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পত্রাদি।

মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, মৎস্যের চাষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা আপনার পৌষ মাসের কৃষকে স্থান দিলে বাধিত হইব।

আপনার কার্ত্তিক মাসের কৃষকে শ্রীহট্ট, ইটা নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৎস্য চাষ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের দেশে মৎস্য দিন দিন যেরূপ মহার্ঘ হইতেছে, তাহাতে গরীবলোক দূরে থাকুক মধ্যবিৎ লোকদিগেরও সর্ব্বদা মৎস্য জুটান দুঃসাধ্য হইয়াছে। এমতাবস্থায় মৎস্য চাষ সম্বন্ধে সর্ব্ব সাধাধারণের সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক।

আমাদের দেশীয় ভদ্রমণ্ডলী যদি মৎস্য চাষ অপমানজনক মনে না করিয়া, তাহাতে মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে যে, মৎস্য অনেক পরিমাণ সুলভ হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ ভদ্রলোকের ২।৩টী, কাহারও বা ততোধিক পুষ্করিণী আছে কিন্তু সে গুলি অযত্নে ফেলিয়া রাখায় স্বল্প সংখ্যক পুষ্করিণীই ব্যবহার ও মৎস্য পোষণোপযোগী আছে। অধিকাংশ পুষ্করিণীই কতকগুলি চড়া ও কতকগুলি আবর্জ্জনা পূর্ণ, কাজেই অব্যবহার্য্য হইয়া আছে। সেই সকল পুষ্করিণী গুলি

যদি খোদিত ও পরিষ্কৃত হয় এবং তাহাতে রীতিমত মৎস্য পোষণ করা যায়, তবে মৎস্যাভাব অনেক পরিমাণে লাঘব হইতে পারে, এবং বিক্রেতারও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জিত হইতে পারে।

চট্টগ্রাম বিভাগে (অন্য বিভাগের কথা ঠিক বলিতে পারি না) একটি পুষ্করিণীর আয়ে ৩ জন লোক বিশিষ্ট একটি পরিবার স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

১২৫ হাত দৈর্ঘ্য ও ৭৫ হাত প্রস্থ একটি পুষ্করিণীতে ১০০০ এক হাজার মৎস্যের সুন্দররূপে সংস্থান হইতে পারে।

১০০০ এক হাজার রোহিত, কাতলা প্রভৃতি মৎস্যের পোনা এদিকে ১৫৲—২০৲ টাকায় বিক্রয় হয়। এই সকল পোনা ৩ বৎসরে অন্ততঃ ১।৷০ হাত পরিমিত মৎস্য হয়।

যদি তাহার একটি মৎস্য গড়ে অন্ততঃ ৸০ বার আনা হিসাবেও বিনীত হয়, তবে ১০০০ হাজার মৎস্যের মূল্য ৭৫০৲ টাকা হইতে পারে। ইহা হইতে মৎস্য ক্রয়ের এবং মৃত ও ভক্ষিত মৎস্যের মূল্য বাবত ১৫০৲ টাকা বাদ দিলে বক্রী ৬০০৲ টাকা ৩ বৎসরে অর্থাৎ প্রতি বৎসর ২০০৲ টাকা উপার্জ্জিত হইতে পারে। *

এই ব্যবসার প্রতি যতই আমাদের দেশীয় ভদ্রলোকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, ততই সাধারণে সুলভে মৎস্য পাইবে, এবং ভদ্রসন্তানগণও সামান্য চাকরীর জন্য লালায়িত না হইয়া, স্বাধীন ব্যবসা দ্বারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন।

অধিক লিখিলে প্রবন্ধ বড় হইয়া যাইবে ভাবিয়া এবার এই পর্য্যন্তই লিখিলাম। আগামী পত্রিকায় কোন্ মৎস্য কোন্ সময়ে ডিম্ব প্রসব করে, এবং অন্যান্য বিষয় যথাশক্তি জানাইতে চেষ্টা করিব। ইতি সন ১৩১৫, তারিখ ১৭ই পৌষ।

শ্রীরাজকুমার রায়।

শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রায়, মারুই, মালদহ।

লৌহনির্ম্মিত দোন সমিতির কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য প্রতি হাত ১৷৷০। শিবপুর, রাজেশ্বর ও মেস্তন লাঙ্গলও উক্ত স্থানে পাওয়া যায়। মূল্য যথাক্রমে ১০৲; ৪৲ ও ৪৷৷০ টাকা।

কৃঃ সঃ।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ সিংহ, ৩০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শুধু পাঁক মাটি, বিশেষতঃ সদ্য পাঁকে এত অধিক নাইট্রোজেনযুক্ত অঙ্গারক দ্রাবক সমুহ বিদ্যমান থাকে যে, তাহাতে উদ্ভিদের ডালপালা ও পাতাই অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ফলপ্রসব করাইতে হইলে কিয়ৎপরিমাণে ফসফরিক অম্ল ও পটাস আবশ্যক। এতদুভয়ই ধঞ্চের সবুজ সারে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে ধঞ্চে প্রয়োগই প্রশস্ত। ধঞ্চের বীজ যদি যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইতে গাছ জন্মিতে পারে। কৃঃ সঃ।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল ভৌমিক, পত্নিতলা, দিনাজপুর।

কৃষকে প্রকাশিত মধুসংগ্রহ প্রবন্ধের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। পাশ্চাত্য প্রথায় মধু সংগ্রহের ব্যবসায়ে অধিক মূলধনের আবশ্যক। উক্ত প্রথায় মৌমাছির চাষ করিতে সাজ সরঞ্জামও অনেক আবশ্যক হয়। যাহা হউক আপনি যখন আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তখন কৃষকে সত্বরেই এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। কৃঃ সঃ।

---

* পুষ্করিণীটি রক্ষা করিবার খরচ ধরা হয় নাই এবং তিন বৎসর পরে প্রত্যেক মৎস্যটি ৸০ আনা মূল্যে বিক্রীত না হইতেও পারে, সুতরাং উপার্জ্জনের মাত্রা আরও অনেক কম হওয়াই অনেক স্থলে খুব সম্ভব। কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

পঞ্জাবে তিলের চাষ।

১৯০৮ সালে পঞ্জাবে ১৪৮,৭০০ একর পরিমিত জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে। গতপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগ অধিক জমিতে আবাদ হইয়াছে, তথাপি দেখা যাইতেছে যে সাবেকের সহিত তুলনায় পঞ্জাবে তিলের চাষ কম হইতেছে। পঞ্জাবের অন্তর্গত মুলতানেই তিলের আবাদ সমধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। মণ্ট-গোমারি, গুরুদাসপুর, ঝাঙ্গ ও কাংরা উপত্যকায় তিলের চাষ নিতান্ত কম হয় না। উক্ত বৎসরে ৪০৩,৬৭০ হন্দর তিল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়।

বঙ্গদেশে গমের আবাদ। ১৯০৮-৯।

বঙ্গদেশের মধ্যে বিহারেই প্রধানতঃ গমের চাষ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষে কিছু অধিক পরিমাণ জমিতে গমের আবাদ হইয়াছে, উক্ত আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ১,১৭৯,৮০০ একর। অক্টোবর মাসে একবার বৃষ্টি হওয়ার পর আর বৃষ্টি না হওয়ায় কতক জমিতে গমের আবাদ হইল না এবং বর্ত্তমান ফসলেরও কিছু ক্ষতি হইয়াছে। সাহাবাদ, সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুরে চর জমিতে ও সাঁওতাল পরগণায় কোন কোন স্থানে চাষের অবস্থা ভাল, কিন্তু দারবঙ্গ, পূর্ণিয়া, গয়া ও হাজারিবাগে ভাল নহে। ইহার উপর গয়া ও মুঙ্গেরে কীটের উপদ্রব দেখা দিয়াছে।

বঙ্গে তৈলশস্য।

বিহার, প্রেসিডেন্সি ও ছোটনাগপুর বিভাগেই সমধিক পরিমাণে তৈলশস্যের আবাদ হইয়া থাকে। ইতিমধ্যেই ১,৫৩৮,৩০০ জমিতে তিল বুনা হইয়াছে। এখনও পূর্ণিয়া অঞ্চলে বুনানি চলিতেছে। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে ক্ষতি হইতেছে।

বঙ্গে ভাদুই শস্য। ১৯০৮।

উক্তবর্ষে ভাদুই ফসলের আবাদী জমির পরিমাণ ৯,০২৮,০০০ একর, বিগত পূর্ব্ব বৎসর ৯,২৫১,০০০ একর। সম্বলপুরে ষোল আনার উপর এবং সিংভূমে ষোল আনা ফসল হইয়াছে। ৪টী জেলায় ১৫ আনা, ৩টী জেলায় ১৩ আনা, এবং ১৩টী জেলায় ১২ আনা ফসল জন্মিয়াছে। হাওড়া, চম্পারণ ও মুঙ্গেরে ফসল মন্দ হয় নাই, কিন্তু পূর্ণিয়া, নদীয়া, দারবঙ্গ, মজঃফরপুর, ভাগলপুর এবং পাটনায় আট আনারও কম ফসল জন্মিয়াছে। অন্যান্য ভাদুই শস্য ছাড়িয়া দিলে মোটের উপর গড়ে শতকরা ৬৮ ভাগ আশু ধান্য জন্মিয়াছে এবং ২১,৯১৪,১০০ হন্দর চাউল পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

বোম্বাইয়ে চাষের অবস্থা। ১৯০৭-৮।

এখানে বাজরার চাষ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রায় ৫৭ লক্ষ একর জমি এই চাষে আবদ্ধ থাকে। বিগত বর্ষে উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় কেবলমাত্র ৪৯ লক্ষ পরিমাণ জমিতে বাজরার চাষ হইয়াছে। জোয়ারের চাষ শতকরা ১৩ ভাগ কম জমিতে হইয়াছে।

ধান।—আবাদী জমির পরিমাণ ২ লক্ষ একর মাত্র। নদীর জল না বাড়ায় বিগত বর্ষে আবাদী জমির পরিমাণ শতকরা ১৭ ভাগ কম।

কলাই প্রভৃতির চাষও কমিয়া গিয়াছে।

তামাক।—অন্যান্য বৎসর ২৯ লক্ষ একর জমিতে তামাক চাষ হয়, এবৎসর উক্ত চাষের জমির পরিমাণ ২৫ লক্ষ একর মাত্র।

ইক্ষু।—আবাদী জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে। বিগত জুলাই ও আগষ্ট মাসে অধিক বৃষ্টি হওয়ায় শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ অধিক জমিতে আবাদ হইয়াছে।

তুলা।—চাষ কম হইয়াছে। অন্য বৎসর আবাদী জমির পরিমাণ ৩৯ লক্ষ একর; বিগত বৎসর ৩৭ লক্ষ একর মাত্র।

মধ্যপ্রদেশে চাষের অবস্থা। ১৯০৭-৮।

মধ্যপ্রদেশের রায়পুর ও চণ্ডা প্রভৃতি স্থানে ধান্য প্রায় ষোল আনা জন্মিয়াছে, কিন্তু সময়োচিত বৃষ্টির অভাবে অন্যত্র নয় কিম্বা দশ আনা ফসলের অধিক আশা করা যায় না।

জোয়ার অতি বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়াছে। বেরারে যে পরিমাণ জোয়ার উৎপন্ন হয়, এ বৎসর তাহার অর্দ্ধেকও হয় নাই।

তুলা বীজ, বৃষ্টির অভাবে বুনিতে বিলম্ব হইলেও স্থানে স্থানে ভালরূপ জন্মিয়াছে। ফসল অন্য বৎসর অপেক্ষা কম হইলেও মোটের উপর দশ ও বার আনা ফসল হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

সার-সংগ্রহ।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের গবেষণা।

বর্ত্তমান ভারতের কৃতী সন্তানদিগের মধ্যে যে কয়েকজন বিদ্যা ও জ্ঞানে বিদেশে সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অন্যতম।

ডাক্তার রায় মহাশয় এ পর্য্যন্ত কেবল রসায়ন শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। দুই বা ততোধিক বস্তু যে বিধানানুসারে পরস্পরের সহিত মিলিয়া পৃথক গুণবিশিষ্ট নানা পদার্থের রচনা করে, তাহাই এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

ডাক্তার রায় মহাশয় তাঁহার গবেষণা দ্বারা সংযোগ বিয়োগের নিয়মগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অনেক সহায়তা করিয়াছেন, এবং পূর্ব্ব-পণ্ডিতগণ বহু চেষ্টাতেও যে সকল যৌগিক পদার্থের সন্ধান পান নাই, রায় মহাশয় সেগুলিকে পরীক্ষা-গারে প্রস্তুত করিবার কৌশল দেখাইয়া, রসায়ন-শাস্ত্রকে সম্পূর্ণতার দিকে অনেকটা অগ্রসর করা-ইয়াছেন। আজও তাঁহার গবেষণা শেষ হয় নাই। প্রতি বৎসরেই তাঁহার আবিষ্কৃত দুই চারিটি নূতন তত্ত্ব রসায়নশাস্ত্রের পুষ্টিবর্দ্ধন করিতেছে।

গন্ধকদ্রাবকের (Sulphuric Acid) সহিত তাম্র, লৌহ ও নিকেল্ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু মিশিয়া একজাতীয় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। তুঁতে বা তুথ এবং হীরাকশ প্রভৃতি যৌগিকগুলি এই জাতিভুক্ত পদার্থ। এই সকল বস্তু পরস্পরের সহিত মিশিলে, তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করে এবং ইহার ফলে কয়েকটি নূতন যৌগিকের উৎপত্তি হইয়া পড়ে। ডাক্তার রায় মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে এই ব্যাপারটি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে তুঁতে জাতীয় জিনিসের পরস্পর সংমিশ্রণ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছিল। গত ১৮৮৮ সালে এডিনবরা রয়াল সোসাইটীর পত্রিকায় এ গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হইলে, সকলে রায় মহাশয়ের প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ইউরোপ বা আমেরিকায় কোন উচ্চ উপাধি লাভ করিতে হইলে, মৌলিক গবেষণা দ্বারা উপাধিপ্রার্থীকে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে হয়। এই গবেষণাটিতে রায় মহাশয় D. Sc. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহার পর ১৮৯৪ সালে এসিয়াটিক্ সোসাইটির এক অধিবেশনে ডাক্তার রায় মহাশয় ঘৃত, মাখন, চর্ব্বি প্রভৃতির স্বরূপ ও বিশুদ্ধি নির্ণয়ের এক রাসায়নিক পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৮৯৬ সাল হইতে ডাক্তার রায় মহাশয় পারদ সম্বন্ধীয় গবেষণা আরম্ভ করেন। এই গবেষণায় ইহাঁর খ্যাতি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। পারদ জিনিসটা অম্লজান (Oxygen) ও গন্ধক প্রভৃতি কয়েকটি বস্তুর সহিত মিলিলে বিচিত্র বর্ণের বহু যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহার এই গুণটির সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

এখন ডাক্তার রায় মহাশয়ের পারদ সম্বন্ধীয় গবেষণার আলোচনা করা যাউক। পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, পারদ জিনিসটা অনেক দ্রাবকেরই সহিত মিশ্রিত হয় সত্য, কিন্তু সোরকাম্লের (Nitric Acid) সহিত এটি যত সহজে মিশে অপর কোন দ্রাবকের সহিত সে প্রকারে মিশিতে পারে না। এই প্রকারে দ্রবীভূত করিতে হইলে, পারদে উত্তাপ প্রয়োগেরও আবশ্যক হয় না। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পারদ হইতে অনেক গুলি যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি দেখা যায়। প্রায় শতাধিক বৎসর ধরিয়া নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ এই সকল যৌগিকের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু দ্রাবণের ঠিক্ অব্যবহিত পরে পারদ কোন্ যৌগিক পদার্থটিকে উৎপন্ন করে, তাহা অজ্ঞাত থাকায়, বৈজ্ঞানিকদিগের শতবর্ষব্যাপী চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া আসিতেছিল। ডাক্তার রায় মহাশয় অতি অল্প দিন গবেষণা করিয়া সেই অজ্ঞাত যৌগিকটির (Mercurous Nitrite) সন্ধান পাইয়াছিলেন। ধাতুর উপর সোরকাম্লের ক্রিয়া যে রহস্য-কুহেলিকায় আচ্ছন্ন ছিল, এই আবিষ্কারে তাহা অপসারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

পারদঘটিত নূতন যৌগিকটির (Mercurous Nitrite) আবিষ্কার বৃত্তান্ত, সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই পত্রখানিকে কখনই বৈজ্ঞানিক পত্র বলা যায় না। কিন্তু ডাক্তার রায় মহাশয়ের আবিষ্কারের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, জর্ম্মাণ রসায়নবিদ্‌গণ সোসাইটির পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধটিরই আমূল অনুবাদ করিয়া, জর্ম্মাণির সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে তত্ত্বাবিষ্কারে পেলিগট্ (Peligot), নিম্যান, (Niemann) ও ল্যাঙ্ (Lang) প্রমুখ বিখ্যাত রসায়নবিদ্‌গণ পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন, একজন হিন্দু বৈজ্ঞানিককে তাহাতেই জয়যুক্ত হইতে দেখিয়া, জর্ম্মাণ সুধীগণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আবিষ্কারককে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকাল হইতে তাম্র, রৌপ্য, পারদ প্রভৃতি ধাতু দ্রবীভূত করিবার জন্য মহাদ্রাবক (Sulphuric Acid), শঙ্খদ্রাবক বা সোরকদ্রাবক (Nitric Acid), প্রভৃতি দ্রাবকের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ঐ ধাতু সকল কেন দ্রবীভূত হয় বা কি অন্তর্নিবিষ্ট গূঢ় কারণে দ্রবীভূত হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। অধ্যাপক রায়ের গবেষণা দ্বারা এই তমসাচ্ছন্ন ও জটিল বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোক পাতিত হইয়াছে। ডাক্তার ডাইভার্স এই সম্বন্ধে যে সমস্ত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তিনি ১৯০৭ খৃঃ অঃ Journal of the Society of Chemical Industry নামক পত্রে "Theory of the action of metals upon Nitric Acid"

শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন যে, ডাঃ রায়ের গবেষণা ব্যতীত তিনি ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না।*

পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, অম্ল ও ক্ষারজ পদার্থের সংযোগ হইলে লবণ জাতীয় এক শ্রেণীর যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইহাতে অম্ল বা ক্ষার কাহারও গুণ থাকে না। ডাক্তার রায় মহাশয়ের আবিষ্কৃত মার্কিউরস্ নাইট্রাইট্ এই প্রকার জাতীয় লবণ (Salt) পদার্থ। অম্লের ভাগ ইহা নাইট্রস্ এসিড (Nitrous Acid) হইতে প্রাপ্ত হয়, এবং ক্ষারের অংশ পারদ হইতে সংগ্রহ করে। উক্ত নাইট্রস্ এসিডকে সোরকাম্লের সহিত তুলনা করিলে তাহাতে অম্লজানের একটি পরমাণু কম দেখা যায়। ইহাই উভয় দ্রাবকের একমাত্র পার্থক্য। নাইট্রস এসিডকে HO—NO বা H—NO, এই দুই প্রকারের সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। একটিতে হাইড্রোজেনের সহিত নাইট্রোজেন সংযুক্ত আছে, অপরটিতে সে প্রকার সংযোগ নাই। যৌগিক পদার্থের পরমাণু সকল কিরূপ ভাবে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ, তাহা এই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা বুঝা যায়, এবং এই আণবিক গঠন দ্বারা দ্রব্যের রূপ ক্রিয়া ও গুণ নিরূপিত হয়। এই সকল কারণে পদার্থের সাঙ্কেতিক চিহ্ন নব্যরসায়ন শাস্ত্রের একটি আবশ্যক অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নাইট্রস্ এসিডের আণবিক গঠন কিরূপ তাহার মীমাংসার জন্য নানা ধাতুর * সহিত মিশিয়া উহা যে সকল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে সে গুলিতে উত্তাপাদি প্রয়োগ করিয়া রায় মহাশয় পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি অপ্রত্যাশিত ফল লাভ করিয়াছেন,—আনুসঙ্গিক রূপে Ethyl Nitrite এবং Nitroethane নামক দুইটি অঙ্গারমূলক পদার্থ নূতন প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার রায় মহাশয় ইহার পরে হাইপোনাইট্রস্ এসিড (Hyponitrous Acid) নামক আর একটি নাইট্রোজেন্-ঘটিত দ্রাবকের আণবিক গঠন স্থির করিবার জন্য গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। টোকিয়ো এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার ডাইভার্স সাহেব এই দ্রাবক হইতে উৎপন্ন যৌগিক হাইপোনাইট্রাইটের (Hyponitrite) আবিষ্কার করেন। তৎপরে অনেক বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ব্যাপারটিতে হাত দিয়া নানা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মূল দ্রাবকটিকে যদি হঠাৎ বিশ্লেষণ করা যায়, তবে তাহা হইতে নাইট্রস্ অক্সাইড্ (Nitrous Oxide) বা হাস্যোদ্দীপক বায়ু উৎপন্ন হয় জানা গিয়াছিল। এই ব্যাপারটির সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও ইহাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া এখন স্বীকার করা যাইতেছে না। ডাক্তার রায় মহাশয় স্পষ্টই দেখাইয়াছিলেন, দ্রাবকটিকে যদি ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট করা যায়, তবে উহা হইতে সোরকাম্লও (Nitric Acid) উৎপন্ন হইতে পারে। এই আবিষ্কারটি দ্বারা হাইপোনাইট্রস্ এসিডের

* "The occasion for presenting the theory in a more developed form to the Society has been given by the reading last month to the Chemical Society, of an important paper on Mercurous Nitrites by Prof. Ray of the Presidency College, Calcutta."

* Mercury, Barium, Calcium, Magnesium, Sodium, Potassium, Silver, Copper, Cobalt এই কয়েকটি ধাতু লইয়া রায় মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছেন।

আণবিক সংস্থান সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা গিয়াছে।

ডাক্তার ডাইভার্স হাইপোনাইট্রাইট লইয়া বহুকাল গবেষণা করিয়াছিলেন। এই জন্য আধুনিক রসায়নবিদ্ মাত্রেই উক্ত পণ্ডিতের মীমাংসাকে চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ডাক্তার রায় মহাশয়ের হাইপোনাইট্রাইট সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান রাসায়নিক সভার পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে, ডাইভার্স সাহেব ঐ গবেষণা সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ডাক্তার ডাইভার্স লিখিয়াছিলেন,—

"This interesting observation throws much light on the nature of the decomposition of silver and mercury hyponitrites by heat. Through Ray and Ganguli's observations, we are at length in possession of much knowledge of what the products are, when hyponitrous acid decomposes, without explosion by the heat generated by liberating it from its salts."

শ্রীজগদানন্দ রায়। প্রবাসী।

বৃক্ষের ক্ষারসহন ক্ষমতা।

ক্ষার ভূমিতে কোন্ জাতীয় বৃক্ষ জন্মিতে পারে না। সম জাতীয় বৃক্ষের কোন্ কোন্ বর্ণ অধিক ক্ষার সহনক্ষম বা একই বর্ণের পৃথক পৃথক বৃক্ষ লতা কি পরিমাণে ক্ষার সহ্য করিতে পারে, আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের কৃষি-বিভাগ এই বিষয় লইয়া বহুতত্ত্বানুসন্ধানের পর কতিপয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

১। এক জাতীয় উদ্ভিদের বিভিন্ন লতা গুল্মাদি যথা গম, জোয়ার এবং ছোলা ম্যাগ্নেসিয়ম সোডিয়ম ক্ষারযুক্ত জমিতে বিভিন্নরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়।

২। একই শ্রেণীর দুইটি উদ্ভিদ যথা ইজিপসিয়ান এবং অপল্যাণ্ড তুলারও বৃদ্ধির পার্থক্য হয়।

৩। ভুট্টা জাতীয় ৮ প্রকার উদ্ভিদ রোপণ করিয়া দেখা হইয়াছে যে, ভুট্টাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষার সহনক্ষম এবং তুলা সর্ব্বাপেক্ষা কম।

৪। নূতন বীজ হইতে উৎপন্ন চারা অধিক ক্ষার সহ্য করিতে পারে, কিন্তু পুরাতন বীজের চারা তাদৃশ পারে না।

৫। ক্ষার ভূমিতে ক্যালসিয়ম ধাতু মিশ্রিত থাকিলে ম্যাগ্নেসিয়ম ও সোডিয়ম ক্ষারের ক্ষারত্ব অনেক কমিয়া যায়। সল্‌ফেট অব ম্যাগ্নেসিয়ম ও সোডিয়ম কার্ব্বোনেটে ক্যালসিয়ম অধিকতর ফলপ্রদ।

৬। বিভিন্ন জাতীয় গাছের পক্ষে ক্যালসিয়ম বিভিন্ন প্রকার ফল প্রদান করে। যে উদ্ভিদ যত অধিক ক্ষার সহনে অক্ষম, ক্যালসিয়ম বিদ্যমান থাকিলে বা প্রযুক্ত হইলে তাহার তত উপকার হয়।

৭। বিভিন্ন প্রকার ক্ষারে ক্যালসিয়ম অল্লাধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিলে ফলও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। বিশেষ বিবরণ Bulletin No. 113 of the United States Department of Agriculture নাম পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদেশে রেশম চাষের উন্নতি।

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে পেব্রাইন নামক এক প্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া গুটী পোকার ধ্বংস হইতে বসিয়াছে এবং সেই জন্য ক্রমে তুঁতের চাষ ও তাহাতে রেশম গুটীর আবাদ কমিয়া আসিতেছে।

এই রোগাক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে চাষের জন্য গুটী নির্ব্বাচন সময়ে দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

১। গুটীর দুইটি অগ্রভাগ যে কঠিন হয়।

২। যে গুটীর উপর রেশমের ফেঁসো কম সেই গুটীই কঠিন এবং ভাল হইয়া থাকে।

বঙ্গীয় রেশম সমিতি রেশম চাষের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা সেণ্ট্রাল বাবুলবনা নর্সরীতে ক্রমান্বয়ে গুটী ও গুটী হইতে বহির্ভূত কীট নির্ব্বাচন করিয়া উপরোক্ত রোগ তাড়াইতে পারিয়াছেন। গুটী কাটিয়া বাহির হইবার পর পঞ্চম দিবসে গুটী গুলি তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষা করা হয়। এই রূপে তাঁহারা রোগ স্পর্শশূন্য গুটী চাষের জন্য রায়তদিগকে বিক্রয় করিতে পারিতেছেন। যে সকল স্থানে রেশম চাষ হইতে পারে তথায় যদি জমিদারেরা এইরূপ নর্সরী স্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ও রায়তদের উভয়ের কল্যাণ হয়। যে জমিতে তুঁতের চাষ হয়, তাহার খাজনা সাধারণ জমি অপেক্ষা ৪।৫ গুণ অধিক। ইহাতে জমিদারের আয় বৃদ্ধি হইবে এবং চাষীরও রেশম চাষে অন্ন সংস্থান হইবে। অধিকন্তু রেশম সূত্র নিষ্কাষণ জন্য কারখানা স্থাপিত হইয়া অনেক লোকের কাজের যোগাড় হইয়া যাইবে।

আমরা শুনিতেছি যে, কাশিমবাজারের মহারাজা মুর্শীদাবাদে এইরূপ একটি নর্সরী খুলিতেছেন। ঐ নর্সরী সন্নিষ্ট মফঃস্বলে আরও অনেক নর্সরী থাকিবে। এই সঙ্গে তুঁতের চাষেরও ব্যবস্থা করা হইবে। এই কার্য্যের জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। অন্যান্য জমিদারগণ তাঁহার পন্থানুসরণ করিলে ভাল হয়।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

সিলঙ্গে উদ্যান ও ক্ষেত্রজাত ফসলের প্রদর্শনী।—১৩ই ও ১৪ই মে (১৯০৮) তারিখে সিলঙ্গে উক্ত প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। প্রতি বৎসর ঐ সময় মেলা বসিয়া থাকে। কথিত বর্ষে বৃষ্টির অভাবে খাসিয়া পর্ব্বতে সব্জী বা ফুল ভালরূপ জন্মায় নাই। যাহা হউক, যে সমুদয় সব্জী, ফল এবং ঘৃত মাখনাদি গোশালাজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা মন্দ নহে। হাঁস, মুরগী প্রভৃতি আহারোপযোগী গৃহপালিত পক্ষী প্রদর্শিত হইয়াছিল। সে গুলি অতি উৎকৃষ্ট। মুরগীর জাতীয় উন্নতির জন্য যে সমস্ত উপায় নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, সম্ভবতঃ তত্রস্থ সাধারণ লোকে তাহা প্রতিপালন করিয়া মুরগীকুলের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিবে।

এ বৎসর পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর কৃষকদিগকে কেবল মাত্র আসল দামে নৈনিতাল দার্জ্জিলিং আলুর বীজ দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সমধিক পরিমাণে আলু চাষে উৎসাহ প্রদান করা সর্ব্বদা প্রশংসনীয়।

বিলাতে রয়েল হর্টিকালচার সোসাইটির প্রদর্শনীতে ২৫ আউন্স ওজনের অনেকগুলি আপেল প্রদর্শিত হইয়াছিল। কোন একটি বাগানে একটি আলু হইতে ২৫ সের আলু উৎপন্ন হইয়াছিল; বীজ আলুটির ১২টি চোক ছিল। উহা ১২ ভাগ করিয়া রোপণ করা হয়। তাহার প্রত্যেকটি হইতে প্রচুর আলু পাওয়া গিয়াছিল।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইতে কাজুবাদাম (Cashew nuts) অনেক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। গত বৎসর তথা হইতে ৮৫০৭ হন্দর পরিমাণ এই বাদাম রপ্তানি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একা বোম্বাই হইতে ৮২০১ হন্দর চালান যায়। ইহার মূল্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা। মান্দ্রাজ হইতে সাড়ে পাঁচশত টাকার মাত্র বাদাম রপ্তানি হইয়াছিল। বাঙ্গালা বা পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে ইহার রপ্তানির কোন হিসাব দেখা যায় না।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

মাঘ মাস।

সব্জীক্ষেত্র।—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভুঁয়ে শসা, করলা, খরমুজ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারী করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরিবে ও ফল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোবর ও ছাই মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতি-পুর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই গর্ত্ত খোঁড়া মাটিগুলি কিছু দিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সারমাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে করিয়া খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিবে।

পুরান ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরান ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্র।—সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলি মাটি দিয়া জমি তৈয়ারী করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মুলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নিচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে এবং উহাতেও উত্তম বীজ হইবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুক্না হইলে হলুদগুলি রোজ একবার ডলিয়া দিবে। ডলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান।—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সমস্ত ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিতেছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদির ডালের অগ্রভাগ এবং পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিঙ্কস্, ফ্লাক্স্, ডেজি, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীত-কালের সব্জী যথা,—গাজর, সালগম, লেটুস্, বাঁধা-কপি, ফুলকপি, মুলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছ গুলির তদ্বির না করিয়া জল্‌দি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

REGISTERED No. C.192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

নবম খণ্ড,—১০ম সংখ্যা।



সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,

সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

মাঘ, ১৩১৫।

মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত;
১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।



কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

কৃষক।

৯ম খণ্ড। মাঘ, ১৩১৫ সাল। ১০ম সংখ্যা।

গো-পালন।

কৃষি প্রধান ভারতবর্ষে গবাদি গৃহস্থের জীবনোপযোগী একমাত্র সম্পত্তি। উৎকৃষ্ট গবাদির অভাবে জমিতে ভালরূপে চাষ দিতে পারা যায় না; সে কারণ পূর্ব্বের মত ফসল উৎপাদন করিতে না পারিয়া কৃষকগণ দিনে দিনে দরিদ্র হইতেছে। আমাদের দীন ভারতে গবাদির ক্রমশঃই অবনতি ঘটিতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গবাদির অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং ক্রমশঃ হইতেছে। তত্রত্য শিক্ষিত সমাজ গবাদির উন্নতি সাধনে বদ্ধ পরিকর, কিন্তু আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোক এ বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। গবাদির উন্নতিতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতিতে দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী; অতএব গবাদির উন্নতি বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

যদিও অন্যান্য দেশে গবাদি ব্যতিরেকে অশ্ব এবং অশ্বতর কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয় কিন্তু আমাদের দেশে কদাচিৎ অশ্বাদি কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে; অথচ অন্যান্য দেশে গবাদির যেরূপ ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, আমাদের দেশে তেমনই ক্রমশঃ তাহাদিগের অবনতি ঘটিতেছে।

গবাদি আমাদের অনেক উপকারে আসে; ইহাদের সাহায্যে কৃষকগণ জমিতে ফসল উৎপাদন করিয়া লাভবান হইতেছে। ইহাদের চর্ম্ম ও হাড় বিক্রয় করিয়া ব্যবসায়ীগণ প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতেছে। ইহাদের মল ও মূত্র হইতে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত করিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। মাল পত্র দূর দূরান্তরে নীত হইয়া ইহারা বাণিজ্যের সহায়তা করিতেছে। ইহাদের সাহায্যে সহরস্থ মল মূত্র আবর্জ্জনাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি সাধন হইতেছে এবং আমাদের পরমোপকার সাধন করিতেছে। গবাদির মল ও মূত্র আমাদের গৃহস্থালীর অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মাংস গোখাদকদিগের পরম তৃপ্তিকর আহার্য্য, কিন্তু দুগ্ধ সর্ব্ব সম্প্রদায়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অতীব প্রয়োজনীয়। দুগ্ধ আমাদের জীবন এবং ইহা আমাদের আহার্য্য বস্তুর মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য।

অতি শিশুকালে আমরা দুগ্ধ পান করিয়া সুস্থ ও সবলকায় হই। দুগ্ধ হইতে ঘি, দধি, ক্ষীর ইত্যাদি উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। দুগ্ধের অভাবে আমাদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। গবাদি সুস্থ, সবলকায়, উচ্চদেহ ও নীরোগী হইলে একদিকে যেমন আমাদের কৃষির ও বাণিজ্যের

উন্নতি, অপরদিকে তেমনি স্বাস্থ্যের ও উন্নতি। নীরোগী গাভীর অভাবে ও রোগাক্রান্ত গাভীর প্রাদুর্ভাবে আজকাল বিশুদ্ধ দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য। রোগগ্রস্ত গবাদির দুগ্ধ ও মাংস লোকের উদরস্থ হইয়া তাহাদিগকেও রোগগ্রস্ত করিতেছে। সে কারণ আমাদের মধ্যে অনেকে অকালে মৃত্যুর করাল-গ্রাসে পতিত হইতেছেন। এদিকে গবাদির অবনতির সহিত আমাদের স্বাস্থ্যের, কৃষির ও বাণিজ্যের অবনতি ঘটিতেছে। অতএব যাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের উপর আমাদেরও মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তাহাদের উন্নতি সাধন করা উচিত নয় কি? যাহারা আমাদের আশ্রিত হইয়া নীরবে আমাদের অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতেছে, তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে দোষ আছে কি? ভারতবাসী! গবাদির অবনতির বিষয়ে একবার ভাবিয়া দেখিলে আপনার হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে এবং গত বিষয়ের জন্য অনুতপ্ত হইবেন। সময় থাকিতে ও গবাদি সমূলে ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে রক্ষা করুণ।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে গবাদির অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হইত। অধুনাতন পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ, সবলকায় ও উচ্চদেহ বিশিষ্ট গবাদি প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় না। এমন কি, পূর্ব্বে গবাদির রোগ প্রায়ই লক্ষিত হইত না; আজকাল ভারতের সর্ব্বত্রই গো-রোগের প্রাদুর্ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে গোরু গুলি শ্যামল ঘাসে পরিপূর্ণ প্রশস্ত ময়দানে বিচরণ করিতে পারিত, উৎকৃষ্ট পানীয় ও পুষ্টিকর খাদ্য তাহাদের আয়ত্ত্য ছিল। শক্তির অতিরিক্ত ও শরীর অবসন্নকারী পরিশ্রমে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইত না। তাহারা পরম যত্নে লালিত পালিত হইত। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মহাজনগণ তাহাদের প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রদর্শন করিতেন। গো-সেবা তখন হেয় ছিল না। এই সব কারণে গো-জাতির উন্নতি পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু অধুনাতন আমরা গো-জাতির উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিতে-ছিনা এবং গো-সেবা হেয়জ্ঞান করিতেছি। পূর্ব্বের মত শ্যামল ঘাসে পরিপূর্ণ চারণ ভূমি কদাচিত দৃষ্ট হয়; যদিও কোন স্থানে চারণ ভূমি পাওয়া যায় তাহা জলাবৃত, কর্দ্দমাক্ত এবং জল নিঃসারণের কোন প্রকার বন্দোবস্ত-বিহীন।

যাহাদের পদাদি পূর্ণ, আবর্জ্জনাময় স্যাঁতসেতে কর্দ্দমাক্ত স্থানে বাস; যাহাদের সঞ্চালিত সদ্বায়ুর অভাবযুক্ত বাষ্প পূর্ণ গৃহে বসতি; যাহাদের যথা প্রয়োজন আহার, পুষ্টিকর খাদ্য ও উৎকৃষ্ট পানীয়ের অভাব তাহাদের উন্নতির কামনা করাও লজ্জার বিষয়। যাহাদিগকে শক্তির অতিরিক্ত ও শরীর অবসন্নকারী পরিশ্রমে নিযুক্ত হইতে হয়; যাহা-দিগকে অতিরিক্ত রৌদ্রে, বৃষ্টিতে ও অতি হিমে কার্য্যে নিয়োগ করা হয়; যাহাদিগের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে হয়, তাহারা যে দিনে দিনে কৃশ, দুর্ব্বল ও খর্ব্বকায় হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? যাহাদের বিশ্রাম নাই, দুর্ব্বল, অক্ষম ও রোগগ্রস্ত হইলেও যাহাদের কার্য্য হইতে অব্যাহতি নাই, তাহারা যে অকালে প্রাণত্যাগ করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমাদের দেশে বলবান বৃষের অত্যন্ত অভাব; সেই জন্য গাভীগণ প্রায়ই হৃষ্টপুষ্ট বাছুর প্রসব করে না। আর সেই বাছুর গুলিকে অকালে মাতৃস্তন্য হইতে বিরত হইতে হয়, সেই জন্য তাহারা হৃষ্টপুষ্ট হয় না।

দ্বিতীয়তঃ চর্ম্ম ব্যবসায়ীগণের প্রলোভনেই হউক অথবা ধনাগমের সুবিধা বুঝিয়াই হউক, চামার-গণের বিষ প্রয়োগে অনেক উৎকৃষ্ট গবাদি অকালে মরিতেছে। কসাইগণও উৎকৃষ্ট গবাদির প্রাণ

হরণে কুণ্ঠিত নহে; এই দুই প্রবল শক্রর হাত হইতে গো-কুল রক্ষা করা আমাদের উচিত নয় কি?

তৃতীয়তঃ—রোগ; ইহার প্রকোপে গো-বংশ ধ্বংস প্রায়। গবাদির চিকিৎসা সহজ নহে। আমরা যেমন আমাদের অসুখের কথা বলিতে পারি, ইহারা তাহা পারে না। ইহাদের চিকিৎসায় সুফল লাভের আশা সুদূরপরাহত। গবাদির মৃত্যুতে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে এবং হইতেছে। গো-রোগ প্রায়ই মহামারিভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং ইহাদের মারাত্মক ও কঠিন কঠিন পীড়া সম্বন্ধে দেশীয় গোয়ালাগণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ নিবারনই শ্রেয়স্কর। বিশেষতঃ গবাদি রোগাক্রান্ত হইলেও কার্য্য করিতে থাকে; এমত অবস্থায় মৃত্যুর প্রাকাল ভিন্ন গবাদি প্রায়ই চিকিৎসকের নিকট প্রেরিত হয় না। অনেকে অর্থাভাবে গবাদির চিকিৎসা করাইতে পারে না; কেহ কেহ গবাদির চিকিৎসায় অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত। কেহ কেহ বা গবাদির চিকিৎসা প্রয়োজন মনে করে না। গবাদির রোগ হইলে অনেকেই পূর্ব্ব হইতে প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করে না। আমাদের অমনোযোগিতায় ও উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে গো-জাতির ক্রমশঃই ধ্বংস হইতেছে।

আমাদের দেশে প্রতিবাধাত্মক চিকিৎসার আদর নাই; চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিবাধাত্মক চিকিৎসাতে গবাদির বহুল উপকার সাধিত হয় কিন্তু ইহার প্রয়োজনীয়তা অনেক কৃতবিদ্য লোক পর্য্যন্ত উপলব্ধি করেন না। অনেকের বিশ্বাস গবাদির কোন প্রকার ব্যারাম নাই; কিন্তু গবাদির যত প্রকার ব্যারাম আছে আমাদের তত নাই; বিশেষতঃ গবাদির মল, মূত্র, দুগ্ধ ও মাংস আমাদের রোগোৎপত্তির কারণ। গবাদি হইতে আমাদের দুরারোগ্য অনেক প্রকার ব্যারাম হয় যথা—রাজযক্ষ্মা, প্রস্থি জ্বর, এনথ্রাক্স, উদরী, কুষ্ঠ ইত্যাদি।

জমিদারগণ প্রজার মা বাপ। প্রজার উন্নতিতে রাজার ও রাজ্যের উন্নতি; গো কুলের উন্নতিতে প্রজার উন্নতি; অতএব নিজের ও রাজ্যের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে গবাদির উন্নতি করা উচিত। গবাদির উন্নতি কল্পে সমস্ত লোকের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে সরকার বাহাদুরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে আমাদের অভাব সম্পূর্ণরূপে মোচন হইবে না; এই বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়া উচিত। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট গবাদির উন্নতি কল্পে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পশু চিকিৎসা কলেজ স্থাপন করিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দকে জেলায় জেলায় প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক লোক অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া গবাদির উন্নতি কল্পে যে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করিতেছে ইহা বড়ই লজ্জার বিষয়। অতএব শিক্ষিত মণ্ডলী! পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী না হইয়া গো-জাতির উন্নতি কামনা করুণ। পাশ্চাত্য মহাজনগণের উৎকৃষ্ট পন্থাবলী অনুসরণ করুণ, অচিরেই দীন ভারত সোণার ভারতে পরিণত হইয়া আপনাদের জয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

স্বদেশী ও বিদেশী রং।

কালের গতি অনিবার্য্য, অপরিহার্য্য। পর্ব্বত প্রান্তর হইতেছে, প্রান্তর সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইতেছে, আবার অতলস্পর্শ বারিধী জলকণা সম্পর্কশূন্য বালুকাময় মরুপ্রান্তরে পরিণত হইতেছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় রং। ভারতের পূর্ব্ব প্রচলিত পাকা রংয়ের পরিবর্ত্তে এক্ষণে বিলাতী অল্পকাল স্থায়ী রং সমূহের চলন বাড়িয়াছে।

প্রয়োজনবশতঃ কয় গজ মাত্র টার্কি রেড অর্থাৎ যাহাকে আলু কাপড় বলি, বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া জলে ধৌত করিবা মাত্র দেখিতে পাইলাম যে, উহার এক চতুর্থাংশ রং ধুইয়া বস্ত্রখণ্ড ফিকা রক্তবস্ত্রে পরিণত হইল। পূর্ব্বে উহাকে আমাদিগের পাকা চিরস্থায়ী রক্তবর্ণ বলিয়াই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এইক্ষণে রং কেবল মাত্র জলে আর্দ্রতা হেতু গলিয়া যাইতে দেখিয়া সেই চিরবিশ্বাসের অন্যথা ঘটিল, সুতরাং তখন মনে আরও কতকগুলি ভাবনা স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার প্রথম চিন্তা "কালি" যে কাল কালি, লাল কালি প্রভৃতি কালিতে আমরা এইক্ষণে পত্রাদি ও দলিল দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করিয়া ভ্রান্ত ধারণাবশে চিরস্থায়ী অথবা বহুবর্ষ স্থায়ী বিবেচনায় মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়া পুত্র পৌত্রের জন্য অতি যত্নে রাখিয়া যাইতেছি, উহার দশা অর্দ্ধ শতাব্দী পরে যে, কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহার কিছুই এইক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি না। এমন কি রাসায়নিকগণ দ্বারা বহুপরিচিত গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্ট্রী অফিসে প্রচলিত Registration Ink অন্যান্য আদালতে বহুমূল্যে ক্রীত ও ব্যবহার হইতেছে ঐ রক্ত মসীতে লিখিত রেজেষ্টরী অফিসের প্রথম অবস্থায় রেজেষ্টরী কৃত কয়েক খণ্ড দলিল দেখিয়া আমরা একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছি। ঐ সকল দলিলের পৃষ্ঠলিপি দেখিয়া এমন কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি নাই যিনি অনুমানেও বুঝিতে পারেন যে, উহাতে কস্মিন কালেও কেহ মসীময় রেখা মাত্রও পাত করিয়াছিল। ফলে রেজিষ্টারের হস্ত লিপি এরূপ নির্ম্মল ভাবে উঠিয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে কোন স্থানে কাগজে একটু লাল দাগ মাত্রও নাই।

পক্ষান্তরে আমরা কার্য্যোপলক্ষে বহু ভূমি দানপত্রে সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কৃষ্ণনগরাধিপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাক্ষরিত যে সকল সনন্দে রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মনঃ নাম স্বাক্ষর বাংলা ভূষা ও শেহাই দ্বারা প্রস্তুত কালিতে লিপি বদ্ধ দেখিয়াছি, এখনও তাহার চাকচিক্যশালীতা ও দৃঢ়তা ও দীর্ঘস্থায়ীতা দেখিলে বোধ হয় যে আরও সহস্র বৎসরেও উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে কি কলিকাতা বা এদেশের স্থানান্তরে প্রস্তুত কিম্বা বিলাতী আমদানী যে সকল কালি আমরা ব্যবহার করিতেছি, ইহা বহু দিন শুষ্ক হইয়া গেলেও উহার উপর কোনরূপে বিন্দুমাত্রও জল পড়িলে তাহা তখনি গলিয়া কালি এমন ধ্যাবড়াইয়া যাইবে যে, উহা "বহুমূল্যের কালি হইলেও" নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণমাত্র স্থায়ী বলিয়াই বুঝা যাইবে।

বহু বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক ও মৌলবীগণ অলক্তরাগরঞ্জিত যে সকল কবচ ও দোয়া তাবিচ ভোজ্যপত্রে, তেড়েট বা তালপত্রে অথবা কাগজে লিখিয়া মাদুলী পদক বা অন্যান্য অলঙ্কার বা

তাবিচের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কিম্বা অধ্যাপক ও মুন্সিদিগের হস্ত লিখিত পুরাতন গ্রন্থাদি দেখিলে উহা যে অচিরকালের লিখিত নহে ইহা কখনই বুঝা যাইবে না। কালি আপামর সাধারণ সকলেরই আবশ্যক সেই জন্য আমরা এখানে কালির কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম। আর বস্ত্রাদি যে সকল বিলাতী পাকা চিরস্থায়ী রংয়ে রঞ্জিত বলিয়া বাজারে বিক্রীত হয়, তাহাও জলধৌত অথবা রজকালয়ে মলধৌত হইয়া ফিরিয়া আসিলে সেই পূর্ব্ব বস্ত্র বলিয়া চিনিয়া লইতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই। এমন কি ঊর্ণাতন্তু, কৌষেয় বসন, লোমজ, চিনাংশুক অথবা কার্পাস বস্ত্র যাহা কেন হউক না, অধিক রৌদ্র ও নিহার বা বর্ষার জল পাইলেও রঞ্জিত বস্ত্র শ্বেত (মলিন) বসনে পরিণত হয়।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগকে এইরূপ ভ্রমান্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ভালমন্দ নির্ব্বাচনের শক্তি সামর্থ একেবারেই নাই, অনুকরণ প্রিয়তাই আমাদিগের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। আমরা এই ক্ষণে বুঝিয়াছি, যাহা বৈদেশীক তাহাই উপাদেয়, এবং যাহা দেশোৎপন্ন তাহাই মন্দ। এই ধারণাবশে আমরা বিদেশী ঠাকুর (শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু), হইতে বিদেশী কুকুর পর্য্যন্তর সমাদর করি। বিলাতী বিড়াল, কুকুর, গাভী, ওয়েলার ঘোড়া, জাপানী বাক্স, চিনার বাসন জর্ম্মাণীর ছাতি, মোজা, আলোকাধার, ফরাসীর কাচদ্রব্য প্রভৃতি সর্ব্ব দেশের সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য আমাদিগের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হয়। আমরা কেবলমাত্র দেশজ দ্রব্যের বেলাই অন্ধ হই। সেই সকল দেশীয় দ্রব্য যদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অতি সুলভও হয়, তথাপি আমরা তাহার আদর করিতে জানি না। একান্ত পক্ষে দেশজাত দ্রব্য একবার বৈদেশীকের হস্ত দিয়া ঘুরিয়া আসিলেও আমরা কতকটা তৃপ্ত হইয়া ক্রয় করিতে সম্মত হই। আর যদি তাহাও অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সর্ব্বশেষে না হয় বিদেশীর প্রদত্ত একটা সার্টিফিকেটও দেখা চাই। নচেৎ মনে ধোঁকা রহিয়া যায়।

এক্ষণে আমরা আমাদিগের মূল বক্তব্য বিষয় যে, পাকা উদ্ভিজ্জাত রং পূর্ব্বে এ দেশে প্রচলিত ছিল ও বর্ত্তমানে যে খনিজ অতি অপদার্থ অস্থায়ী, কাঁচা রং প্রচলিত হইয়াছে, তাহারই কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পূর্ব্বে এদেশের কৃষি উৎপন্ন বৃক্ষের কাষ্ঠ, ত্বক, ফল, মূল, পুষ্প, বৃন্ত ও শিকড় প্রভৃতি রঞ্জন-শিল্পে ব্যবহার হইত। তাহার রংও যেমন চিরস্থায়ী ছিল, রঞ্জিত বস্ত্র প্রভৃতির বহুস্থায়ীত্ব পক্ষেও সেই রূপ সহায়তা করিত, ঐ সকল রং একবার বিশুদ্ধ ভাবে ব্যবহার করিলে আর কোন কালে তাহার ধ্বংস হইত না। অধিকন্তু দেখা যায় যে, এই সকল উদ্ভিদজাত রং শরীরের পক্ষে কোন কালে অনিষ্টকর নহে। পক্ষান্তরে খনিজ রংয়ে অনেক সময় স্বাস্থ্য হানিকর পদার্থ মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়।

আমরা নিম্নে কয়েকটি রঞ্জক উদ্ভিদের নাম প্রদান করিলাম। রঞ্জনবিদ্যা বিশারদ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি এই সকল দ্রব্য লইয়া একবার পরীক্ষা

করিয়া দেখেন ও উহা কার্য্যোপযোগী করিয়া পুনরায় ব্যবহারে আনিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার সাধন ও কৃষিকার্য্যের কিছু প্রসার বৃদ্ধিও হইতে পারে।

বাবলার ছাল, গরাণ গাছের ছাল, বকমকাষ্ঠ, আছফুলের শিকড়, কুসুমফুল, হরিতকী, বয়ড়া, আমলকী, নীল, লাক্ষা, সেফালিকা ফুলের বৃন্ত, হরিদ্রা, জাফরাণ, নটকান ফলের বীজ প্রভৃতি পদার্থে পূর্ব্বকালে বস্ত্রাদির রঞ্জনকার্য্য সমাহিত হইত।

উপরোক্ত ত্বককাষ্ঠ ও ফল সমূহের দ্বারা চর্ম্ম এবং বস্ত্র রঞ্জন কার্য্য উত্তমরূপে ও সুলভে সম্পাদন হইতে পারে ইহা এখনও আমাদিগের দৃঢ় ধারণা।

বাবলার ছাল, হরিতকী, বয়ড়া ও আমলকী দ্বারা উত্তম পাকা কাল আলপাকা অথবা কেলিকোর ন্যায় রং হয়। উহাতে চর্ম্ম এবং উভয়ই রঞ্জিত হইতে পারে।

গরাণ কাষ্ঠের ছালে চর্ম্ম রঞ্জন হয়। ইহাতে বাদামী রং ভাল হয়।

বকমকাষ্ঠ ও আছফুলের শিকড়ে বস্ত্রে লোহিত রং হয়।

কুসুমফুলে কুসুমী রং হয় এবং বস্ত্র রঞ্জন ব্যবহারেই উপযোগী।

নীলে নীল বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

লাক্ষা দ্বারা অলক্তক সদৃশ রং এবং বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইতে পারে।

সেফালিকা পুষ্পবৃন্তে হরিদ্রাভ রক্তবর্ণ এবং বস্ত্র রঞ্জনেই ব্যবহার্য্য।

হরিদ্রায় হরিদ্রাবর্ণ এবং জাফরাণে তদপেক্ষা একটু ঘোর ও রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ রং দৃষ্ট হয়।

নটকান বীজে গেরিমাটির ন্যায় বর্ণ উৎপন্ন ও প্রতিফলিত হয়। ইহাও বস্ত্র রঞ্জনের উপযোগী।

আমরা বাল্যকালে হরিতকী, বয়ড়া, আমলকী, টেরী ফল সহ কয়েক খণ্ড পুরাতন লৌহ, জলে দুই এক দিন ভিজাইয়া রাখিয়া শেষে অগ্নিতে পাক করিয়া যে কালী প্রস্তুত করিয়া, তদ্দ্বারা কাগজের উপর লিখিতাম, সে লিপি কাগজ নষ্ট হইয়া গেলেও অক্ষর নষ্ট হইত না। ঐ কালীতে অল্পমাত্র হীরাকসের গুঁড়া মিশ্রিত করিলে আরও গাঢ় কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইত, এবং কেবলমাত্র চারি পয়সা ব্যয়ে দুই পাঁইট বোতল কালি প্রস্তুত হইত। অপিচ অধ্যাপক, ভট্টাচার্য্য ও মৌলবীগণ লাক্ষা রসোৎপন্ন অলক্তকরাগ সহ দ্রব্যান্তর (যাহা আমরা অজ্ঞাত) মিশ্রিত করিয়া যে লাল কালি প্রস্তুত করিতেন, তাহাও চিরস্থায়ী হইত। অতঃপর আমাদিগের বাসনা যে, বিলাত প্রত্যাগত রঞ্জন-বিদ্যা বিশারদগণ একবার এই সকল প্রস্তাবিত দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীগঞ্জ।

হরিদ্রা।

হরিদ্রা শব্দের বাঙ্গালা নাম হলুদ। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে হলদী এবং ইংরাজেরা ইহাকে "টরমারিক" (Turmeric) কহিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতিঘরে নানা কারণে ইহা নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থ। পাক ক্রিয়ায়, শুভ উৎসবে, বিশেষতঃ বিবাহোপলক্ষে, রং প্রস্তুত করণে, ঔষধে এবং তদ্ভিন্ন বহুবিধ প্রয়োজনে হরিদ্রা ব্যবহৃত হয়। অনেক স্থানে স্ত্রীলোকেরা ইহা গাত্রে মাখে এবং

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশেও ইহার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। খনা কহিয়াছেন,—

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রোও।
দাবা পাশা খেলা ফেলিয়া থোও॥
আষাঢ়ে শ্রাবণে নিড়াবে মাটি।
ভাদরে নিড়ায়ে করিবে আঁটি॥
অন্যথা নিয়মে পুঁতিবে হলদি।
পৃথিবী বলেন তাতেই ফল দি॥

পণ্ডিতা খনার বচনানুসারে অদ্যাপি হলুদের চাষ এইরূপেই চলিয়া আসিতেছে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ইহার জন্য মাটি নিড়াইয়া রাখা উচিত। সর্ব্বপ্রথমে ভূমির প্রকৃতি বুঝিয়া হরিদ্রার আবাদে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। যে প্রকার জমি হয়, হলুদও সেই প্রকার হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে স্থলে বালুকার প্রচুরতা দেখা যায় অথবা যেখানে এঁটেল মাটি থাকে, সে স্থলে হলুদের চাষ ভাল হইতে পারে না। যে মাটি কিছুদিনের "পতিত জমি" বলিয়া পরিচিত অথবা দুই এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত যে ভূমিতে আর কোন দ্রব্যের চাষ হয় নাই, সেই জমিতেই হলুদের আবাদ অতি সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। যে ভূমিতে বন্যার আশঙ্কা থাকে অথবা যেখানে অধিক পরিমাণে জল জমিয়া থাকিবার সম্ভাবনা, সে জমিতে হরিদ্রার চাষ করা বিধেয় নহে। হলুদের চাষে ভূমি প্রায় দেড় হস্ত গভীর হওয়া আবশ্যক। মাটি যেন শক্ত না হয় এবং মাটিতে ইট, পাথর, কাঁকর বা ডেলা না থাকে। মাটিকে খুব আলগা (সরল) করিয়া এবং মৃত্তিকাকে চারিদিকে সমপরিমাণে ছড়াইয়া দিয়া, বৈশাখ মাসের শুভ দিনে কোদালির সহায়তায় এক এক হস্ত ব্যবধানে ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া, সেই গর্ত্ত বা "জুলি"র মধ্যে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর এক একটী বীজ লাগাইয়া দিবে। বলা বাহুল্য, হরিদ্রার মূল বা গেঁড় লাগাইতে হয়। মূলকে অনেক স্থানে কৃষকেরা হলুদমুড়ো কহিয়া থাকে। সচরাচর দুই জাতীয় হরিদ্রার আবাদ এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই প্রকারই উৎকৃষ্ট। ইহাদের একটির নাম বাঘনখা, অপরটির নাম দুর্গামেড়। অপরাপর প্রকারের হলুদ দেখা যায় কিন্তু তাহা ইহাদের তুলনায় নিকৃষ্ট। হলুদের চাষে বীজ নির্ব্বাচনের বহুদর্শীতা থাকা আবশ্যক; বীজ উৎকৃষ্ট হইলেই হরিদ্রাও উৎকৃষ্ট হয়। ভাল বীজ, ভাল জমি এবং যত্ন ভাল হইলে অতীব উৎকৃষ্ট হলুদি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ভাল হলুদে কৃষকের প্রায়ই লোকসান হয় না, কারণ ভাল হরিদ্রার নিত্য প্রয়োজন বশতঃ ইহার কাট্‌তিও যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র হরিদ্রার প্রয়োজন আছে। সুতরাং নানা দেশে হলুদের রপ্তানী হইয়া থাকে। এই কারণে হরিদ্রার চাষে প্রায়ই ক্ষতি হয় না এবং বাজারে হলুদ প্রায়ই অবিক্রী থাকে না। খনার মতে বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টির পরেই হলুদের চাষ করা কর্ত্তব্য। গোড়াগুলি পুঁতিবার পূর্ব্বে ধারাল ছুরি দ্বারা অগ্রভাগকে অল্প অল্প কাটিয়া দিলে ভাল হয়। পানের ক্ষেত্রকে যেমন চাষারা

বরজ কহিয়া থাকে, হরিদ্রার ক্ষেত্রকে কৃষকেরা হলুদবাড়ী বলিয়া সম্বোধন করে।

হরিদ্রার গাছ বাহির হইতে দেখিলে তাহার নিড়ানী আরম্ভ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঘাস বা কণ্টক জন্মাইতে দেওয়া উচিত নহে। মাটিকে সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। বৃষ্টির অব্যবহিত পরে হলুদবাড়ীর কার্য্য আরম্ভ করা বিধেয় নহে। জল শুকাইয়া গিয়া মাটি একটু সরস থাকিতে থাকিতে কার্য্য আরম্ভ করাই নিয়ম। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত হলুদবাড়ীর কাজ অল্পে অল্পে চলে; পৌষ বা মাঘ মাসে গাছগুলি শুখাইতে আরম্ভ হইলেই এক একটী গাছকে মোড়ান দিয়া বাঁধিয়া দিবে। গাছ সতেজ হইলে মোড়ত না দিলেও ক্ষতি হয় না। গাছগুলি সুন্দররূপে শুষ্ক হইয়া গেলে গাছে আগুন লাগাইয়া দেওয়া উচিত; পাতাসমূহ দগ্ধ ও ভস্মাকারে পরিণত হইলে ঐ দগ্ধ ছাই সারের (Manure) কার্য্য করে। জমিতে ঐ সার ছড়াইয়া দিয়া, হলুদবাড়ীর ভূমিতে ধান্য জন্মাইলে, জমির উর্ব্বরতা শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়।

হলুদের জমিতে গোবর, ছাগলের নাদি, অস্থি চূর্ণ এবং ঘুঁটে বা ঘশির ছাই "সার" রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতি একর জমিতে হরিদ্রার চাষে, ৫০৲ টাকা খরচ পড়ে এবং চাষ ভাল হইলে এক একর পরিমাণ জমি হইতে শুষ্ক হলুদ ১৬।০ মণ পাওয়া যাইতে পারে তাহার দাম ১২৫৲ টাকার কম নহে।

হলুদ তুলিয়া তাহাতে অল্প পরিমাণে গোবর মাখাইয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। তদনন্তর রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লওয়া আবশ্যক। পরে রৌদ্রে দিয়া কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইলে কাষ্ঠের তক্তার দ্বারা একবার দলিয়া লইতে হয়। শুষ্ক হইয়া গেলে একদিন বা দুই দিন ঢাকিয়া রাখিবে, তাহার পরে বিক্রয়ের জন্য বাজারে প্রেরণ করিতে হয়। হলুদের চাষে লাভ ভিন্ন ক্ষতির কথা প্রায়ই শুনা যায় না। পৃথিবীর নানা স্থানে হলুদের নিত্য ব্যবহার আছে।

মোমের ব্যবসা।

ভারতবর্ষের মোম বিশেষতঃ বাঙ্গালার মোম ইংলণ্ডে যেরূপ আদরে গৃহীত হইয়া থাকে তাহাতে উত্তরোত্তর এই ব্যবসায়ের উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা। কিন্তু বিগত ২৫ বৎসরের রপ্তানির হিসাবে দেখা যায় যে ইহার অবস্থা সমভাবেই রহিয়াছে। এদেশ হইতে বৎসরে প্রায় চারি লক্ষ টাকার মোম বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বাঙ্গালা হইতে আড়াই লক্ষ টাকার অধিক চালান হয়। বাঙ্গালাতেই অধিক পরিমাণে মোম উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যবসায় প্রধানতঃ অশিক্ষিত লোক-দিগের দ্বারা পরিচালিত বলিয়াই ইহার কোনরূপ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। জঙ্গলী লোকেরা অরণ্য হইতে যে পরিমাণ মৌচাক সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহা গালাইয়া যে মোম উৎপন্ন হয় তাহাতেই এই ব্যবসায় চলে। কিন্তু যাহাতে মৌ চাকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় সে পক্ষে কোন ব্যবসায়ী কোনরূপ চেষ্টা করেন না এবং এইরূপ চেষ্টা করিলে যে তাহা সম্ভব ইহাও কাহার ধারণা নাই। এই কারণেই এই ব্যবসা এ প্রকার সমভাবে রহিয়াছে। ইউরোপ ও মার্কিনে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই ব্যবসায় পরিচালিত হয় বলিয়া তথায় ইহার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। ইংলণ্ডে এদেশী মোমের যে

আদর তাহার কারণ এখানকার প্রখর সূর্য্যের উত্তাপে এদেশের মৌচাকে ভালরূপ মোম উৎপন্ন হয়। এইজন্য যে সময়ে ইউরোপে বড় একটা রৌদ্র হয় না সেই সময়ে তথায় এদেশের মোম অধিক পরিমাণে চালান হইয়া থাকে। কিন্তু জাপান ও মার্কিনের মোম আরও ভাল হয় বলিয়া তাহা এখানকার মোম অপেক্ষাও অধিক দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

অতএব যেরূপ ইউরোপে ও মার্কিনে মোম প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা শিক্ষা করা আমাদিগের বিশেষ আবশ্যক। প্রথমতঃ যাহাতে মৌ-চাকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় সেদিকে মনোযোগ প্রদান করা বিশেষ প্রয়োজন। ইউরোপের মধ্যে রুষদেশে মোমের ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। রুষের কৃষিজীবিরা চিনির পরিবর্ত্তে মধু ব্যবহার করিয়া থাকে এবং উহাদিগের ধর্ম্ম মন্দিরে রাত্রে মোমবাতি জ্বালান হয় বলিয়া তথাকার লোক মৌচাক সংগ্রহে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে। রুষের যে সকল প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প জন্মায় তথায় মৌমাছিদিগের চাক বাঁধিবার সুবিধার জন্য কৃত্রিম চাক তৈয়ার করিয়া বৃক্ষাদিতে ঝুলাইয়া রাখা হয়। মৌমাছি সকল মধু সংগ্রহ করিয়া সেই কৃত্রিম চাকে আশ্রয় লইয়া থাকে। যখন এই সকল চাক হইতে মোম পাইবার সম্ভাবনা বিবেচনা করে, তখন কৃত্রিম চাকের অধিকারীরা আস্তে আস্তে উহা ভাঙ্গিয়া লয় এবং যাহাতে মৌমাছিরা একেবারে তথা হইতে উড়িয়া পলায়ন না করে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে জর্ম্মানীতে অধিকতর সুব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতে লোকে মৌমাছি রক্ষা করিয়া মোম সংগ্রহ করিতে শিক্ষালাভ করে রাজ-সরকার হইতে সে বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করা হইয়া থাকে। যাঁহারা মৌমাছি রক্ষা করিতে বিশেষ পটু তাঁহাদিগকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া গ্রামে গ্রামে পাঠান হয়। তাঁহারা গ্রামবাসীদিগকে চাক নির্ম্মাণের কৌশল বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। এই সকল শিক্ষককে রীতিমত পরীক্ষা করিয়া সরকার হইতে প্রশংসাপত্র প্রদান করা হইয়া থাকে। যে সকল গ্রামবাসী চাক রক্ষায় বিশেষ পটুতা প্রদর্শন করেন তাঁহারাও রাজভাণ্ডার হইতে পুরস্কার লাভ করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে অনেক গ্রামে সভা আছে। সেই সকল সভায় মৌমাছিদিগের স্বভাব, তাহাদিগের চাকের ব্যবস্থা, মধুসংগ্রহ প্রণালী ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে এবং তাহাতে লোকে মৌমাছির চাক রক্ষা করিতে শিক্ষালাভ করে। ইহাতে সে দেশে মৌচাকের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে এবং সে জন্য মোমের ব্যবসায়েরও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

মার্কিন যুক্ত রাজ্যে মৌমাছি রক্ষা করা একটা বিশেষ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। এজন্য তথায় নানাপ্রকার নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষেও যে এইরূপ মৌমাছি রক্ষা করিয়া মোমের ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে ফুল উৎপন্ন হয়। এই সকল ফুল হইতে যে মধু উৎপন্ন হয় তাহা যার পর নাই স্বাদু ও সুমিষ্ট। পার্ব্বত্য প্রদেশের অরণ্য জাত মধু বা শ্রীহট্টের কমলা ফুলের মধুর যাঁহারা আস্বাদন লইয়াছেন, তাঁহারা এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। এখানকার মধুর এই মিষ্টতার জন্য পূর্ব্বকালে পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজেরা এদেশ হইতে মধু লইয়া যাইতেন এবং এখানকার মোমের মূল্য সুলভ বলিয়া তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে তাঁহারা ক্রয় করিতেন। অতএব এই পুষ্পপ্রধান-

দেশে যে অনায়াসে মৌচাক রক্ষার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কীটতত্ত্ববিদেরা বলেন এদেশের মৌমাছি সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে পাহাড়ে মৌমাছি, যাহাকে তাঁহারা Apis dorsata বলেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা সচরাচর খোলা জায়গাতেই চাক বাঁধিয়া থাকে। পাহাড়ের গুহায় অথবা তলদেশে এবং বৃক্ষাদির নিম্নদেশে ইহাদিগের চাক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের প্রস্তুত এক এক খানি চাক এত ভারি যে অনেক সময়ে একজন লোক তাহা বহিয়া লইয়া যাইতে পারে না। ইহাদিগের এক এক খানি চাকে ৫ সের হইতে ১০ সের মধু ও এক সের হইতে দেড় সের মোম প্রস্তুত হয়।

আর এক শ্রেণীর মৌমাছি আছে তাহাদিগকে গেছো মৌমাছি বলে। ইহাদিগের বৈজ্ঞানিক নাম Apis Indica। এই গেছো মৌমাছিদিগের আবার দুইটি পৃথক পৃথক দল আছে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের চাক তৈয়ার করিয়া শুষ্ক গাছের ফাটালে চাক বাঁধে। এই চাকগুলি অনেক সময়ে স্তরে স্তরে বাঁধা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি এক এক খানি চাকে উপর্য্যুপরি সাতটি পর্য্যন্ত স্তর দেখা গিয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইহারা গাছের শাখাতেই চাক বাঁধিয়া থাকে। এই সকল চাক প্রায় মানুষের হাতের সমান দেখা যায়, কখন কখনও বা তদপেক্ষা বড়ও দেখা গিয়াছে।

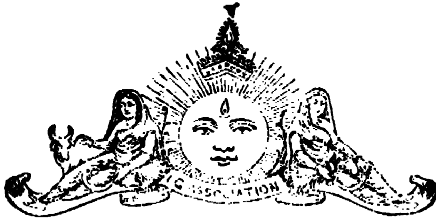
তৃতীয় শ্রেণীর মৌমাছিকে কুস্মী ও কুস্মে মাছি বলে। বৈজ্ঞানিকেরা উহাকে Apis florea বলেন। ইহাদিগের আকার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং ইহারা যে চাক বাঁধে তাহাও ক্ষুদ্র। ইহারা বাঁশ গাছ, বেণা ঝোড় অথবা বাকস ফুলের গাছের মত ঝোপে অণ্ডাকৃতি চাক সকল বাঁধিয়া থাকে। এই জাতীয় মৌমাছিদিগের হুল নাই বলিয়া অনেকে অনুমান করেন ইহাদের চাক ভাঙ্গিতে বড় একটা কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

শেষোক্ত দুই শ্রেণীর মৌমাছিকে সহজেই কৃত্রিম চাকে চাক বাঁধিতে আকৃষ্ট করা যাইতে পারে। বসন্ত কালে ব্রহ্মদেশের লোক তাহাদিগের একটি পর্ব্বোপলক্ষে তথায় মৌমাছিদিগের চাক বাঁধিবার জন্য বাঁশের কৃত্রিম চাক প্রস্তুত করিয়া দেয়। এই সকল চাকে অনেক মৌমাছি আশ্রয় লইয়া থাকে এবং তাহারা তথায় মধু সঞ্চয় ও মোম উৎপন্ন করে। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মবাসীদিগের জীবিকার্জ্জনের বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। ব্রহ্ম দেশের অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠ নির্ম্মিত বলিয়া তথায় অনেক বাড়ীতেই মৌচাক দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের বোধ হয় আমাদের বাড়ীর নিকটে যদি কাঠের চাক তৈয়ার করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মৌমাছিরা গাছ বা ঝোপে চাক না বাঁধিয়া কৃত্রিম চাকেই মধু সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা মধু ও মোম সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

এদেশে যাঁহাদিগের মোমের কারখানা আছে তাঁহারা যদি রিফাইন করা সম্বন্ধে একটু সতর্কতা অবলম্বন করেন তাহা হইলে বাঙ্গালার মোম অধিক মূল্যে বিলাতের বাজারে বিক্রয় করিতে পারেন। এদেশের সাধারণ লোক যাহাতে কৃত্রিম চাক বাঁধিতে শিক্ষা করে এবং যাহাতে গ্রামবাসীরা যত্ন করিয়া মৌচাক সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয় সে বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দান করিলে ক্রমে ক্রমে এখনকার অপেক্ষা আরও অধিক মোম উৎপন্ন হইবে ও তদ্দ্বারা লোকের জীবিকার একটি পথ প্রশস্ত হইবে। *

---

* কৃষকের জনৈক গ্রাহক। (পত্রান্তর হইতে সংগৃহিত)



কৃষক। মাঘ, ১৩১৫।

রোহিত ও ইলিস মৎস্য।

আমরা গত বারে সাধারণ ভাবে মৎস্য চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে বিশেষ বিশেষ মৎস্যের জীবন ইতিহাস, তাহাদের বাসস্থান প্রভৃতি আলোচনা করা যাউক। স্বাদু জলীয় মৎস্যের মধ্যে রোহিত, মিরগেল, কাতলা প্রভৃতির আদর ও কাটতি যেমন অধিক, ক্ষার অথবা লবণজলীয় মৎস্যের মধ্যে ইলিস মাছের আদরও সেইরূপ। আমরা তজ্জন্য রোহিত জাতীয় মৎস্যের ও ইলিস মৎস্যের বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি।

ইউরোপ অথবা আমেরিকার অধিকাংশ মৎস্যাদির সহিত বঙ্গদেশীর মৎস্যের সাদৃশ্য নাই। কিন্তু ইলিস ও রোহিত জাতীয় মৎস্য উভয় দেশেই পাওয়া যায়। ইলিস মৎস্যের বৈজ্ঞানিক নাম (Clupea Ilisha) ক্লুপিয়া ইলিস। ভারতের পূর্ব্ব উপকুলের যে সমস্ত নদী বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সকল গুলিতেই ইলিস মৎস্য পাওয়া যায়। পশ্চিম উপকুলে এক সিন্ধু নদ ব্যতীত অন্য কোথায়ও ইলিস মাছ পাওয়া যায় না। কিন্তু বঙ্গদেশেই ইলিস মাছের প্রাচুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বঙ্গের দক্ষিণে ইহা চিল্কা হ্রদে প্রবেশ করিয়া থাকে, মহানদী বড়বুলঙ্গ ও সুবর্ণরেখা নদীসমূহে গমন করে। নিম্নবঙ্গে গঙ্গার যাবতীয় মোহানাতেই ইহা পাওয়া যায়। হুগলী, রূপনারায়ণ, বালেশ্বর, পদ্মা প্রভৃতি নদীগুলি সময়ে ইলিস মাছে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কোন প্রকার বাধা না পাইলে ইলিস মাছ নদীর স্রোত বহিয়া অনেক দুর চলিয়া যায়। সমুদ্রকুল হইতে ৪১৫ মাইল দুরবর্ত্তী পাটনাতেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ইলিস মাছ পাওয়া যায়।

বৎসরে অধিকাংশ সময় ইলিস মাছ পাওয়া গেলেও আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ইলিস মাছ খাইতে সুস্বাদু থাকে। এই সময়েই ইলিস ডিম্ব প্রসব করে। কিছু দিন পূর্ব্বে ইলিস মাছ কাটতির একটা হিসাব প্রস্তুত করার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, মোটামুটি ৮০০০ খানি নৌকা ইলিস ধরিবার জন্য নিযুক্ত হয়। এই ৮০০০ নৌকায় কিন্তু এক প্রকার জাল ব্যবহৃত হয় না। ইহার মধ্যে চারি হাজার সাঙ্গলে, দুই হাজার ছান্দি, বার শত থড়কে ৪ শত বাছাড়ি এবং ৪ শত কোনা জাল ব্যবহার করে। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ইলিস মৎস্য ধৃত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইলিস জাতীয় মৎস্য ইউরোপ ও আমেরিকায় পাওয়া যায়। এ সমস্ত স্থানে ইলিসের জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তদ্দারা বুঝিতে পারা যায় যে, ইলিস অধিকাংশ সময় সমুদ্রেই অতিবাহিত করে। কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই ইহারা নদীতে আগমন করে। নদীতে প্রবেশ করিয়া উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধানের পর ইহারা ডিম্ব প্রসব ও নিক্ষেপ করে। যে সময় নদীর জলের তাপ ৫৬°—৬৬° ডিগ্রি থাকে, সেই সময়েই

অধিকাংশ ইলিস নদীমুখে প্রবেশ করে। ততোধিক উত্তাপ হইলে ইলিস মৎস্যের আগমনের মাত্রা কমিয়া যায়। আপাততঃ আমাদের দেশে যেরূপ নদীগর্ভ অবরোধ করিয়া এবং বড় বড় জাল নিক্ষেপ করিয়া ডিম্ব সহিত ইলিস মৎস্য ধৃত করা হয়, এক সময় আমেরিকাতেও সেইরূপ হইত এবং তজ্জন্য ইলিস মৎস্য বংশ প্রায় নির্ম্মূল হইয়া আসিয়াছিল। ইলিস মাছের পোনা একটু বড় হইলেই আবার সমুদ্রে ফিরিয়া যায়। কিন্তু ইহাদের শত্রু এত অধিক যে, যে পরিমাণ পোনা উৎপাদিত হয়, তাহার শতাংশের এক অংশ বড় হইয়া আবার ডিম্ব প্রসব করিতে সমর্থ হয় কিনা সন্দেহ। এই রূপে স্বাভাবিক শত্রু ব্যতীত কলুষিত জলও ইলিস মাছের জীবন ধারণের আর একটি অন্তরায়। দ্রাবকসমূহ, কাঠের গুঁড়া, আবর্জ্জনা, তৈল প্রভৃতি নদীতে অধিক পরিমাণে নিক্ষিপ্ত হইলে ইলিস মৎস্য থাকিতে পারে না। নদীতে প্রবেশ করার পর ইলিস অতি সামান্য পরিমাণেই আহার করিয়া থাকে। কিন্তু ডিম্ব প্রসবের পর ইহারা ক্ষুধার্ত্ত হয়। পূর্ণবয়স্ক ইলিসের এক রকম দন্ত নাই বলিলেই হয়। জলের সহিত যে পোকা প্রভৃতি থাকে, ইহারা প্রায় তাহাই গলাধঃকরণ করে। এতদ্ভিন্ন ইহারা ছোট ছোট কাঁকড়া, চিঙ্গড়ি প্রভৃতিও আহার করে।

সমুদ্র হইতে নদীমুখে প্রবেশ করিয়া ইহারা অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রবেশ করিবার ৭—১০ দিনের মধ্যেই ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। যে সময়ে দিবসের তাপের মাত্রা অত্যন্ত অধিক, অর্থাৎ প্রায় সন্ধ্যার সময়ই ডিম্ব প্রসবের সময়। পাঁচটা হইতে দশটাই প্রশস্ত সময়। ডিম্ব, ভ্রূণস্থলীতে প্রথমে খুব নিরেট অবস্থায় থাকে। তাহার পর ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এত অধিক বড় হয় যে, এমন কি ডিম্ব সমেত এক একটি ভ্রূণস্থলীর ওজন ১৩ আউন্স পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ডিম্ব প্রসবের পরও ডিম্বস্থলীতে কতকগুলি ডিম্ব থাকে। এই গুলি হইতে পর বৎসর আবার ডিম্ব হয় কিনা এবং ইলিস প্রতি বৎসর ডিম্ব প্রসব করে কিনা তাহা জানা নাই।

ইলিস মৎস্য বাসা তৈয়ারি করে না। নদীগর্ভে আলগা ভাবেই ডিম্ব সংরক্ষিত হইতে থাকে। স্ত্রী ও পুং জাতীয় মৎস্য পাশাপাশি চলিতে থাকে এবং ডিম্ব নির্গত হইলেই পুং মৎস্য তাহা স্বীয় বীর্য্য দ্বারা নিষিক্ত করিয়া দেয়। অপরাপর মৎস্যের ন্যায় ইলিসের ডিম্বের সংখ্যা তত বেশী নয়। তথাপি একটি মাছ গড়ে ত্রিশ হাজার ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্ব প্রসূত হইবার পরই উহা জলে ডুবিয়া যায় এবং না ফোটা পর্য্যন্ত এক স্থানেই থাকে। বাণ জাতীয় মৎস্য ইলিসের ডিম্ব সমধিক পরিমাণে নষ্ট করে। এতদ্ভিন্ন ডিম্বের উপর ছত্রক জন্মিয়া ও বালি পড়িয়াও অনেক ডিম্ব নষ্ট হয়।

কয়েক বৎসর হইতে আমেরিকায় কৃত্রিম উপায়ে ইলিসের বংশ বৃদ্ধি করা হইতেছে। সমুদ্র উপকূলের সর্ব্বত্রই ইলিসের স্বাভাবিক

সন্তানোৎপাদন স্থানের অনুসন্ধান করা হইয়াছে। সকল নদীতেই ডিম্ব পরিস্ফুটনাগার স্থাপিত হইয়াছে। বিশেষভাবে নির্ম্মিত জাহাজেও ডিম্ব সংরক্ষিত হইয়া ফোটান হয়। ১৮৯৭ সালে ২০৫,০০০,০০০ ডিম্ব সংগ্রহ হয়। তাহার মধ্যে ১৩৪,৫৪৫,০০০ ডিম্ব ফোটে। পরিপক্ক মৎস্য ধরিয়া ডিম্ব এবং বীর্য্য বাহির করিয়া লওয়া হয়; তাহার উভয় একত্র মিশ্রিত করিয়া অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ডিম্ব-পরিস্ফুটনাগারে আনীত হয়।

রোহিত জাতীয় মৎস্যের এতদ্দেশে যথেষ্ট আদর আছে। রোহিত সাইপ্রিনিডি (Cyprinidæ) শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীতে রুই, মিরগেল, কাতলা, কালবোশ প্রভৃতি ব্যতীত মৌরুলা, নানা জাতীয় পুঁটি, চেলা, বাটা, কুরচি, নান্দিম, খয়রা, ডানকোনা, খড়িকা, দাঁড়িকা প্রভৃতি মৎস্য রহিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় ঠিক এতদ্দেশীয় রোহিত জাতীয় মৎস্য পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু উক্ত দেশ সমূহে রোহিত জাতীয় মৎস্যের অভাব নাই। রোহিত মৎস্য কত দিন জীবিত থাকে এবং কত বড় হয় তাহার কোন স্থিরতা নাই। কিন্তু ইহারা যে সাধারণতঃ আধ মণ পর্য্যন্ত হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য মৎস্যের বৃদ্ধি অনেকটা জলের ও আহার্য্য দ্রব্যের উপর নির্ভর করে। নাতি শীতোষ্ণ দেশে তিন বৎসরে একটি মাছ প্রায় ২ সের হয়, কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এতদপেক্ষা অনেক সত্বরে মৎস্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমেরিকায় ইষদুষ্ণ জলে মাছ রাখিয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, দুই বৎসরেরও কম সময়েও মাছ আকারে ২২ ইঞ্চি ও ওজনে প্রায় ৫ সের হইয়াছিল।

রোহিত জাতীয় মৎস্য জল হইতে তুলিয়া লইলেও অনেকক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে। অবশ্য ইহাদিগকে আর্দ্র অবস্থায় রাখা আবশ্যক। আর্দ্র শৈবালে প্যাক্ করিয়া রোহিত মৎস্য অনেকদূর লইয়া যাইতে পারা যায়। বালতি অথবা অন্য পাত্রে সামান্য জল দিয়াও মাছ রাখিতে পারা যায়। কিন্তু জল পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। পুষ্করিণীতে জল ময়লা হইলেই রোহিত জাতীয় মৎস্য ভাসিয়া থাকে। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে জলে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের অভাব হইয়াছে। রোহিত মৎস্যের খাদ্য প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জ পদার্থ। কিন্তু ইহা ব্যতীত ইহারা সম্বুক, চিংড়ি, পতঙ্গ-কীড়া প্রভৃতিও ভক্ষণ করিয়া থাকে। কত বয়সে রোহিত মৎস্য সন্তানোৎপাদনোপযোগী হয়, তাহার কিছু স্থিরতা নাই। ইহা অনেকটা জলবায়ুর উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। ইউরোপ ও আমেরিকায় সাধারণতঃ তিন বৎসর বয়সেই ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। কিন্তু আমেরিকায় নয় মাস বয়সেও ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা গিয়াছে। ডিম্ব প্রসবের সময় স্ত্রী মৎস্যকে স্ফীত উদর দ্বারা চিনিতে পারা যায়। রোহিত মৎস্যের ডিম্ব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ডে সাহেব বলেন একটি ৪½ সের ওজনের স্ত্রী মৎস্যের উদরে ছয় লক্ষ ডিম্ব পাওয়া যায়। রোহিত মৎস্য যেরূপ অবহেলার সহিত যেখানে সেখানে, জলজ উদ্ভিদের গাত্রে ডিম্ব স্থাপন করে, তাহাতে ডিম্বের সংখ্যা যদি এত অধিক না হইত তাহা হইলে উহার বংশ রক্ষা হইত না। মৎস্য চাষের পুকুরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্ত্রী ও পুং মৎস্য রাখা হয়। স্ত্রী অপেক্ষা পুং মৎস্যের সংখ্যা অধিক থাকে। একটি স্ত্রী দুইটি পুরুষ অথবা ২টি

স্ত্রী ৩টি পুরুষ এই হিসাবে এক একটি দল গঠিত হয়। প্রত্যেক ৩টি পুরুষের জন্য একটি তিন বৎসর বয়স্ক পুং মাছ রাখা হয়। ইহারা পূর্ব্বোক্ত তিনটি মাছকে চালাইয়া বেড়ায়। সন্তানোৎপাদনের সময় পুং মৎস্যের একটি যৌন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। উহা কতকগুলি ব্রণের ন্যায় এবং পুং মৎস্যের মস্তকে ও পৃষ্ঠে ঐ গুলি প্রকাশ পায়। এতদ্বারা উহারা স্ত্রী মৎস্যকে ধরিয়া রাখিতে পারে। ডিম্ব প্রসূত হইলেই এক প্রকার আঠাবৎ পদার্থ দ্বারা উহা জলজ উদ্ভিদের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া যায়। মাটিতে পড়িয়া গেলেই ডিম প্রায় নষ্ট হয়। ৪-৫ দিনেই ডিম ফুটিয়া উঠে। এতদ্দেশে পুকুরে প্রায় রোহিত মৎস্যের পোনা হইতে দেখা যায় না। কিন্তু বোধ হয় হিংস্রক মৎস্যের প্রাচুর্য্যের জন্য রোহিত মৎস্য হয়ত ডিম্ব না প্রসব করিতে পারে। যদি ইউরোপ এবং আমেরিকার ন্যায় ডিম্ব প্রসবের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত মৎস্য গুলিকে স্বতন্ত্র রাখা যায় এবং ঠিক ডিম্ব প্রসবের প্রাক্কালেই স্ত্রী ও পুং মৎস্যকে একত্রিত করা যায় তাহা হইলে পুকুরেই পোনা জন্মিতে পারে। যথেষ্ট উত্তম জল, কাদা অথবা দোঁয়াস মাটি থাকিলেই পুকুরে পোনা হইতে পারে। পোনা উৎপাদনের জন্য ১টি পোনা উৎপাদনের পুকুর, একটি পোনা পালন করিবার পুকুর ও একটি মজুত করিবার পুকুর আবশ্যক। এ সম্বন্ধে বিশেষ রূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক।

পত্রাদি।

শ্রীশশীভূষণ মজুমদার, হাজারিবাগ।

লতা কস্তুরী পাট। লতা কস্তুরী মশলা হিসাবে বিক্রয় হয়। কিন্তু সেরূপ বিশেষ কাটতি নাই। কস্তুরী বীজ সমিতি হইতে পাওয়া যাইতে পারে। বিঘা প্রতি দেড় হইতে দুই সের বীজ আবশ্যক হয়। চাষ ঢেঁড়সের ন্যায় এবং বীজ বপনও ঢেঁড়সের সময় করিতে হয়। সাধারণতঃ পাট যেরূপ ভিজাইয়া আঁশ বাহির করা হয় সেই উপায়ে কস্তুরী হইতে আঁশ বাহির করিতে পারা যায়।

কৃঃ সঃ।

শ্রীযুক্ত "কৃষক" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

১। চাউল ছাঁটা কল—যাহা অবিষ্কার হইয়াছে তাহার কত টাকা মূল্য এবং চাউল ছাঁটা কিরূপ হয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক কৃষক পত্রিকায় লিখিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

২। CAROLINA RICE.

Carolina rice—অর্থাৎ আমরা দেশী কথায় যাহাকে পাটনাই চাউল বলি ইহার আদি উৎপত্তির স্থান ভারতবর্ষ। সুদূর আমেরিকাবাসী সাগর পার হইয়া আসিয়া আমাদের দেশ হইতে বীজ ধান্য লইয়া গিয়া আজ তাহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ফসল লইয়া জগতের মধ্যে প্রচার করিতেছে।

যে ভাবে এবং যে উপায়ে আমাদের দেশে চাষ আবাদ হইতেছে তদ্ভিন্ন অপর উপায়ে উন্নতির আশা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না; পাবেই বা কেমন করিয়া। আমরা নিজ নিজ সাংসারীক ভাবনায় অস্থির; কেমন করিয়া সকল ভাবনা, চেষ্টা ত্যাগ করিয়া উন্নতির ভাবনা করি।

আমরা আমাদের চিরন্তন প্রথা অনুসারে চাষ করিতেছি এবং আমাদের ফসলও ক্রমশঃ কম ও হীন হইতেছে। কিন্তু আমেরিকাবাসী এই পাটনাই ধান্য আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়ে চাষ করিয়া উত্তম ফসল লাভ করিতেছে। আমরা

বিলাতের বাজারে হন্দর প্রতি ১২।১৩ শিলিং পাই কিন্তু উহারা ৩০।৩৫ শিলিং পায়। উভয় দেশের এক জাতীয় চাউলের কিরূপ প্রভেদ!

দক্ষিণ ভারতবর্ষে (Carolina rice) এই ধান্যের আবাদ করা হইয়াছিল। তাহাতে রীতমত পরিচর্য্যা হয় নাই তাহাতে ১৷৷০ গুণ ফসল হইয়াছিল এবং এদেশীয় অপেক্ষা উত্তম চাউল ও বিচালী হইয়াছিল ও অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল।

ইহার রীতিমত কৃষি প্রণালী কিরূপ এবং বীজ ধান্যাদির মূল্য কিরূপ ও কোথায় পাওয়া যায়, তাহা যদি কেহ অবগত থাকেন অনুগ্রহ করিয়া কৃষক পত্রিকায় লিখিয়া সাধারণের উপকার করেন তাহা হইলে সাধারণেরও মঙ্গল এবং দেশেরও মঙ্গল হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য।
ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা।

[চেতলায় এক প্রকার চাউল তৈয়ারি করা কল পাওয়া যায়। বড় কলের মূল্য ৬০৲ টাকা, ছোট কলের মূল্য ৪০৲ টাকা। "কৃষকের" নাম উল্লেখ করিয়া এস, পি, ঘটক, মেকানিক, চেতলা আলিপুর পোঃ আঃ, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে চাউল ছাঁটা কলের বিশেষ খবর জানিতে পারিবেন। কৃঃ সঃ।]

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

বঙ্গে তৈল শস্য।—১৯০৮-০৯। বিভিন্ন প্রকার তৈল শস্য প্রধানতঃ বিহার, ছোটনাগপুর এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে জন্মিয়া থাকে। পৌষ মাসের শেষ পর্য্যন্ত এবৎসর সবেমাত্র ১,৫৩৮,৩০০ একর পরিমাণ জমিতে তৈল শস্যের আবাদ হইয়াছে। ইহা হইতে অবশ্য তিল চাষের জমি বাদ দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর এমন সময় ইহার প্রায় দ্বিগুণ জমিতে তৈল শস্যের আবাদ হয়। সর্ব্বত্রই বৃষ্টির অভাবে তৈল শস্যের বুনানী সকল জমিতে হয় নাই। ক্ষেত্রস্থ শস্যেরও অনেক হানি হইতেছে। বর্দ্ধমান, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, পাটনা, দারবঙ্গ এবং পূর্ণিয়ার তৈল শস্যের অবস্থা খারাপ হইলেও অন্যান্য জেলায় মোটের উপর নিরাশজনক নহে।

বঙ্গদেশে গমের আবাদ।—১৯০৮-৯। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে বিহারে গমের আবাদ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। পৌষ মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ১,১৭৯,৮০০ একর পরিমাণ জমিতে গম বোনা হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর এমন সময় গম আবাদী জমির পরিমাণ ১,০০৩,১০০ একরের অধিক দেখা যায়। ধান চাষের সময় বৃষ্টির অভাবে অনেক জমিতে ধানের আবাদ হয় নাই সেই সকল জমিতে গম বোনা হইয়াছে, চম্পারণে বুনানী কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই। বিহার অঞ্চলে, সাহাবাদ, সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, মুঙ্গের, প্রভৃতি জেলায়, ভাগলপুরের চর জমিতে এবং সাঁওতাল পরগণায় স্থানে স্থানে গম চাষের অবস্থা ভাল। কিন্তু সর্ব্বত্রই বৃষ্টির অভাব অনুভূত হইতেছে। নদীয়া ও মুঙ্গেরে মন্দ নহে কিন্তু দারবঙ্গে, পূর্ণিয়ায়, হাজারিবাগ, গয়া ও সাঁওতাল পরগণায় স্থানে স্থানে গমের অবস্থা খারাপ বলিতে হইবে। গয়া ও মুঙ্গেরে আবার গমে পোকা লাগিয়াছে।

বঙ্গদেশে বিগত পৌষ মাস পর্য্যন্ত শস্যের অবস্থা।—গয়া, সাহাবাদ, দ্বারবঙ্গ, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া এবং পালামাউয়ে সামান্য এক পসলা বৃষ্টি ব্যতীত কোথায়ও বৃষ্টি হয় নাই।

হৈমন্তিক ধান্য ক্ষেত্র হইতে আহরণ করা হইয়া

গিয়াছে। ধান ঝাড়া মাড়া কার্য্য চলিতেছে। বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরে আখ মাড়া হইতেছে। রবি খন্দের বুনানী শেষ হইয়াছে। নবদ্বীপ, ভাগলপুর, সম্বলপুর, হাজারিবাগ এবং রাঁচিতে আশু জাতীয় তৈল শস্য ও কলাই আদির আহরণ আরম্ভ হইয়াছে।

সর্ব্বত্রই বৃষ্টির অভাব অনুভূত হইতেছে। এমন কি উত্তর বিহার, খুলনা এবং সাঁওতাল পরগণার জমিতে রসাভাবে ফসলের হানি হইতেছে। কপি, সালগম প্রভৃতি শীতকালের সব্জীর অবস্থা মন্দ নহে।

পাটনা ও ভাগলপুরে ফসলে পোকা লাগিয়া অনিষ্ট করিতেছে। পূর্ণিয়ায় গবাদির গলা ফুলা রোগ হইতেছে, এতদ্ব্যতীত বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, গয়া, নবদ্বীপ, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া, পুরী, পালামাউ এবং মানভূমে গবাদির অন্যান্য রোগও অল্প বিস্তর হইতেছে। সাঁওতাল পরগণায় স্থানে স্থানে পশু খাদ্যের অভাব হইয়াছে। অন্যত্র অভাব নাই। সাহাবাদ, দ্বারবঙ্গ, মজঃফরপুর এবং পূর্ণিয়ায় ইতিমধ্যেই পানীয় জলের অভাব হইয়াছে।

মোটা চাউলের দর কিছু কমিয়াছে, কিন্তু এখন খাদ্য শস্যের দর সর্ব্বত্র চড়া।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও উত্তর বিহারে চাষের অবস্থা আদৌ ভাল নহে। চাষীর অবস্থাও শোচনীয়। কটক, বালেশ্বর ও পুরীতে অদ্যাবধিও চাষীদিগকে সাহায্য করা হইতেছে এবং দ্বারবঙ্গে দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সাহায্যার্থ পুর্ত্তকার্য্য চলিতেছে।

বঙ্গে তিলের আবাদ।—১৯০৮-০৯। বর্ত্তমান বর্ষে ১৪৭,৭০০ একর পরিমাণ জমিতে তিলের আবাদ হইয়াছে। বিগত বর্ষ অপেক্ষা তিলের আবাদী জমির পরিমাণ কিঞ্চিৎ বাড়িলেও তিল চাষ অনেক কম হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ সাধারণতঃ প্রায় ২১৩,৩০০ একর জমিতে তিল চাষ হয়। পালামাউ এবং সম্বলপুরে বার আনা, সিংভূম এবং খুলনায় ষোল আনা, নবদ্বীপে তের আনা, মেদিনীপুরে দশ আনা, সাঁওতাল পরগণায় সাত আনা এবং যশোহরে ছয় আনা মাত্র ফসল হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মোটের উপর বিগত বর্ষ অপেক্ষা ফসল অধিক হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। এক একরে ৪½ মণ তিল জন্মিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইলে সমগ্র বঙ্গে ১৬,৮০০ টন তিল জন্মিয়াছে বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

বঙ্গে ভাদুই শস্য।—১৯০৮। বিগত বর্ষে ৯,০২৬,০০০ একর মাত্র জমিতে ভাদুই শস্যের আবাদ হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা ২২৫,০০০ একর কম জমিতে আবাদ হইয়াছিল। গড়পড়তা বার আনার কিছু উপর ফসলের আশা করা যায় এবং এই হিসাবে ২১,৯১৪,১০০ হন্দর আউস চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। তৎপূর্ব্ব বর্ষে ২৩,৪৫০,৫০০ হন্দর চাউল পাওয়া গিয়াছিল।

কালীগঞ্জ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বর্ত্তমান বর্ষে নারিকেল ও সুপারি ফসলের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। বিগত গ্রীষ্মকালে আদৌ বৃষ্টি না হওয়া এই অজন্মার কারণ বলিয়া বোধ হয়। অধিকন্তু কয় বৎসর হইতে সুপারি গাছ মারা যাইতেছে; প্রথমে গাছের মাথা সরু দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া ক্রমে পত্রপুঞ্জ বিশুষ্ক এবং সর্ব্ব শেষে অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া একেবারে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

এ বৎসর খেজুররস ও গুড়ের উৎপাদনের অবস্থা বেশ ভালই বোধ হইতেছে। খেজুর গুড়ের মূল্য ক্রমেই হ্রাস হইতেছে।

পূর্ব্বে এদেশে তাল গাছের বৃক্ষ স্বামীর বার্ষিক আয়ের কোন প্রকার সম্ভব ছিল না বলিলেই হয়। তেলো গাছে পাকা তাল, কচি তাল, শাঁস ও ভাল পত্র প্রভৃতি বিক্রয় লব্ধ অর্থে গৃহস্থের বার্ষিক যৎ-সামান্য কিঞ্চিৎ আয় হইত বটে কিন্তু তাহারও ক্রেতার একান্ত অভাব ছিল সুতরাং অন্য ফলকর বৃক্ষের হিসাবে উহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কড়ি, বরগা, লাঙ্গলের ঈশাদণ্ড প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য গাছ কাটিয়া কাষ্ঠ বিক্রয়ে যাহা কিছু লাভ হইত কিন্তু তাহাও বহু বৎসর সাপেক্ষ ছিল তালের অসার কাষ্ঠ কোন কার্য্যেরই নহে আবার অতিশয় পাকা গাছও কার্য্যের বিশিষ্ট উপযোগী নহে, সুতরাং তাল বৃক্ষ রোপণে বৃক্ষ স্বামীর লাভের অংশ সামান্যই ছিল কিন্তু অতীত কয় বৎসর হইতে ক্রমে উহার উৎপন্ন রসে বার্ষিক একটা আয়ের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ কএক জন পার্শি আসিয়া তালের রসে তাড়ি প্রস্তত বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছিল তৎপরে অনেক ক্লষক ও রস উৎপাদনের সন্ধান অবগত হইয়া ঐ রস দ্বারা গুড় পাটালী চিনি ও মিছরি প্রস্তত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যদিও এদেশোৎপন্ন তালের চিনি ও মিছরি অদ্যাপি আমাদিগের হস্তগত হওয়ার সুবিধা ঘটে নাই সত্য বটে, কিন্তু গুড় ও পাটালী যাহার আমরা আস্বাদন লইয়াছি তাহা অতি উপাদেয় ও খেজুর বা ইক্ষু গুড় অপেক্ষা কোন অংশে নিক্লষ্ট নহে বলিয়াই বুঝিয়াছি। তালের গুড় ক্লষকগণ কলসি ও ভাঁড় পূর্ণ করিয়া (খেজুর ও ইক্ষু গুড়ের ন্যায়) সঞ্চয় করিয়া বর্ষাকালের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে (ইহাও আমরা অবগত হইয়াছি)। ঐ গুড় অন্যান্য গুড়ের ন্যায় বহুদিন ব্যবহারোপযোগী উত্তম অবস্থায় থাকে; কিছু মাত্র দুর্গন্ধ, বিক্লত বা পচিয়া যায় না।

পার্শিগণ যে তাড়ি কাটিতেছে তাহাতে গভর্ণমেণ্টের আবগারী বিভাগের কিছু আয় বৃদ্ধিও হইয়াছে কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, দুই একটি দেউনিয়া আইনের কবলে পতোনোন্মুখ, অর্থ-ক্লচ্ছ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ভদ্র সন্তান ব্যতীত এদেশের ক্লষকগণ অদ্যাপি তাড়ির সুবিমল চিত্তোন্মাদক মিষ্ট আস্বাদ প্রাপ্ত হয় নাই বা তাহারা ঐরূপ আস্বাদ গ্রহণে এক্ষণে প্রস্তুতও নহে। বেহার-বাসী যে বহুল সঙ্খ্যায় নৌকার নাবিকবৃন্দ এদেশে নৌ-চালনা কার্য্যে নিযুক্ত আছে কেবল মাত্র তাহারাই সুমধুর ও সুগন্ধ (!) তাড়ি পান করিয়া সময় সময় নৃত্য গীতাদি কলা প্রদর্শন ও আনন্দ উপভোগ করে মাত্র।

এস্থলে খুলনার কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকটও আমাদিগের একটু অনুরোধ আছে এই যে, যে সকল পার্শিকে তাড়ি বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রদান করা হয় তাহারা যাহাতে হাটের ও বাজারের মধ্যে বহু জনতাপূর্ণ স্থানে দোকান না খুলিয়া একটু আশে পাশে লোকের চক্ষুর অন্তরালে দোকান খুলিয়া ঐ সকল মাদক দ্রব্য বিক্রয় করে তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা হয়; তদ্ভিন্ন সাধারণ ভদ্রাভদ্র লোকের বিশেষতঃ পথবাহী নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের পক্ষে একটু অসুবিধা ঘটে।

বর্ত্তমান বর্ষে ধান্য ছেদন শেষ হইয়া গিয়াছে। কার্ত্তিক মাসে ও আশ্বিন মাসের শেষার্দ্ধ সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় অনেক ধান্যে শস্য না হইয়া চিটা ভূষি হইয়া গিয়াছে ক্লষক ও তাহাতে ভূম্যধিকারীবর্গকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে সকল বিলে ধান্য জন্মিয়াছে তথায় বার আনা রকম ফসল হইয়াছে বলিয়া আশা করা যায়, কিন্তু কোন কোন বিলের ভূমি একেবারে বিশকে বিল পতিত হইয়া তাহাতে তৃণ পর্য্যন্তও অঙ্কুরিত

হয় নাই। ধান্তের বাজার দর এক্ষণে পাঁচ সের, পালির মাপে এক পালি ধান্ত আশি সিক্কা ওজনের সাড়ে তিন সের ধান্ত হয়।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সার-সংগ্রহ।

জলোত্তলন যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে জলসেচন।

আমেরিকায় যুক্তরাজ্যে জমিতে জল সেচনের জন্য এক একটী কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা নির্দ্দিষ্ট হারে কর লইয়া চাষীর ক্ষেতে ক্ষেতে জল সেচনের বন্দোবস্ত করে। জল যত নিম্ন হইতে উঠাইবার আবশুক হয় তদনুপাতে করেরও তারতম্য হয়। লুসিয়ানায় ২০ ফিট নিচে জল আছে; সেখানে একর প্রতি করের পরিমাণ ২৪৸৵০ আনা, আরকানসাসে ৪০ ফিট নিচে জল, তথায় করের পরিমাণ ৩৬।০ আনা। তাহারা আপনাদের ইচ্ছা মত ও সুবিধামত চাষের ক্ষেত্রে জল সেচন করেন। তাঁহাদের উপর চাষীদের কোন জোর নাই। কোন চাষীকে জলের অপব্যবহার করিতে দেখিলে তাঁহারা তাহাকে জল দেওয়া বন্ধ করিতে পারেন এবং জল দেওয়া বন্ধ করিলেও চাষী কর প্রদানে মুক্তি পাইবেন না। ভারতবর্ষে এতদুর বাঁধাবাঁধি নিয়ম চলিবে না। সেখানে কি প্রকার উপায়ে জল উত্তোলন করা হয় তাহা কিন্তু দেখা উচিত। কম খরচে এখানেও তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। মান্দ্রাজে কোথাও কোথাও যন্ত্র সাহায্যে জল উঠাইয়া ক্ষেতে দেওয়া হইতেছে। আমাদের এই দরিদ্র দেশে খরচের দিকে প্রধান লক্ষ্য থাকা আবশুক। বঙ্গদেশে জল অধিক নিম্ন হইতে উঠাইতে হয় না সুতরাং এখানে অধিকাংশ স্থানে সিউনি, দোন দ্বারা কাজ চলিতে পারে। যদি তাহা অপেক্ষা সহজ, সুলভ উপায় থাকে তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।

ভুট্টার ডাঁটা হইতে আমেরিকায় উৎকৃষ্ট কাগজ তৈয়ার হইতেছে! কাঠের মণ্ড তৈয়ার করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয় ইহাতে তাহার অর্দ্ধেক খরচ পড়ে।

মার্কিনে যেরূপ প্রণালীতে তামাক প্রস্তুত হয়, কুচবিহার রাজ্যে সেইরূপ প্রণালীতে তামাক তৈয়ার হইতেছে। ইহাতে বেশ লাভ হইতেছে। গত বৎসর তথায় যে সকল তামাক ঐরূপে তৈয়ার করা হইয়াছিল, তাহা সাধারণ তামাক অপেক্ষা মণ করা পাঁচ টাকা অধিক দরে বিক্রয় হইয়াছে। এই জন্য তথায় তামাকের আবাদ বৃদ্ধি হইতেছে।

পাঠকেরা অবগত আছেন যে হিমালয় পর্ব্বতের পাইন জাতীয় দেবদারু গাছ (Pinus longifolia) হইতে নির্য্যাস বাহির করিয়া তার্পিণ তৈল, ধুনা ও রজন প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাইন গাছ হইতে এই রূপ রস বাহির করাতে গাছের কোন ক্ষতি হয় কি না, কয়েক বৎসর ধরিয়া শিবপুর কলেজে ইহার পরীক্ষা হইতেছিল। পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহাতে গাছ দুর্ব্বল হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত যথেষ্ট শক্ত ও সবল হয় ও উহার কাঠে কোন দোষ ঘটে না। আমেরিকাতেও ঐ রূপ

পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তাহারও ফল ভারতের ন্যায় সন্তোষজনক।

ব্রহ্মদেশে মটর ও সীম।—ব্রহ্মদেশে প্রায় ২৬ প্রকার মটর ও সীম জন্মিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সাধারণ মটর, ছোলা (Chicken pea) পায়রা মটর ও মুগ, মাশকলাই এবং সয় সীম (Soy bean), মাখম সীম, কিড্‌নী সীম (Phaseolus Vulgaris) এই গুলিই প্রধান। Sunn-hemp (Crotolaria juncia) ইহা এক প্রকার শুঁটীধারী সীম। ব্রহ্মে ইহার চাষ প্রচুর হইয়া থাকে। ইহার আঁশে তথায় মাছ ধরিবার জাল তৈয়ারি হয়।

ভারতবর্ষের খনিজ সম্পত্তি।

	১৯০৪	১৯০৭
সুবর্ণ—	৩½ কোটি টাকা—	প্রায় ৩ কোটি টাকা
কয়লা—	২ ,,	৩ ,,
পেট্রোলিয়ম	৭০ লক্ষ—	প্রায় ৯১ লক্ষ
লবণ—	,, ৬৫ ,,	,, ৬৪ ,,
সোরা—	,, ৩১ ,,	,, ৪১ ,,
ব্যবহার্য্য ম্যাঙ্গানিস বা Manganese Ore	১২½ লক্ষ—	প্রায় ৯০ লক্ষ
অভ্র Mica ,,	১২ ,,	,, ৩৩½ ,,
চুণী মণি জহরৎ	১৩½ ,,	,, ১৫ ,,
Jade Stone	৬½ ,,	,, ৭½ ,,
গ্রাফাইট—বা কৃষ্ণসীস	২½ ,,	,, ১ ,,
লৌহ Iron Ores ,,	১½ ,,	,, ২ ,,
রঙ্গ বা Tin Ores	সওয়ালক্ষ—	পউনে দুই লক্ষ
ক্রোমাইট (Cromite)	৬২ হাজার—	দেড় লক্ষ
হীরক—	,, ৪০ হাজার—	৪২ হাজার
ম্যাগ্নেসাইট— (Magnesite)	৫½ হাজার—	৭½ হাজার
রজন (Amber)	১২½ হাজার—	৬ হাজার
মোট টাকা—	প্রায় ৮ কোটি—	প্রায় ১০ কোটি।

উপরের তালিকা হইতে বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে গত তিন বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর মোটের উপর যথেষ্ট অধিক টাকার খনিজ দ্রব্য উৎখাত ও বাজারে ব্যবসায়ের জন্য আনীত ও বিক্রীত হইয়াছে। সমস্ত প্রকার খনিজের মধ্যে কয়লা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

স্বর্ণ, হীরক, কৃষ্ণসীস, রজন, রাং, অভ্র প্রভৃতি জিনিষের মূল্য, ১৯০৪।৫।৬ সাল অপেক্ষা অবশ্য কম হইয়া গিয়াছে। এখন ভারতবর্ষের কয়লা ও ম্যাঙ্গানিস ও লৌহের আদর খুব বেশী ও লোকের মনও সেই দিকে বেশী আকৃষ্ট, সেই জন্য সুবর্ণ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য খনি হইতে কম বাহির করা হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

পূর্ব্ববঙ্গ শিল্পোন্নতি প্রয়াস।—পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বর্ত্তমান শিল্পের তথ্যানুসন্ধান জন্য গভর্ণমেণ্ট মিঃ জি, এন, গুপ্তকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মিঃ গুপ্ত সবিশেষ অনুসন্ধানের পর যে বিবরণী দাখিল করিয়াছেন এতদিনে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্ট আগামী ২৫এ ফেব্রুয়ারী ঢাকাতে এক শিল্প সভা আহ্বান করিবেন।

অন্নকষ্ট।—রঙ্গপুরের কতক স্থানে এবং দিনাজপুর, মালদহ জেলাতে ও বগুড়া প্রভৃতিতে ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, মালদহ চাঁচলের সদাশয় ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রাজা শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় স্বীয় অন্নক্লিষ্ট প্রজাদিগকে প্রতিমাসে ৪৫ শত টাকার চাউল দান করিতেছেন। অর্থের সদ্ব্যবহার এইরূপেই করিতে হয়। দ্বারবঙ্গের মহারাজা অন্নক্লিষ্ট প্রজাপুঞ্জের সাহায্য জন্য ৯ লক্ষ টাকা দান ও তাগাবি মঞ্জুর করিয়াছেন।

কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী।—১৯০৮।—বিগত বর্ষে বঙ্গদেশের নানা স্থানে শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। নিম্নে তন্মধ্যে কতিপয় বিশেষ প্রদর্শনীর বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

সুরী প্রদর্শনী।—কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে এখানে তুলা, পাট, মধ্য প্রদেশের সরু আউস ধান, সমুদ্রবালি ধান্য, কাসাভা, আলু, তামাক ও কপি সালগম প্রভৃতি শীতকালের সব্জী প্রদর্শিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এই সমস্ত দ্রব্য ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত জল সেচনের দোন ও রেশম, তসর, তুলা জাত দ্রব্য, গালার খেলনা প্রভৃতি দেখান হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীতে গভর্ণমেণ্ট হইতে ৩০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল।

ভিটা মেলা।—১লা মার্চ্চে এই মেলা বসিয়াছিল। এখানে গবাদি জন্তু প্রদর্শিত হইয়াছিল। পশ্বাদির সংখ্যা ১২৮টী। উপযুক্ত প্রদর্শদিগকে সর্ব্বসমেত ২৯৭৲ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল। এক জোড়া ভাল বলদ প্রদর্শনের জন্য একজনকে একটী স্বর্ণ পদক প্রদান করা হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুতের জন্য এক ব্যক্তি একটী রৌপ্য পদক, একটি উত্তম কাষ্ঠের কাজের জন্য অন্য এক ব্যক্তি আর একটী রৌপ্য পদক পাইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট ১৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

বহরমপুর কৃষি মেলা।—এখানে উৎকৃষ্ট হলবাহী বলদ ও গাভী প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং প্রদর্শকগণ উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছিল। ২৯শে ফেব্রুয়ারি এই মেলা খোলা হয়।

বাগডোগরা মেলা।—এই মেলায় প্রায় ১,০১৩ গবাদি পশু প্রদর্শিত হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৫৲ টাকা মাত্র পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট ১৫০৲ টাকা দান করেন।

কুষ্টিয়া কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী।—অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যাদির সঙ্গে মেষ্টন লাঙ্গলের ব্যবহার কৃষক দেখাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বারাসাত প্রদর্শনী।—এখানে এবার প্রদর্শনী ভাল হয় নাই, বৃষ্টির অভাব হেতু স্থানীয় কোন কৃষিজাত দ্রব্য প্রদর্শনের সুবিধা হয় নাই। এখানে কেবল বারাসাত সব ডিভিসনেরই দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে সন্নিহিত দূরতর স্থান হইতেও দ্রব্যাদি লওয়া হইবে।

দুমকা মেলা।—এখনে ১৮ বৎসর ধরিয়া মেলা বসিতেছে। সাঁওতালেরা ক্রমে মেলার মর্ম্ম বুঝিতেছে এবং তাহারা বিগত মেলায় কতিপয় রকম সরু চাউল এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় ভুট্টা উপস্থিত

করিয়াছিল। এই প্রকারের ভুট্টা বা ধানের চাষ ইতিপূর্ব্বে এখানে হইত না। কয়েক জাতীয় বুড়ি কাপাসও প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং দেখিলে বোধ হয় যে আখ চাষেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। সুন্দর গবাদি পশু ও হাঁস, মোরগাদি গৃহপালিত পক্ষী আসিয়াছিল। উপযুক্ত ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট এই মেলায় ১০০৲ টাকা দান করেন।

হুগলী প্রদর্শনী।—এখানে কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও কৃষি যন্ত্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে আসিয়াছিল, কিন্তু প্রদর্শনীর বিশেষত্ব অনেক সুনিপুণ তাঁতিকুলের সমাবেশে। সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ তাঁতিকে একটী স্বর্ণ পদক প্রদান করা হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট হইতে ২৫০৲ টাকা সাহায্য করা হইয়াছে।

সিতামারি মেলা।—১০ই হইতে ১৯শে পর্য্যন্ত এই মেলা ছিল। নানা প্রকার গৃহপালিত পশু প্রদর্শনের জন্য এই মেলা বিখ্যাত। বিগত মেলায় ৪০,০০০ পশু আসিয়াছিল, তন্মধ্যে ২২০ জন পারিতোষিক পাইয়াছেন।

খরসিয়ং প্রদর্শনী।—১৯০৮, ২৬শে ফেব্রুয়ারি এই মেলা বসিয়া ছয় দিন ছিল। ঘোড়া, টাটু, গবাদি পশু, গৃহপালিত পক্ষী, সব্জী ও ফুল এবং ফল প্রদর্শিত হইয়াছিল। এখানকার পার্ব্বতীয় লোকেরা মেলার মর্ম্ম তত বুঝে না, তথাপি এখানে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি অতি সুন্দর ছিল। গভর্ণমেণ্ট এই মেলায় ২০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

সম্বলপুর কৃষি-শিল্প মেলা।—১১ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এই মেলা ছিল। কৃষি-শিল্প জাত বহুতর দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। এখানে আগে আলু চাষ হইত না। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে আলু চাষ প্রবর্ত্তিত হয়, এক্ষনে অনেকে আলু প্রদর্শন করিয়া পারিতোষিক পাইতেছে। মেলায় সুন্দর তসর কাপড় আসিয়াছিল। সুপরিষ্কৃত গুড় দেখাইয়া এক ব্যক্তি পুরস্কার পাইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট ৩০০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

খুলনা মেলা।—প্রদর্শিত দ্রব্যের মধ্যে শ্যামসাড়া ইক্ষু বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং আলু ও তুলা দেখিয়া বোধ হয় যে এখানকার মাটি এই সকল ফসলের বিশেষ উপযুক্ত। অর্থ পুরস্কার ব্যতীত ২৪টী রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট ৫০০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

বিহার কৃষি-শিল্প-প্রদর্শিনী।—২২শে ফেব্রুয়ারি বাঁকিপুরে এই মেলা বসে। এই মেলার সঙ্গে একটী পুষ্প মেলা হইয়াছিল। রামকোলা চিনির কারখানা হইতে অতি বৃহৎ মরিসস্ জাতীয় ইক্ষু আসিয়াছিল। ব্রহ্ম দেশের ধান ভানা কল ও অনেকে আগ্রহ করিয়া দেখিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট এই প্রদর্শনীর জন্য ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার অর্থ সাহায্য ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট প্রায় সকল মেলায় কৃষি বিভাগ হইতে কৃষিকার্য্যাভিজ্ঞ কর্ম্মচারী পাঠাইয়া উপস্থিত কৃষকদিগকে কৃষি যন্ত্রের ও সারের ব্যবহার প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় কৃষি কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। কোন স্থলে ডেঃ ডাইরেক্টর, মিঃ স্মিথ, স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ কৃষি শিল্প প্রদর্শনী।—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও ময়মনসিংহ নগরে কৃষি শিল্প জাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে।

দেশের কল্যাণকামী অনুষ্ঠাতৃবর্গের এ উদ্যম প্রশংসনীয়। রামগোপালপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজা যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুরের কৃতবিদ্য পুত্র কুমার নগেন্দ্র কিশোরকে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমরা বড়ই আশ্বাসিত হইয়াছি। তাঁহার কৃষি-ক্ষেত্র জাত কপি, শালগম, মূলা, বেগুন, আলু, ইক্ষু, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি যে যে দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, সকলগুলিই শ্রেষ্ঠ স্থানীয় হইয়াছে। সহজ প্রাপ্য লতা গুল্মাদি হইতে ২০ প্রকার তন্তু প্রদর্শিত হইয়াছিল। দেশের ধন বৃদ্ধির জন্য কুমার নগেন্দ্র কিশোরের এই অভিনব অনুরাগ সাধারণ গৌরবের বিষয় নহে। এই পাটের জন্য এবং কৃষির উৎকর্ষের জন্য প্রদর্শনী হইতে কুমার বাহাদুরকে একটী স্বর্ণ মেডেল প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য জমিদারগণ কুমার নগেন্দ্র কিশোরের পথানুসরণ করিয়া দেশের ধন বৃদ্ধির সহায় হইবেন, এ আশা দুরাশা নহে।

অন্নরক্ষিণী সভা।—বর্ত্তমান অন্নকষ্টে সকলকেই যে অল্প-বিস্তর ক্লিষ্ট হইতে হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। বিগত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে অনেকেরই আয় যে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বৃদ্ধি পায় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ; অথচ, খাদ্য-শস্যের মূল্য দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায়, সকলকেই সে অসুবিধা হাড়েহাড়ে ভোগ করিতে হইতেছে,—ইহা সুনিশ্চিত। পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বের কথা কহিতে গেলে তো চক্ষু স্থির হইতে হয়। দুই বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সর্ব্ববিধ খাদ্য-শস্যের মূল্যই শনৈঃশনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দের এবং ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দের দুই বৎসরের হিসাব নিম্নে দেখান যাইতেছে। তাহাতেই বুঝা যাইবে, দিন দিনই অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

	১৯০৫-৬ মূল্য।	১৯০৭-৮ মূল্য।
মোটা চাউল	৩৶/১০	৫।৶০
ময়দা	৩৶৮	৪।৶৮
গম	২৸৶৬	৩।।৶৬
ভুট্টা	২।।/১০	৩।।১০

এক বৎসরের হিসাবেই প্রতিপন্ন হয়—শস্যাদির মূল্য দেড় গুণ বৃদ্ধি। কেবল শস্য বলিয়া নহে; গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য প্রায় সকল সামগ্রীরই মূল্য এইরূপ বাড়িয়া গিয়াছে।

যাহা স্বতঃসিদ্ধ, যাহা সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত সে বিষয় আর অধিক আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এখন আলোচনার আবশ্যক,—কি উপায়ে এই অন্নকষ্ট দূরীভূত হইতে পারে। কি রাজা, কি প্রজা, কি গভর্ণমেণ্ট, কি জন-সাধারণ,—সকলেরই এখন এতৎপ্রতি মনঃসংযোগ আবশ্যক। দু'এক কথায় বা কোন একটী উপায় নির্দ্ধারণে দেশের এই দারুণ অন্নকষ্ট যে দূর হইতে পারে, তাহা অবশ্য আমরা কখনই মনে করি না। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জলবায়ু ও রীতি প্রকৃতি। সে হিসাবে অন্নকষ্ট নিবারণের পক্ষেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিধি-ব্যবস্থা সঙ্গত। অন্নরক্ষিণী সভা অল্প দিনে মোটামুটি কয়েকটি তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গভর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিয়াছেন। সভা হইতে ঐ সম্বন্ধে আরও নানা তত্ত্ব সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। অন্নরক্ষিণী সভার মোটামুটি সিদ্ধান্ত এই যে,—(১) দেশের আবশ্যকোপযোগী শস্য দেশে সঞ্চিত রাখিয়া, পরে উদ্‌বৃত্ত শস্য বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা, (২) আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, এবং বাঁধ বাঁধিয়া খাল কাটিয়া বা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া অনুর্ব্বর জমির উর্ব্বরতা-সম্পাদন, (৩) নূতন নূতন পদ্ধতিতে নূতন নূতন খাদ্য-দ্রব্যের চাষ-আবাদের অনুষ্ঠান

ইত্যাদি। আলোচনার এইরূপ আরও নানা কথা আছে। তাহার এক একটী বিষয়েই এক একটী প্রবন্ধ প্রকটনের আবশ্যক হয়। ফলতঃ এখন অন্ন-সমস্যার প্রতি সকলেরই মনোনিবেশ করা প্রয়োজন হইয়াছে। এখন সকলের দেখা উচিত,—কি উপায়ে দেশের এই কষ্ট দূরীভূত হইতে পারে। —বঙ্গবাসী।

বিদেশী চিনি।—বিদেশী চিনির আমদানি এ দেশে হু হু বাড়িয়া যাইতেছে। গত নয় মাসে যবদ্বীপ হইতে এদেশে বাহাত্তর লক্ষ মণের উপর, আর মরিসস হইতে চব্বিশ লক্ষ মণের উপর এবং অষ্ট্রীয়া হঙ্গেরি হইতে চুরানব্বই লক্ষ মণের উপর অর্থাৎ প্রায় মোটে এককোটী বার লক্ষ মণ চিনি এদেশে আসিয়াছে।

দানাপুরে ছুতরের কার্য্য।—কাষ্ঠের গড়ন দানাপুরে অন্য স্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে এবং ঐ সকল আসবাব পত্রের দরও সস্তা। কিন্তু সেগুলি কলিকাতায় কাষ্ঠের কার্য্যের মতন সুগঠিত বা সুন্দর হয় না। বেহারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছুতরের কার্য্য শিখিবার একটী শ্রেণী আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সূত্রধরের কার্য্যে সুনিপুণ কোন ছাত্রের নাম শুনা যায় না, বা তথাকার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অদ্যাবধি কোন ছাত্র সূত্রধরের কারখানা খুলে নাই।

পাটনার দরি বা সূতী গালিচা।—পাটনা সহরে, ওব্রা ও সসারামে গালিচা প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারি হইয়া থাকে। কমিং সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ যে সেনামিয়া নামক জনৈক তাঁতি বিশ বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ কাপড় বোনা তাঁতে গালিচা বুনিবার কল্পনা করে। তাহার কল্পনা কাজে লাগিয়াছে এবং ঐ প্রকারে বহু সূতী গালিচা তৈয়ারি হইতেছে। ইহাতে একটা উপকার হইলেও অন্য দিকে দেখা যায় যে পূর্ব্বের মত ভাল গালিচা আর এখানে তৈয়ারি হয় না। পাটনা এককালে গালিচা দুলিচার জন্য বিখ্যাত ছিল। পশমী গালিচা ও আসন যথেষ্ট তৈয়ারি হইত।

বাঙ্গালী ভূ-প্রদক্ষিণকারীর স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন।—শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঘোষ সমগ্র ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক জাপান হইয়া ভারত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কলিকাতার শিল্প বিজ্ঞান-সমিতির বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তিনি ফলিত রসায়ণ (Applied chemistry) অধ্যয়নার্থ তিন বৎসরের জন্য লণ্ডনে ও আমেরিকায় গমন করেন, এবং ধনে, জনে, বাণিজ্য সম্পদে অতুলনীয়, পৃথিবীর অদ্বিতীয় কেন্দ্রস্থল, মহানগরী নিউইয়র্কে (New-York) অবস্থান পূর্ব্বক সুবিখ্যাত প্র্যাট (Pratt) কলেজে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন এবং পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক উত্তীর্ণ হন। অধ্যাপক প্রবর ডাক্তার রজার্স (Dr. Rogers Ph. D.) ইহার রাসায়নিক গবেষণায় মুগ্ধ হইয়া অনতিবিলম্বে ইহাকে আমেরিকান রাসায়নিক সমিতির (American Chemical Society) সভ্য শ্রেণীভূত করেন। আমেরিকান যাবতীয় শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা এই সমিতি গঠিত। ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মিঃ ঘোষই এই সম্মান লাভে সমর্থ হইলেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে ইনি তত্রত্য প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক যন্ত্রাগার ও ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং কতিপয় ফ্যাক্টরীর রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত হন। সম্প্রতি তিনি "Chemical Techno-

ogy of Oils, Fats and Manufactured Products" নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। এই পুস্তক নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানীয় সংবাদপত্র ও অধ্যাপকগণ পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই বহুসংখ্যক পুস্তক বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। বিক্রয়-লব্ধ-অর্থ মিঃ ঘোষের ভ্রমণ ব্যয় ও বিদেশবাসের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। তিনি আরও দুই তিনখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন; শীঘ্রই তাহা প্রকাশিত হইবে।

তাড়িত প্রভাবে ধনরক্ষা।—পৃথিবীর ধনাগার গুলির (Treasury Building) মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ওয়াসিংটন নগরের ধনাগারটী সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই ধনাগারে বিভিন্ন মুদ্রা ও নোট প্রভৃতিতে সর্ব্বদাই অর্ব্বুদ মুদ্রা মজুত থাকে। মার্কিণ-গভর্ণমেণ্ট এই ধনাগার রক্ষার জন্য তিনটী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (১) সশস্ত্র সুদক্ষ প্রহরীবর্গ, (২) টাইম লক্‌স এবং (৩) বৈদ্যুতিক এলারম্।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

ফাল্গুন মাস।

সব্জী বাগান।—তরমুজ, খরমুজ, শসা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যে সকল দেশী সব্জী চাষ মাঘ মাসে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। সব্জী ক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাঁপা নটে বীজ এই সময় বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া যায়।

কৃষি-ক্ষেত্র।—ছোলা, মটর, যব, শরিষা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এতদিনে ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এই সময় ক্ষেত্র সকল চষিয়া ভবিষ্যতে পাট, ধান প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফল বৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কার্য্য নাই।

ফুলের বাগান।—এখন বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছ গুলির তদ্বির না করিলে জলদি ফুল ফুটিবে না। জলদি ফুল না ফুটিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

এই সময় টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মূলজ ফুল ও বাহার গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ করিবার ইচ্ছা থাকিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা পড়িয়া সঞ্চিত হইয়া আছে, সেই পাতায় এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁশের গোড়ায় সারের কার্য্য করে, এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক সেইখানে এই প্রকার বহুদূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

[redacted]

কৃষক।



কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

নবম খণ্ড,—১১শ সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,

সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

ফাল্গুন, ১৩১৫।

মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত;

১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।



কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

কৃষক।

৯ম খণ্ড। ফাল্গুন, ১৩১৫ সাল। ১১শ সংখ্যা।

গোরুর আবাস গৃহ বা গোয়াল ঘর।

বাটীর সন্নিকটে উন্নত ভূমিতে এরূপ ভাবে গোয়াল ঘর তৈয়ার করিবে যাহাতে গো-গৃহে রৌদ্র ঢুকিতে পারে, বাতাস চলাচল করিতে পারে এবং গোরুর সেবা শুশ্রূষা সুচারুরূপে চলিতে পারে। আটাল মাটি দিয়া বেশ করিয়া পিটিয়া মেঝে তৈয়ার করিবে; কিঞ্চিৎ ঢালু করিয়া এরূপ ভাবে মেঝে তৈয়ার করিবে যাহাতে মূত্রাদি অনায়াসে নির্গত হইতে পারে। অত্যধিক ঢালু করিয়া মেঝে তৈয়ার করিলে গর্ভিণী গাভীর গর্ভপাত হইতে পারে। গোয়াল ঘরের এক দিক খোলা রাখিয়া তিন দিকে বেড়া দিতে হইবে। আড়া আড়ি করিয়া জানালাগুলি এরূপ ভাবে তৈয়ার করিবে যাহাতে গোরুর গায়ে অনবরত বাতাস লাগিতে না পারে। মেঝে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে; স্যাঁতস্যাঁতে হইলে মেঝেয় ছাই ইত্যাদি ছড়াইয়া দিবে। দিনের বেলায় গোরুগুলিকে স্থানান্তরে রাখিয়া খাওয়াইবে। কর্দ্দমাক্ত স্থানে গোরুকে শোয়াইলে জ্বর, সর্দ্দি, কাশি ইত্যাদি ব্যারাম হইতে পারে। তজ্জন্য শুষ্ক খড় কুটা ইত্যাদি পাতিয়া গোরুকে বিছনা করিয়া দিবে। প্রত্যহ খড় কুটা রৌদ্রে শুকাইবে; মল মূত্রের সহিত মিশ্রিত অব্যবহার্য্য খড় কুটা সারের গর্ত্তে ফেলিবে। এক গোয়ালে ষাঁড় ও গাভী রাখিবে না; কিন্তু গাভী ও বলদদিগকে তফাৎ তফাৎ করিয়া, পৃথক পৃথক গোঁজে এক ঘরে বান্ধিয়া রাখিতে পারা যায়। গোয়ালের এক দিকে একটী স্বতন্ত্র খোঁয়াড়ে বাছুর গুলিকে রাখিবে। মেঝের কোন স্থান নীচু হইলে ঐ স্থানে মাটী পিটিয়া দিবে। মাছির উপদ্রব হইলে গোয়ালে ধোঁয়া দিবে। ঢিপির উপরে মাটীর অথবা কাঠের ডাবায় জাব দিবে। প্রত্যহ ডাবাটী পরিষ্কার করিবে। চাটিবার জন্য ডাবায় লবণ রাখিবে। গোময় ও গোমূত্র হইতে উৎকৃষ্ট সার তৈয়ার হয়। গোয়াল ঘরের পশ্চাতে এরূপ ভাবে একটী ছোট নালা কাটিয়া দিবে যাহা বহিয়া অনায়াসে মূত্রাদি বাহিরে যাইতে পারে এবং যে স্থানে গোময় ও মূত্রাদি রাখিবে ঐ স্থানে একটী বড় গর্ত্ত খনন করিয়া দিবে। ঐ গর্ত্তে গোময় ও গোয়াল কাড়িয়া বিচালী ও খড় কুটা ইত্যাদি ঢালিবে। সার তৈয়ার করিবার প্রয়োজন না থাকিলে নালা এরূপ ভাবে কাটিয়া দিবে যাহা বহিয়া গোমূত্র বাটী হইতে দূরে গিয়া পড়িতে পারে। উত্তর কিম্বা পূর্ব্ব মুখ করিয়া গোয়াল ঘর বাঁধিবে।

গো-চারণোপযোগী মাঠের অভাবে ক্রমশঃই যে গোরুর অবনতি ঘটিতেছে তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইবে। এস্থলে গো-চারণ স্থাপন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। মাঠটী এত বড় হওয়া আবশ্যক যাহাতে স্থানীয় গোরুগুলির তিন গুণ এক সময়ে চরিয়া খাইতে পারে। উক্ত জমিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ রাখালদের খেলিবার ও বেড়াইবার জন্য, দ্বিতীয় ভাগ পতিত ঘাস ভাল হইয়া জন্মাইবার জন্য ও তৃতীয় ভাগ গোরুগুলির চরিয়া খাইবার জন্য রাখিতে হইবে। গোরুগুলি তৃতীয় ভাগ হইতে দ্বিতীয় ভাগে চরিতে গেলে রাখালেরা তৃতীয় ভাগে আসিবে ও প্রথমটী পতিত থাকিবে। পরিমাণে অনেক ও সুস্বাদু ভাল ঘাস জন্মাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে চাষ দেওয়াইতে হইবে এবং সার প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইবে। গো-চারণ ভূমিতে জলাশয় খনন করিয়া দিতে পারিলে অনেক ভাল হয়। রৌদ্রের সময় গাছের ছায়াতে যাহাতে গোরুগুলি থাকিতে পারে তাহার ও বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। জলাশয়ের এক পাড় এরূপ ঢালু হওয়া চাই যাহাতে গোরু নামিয়া আপন ইচ্ছামত জল পান করিতে পারে। উৎকৃষ্ট চারণ ভূমিতে চারণ করিয়া গোরুগুলি হৃষ্টপুষ্ট, সুস্থ সবলকায়, উচ্চ দেহ বিশিষ্ট ও নীরোগী হয় এবং গাভীগুলি পরিমাণে অধিক সুমিষ্ট দুধ দেয়। আমাদের দেশে নিম্নলিখিত ঘাস গুলি বেশ জন্মায়। দুর্ব্বা, অঞ্জন, মাকর, গন্ধি, দোবরা ও গিনি ঘাস ইত্যাদি।

প্রসবের অর্দ্ধ ঘন্টা পরে বাছুর নিজে উঠিতে পারে এবং দুধ খাইতে পারে। দুধ খাইয়া মাতার নিকট শুইয়া তাহার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। প্রসবের পরে বাছুরের নাড়ি কাটিয়া দিবে এবং যে স্থানে কাটিবে, তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে ২টী বন্ধনী দিয়া বান্ধিয়া দিয়া বাঁশের চাটী দিয়া কাটিয়া, কর্ত্তিত স্থানে গন্ধ বিরাজের তৈল ইত্যাদি পচন-নিবারক ঔষধ লাগাইবে।

বাছুরকে মাতৃস্তন খাওয়াইবে, কারণ ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা সারিয়া যায়। বাছুর নিজে মাতৃস্তন না পানাইলে, দুধ দোহাইয়া বাছুরকে খাওয়াইবে। ২।১ দিন বাছুর দিয়া পানাইতে চেষ্টা করিলে পর, বাছুর আপনা আপনিই পরে মাতৃস্তন খাইবে। বাছুরকে যত্ন পূর্ব্বক লালন পালন করিবে এবং ইচ্ছামত মাতৃ দুগ্ধ খাইতে দিবে। ২।১ ফোঁটা গলাধঃকরণ হইবার পরে, বাছুরকে মাতৃস্তন হইতে বিরত করা উচিত নহে। ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত বাছুরকে মাতৃ দুগ্ধ খাইতে দেওয়া উচিত। বাছুর যেমন দিন দিন বাড়িতে থাকিবে, তাহার খাদ্যের পরিমাণও সেরূপ ক্রমশঃ বাড়াইয়া দিবে। বাছুরকে আবশ্যক মত তাহার মাতার দুগ্ধ খাইতে দেওয়া না হইলে ফেন কিঞ্চিৎ লবণের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে। মাতৃ দুগ্ধ ছাড়াইবার পূর্ব্বে কচি কচি কাঁচা ঘাস, ফেন, ভুসি ও তিসির খইল খাওয়াইবে। ক্রমশঃ খড় কুটা খাওয়াইতে অভ্যাস করাইবে। পূর্ণ বয়স্ক গোরু অপেক্ষা বাছুরের সেবা শুশ্রূষা অপেক্ষাকৃত কষ্ট সাধ্য। ৪ মাসের পরে বাছুরকে মাঠে চরিতে দিবে বা বাড়ীতে উপযুক্ত আহার খাইতে দিবে। উদর পূরণ করিয়া খাওয়াইলে বাছুর অল্প দিনের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান হইবে। বৃষ্টিতে কিম্বা হিমে বাছুরকে রাখিবে না। প্রত্যহ ২।১ ঘন্টা কাল বাছুরকে দৌড় করাইবে, কারণ ইহাতে ইহার "ঘুর্ণি" রোগ হইয়া মারা যাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

সকল জাতীয় বাছুরের আহার এক প্রকার হইবে না। স্ত্রী জাতীয় বাছুরের অপেক্ষা পুং

জাতীয় বাছুরের অধিক পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। পুনরায় পুং জাতীয় বাছুরের মধ্যে "এঁড়ের ও দামড়ার" এক খাদ্য হওয়া উচিত নহে। কেননা ইহাদিগকে পৃথক পৃথক কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে এবং সে কারণ ইহাদের খাদ্যেরও পার্থক্য থাকিবে। ১।২।৩ মাস কাল পর্য্যন্ত সকল বাছুরের খাদ্য এক রকম হইবে। কারণ এই সময়ে দুগ্ধই ইহাদের প্রধান আহার। ৩ মাস পরে ইহাদের আহারে পার্থক্য থাকিবে। ২ বৎসরের পর বাছুর পূর্ণ বয়স্ক হয়।

৪।৫ মাসের সময় বাছুরের সারা দিনের খোরাকী।

খইল কিম্বা ভুষি	...	।০ এক পোয়া।
লবণ	...	½ অর্দ্ধ কাঁচ্চা।
কাঁচা ঘাস	...	/১½ দেড় সের।
ফেন	...	যত খাইতে পারে।

৬ মাসের সময় বাছুরের সারা দিনের খোরাকী।

খইল কিম্বা ভুষি	...	।৵০ দেড় পোয়া।
লবণ	...	½ অর্দ্ধ কাঁচ্চা।
কাঁচা ঘাস	...	/২।—/২½ সের।
ফেন	...	যত খাইতে পারে।

১ বৎসর বয়সের বাছুরের সারা দিনের খোরাকী।

খইল কিম্বা ভুষি	...	৸০ তিন পোয়া।
লবণ	...	৫ এক কাঁচ্চা।
কাঁচা ঘাস	...	/৫ পাঁচ সের।
শুষ্ক খড়	...	/১ এক সের।
ফেন	...	যত খাইতে পারে।

২ বৎসর বয়সের বাছুরের সারা দিনের খোরাকী।

খইল	...	/২ দুই সের।
ভুষি	...	/১ এক সের।
লবণ	...	/০ এক ছটাক।
কাঁচা ঘাস	...	/॥০ বিশ সের।
শুষ্ক তৃণাদি	...	/৪ —/৫ সের।

ফেন ও চাউল ধোওয়া জল যত খাইতে পারে।

পূর্ব্বে যে খাদ্যের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা স্ত্রী জাতীয় বাছুরদিগের জন্য। বকনার খাদ্য দ্রব্য গাভীর খাদ্য দ্রব্যের ন্যায় হইবে কিন্তু পরিমাণে অল্প করিয়া দিবে। বকনাকে অধিক পুষ্টিকর কোন দ্রব্য খাওয়াইবে না, কারণ ইহাতে ইহার বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি রোগ হইতে পারে। বকনাকে এরূপভাবে খাওয়াইবে যাহাতে পশুটী হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় কিন্তু অধিক স্থূলকায় না হয়। দামড়া ও এঁড়ে বাছুরের খাদ্য দ্রব্য প্রায় একরূপ; কিন্তু এঁড়ে বাছুরকে দামড়া অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইবে। খাদ্যাখাদ্য বিচারে ও বলদ ও ষাঁড়ের খাদ্যের তালিকায় সকল খাদ্য দ্রব্যের উল্লেখ করা হইবে।

গোরুর খাদ্য জিনিষ।--খড় কুটা, বিচালী, শুষ্ক তৃণ, দুর্ব্বা, বেনা ইত্যাদি কাঁচা ঘাস, খইল, দাইলের ভুষি, গমের ভুষি, ভাত, চাউল, ও কলাই সিদ্ধ, ছাতু, ছোলা, খেঁসারী দাইল, উরিদ, মুগ, লাউ সিদ্ধ, যবের গুঁড়া, চাউলের কুঁড়া, খোড়, বাঁশ পাতা, নানাবিধ গাছের পাতা, কলা পাতা, মকাই ইত্যাদি।

ষাঁড়, বলদ ও গাভীর এক খাদ্য হওয়া উচিত নহে; গমের ভুষি ও খইলে গাভীর দুধ কমিয়া যায় কিন্তু ষাঁড় ও বলদের পক্ষে উহা উপকারী।

ছোলা ইত্যাদি অধিক পুষ্টিকর খাদ্য বলদকে না খাওয়াইলে উহার কোন অনিষ্ট হয় না। কিন্তু উহা ষণ্ডকে খাইতে দেওয়া উচিত। তজ্জন্য কোন কোন আহার, কোন কোন জাতীয় পশুকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। গোরুর খাদ্য এরূপ হওয়া চাই যাহাতে গাইএর দুধ বাড়ে, ষণ্ড হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় এবং বলদ ভাল রূপে চাষের কার্য্য করিতে পারে।

কাঁচা ঘাস।—গোরুর একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য। সম্বৎসরব্যাপী গোরুকে কাঁচা ঘাস খাওয়াইলে, গোরু সুস্থ বলবান ও হৃষ্টপুষ্ট হইবে। বেনা, কুর্ত্তিকলাই, মকরা বা মুধন, দল, সানা ও গিনি ঘাস কাঁচা অবস্থায় খাওয়াইবে। কারণ ঐ সকল ঘাস হইতে শুষ্ক তৃণাদি তৈয়ার হয় না। সমস্ত শিশির রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যাওয়ার পর, গোরুকে মাঠে চরিতে দিবে। কাঁচা ঘাস কাটিয়া খাওয়াইলে প্রথমে রৌদ্রে কিয়ৎক্ষণ ঘাস বিছাইয়া রাখিবে। বাঁশ পাতা, কলা পাতা কিম্বা অন্যান্য গাছের পাতা টাটকা অবস্থায় গোরুকে খাইতে দিবে। বিষাক্ত গাছ গাছড়ার পাতা গোরুকে খাইতে দিবে না। ঘাসে মাটি থাকিলে কখনও ইহা জলে ধৌত করিবে না, কারণ ইহাতে জলের সহিত ঘাসের সার ভাগ চলিয়া যায়। মাটী ছাড়াইয়া ঘাস গোরুকে খাইতে দিবে। সকল প্রকার কাঁচা ঘাস হইতে শুষ্ক তৃণাদি তৈয়ার হয় না। বিচালী হইতে শুষ্ক তৃণাদি অধিক সারবান। দূর্ব্বা, আঞ্জাম, পালভার, মনিয়ারা কিম্বা বরশীগাছ শুকাইয়া শুষ্ক তৃণাদি তৈয়ার হয়। পূর্ব্বোক্ত ঘাস গুলি কাঁচা অবস্থায়ও গোরুকে খাওয়াইতে পারিবে। সকল সময়ে কাঁচা ঘাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না, সে কারণ অনেকে ভাদ্র, আশ্বিন মাসে কাঁচা ঘাস শুকাইয়া শুষ্ক তৃণাদি তৈয়ার করিয়া রাখে। কাঁচা ঘাসের মধ্যে দূর্ব্বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাঁচা ঘাস দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক এবং ইহা খাওয়াইলে গাভী অধিক পরিমাণে সুমিষ্ট দুধ দেয়। ষণ্ড ও বলদ গুলিকে কাঁচা ঘাস না খাওয়াইলেও চলিতে পারে। অন্ততঃ প্রত্যেক দুগ্ধবতী গাভীকে প্রত্যহ ⁄॥৹ মণ কাঁচা ঘাস খাওয়ান উচিত।

কাঁচা ঘাস সঞ্চয় করিবার কৌশল।—কোন উঁচু জমির মাটি খনন করিয়া গর্ত্ত করিবে; এবং ঐ উদ্বৃত্ত মাটি দিয়া প্রাচীর দিবে। পরে গর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া উপর পর্য্যন্ত কাঁচা ঘাস ঠাসিয়া ঠাসিয়া রাখিবে। যাহাতে ঘাসের গাদায় জল ও বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, সেই জন্য ভার চাপাইবে। গর্ত্তটী পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা ভাল। ইহাতে নিচে হইতে জল উঠিতে পারে না। গর্ত্তটী পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করিতে না পারিলে গর্ত্তের নিচে তক্তা দিয়া পাটাতন করিবে, মোট কথা গর্ত্তের নিচে হইতে জল উঠিয়া যাহাতে ঘাস পচিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। যে সকল ঘাস ঐরূপ ভাবে রাখা হয়, তাহাকে "সাইলেজ" কহে এবং যে ভূমিতে কাঁচা ঘাস রাখা হয়, তাহাকে "সাইলো" কহে। ভাদ্র কিম্বা আশ্বিন মাসে কাঁচা ঘাস ও লতাপাতা, যাহা গোরুতে খায়, প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ঐ সময়ে ঘাস পোতা ভাল।

সাইলেজ দুই প্রকার—তিক্ত ও মিষ্ট; মিষ্ট সাইলেজ তৈয়ার করিলে ২।১ দিন পরে ঘাসের গাদার উপর ভার চাপাইবে; তিক্ত সাইলেজে, যত শীঘ্র পার ঘাসের গাদার উপর ভার চাপাইবে। ভার চাপাইবার পর, সাইলেজ কমিয়া গেলে পর পুনরায় নূতন ঘাস ঠাসিয়া ঠাসিয়া রাখিবে। কাঁচা ও সবুজ অবস্থায় ঘাস রাখিবার বন্দোবস্তকে "এন্‌সিলেজ" কহে। মিষ্ট অপেক্ষা তিক্ত সাই-

লেজ ভাল। ঘাসের গাদার উপর ছাউনি দিবে, যাহাতে জল বা বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে। চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসে, যখন কাঁচা ঘাস দুষ্প্রাপ্য হইবে, তখন পোতা ঘাস ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া খইলের সহিত গোরুকে খাইতে দিবে।

ইহা ঈষৎ সবুজ রং বিশিষ্ট, শক্ত ও পরিষ্কার; ইহার বৃন্তগুলি শক্ত এবং পাতাগুলি ছোট ছোট; ইহা সুগন্ধ ও মিষ্ট আস্বাদযুক্ত। ফুল হইবার পূর্ব্বে ঘাস কাটিলে ঘাস সারবান হয় না; বীজ হইবার পরে কাটিলে বীজে সারভাগ থাকে, কিন্তু ঘাসে সারভাগ অল্প থাকে। তজ্জন্য বীজ হইবার পূর্ব্বে ও ফুল হইবার পরে কাঁচা ঘাস কাটিয়া, পরে শুকাইয়া শুষ্ক তৃণাদি তৈয়ার করিবে। কাঁচা ঘাস যখন দুষ্প্রাপ্য হয়, সেই সময়ের জন্য শুষ্ক তৃণাদি গৃহস্থের সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

অতি রৌদ্রে শুকাইলে তৃণাদি সহজে ভঙ্গপ্রবণ হয়। বৃষ্টিতে ভিজিলে ঘাসের সারভাগ জলের সহিত মিশিয়া যায়। ঘাসগুলিকে ২।৩ দিন রৌদ্রে শুকাইলে উৎকৃষ্ট তৃণাদি তৈয়ার হইবে। প্রত্যহ ৩।৪ সের পরিমাণ শুষ্ক তৃণাদি গোরুকে খাইতে দেওয়া উচিত। শুষ্ক তৃণাদি দুগ্ধ বৃদ্ধি-কারক এবং দুধাল গাভীর উত্তম খাদ্য। ধান, যব, সরিষা, গম, বার্লি, মকাই, বাজরা, মটরশুঁটী, কলাই, উরিদ, মুদ, খেসারী ইত্যাদির গাছ হইতে উৎকৃষ্ট পোয়াল, বিচালী, তৃণ কিম্বা খড় কুটা হয়। বিচালী শুষ্ক তৃণাদি অপেক্ষা কম পুষ্টিকর।

বিচালী।—ভাল খড় লম্বা, পরিষ্কার, হলদে ও সুগন্ধযুক্ত। কোন কোন বিচালী আঁসাল ও শক্ত-পানা এবং কোন কোন বিচালী নরম। ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া খইল, ভুষি কিম্বা কুঁড়ার সহিত মিশাইয়া জাব তৈয়ার করিলে গোরুর উৎকৃষ্ট খাদ্য তৈয়ার হইবে।

মকাই।—ইহা চূর্ণ করিয়া গোরুকে খাইতে দিবে; মকাই গাভীর মন্দ খাদ্য নহে। প্রত্যহ ৴া০ সেরের বেশী মকাই গাভীকে খাইতে দিবে না। ষাঁড় ও বলদের অমিশ্রিত মকাই উৎকৃষ্ট খাদ্য নহে, কিন্তু ছোলার সহিত সমান পরিমাণে মকাই মিশাইয়া খাওয়াইলে উহাদের উৎকৃষ্ট খাদ্য হইবে। প্রত্যহ ৴১ সেরের বেশী মকাই ষাঁড় কিম্বা বলদকে খাইতে দিবে না।

ছোলা।—ইহা ষাঁড় ও বলদের উৎকৃষ্ট খাদ্য কিন্তু গাভীকে ছোলা খাওয়াইবে না। প্রত্যহ ৴২ সেরের বেশী ছোলা কোন পশুকে খাইতে দিবে না। ছোলা চূর্ণ করিয়া কিম্বা ভিজাইয়া ভুষির সহিত অথবা জাবের সহিত মিশাইয়া গোরুকে খাইতে দিবে।

বাজরা।—প্রথমে জলে ভিজাইবে, পরে কাটা খড়ের সহিত মিশাইয়া জাব তৈয়ার করিয়া ষাঁড় কিম্বা বলদকে খাইতে দিবে। প্রত্যহ ৴২ সেরের বেশী বাজরা গোরুকে খাওয়াইবে না। গাভীকে বাজরা খাওয়াইবে না।

মুগ, উরিদ ও মটর ইত্যাদি পুষ্টিকর দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া জাবের সহিত ষাঁড় কিম্বা বলদকে খাওয়াইতে পারিবে কিন্তু গাভীকে খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

খইল।—তিসির খইলে দুগ্ধে মাখম বৃদ্ধি পায়; তিলের খইল উপকারী, সরিষার খইল উৎকৃষ্ট। নারিকেল, মহুয়া এবং কাপাসের খইল কোন কোন স্থানে ব্যবহার হয় কিন্তু তাহাতে তত উপকার নাই। সর্ষপে রাই মিশান খইল গোরুর বিষ; রেড়ির বা ঢেঁড়ির খইল অপকারক, খাওয়ান নিষেধ। খইল চূর্ণ করিয়া কিম্বা জলে ভিজাইয়া জাবের সহিত মিশাইয়া গোরুকে খাইতে দিবে। প্রত্যহ ৴১ সেরের কম কিন্তু ৴২ সেরের বেশী খইল গোরুকে খাইতে দিবে না।

ভুষি।—নানাবিধ দাইল (মুগ, মুশুরী, মটর, কলাই, খেসারী, অরহর, মটর ইত্যাদি) যব, গম ইত্যাদি হইতে ভুষি তৈয়ার হয়। ছোলা, মুগ, উরিদ ইত্যাদি যেমন ষাঁড় ও বলদের উৎকৃষ্ট খাদ্য, সেরূপ ভুষি গাভীর উত্তম খাদ্য। গাভীকে প্রত্যহ ৴১ সের পরিমাণ ভুষি খাইতে দিবে। গমের ভুষি বা গমের খোসা গাভীকে খাইতে দিবে না, ইহাতে গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়। কাটা খড় ইত্যাদির সহিত ভুষি মিশাইয়া ছানি তৈয়ার করিলে গাভী তৃপ্তির সহিত খায়। ষাঁড় ও বলদের ভুষি পুষ্টিকর খাদ্য নহে কিন্তু ছোলার সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে গোরু অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান হয়।

কলাই।—কলাই কিম্বা খেসারী দাইল সিদ্ধ করিয়া গোরুকে খাওয়াইলে দুধাল গাভীর দুধ বৃদ্ধি পায়। ফেন ও গুড় গাভীর উত্তম খাদ্য।

ভাত।—ভাত গোরুর মন্দ খাদ্য নহে। প্রত্যহ ৴১ সেরের বেশী চাউল সিদ্ধ করিয়া গোরুকে খাওয়াইবে না। চাউল ও কলাই একত্রে সিদ্ধ করিয়া দুধাল গাভীকে খাওয়াইলে দুধ বৃদ্ধি পায়।

তিসি।—রোগগ্রস্ত গোরুর উৎকৃষ্ট খাদ্য। সিদ্ধ করিয়া ভুষির সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে। প্রত্যহ ৴॥৹ সেরের বেশী খাইতে দিবে না।

সিমুলের বীজ।—জলে ভিজাইয়া, চূর্ণ করিয়া কিম্বা সিদ্ধ করিয়া গোরুকে খাইতে দিবে। খইল কিম্বা ভুষির সহিত মিশাইয়া খাইতে দিলে প্রত্যহ ৴১ সেরের বেশী খাইতে দিবে না। কিন্তু অন্য কোন পুষ্টিকর দ্রব্য (খইল ভুষি ইত্যাদি) না দিলে ৴২ সের পর্য্যন্ত খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। ইহা গাভীর উৎকৃষ্ট খাদ্য।

কাঁচা যব।—গাভীর মন্দ খাদ্য নহে; প্রত্যহ ৴১ সের পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। গমের ভুষি গাভীকে খাইতে দিবে না কিন্তু ষাঁড় ও বলদের উত্তম খাদ্য।

কলার থোড়।—খইল ও বিচালীর সহিত মিশাইয়া জাব তৈয়ার করিলে গাভীর উৎকৃষ্ট খাদ্য তৈয়ার হয়।

লাউ সিদ্ধ।—দুগ্ধবতী গাভীর উত্তম খাদ্য।

কাঁটানটে সিদ্ধ করিয়া দুধাল গাভীকে খাওয়ান উচিত।

শ্রীকুঞ্জবিহারী দে।

আখ মাড়া।

ইক্ষুর রসে লৌহের সংস্পর্শ দোষণীয় কি না? ইহার বিচার করিয়া দেখা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বে কাঠের ঘানিতে আখ-মাড়া এবং মাটীর হাঁড়িতে গুড় তৈয়ার করা হইত। এই ৩০।৪০ বৎসর হইতে লোহার কলে আখ-মাড়া এবং লোহার কড়াইতে গুড় তৈয়ার হইতেছে। ইহাতে গুড়ের অনিষ্ট হইতেছে কি না, আখ হইতে যে পরিমাণে রস বাহির হওয়া উচিত, এবং রস হইতে যে পরিমাণে গুড় এবং গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হওয়া উচিত, লোহার কল ও কড়াই হইয়া উপকার কি অপকার হইয়াছে? গত বৎসর পাঞ্জাব প্রদেশের আস্কা কুঠীর ম্যানেজার ৺ সিঙ্কিন সাহেব তাহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

১। লোহার কল ও কাঠের কলের পাশাপাশি বসান হয় এবং দুইবার করিয়া একই আখ-মাড়া হয়। প্রথমবার মাড়ায় আখের গায় যে সকল ময়লা থাকে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। সুতরাং দ্বিতীয়বারে যে রস বাহির হয় তাহা অধিক পরিষ্কার। একই স্তূপ হইতে দুই কলের আখ যোগান হইয়াছিল। উভয় কল একই সময়ে চালান হয় এবং একজন অভিজ্ঞ লোক দ্বারা উভয় প্রকার রস জ্বাল দেওয়া হয়। প্রত্যেক কলে প্রথমবার চারি ঘড়া রস বাহির করিয়া পুনরায় ঐ পেষিত আখ কলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়বারের রস প্রথমবারের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা ছাঁকিয়া লওয়া হয়। অনেকগুলি ছোট হাঁড়িতে রস জ্বাল দেওয়া হয়। একটী হাঁড়ির রস অন্যটীতে লইয়া যাওয়া হয়। এই প্রকারে শেষ হাঁড়ি হইতে ছোট ছোট কলসীতে গাঢ় রস ঢালা হয়।

কল হইতে যখন রস বাহির হয় তখন তাহার গাঢ়ত্ব পরীক্ষা করিয়া তুলনায় দেখা যায় যে—

লোহার কলে প্রথমবারের রস		১৫
ঐ	দ্বিতীয়বারের রস	১৬
কাঠের কলে প্রথম বারের রস		১৪
ঐ	দ্বিতীয় বারের রস	১৫

১॥ মাস পরে গুড় পরীক্ষা করা হয়। কোন গুড়ে চুণ দেওয়া হয় এবং কোনটায় তাহা দেওয়া হয় না। সুতরাং দুই কলে এবং দুই প্রণালীতে ৪ চারি প্রকার গুড় হয়। মান্দ্রাজের রসায়নবিদ্ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহাতে—

		লোহার কলে।		কাঠের কলে।	
		চুণ দিয়া	চুণ বিনা	চুণ দিয়া	চুণ বিনা
চিনি	...	৮৮.১০	৮০.০০	৯০.৬০	৯৭.২০
রাব	...	৫.০৩	৯.৪৪	৩.৬৫	৮.০৯
জল	...	৩.২২	৬.৫২	২.৫২	৭.৪২
ভস্ম	...	১.৩২	১.৭৮	১.২০	.৮৮
একুন	...	৯৭.৬৭	৯৭.৭৪	৯৭.৯৭	৯৭.১৯

যে গুড়ে চুণের জল দেওয়া হয়, তাহাতে জলের ভাগ কম ছিল. কিন্তু যাহাতে চুণ দেওয়া হয় নাই, তাহার কলসীর গাত্র ভিজিতে দেখা যায়। কাঠের কলে তৈয়ারি গুড়, লোহার কলে তৈয়ারি গুড় অপেক্ষা কোন কোন অংশে ভাল ছিল; অথচ তাহাতে রাবের অংশ কম। লোহার কলের গুড় সহজে দানা বাধে এবং রাব সহজে বাহির হইয়া আসে। কিন্তু কাঠের কলের গুড়ে তাহা হয় নাই। গুড় জ্বাল দেওয়া দোষেও এই প্রভেদ হইতে পারে।

চুণ দেওয়া গুড় উভয় স্থলেই ভাল; ইহাতে সহজে দানা বাঁধে এবং রস সহজে বাহির হইয়া যায়। লোহার কলে গুড়ের দানা অপেক্ষাকৃত অধিক মিহি এবং রং গাঢ়।

সকল অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে লোহার কলে রস বেশী বাহির হইলেও কাঠের গুড় বেশী হয়। বেশী কঠিন করিয়া মাড়া হইলে রসে ময়লা বেশী হয়, এবং অম্লত্ব জন্মে; তাহাতে রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। একই পরিমাণে চুণ দেওয়া হয়, তথাপি লোহার কলের রসে অম্লত্ব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না। তাহাতে রাবের পরিমাণ বেশী হয়। যে গুড়ে চুণ একেবারে দেওয়া হয় নাই, তাহাতে রাবের পরিমাণ আধিক্য হইতে প্রমাণ হইবে যে অম্লত্ব চুণ দ্বারা দূর করা হয়।

গুড়ের বর্ণ গাঢ় হইলে তাহার আদর কম। এবং লোহার কলের গুড়ের বর্ণ গাঢ়। এই জন্য গঞ্জাম প্রদেশের চিনি প্রস্তুতকারীরা লোহার কল পছন্দ করে না। কিন্তু লোহার কলে যে পরিমাণে সহজে ও সত্বর রস বাহির হয়, কাঠের কল হইতে সেই ফল পাওয়া যায় না। তবে Tea-rolling machine অর্থাৎ চার পাতা মাড়াইবার জন্য লোহা যেমন হাল্কা কাঠ দিয়া মোড়া হয়, যদি আখের কলে তাহা করা হয়, তবে আখের রস লোহার সম্পর্কে আসে না। আবার বাঙ্গালা দেশে যে রস জ্বাল দিবার জন্য লোহার বড় বড় কড়াই হইয়াছে, এই লৌহ সম্পর্ক ও গুড়ের পক্ষে অনিষ্ট কর। মাটির হাঁড়িতে রস জ্বাল দেওয়া তত সহজ নয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে কাঠ ও লোহা উভয়েরই সুবিধা ও অসুবিধা আছে। যদি লোহার কল ও কড়াই ব্যবহার করিতেই হয় তবে তাহা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে।



কৃষক। ফাল্গুন, ১৩১৫।

নাইট্রোজেন জীবাণুজ সার।

আমাদের অনেক পাঠকই অবগত আছেন যে মটর, সীম, অরহর প্রভৃতি শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের মূলে কতিকয় জীবাণু দৃষ্ট হয়। এই সকল জীবাণু নাইট্রোজেন সঞ্চয় করিয়া জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। জীবাণু দ্বারা নাইট্রোজেন সঞ্চয়ের বিষয় বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিজ্ঞাত না হইলেও এতদ্দেশে এবং ইউরোপে ইহা কার্য্যতঃ জানা ছিল। আমাদের দেশে সাধারণ কৃষক সমূহের শস্য পর্য্যায়ের পদ্ধতি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাহারাও শিম্বী ফসলের উপকারিতা কতক পরিমাণে অবগত আছে।

পূর্ব্বে এ বিষয় সম্বন্ধে কতক কতক আলোচনা হইলেও উনবিংশ শতাব্দীতেই নাইট্রোজেন-জীবাণু-রহস্য পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী রসায়নতত্ত্ববিৎ বোসিগো প্রমাণ করেন যে জমি হইতে মূল দ্বারা শোষণই উদ্ভিদের নাইট্রোজেন সংগ্রহের একমাত্র উপায়। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ কৃষিক্ষেত্র রথামষ্টেডেও লস্ ও গিলবার্ট এবং পিউর পরীক্ষাবলী দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় শিম্বী

জাতীয় বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি, কিন্তু উক্ত Theory দ্বারা সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যাইত না। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে হেলরিগেল্ মত প্রকাশ করিলেন যে উক্ত জাতীয় উদ্ভিদ্ নিশ্চয়ই বায়ু মণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। দুই বৎসর পরে তিনি এবং উইলফার্থ প্রমাণ করেন যে শিম্বী জাতীয় গাছ একবারেই নাইট্রোজেনবিহীন মৃত্তিকায় জন্মিতে পারে। কিন্তু উহাদের মূলে গুটিকা সদৃশ স্ফীতাংশ—যাহাকে আমরা ভবিষ্যতে গুটি বলিব—বহু দিবস হইতে অনেক বৈজ্ঞানিকের নিকট পরিচিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিৎ ম্যালপিঘি সর্ব্ব প্রথমে ইহার উল্লেখ করেন এবং তাঁহার দ্বারা ইহা রোগ সম্ভূত বলিয়া বিবেচিত হয়। অপরাপর বৈজ্ঞানিকও উক্ত রূপ মত প্রচার করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রুসীয় ওরোনীন সর্ব্ব প্রথমে এই সমুদয় গুটির গঠন বর্ণনা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে এই গুটি সমূহে এক প্রকার জীবাণু দৃষ্ট হয়। অনেক বৈজ্ঞানিক তাঁহার গবেষণালব্ধ ফলের প্রতিবাদ করিলেও অবশেষে এরিক্সন্ প্রমুখ পণ্ডিত মণ্ডলী দ্বারা তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ সত্য বলিয়া প্রতিপাদিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত গুটি সমূহ যে জীবাণু দ্বারা গঠিত হয় তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সুবিখ্যাত উদ্ভিদ্ রোগবিৎ মার্সাল ওয়ার্ড নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সীম গাছের মূলে গুটি জীবাণু দ্বারা গঠিত হয়; মৃত্তিকা অথবা বালি পূর্ব্বে গরম না করিয়া, তাহাতে সীম বীজ পুঁতিলে এক মাসের মধ্যেই গুটি দেখা দেয়, (২) পূর্ব্বে গরম করা কোন প্রকার উপাদানে (মৃত্তিকা, জিলাটিন প্রভৃতিতে) গুটি জন্মায় না, (৩) মূলাণু সমূহের মধ্যে পুরাতন গুটি রাখিয়া নূতন গাছের মূলে গুটি উৎপাদন করিতে পারা যায় (এবং (৪) জীবাণুর কাণ্ডতন্তুকে (hypha) মূলাণু বহিস্ত্বকে প্রবেশ করিতে দেখা গিয়াছে।

১৮৮ খৃষ্টাব্দে বিজারনিক্ গুটি হইতে জীবাণু পৃথক করিয়া উহার নাম দেন ও বেসিলাস্ র‍্যাডিসিকোলা (Bacillus radicicola)। পরবর্তী অনুসন্ধান দ্বারা এই রূপ অনেক জীবাণু পৃথগীভূত হয় এবং অবশেষে প্রমাণ হয় যে শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের উপকারিতার প্রধান কারণ এই যে উহাদের মূলে এই সকল নাইট্রোজেন সঞ্চয়কারী জীবাণু বাস করে। এই জন্যই যে সকল জমিতে মুক্ত অবস্থায় নাইট্রোজেন না থাকার জন্য অপর জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাইতে পারে না সেরূপ স্থলে শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদ অনায়াসে জন্মাইয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসরে বহুল পরিমাণ নাইট্রোজেন এই সমূহ উদ্ভিদ দ্বারা সংগৃহীত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রথামস্টেড্ পরীক্ষা ক্ষেত্রের একটি পরীক্ষার বিষয় উল্লেখ করিতে পারা যায়। দুই খণ্ড জমিতে ২৭ বৎসর ধরিয়া শিম্বী জাতীয় ফসল ও গোধূম উৎপাদন করা হয়। যে জমিতে শিম্বী জাতীর ফসল উৎপাদন করা হইয়াছিল, তাহার প্রথম ২৭ ইঞ্চি মৃত্তিকার পরীক্ষাশেষে গড়ে একর প্রতি ৬,৬০৪ পাঃ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে যাহাতে গোধূম জন্মান হইয়াছিল তাহাতে গড়ে একর প্রতি ৫,৮৪৭ পাঃ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। সুতরাং শিম্বী জাতীয় ফসলের দ্বারা ৭৫৭ পাঃ নাইট্রোজেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে শিম্বী জাতীয় ফসল অপরাপর ফসল অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। এক একর জাত গোধূমে বৎসরে ১২ পাঃ নাইট্রোজেন

পাওয়া যায়; কিন্তু এক একর জাত শিম্বী জাতীয় ফসলে ২৪ পাঃ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। সুতরাং দেখিতে গেলে শিম্বী জাতীয় ফসল দ্বারা মোট সংগৃহীত নাইট্রোজেনের মাত্রা পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ অপেক্ষাও অনেক অধিক।

নাইট্রোজেন জীবাণু দ্বারা জমির দুই প্রকার উপকার সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ শিম্বী জাতীয় ফসল নিজে কোন প্রকার নাইট্রোজেন-যুক্ত সার গ্রহণ না করিয়া জন্মিতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ যে জমিতে উক্ত শিম্বী ফসল জন্মে সে জমি ও সার-বহুল হইয়া উঠে। কি প্রকারে এই জীবাণু নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে তাহা এখনও সবিশেষ জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু বেসিলস্ রেডিসিকোলা অথবা Pseudomonas Radicicola সিউডোমোনাস্ রেডিসিকোলা—ইহার নূতন নাম—উদ্ভিদের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে কয়েকটি বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যথা (১) মূল জীবাণুযুক্ত মৃত্তিকার সহিত সংস্পৃষ্ট হওয়া আবশ্যক, (২) জমিতে অধিক পরিমাণ নাইট্রেট থাকিলে চলিবে না, সোরার আধিক্যে জীবাণু গুলি পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই তাহা দেখা গিয়াছে, (৩) লবণ, ফসফেট্ ও পটাস উপযুক্ত পরিমাণে থাকা আবশ্যক, (৪) জমি উত্তমরূপ বায়ুযুক্ত হওয়া প্রয়োজনীয়।

নাইট্রোজেন জীবাণু বিষয় অনুসন্ধান করিতে করিতে অনেক পণ্ডিতের মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহা এই, এক জাতীয় জীবাণুই সকল প্রকার শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের মূলে গুটি উৎপাদন করে, কিম্বা বিভিন্ন জাতীয় শিম্বী ফসলের বিভিন্ন প্রকার জীবাণু আছে। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে এক সিউডোমোনাস্ রেডিসিকোলাই যাবতীয় শিম্বী ফসলের মূলে গুটি উৎপাদন করে, কিন্তু অনেক দিবস কোন বিশেষ শিম্বী ফসলের মূলে অবস্থান করিয়া উহাদের অনেকটা প্রকৃতিগত রূপান্তর হইয়া যায়। অপর কোন শিম্বী ফসলে উহা দ্বারা টিকা দিলে প্রথমে জীবাণু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে একটু বিলম্ব হয়, কিন্তু অবশেষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও একটি কথা আছে। যে রূপ স্থান হইতে জীবাণু বীজ গ্রহণ করা হয়, জীবাণু তদ্রূপ তেজশালী হয়। অর্থাৎ মৃত্তিকা, পেষিত গুটিকা কিম্বা বিশুদ্ধ culture হইতে বীজ গ্রহণ করিলে, শেষোক্ত স্থানের বীজই উৎকৃষ্টতম হইয়া থাকে।

এই জীবাণুজ সারের বিশেষত্ব এই যে ইহার বীজ প্রস্তুত করিয়া লইয়া ইহার দ্বারা অনুর্ব্বর মৃত্তিকাকে টিকা দেওয়া চলে। শিম্বী ক্ষেত্র হইতে বীজ গ্রহণ করিয়া নূতন আবাদি জমিতে টিকা দিয়া ব্রেমেনের মুর কলচার একস্পেরিমেন্ট ষ্টেসনে (Moor Culture Experiment Station) সবিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার অন্যান্য স্থলেও এই রূপ প্রথা অবলম্বিত হয়। কিন্তু ইহার দুইটি অসুবিধা আছে—প্রথমতঃ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহুল পরিমাণ মৃত্তিকা বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয় এবং দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার মৃত্তিকার সহিত অনেক জাতীয় পোকা ও উদ্ভিদ্ রোগ চলিয়া যাইতে পারে।

এই জীবাণুজ সার অনেক প্রকারে প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম বিশুদ্ধ Culture, নাইট্রাজিন (Nitragin)। জর্ম্মন সওদাগর হষ্ট ইহা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ইহাতে সুফল না হওয়ায় নব্ এবং হিলনার নামক পণ্ডিতদ্বয় উহা পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন আকারে বাহির করেন। ইহা দৃঢ়ীভূত জিলাটিনের দ্বারা প্রস্তুত। জর্ম্মনীর অনেক স্থলে ইহা ব্যবহৃত হয় এবং ইহা প্রয়োগে

এমন কি শিম্বী ফসল প্রসবকারী জমিরও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ১৯০৪ সালে মার্কিন কৃষি-বিভাগের মুর সাহেব কোন প্রকার দ্রাবণে জীবাণুর চাষ করিয়া, তাহাতে তুলা ভিজাইয়া লইয়া উক্ত তুলা শুষ্ক করতঃ বিভিন্ন স্থানে টিকা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু এইরূপে শুষ্ক করায় জীবাণুর তেজ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় এবং তজ্জন্য সকল সময় উত্তম ফসলও পাওয়া যায় না। সম্প্রতি মার্কিন কৃষি বিভাগ এই প্রথা পরিত্যাগ করিয়া দ্রব অবস্থায় জীবাণু বীজ প্রেরণ করিতেছেন।

বিলাতে লণ্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক বটমলি মুর সাহেবের প্রস্তুত দ্রাবণের ন্যায় নাইট্রো-ব্যাক্‌টিরিন নামক এক প্রকার দ্রাবণ প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা দ্বারাও বিলাতের অনেক স্থলে পরীক্ষা হইতেছে। আমরা এস্থলে তৎসমুদয়ের ফলাফলের একটা মোটামুটি পরিচয় দিলাম।

নাইট্রোজেন জীবাণুজ সার সম্বন্ধীয় পরীক্ষা-বলীর মধ্যে বিলাতের সুবিখ্যাত রয়েল হর্টিকাল-চারল্ সোসাইটির উইসলি উদ্যানের পরীক্ষা সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ যোগ্য। এই পরীক্ষা অধ্যাপক বটমলির নাইট্রো-ব্যাক্‌টিরিন সাহায্যে পরিচালিত হয়। এস্থলে নাইট্রো-ব্যাক্‌টিরিন সম্বন্ধে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বিবৃত করা আবশ্যক। নাইট্রো-ব্যাক্‌টিরিনের সহিত একটি পুস্তিকা গ্রাহকের নিকট প্রেরিত হয়। উহার সারাংশ নিম্নরূপ;—যে স্থলে স্বভাবতঃ প্রচুর পরিমাণে শিম্বী ফসল উৎপাদিত হয় সে রূপ স্থলে নাইট্রো-ব্যাক্‌টিরিন প্রয়োগে কোন ফল হয় না; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নাইট্রো-ব্যাক্‌টিরিন চূর্ণ রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে তিনটি পুরিয়া থাকে। প্রয়োগের সময় একটি টব বিশেষ রূপে পরিষ্কার করিয়া তাহাতে পরিষ্কৃত জল রাখিতে হয়। বৃষ্টির জল ফুটাইয়া শীতল করিয়া লইলে ভাল হয়। তৎপরে ১ নং পুরিয়ার চূর্ণ গুলি উক্ত টবে ফেলিয়া দিয়া গলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বেশ করিয়া নাড়িতে হয়। তাহার পর দ্বিতীয় নম্বর পুরিয়া সাবধানের সহিত খুলিয়া উহার মধ্যস্থিত তুলা এবং চূর্ণ টবে ফেলিয়া বেশ করিয়া নাড়া আবশ্যক। ইহার পর একটি আর্দ্র তোয়ালে দ্বারা টব ঢাকিয়া গরম স্থানে উহা রাখিয়া দিতে হইবে। উনুনের ধারে টব রাখিয়া দিতে পারা যায় কিন্তু উত্তাপ ৭৫°—৮০° ডিগ্রি ফারম্‌হিটের অধিক হইলে বীজ খারাপ হইয়া যাইতে পারে। ২৪ ঘণ্টা এইরূপ অবস্থায় থাকার পর ৩ নং পুরিয়াস্থিত চূর্ণ টবে দিয়া আবার নাড়িয়া রাখিয়া দিতে হইবে। ক্রমশঃ জল ঘোলা হইয়া যাইবে। উত্তাপ উপযুক্ত পরিমাণ হইলে ২৪—৩৬ ঘণ্টার মধ্যে জল ঘোলা হইয়া যায়। যদি ঐ সময়ের মধ্যে জল ঘোলা না হয় তাহা হইলে ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। জীবাণু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিলেই জল ঘোলা হয়। এস্থলে তিনটি পুরিয়াতে কি কি দ্রব্য থাকে তাহা জানি-বার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। তাঁহা-দের অবগতির জন্য বলা যাইতে পারে যে ১ নং পুরিয়াতে অল্প মাত্রায় ইক্ষু শর্করা, পটাসিয়ম সল্‌ফেট্, এবং ম্যাগনেসিয়ম সল্‌ফেট থাকে। ২য় পুরিয়াতে মৃত্তিকার কণাবৎ পদার্থ তুলার সহিত জড়িত থাকে। ঐ কণাগুলিতেই জীবাণু অবস্থান করে। ৩য় পুরিয়াতে কেবল ফস্‌ফেট্ অব অ্যামোনিয়া থাকে।

জমির টিকা দিতে হইলে পূর্ব্বে বায়ুতে মৃত্তিকা শুষ্ক করিয়া উক্ত মৃত্তিকা পূর্ব্বোক্ত জীবাণু দ্রাবণের সহিত সমান পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সিক্ত করিয়া লইতে হয়। এই মৃত্তিকা পুনর্ব্বার

আরও কতক পরিমাণ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া জমির উপর ছড়াইয়া দিতে হয় এবং তৎপরে কোদালি দ্বারা বেশ করিয়া ক্ষেত্রস্থ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। বীজ টিকা দেওয়া আবশ্যক হইলে একটি চালুনির উপর বীজ রাখিয়া উক্ত চালুনি দ্রাবণে ডুবাইয়া লইলে বীজ গাত্র দ্রাবণ দ্বারা আর্দ্র হইয়া যায়। সামান্য সময় দ্রাবণ সংস্পর্শে রাখিয়া উহাদিগকে তুলিয়া লইয়া শুষ্ক করিতে হয়। শুষ্ক করিবার সময় অন্ধকারে শুষ্ক করাই ভাল। কারণ আলোক লাগিলে জীবাণু সমূহের ক্ষতি হয়।

উইসলি উদ্যানে কয়েক জাতীয় মটর দ্বারাই পরীক্ষা নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। পরীক্ষার জন্য এক খণ্ড পতিত জমি ও এক খণ্ড আবাদি জমি নির্ব্বাচিত হয়। এস্থলে পরীক্ষা সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব ও অনাবশ্যক কিন্তু মোটের মাথায় রয়েল হর্টিকাল্‌চারল্ সোসাইটির উদ্যান পরিদর্শক চিটেনডেন সাহেব যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন সেগুলি ভ্রম প্রমাদ শূন্য নহে। তাঁহার মতে নাইট্রো-ব্যাক্টিরিনে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। বিলাতের অনেক বৈজ্ঞানিকই তাঁহার সিদ্ধান্তগুলির ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে জমিতে নাইট্রো-ব্যাক্টিরিন প্রয়োগ করেন তাহাতে স্বভাবতঃই নাইট্রোজেন জীবাণুর সংখ্যা প্রচুর পরিমাণ; সুতরাং সেরূপ জমিতে সুফল না হইবার কথা। কিন্তু এই প্রকার জমি ছাড়িয়া দিলে তিনি যে আর এক খণ্ড সার বিহীন জমিতে নাইট্রো-ব্যাক্টিরিনের পরীক্ষা করেন তাহা হইতে আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। এই প্রকার জমিতে বৃদ্ধির মাত্রা শতকরা ১৫ গুণ। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ রিভিউ অব্ রিভিউজ্ পত্রিকার সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেব ১৯০৮ সালে তদ্দেশে নাইট্রো-ব্যাক্টিরিন সম্বন্ধে যে সমুদয় পরীক্ষা হয় তাহার ফলাফল সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে শতকরা ৬৭ ভাগ পরীক্ষায় উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। এস্থলে ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে এই সমুদয় পরীক্ষা সকল রকমের জমিতে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল এবং অনেকেই সর্ব্বপ্রথমে এই সার ব্যবহার করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বিলাতের সুপরিচিত বীজ ও গাছ বিক্রেতা কার্টার এণ্ড কোম্পানি কয়েক জাতীয় সিম, মটর, ক্লোভার ও ভেচ্ লইয়া পরীক্ষা সম্পাদন করেন। তাহার ফলে গড়ে ফসলের পরিমাণ শতকরা ৬০ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই সমুদয় পরীক্ষার ফলে বুঝিতে পারা যায় যে নাইট্রো-ব্যাক্টিরিন ভবিষ্যতে সার জগতে নব যুগ প্রবর্ত্তন করিবে। বিঘা প্রতি বিলাতে ৭॥০ টাকার পশ্বাদির মল আবশ্যক হয়। সেই স্থলে ।৵০ আনার নাইট্রো-ব্যাক্টিরিন হইলে সমান অথবা অধিক পরিমাণ ফসল পাওয়া যায়। আবার নাইট্রো-ব্যাক্টিরিন শুধু শিম্বী জাতীয় ফসলের জন্য নহে অপরাপর ফসলেও ইহা দ্বারা অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। ষ্টেড সাহেব সেগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন। আমাদের দেশেও এই নাইট্রো-ব্যাক্টিরিন দ্বারা পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু যে সকল স্থানে সাধারণতঃ নাইট্রোজেন জীবাণুর সংখ্যা অধিক, সেই রূপ স্থলেই পরীক্ষা নির্ব্বাহিত হওয়ায় ফলাফল উত্তমরূপ বুঝিতে পারা যায় নাই। যদি অনাবাদি ও স্বভাবতঃ অনুর্ব্বর জমিতে পরীক্ষা হয় তাহা হইলে ইহার গুণাগুণ সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। ইতিমধ্যে যদি কেহ নাইট্রো-ব্যাক্টিরিন দ্বারা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান তাহা হইলে তাঁহার অবগতির জন্য বলিতে পারা যায় যে টিন বাক্সে

প্যাক করা /৫ সের জলের উপযুক্ত নাইট্রো-ব্যাক্‌টিরিন ডাকে বিলাত হইতে আনাইতে পারা যায়। প্রত্যেক প্যাকেটের দাম ৪।৹ টাকা। এই চূর্ণ শিম্বী জাতীয় ফসলে প্রয়োগের উপযোগী। শিম্বী ভিন্ন অপর জাতীয় ফসলে প্রয়োগ করিবার নাইট্রো-ব্যাক্‌টিরিমের মূল্য কিছু কম, ৪৲ টাকা মাত্র। কিন্তু মটর, সিম, প্রভৃতি বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন culture আবশ্যক। এতৎসম্বন্ধে যাবতীয় আবশ্যকীয় খবর ও সার নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পাওয়া যাইবে :—Nitro-Bacterine Distributing Agency, Portugal Street, Kingsway, London W. C.। আমরা আশা করি আমাদের কৃষি-উৎসাহী সুশিক্ষিত পাঠকবর্গ এই নবোদ্ভূত সার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থাপক সভা।

বিগত ১৯০৯, ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জে, ডবলিউ মলিসন সাহেব সভাপতি ছিলেন। ১৯০৪ সালে এই সভার প্রথম সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রদেশের কৃষি-দক্ষ সরকারী কর্ম্মচারীগণ একত্র সমবেত হইয়া পরামর্শ ও যুক্তি দ্বারা ভারতীয় কৃষির উন্নতি কল্পে গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান করাই এই সভার উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ এই সভায় ৫০ জন মেম্বর ছিলেন, পরে ১৯০৭ সালে গভর্ণমেণ্টের সভ্য সংখ্যা কমাইয়া ৩২ জন করিতে অভিমত প্রকাশ করেন। তদনুসারে সভ্য সংখ্যা ৩৮ জন থাকিবে বলিয়া স্থির হয়। কৃষি-বিভাগের ইন্সপেক্টার-জেনেরাল সভাপতি থাকিবেন। ইম্পিরিয়াল কৃষি-বিভাগের পুষা কলেজের ৮ জন কর্ম্মচারী, ডিরেক্টর, ব্যবসায়-তত্ত্ব (Commercial Intelligence) বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল, ব্যবহারিক বস্তু (Economic products) বিভাগের রিপোর্টার, গো-চিকিৎসা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল। প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগের ৮ জন ডিরেক্টর, এবং উক্ত কৃষি-বিভাগ সমূহ হইতে ৮ জন কৃষি-কার্য্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি, প্রতি বৎসর সভাপতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ৭ জন ব্যক্তি, বরোদা মহীশূর ও কাশ্মীর হইতে ৩ জন সভ্য নিযুক্ত হন।

২৭শে ফেব্রুয়ারি (১৯০৮ সালে) যে সভা বসে তাহাতে মলিসন সাহেব সভাপতি ছিলেন এবং ৫১ জন সভ্য এবং ৭ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় কি প্রকারে পরীক্ষিত কৃষি-বিষয় গুলি চাষীগণের মধ্যে প্রচার করা যাইতে পারে; কি উপায়ে আঁশ উৎপাদনকারী তরু লতাদির চাষ বৃদ্ধি হয়, আহার্য্য পক্ষী পালন, পুষা কলেজের ছাত্রদের পাঠ্য নির্ব্বাচন, প্রাদেশিক কৃষি কলেজ ইত্যাদি অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের অধিবেশনেও উক্ত বিষয় গুলির পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। যদিও উক্ত সভার পরামর্শে কৃষির উন্নতিকর এখনও কোন স্থায়ী কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই তথাপি কৃষি কর্ম্মানুরত, অভিজ্ঞগণ একত্র হইয়া ভারতের নানা স্থানে কৃষি উন্নতি কল্পে কোথায় কি চেষ্টা হইতেছে বা কি করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয় লইয়া বৎসর বৎসর জল্পনা কল্পনা করিলে ভবিষ্যতে ভাল হইবারই সম্পূর্ণ আশা করা যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে শিল্প সমিতি।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় একটি শিল্প সমিতির অধিবেশন হয়। তদুপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট স্যার ল্যানসেলট হেয়ার যে বক্তৃতা দ্বারা সমিতি উদ্বোধন করেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

ছোটলাট বাহাদুর সভার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে সকলকে জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, যে সকল শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে আমরা হস্তক্ষেপ করিব, প্রথমে তাহার নির্দ্ধারণ ও পরে কোন স্থানে কোন ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইলে ভাল হয় তাহা স্থির করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে আমি আপনাদিগের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি মাত্র। আপনারা আমার এই উক্তিকে গভর্ণমেণ্টের সঙ্কল্প বলিয়া মনে করিবেন না। আমার প্রস্তাবিত বিষয়ে যদি কোন ত্রুটী থাকে, তাহা হইলে আপনারা অবাধে তাহার উল্লেখ করিতে পারেন। আপনারা এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া যে মন্তব্যে উপনীত হইবেন, তাহা অবাধে প্রকাশ করিবেন।

এই দুইটি বিষয় স্থির হইলে পরে কিরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহায়তা গৃহীত হইতে পারে, কিরূপে মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং অবশেষে কিরূপে ও কোথায় উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশ, সুতরাং এ দেশে সুলভ দ্রব্যের বিক্রয়ই অধিক হইবে, এ কথা আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। যে দেশের লোকের আয় সামান্য সে দেশে অল্প মূল্যের দ্রব্যের ব্যবসায়েই সমধিক উন্নতি লাভের সম্ভাবনা।

অনন্তর ছোটলাট বাহাদুর বলিলেন যে, যদিও অর্থনীতির মূল সূত্র লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করি না বটে, তথাপি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উচ্চতর আসনে সমারূঢ় আছি বলিয়া আমি আপনাদিগকে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট কিরূপ পথ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা বোধ হয় আপনারা আমার উক্তি হইতে বুঝিতে পারিবেন। প্রথমতঃ আমি এই ব্যাপারে আপনাদিগকে বর্ণ বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। ইউরোপীয় এবং দেশীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব ও সহানুভূতি স্থাপিত হউক, উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টায় শিল্প ও বাণিজ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হউক। শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে বর্ণবিদ্বেষ অন্তর্হিত হইয়া, উহা সকল শ্রেণীর পক্ষেই সমান উন্মুক্ত হউক, এবং যোগ্যতর ব্যক্তিই জয়লাভ করুক।

মান্দ্রাজের শিল্প সমিতির অধিবেশনে মিঃ মুধোলকার যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে আমি দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। মহীশূরের স্বর্ণখনি হইতে যাহা লাভ হয় তাহার অধিকাংশই ইউরোপে চলিয়া যায় বলিয়া তিনি কেবল দুঃখ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ইহার প্রতিকারের জন্য গভর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যত দিন ইউ-রোপীয়গণ তাঁহাদের মূলধন বাহির করিতে কুণ্ঠিত বা ভীত না হইবেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের বুদ্ধি বলের অভাব না হইবে, ততদিন তাঁহারা যে লভ্যাংশ হস্তগত করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? তাঁহারা এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, এ কথা বলা আর সেই ব্যবসায়কে নষ্ট করা একই কথা।

ইউরোপীয়গণের ব্যবসায়ে এ দেশের বহু সংখ্যক শ্রমজীবি প্রতিপালিত হইতেছে এবং রাজ্যের ধনবৃদ্ধি হইতেছে, এ কথা যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, এ দেশে নানাপ্রকার বাণিজ্যে মূলধন ন্যস্ত করা যাইতে পারে এবং সেই সকল বাণিজ্যে ভবিষ্যতে উন্নতি হইতে পারে, এ শিক্ষা ইউরোপীয়-গণই আপনাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আপনারা এ কথা স্থির জানিবেন যে, আপনারা যদি কোন সম্প্রদায় বিশেষের উদ্যম ও উৎসাহ নাশ করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে সকল সম্প্রদায়ের উদ্যম ও উৎসাহ নাশ করিতে হইবে; এক শ্রেণীর উদ্যম ও উৎসাহ রক্ষা করা কখনও সম্ভবপর নহে। শ্রম-জীবি পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে অথবা ধনীর প্রদত্ত মূলধনের সুদের পরিবর্ত্তে আপনারা তাহাদিগকে আর কি দিতে পারেন? ইহাই সাধারণ নিয়ম। আজ যদি আপনারা বলেন যে ইউরোপীয়দিগের বাণিজ্যে আপনারা বাধা দিবেন, তাহা হইলে কাল আপনারা বলিবেন যে উচ্চ জাতীয় ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারিবেন না। আজ যদি আপনারা ইউরোপকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কাল আপনারা নারায়ণগঞ্জকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঢাকার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিবেন। ফলে, কোন প্রকার শিল্প বা বাণিজ্যই রক্ষা পাইবে না। কারণ এইরূপ অব্যবস্থায় সমস্ত কেহই মূলধন বাহির করিবার জন্য সাহসী হইবেন না।

যতদিন আমরা পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ না করিব ততদিন আমাদের আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হইবে না। সকল ব্যবসায়ে যখন বুদ্ধি ও মূলধন আবশ্যক, তখন যে স্থান হইতে আমরা এই দুই দ্রব্য পাইব সেই স্থান হইতেই উহা গ্রহণ করিব। ইউরোপীয় অথবা ভারতবাসী, যিনিই হউন না কেন, বাণিজ্য ক্ষেত্রে যিনি এই দুইটি দ্রব্য বাহির করিবেন তিনিই লাভবান্ হইবেন। আপনারা ইহা নিশ্চিত জানিবেন যে যদি কোন ভারতবাসী বুদ্ধি অথবা মূলধন লইয়া এই ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন তাহা হইলে তাঁহার উন্নতি অবধারিত। আপনারা যদি ইউরোপীয়দিগের সহায়তা গ্রহণে বিমুখ হয়েন তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা কোথায় পাইবেন তাহা আমরা বলিতে পারি না।

বয়কটের সাহায্যে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আপনারা যথাশক্তি বয়কটে বাধা প্রদান করুন ইহাই আমার অনুরোধ। মিঃ মুধোলকার যথার্থই বলিয়াছেন যে বয়কটের উপর যে শিল্প ও বাণিজ্য নির্ভর করিতেছে তাহার ভিত্তি যে কেবল দুর্ব্বল তাহা নহে, সেই শিল্প ও বাণিজ্যকে ভিত্তিহীন বলা যাইতে পারে। পরের অনুগ্রহের উপর এইরূপ শিল্প বাণিজ্যকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়; কারণ যে ব্যক্তি বিদেশী পণ্য পরিবর্জ্জন করিয়া অধিক মূল্যে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করেন, তিনি স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। কেহ যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক এই অনুগ্রহ প্রকাশ করেন

তাহা হইলে আমার কিছুই বক্তব্য নাই, কিন্তু যাঁহারা বয়কট প্রচার করেন তাঁহারা নিজের পকেটে সহজে হাত দিতে সম্মত হন না। আমরা সকলেই জানি যে কেহই ইচ্ছা পূর্ব্বক বিদেশী পণ্য পরিবর্জ্জন করিতে সম্মত হয় না। সামাজিক শাসন ও অন্য প্রকার অত্যাচারের ভয় দেখাইয়া বয়কট প্রচার করা হইতেছে বলিয়াই দেশে এত অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এই অশান্তিকে কিছুতেই সমর্থন করিতে পারা যায় না। কোন লোক যদি এক আনা মূল্যের একখানা বিদেশী দর্পণ ক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে, তাহার রজক ও নাপিত বন্ধ করা হইবে, কেহ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিবে না, তাহার নিমন্ত্রণ কেহ গ্রহণ করিবে না! রাজবিধান অনুসারে ইহার কোন প্রতিকার হইতে পারে না সত্য, কিন্তু সেজন্য কি ইহাকে অন্যায় বলিব না? যুদ্ধ বিগ্রহের সময় যেরূপ সামাজিক অশান্তির আবির্ভাব হয় এইরূপ বয়কটেও সেইরূপ সামাজিক অশান্তি আনয়ন করে।

অমূলক ও ঘৃণাজনক কথার সাহায্যে বয়কট প্রচার করিয়া অনেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করা হইতেছে। বয়কট প্রচারকগণ এখন ইচ্ছা করিলেই এই বিদ্বেষের উন্মূলন করিতে পারেন না। ইহারই ফলে দেশে বিপ্লববাদ প্রচার ও নরহত্যা সংঘটিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ, গৃহদাহ, মিথ্যা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা প্রকার অত্যাচার যে কত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। এই সকল বিধি-বিগর্হিত কার্য্য রাজপুরুষগণের গোচর হইলেই তাঁহারা ইহার প্রতিবিধানে কঠোরতা অবলম্বন করিবেন। আমি এখন কেবল সামাজিক শাসনের কথাই বলিতেছি এবং যদি আমরা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি কামনা করি, তাহা হইলে জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই আমার বক্তব্য। গভর্ণমেণ্ট দেশের শিল্পোন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং রাজপুরুষগণ যদি এই ব্যাপারে দেশীয় জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের ইচ্ছাকে দুরাশা বলা যায় না। ইউরোপীয়গণ এ দেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতেছেন, এই কথা যদি এদেশে প্রচার করা হয় এবং জনসাধারণে উহাতে বিশ্বাস করে, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই দেশীয় লোকের সাহায্য পাইব না। যাহার সহায়তা আবশ্যক তাহার কুৎসা কীর্ত্তন করা সঙ্গত নহে।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের লোকনায়ক আছেন তাঁহাদিগকে আমি অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা কার্য্যে ও কথায় এই সহানুভূতি প্রচার করুন, এবং সকলকে বিদেশী পণ্য বয়কট বিধান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করুন। এই বয়কট বিদ্যমান থাকিলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে সুতরাং দেশের মঙ্গলকর কার্য্যে অর্থের অভাব হইবে।

আমি আশা করি, এই সমিতির কল্যাণে পূর্ব্ববঙ্গের সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণী জাতি-বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া একযোগে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধনার্থ বদ্ধপরিকর হইবেন, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ও সহানুভূতির সঞ্চার হইবে এবং সকলেই বুঝিতে পারিবেন আপনাদের উন্নতি সাধনের জন্য গভর্ণমেণ্ট বাস্তবিকই চেষ্টা করিতেছেন। আমি আশা করি আপনারা আমার

উক্তির সারবত্তা ও সঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমার কথা গুলি মনে রাখিবেন।

পত্রাদি।

আবাদ ধবলাট, সাগরদ্বীপ। পোঃ আঃ
ডায়মণ্ডহারবার।

মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষক সম্পাদক মহশয় সমীপেষু—
মহাশয়,

আপনকার কৃষক পত্রে কৃষি বিষয় জ্ঞান যেরূপ সরল ভাবে পাওয়া যায় তাহা আর বেশী কি বলিব। এক্ষণে এক বিষয় কৃষকের গ্রাহকগণের মনাকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আজকাল সমুদ্র উপকুলে অনেক জমি হাশিল হইয়া আবাদ হইতেছে। কৃষকগণ এখন কেবল ধান্ত আবাদ করে। মৎস্ত প্রচুর পাওয়া যায় ও বীজ বৃক্ষাদি সন্নিকট স্থানে না পাওয়ায় কৃষকগণ শাক সজ্যাদি রোপণ করে না এবং জানেও না। আপনাদের উপর কৃষি বিষয় জ্ঞান প্রাপ্তির বড়ই আশা করি, যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনারা বা আপনার পত্রের প্রবন্ধ লেখকগণ সমুদ্র উপকুলে যে যে বৃক্ষ ও শাক সব্জি হইতে পারে, সেইরূপ তালিকা ও তাহার রোপণ প্রণালী আদি দিয়া প্রবন্ধ লেখেন তাহা হইলে প্রকৃতই এই সকল স্থানের কৃষকদিগের বড়ই উপকার হয়। দক্ষিণ বঙ্গে একটি আদর্শ কৃষি উদ্যান বড়ই আবশুক। অনুগ্রহ করিয়া আপনকার পত্রিকায় সংবাদ ও মন্তব্য কলমে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে বড়ই বাধিত হইব। ফ্রেজারগঞ্জ নামক তাঁহাদের নূতন আবাদে উদ্যান হইলে এবং তথা হইতে বীজাদি স্বল্প মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিলে সুন্দরবন, সাগরদ্বীপবাসী কৃষকদিগের বড়ই উপকার হয়। ভরসা করি অর্দ্ধ শত ক্রোশ দূরস্থিত আপনার গ্রাহকের পত্র কৃষক পত্রে স্থান লাভ করিবেক। ইতি।

পুঃ এখানে আমার ২টা চক বাঁদ মেড়া আছে। জঙ্গল কাটান নাই। যদি কেহ জঙ্গল কাটাইয়া চাষ করে তাহা হইলে আমি বিলি করিব। জমি আন্দাজ ১৫০০/০ বিঘার কম নহে। মেদিনীপুরের লোকেরা প্রায় এখানে ও অন্যান্য স্থানে এইরূপ জমি লয়। অল্প জমি লইলেও তাহা বিলি করিতে পারি। শ্রীলাল বিহারী দত্ত।

গেণ্ডেরিয়া, ঢাকা।

শ্রীযুক্ত 'কৃষক' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
মহাশয়,

আমার কয়েকটী কাঁটাল গাছে এবার প্রচুর পরিমাণে মুকুল বা 'মুচি' হইয়াছে। গা ফুটিয়া সেগুলি বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহার সমস্ত গুলিই ঝরিয়া পড়িতেছে। একটীও টিকিবে কিনা সন্দেহ। অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে উপায় অবলম্বনে গাছে প্রকৃত ফল ধরিতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায়।

[মহাশয় আপনার পত্রের উত্তরে আপনাকে জানান যাইতেছে যে, বোধ হয় রসাভাবে কাঁটালের মুচী গুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহা যদি সত্য হয় তবে আইল বাঁধিয়া জল দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু পোকা লাগিয়াও ঐ প্রকার ঝরিয়া পড়া সম্ভব। তাহা হইলে ভালরূপ অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়া পাঠাইলে স্বতন্ত্র ব্যবস্থার কথা বলা যাইতে পারে।]

মাননীয় 'কৃষক' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
A query.

আমাদের নিজেদের একটী সব্জী বাগ আছে। বাগানটী এক মজা পুষ্করিণীর পাড়ে স্থাপিত।

আজ কএক বৎসর ধরিয়া এই বাগানে আলু, বেগুন, কপি প্রভৃতি তরিতরকারির আবাদ হইয়া আসিতেছে। এবৎসর কপির আবাদ বেশী হইবে বলিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে পাঁক মাটি ও গোবর সার (Nitrogen manure) প্রয়োগ করা হইয়াছিল। প্রথম ভাদ্রেই জলদী ফুল কপির চারা বসান হয়। এবার এদেশে শেষ বর্ষা দেখা দেয় নাই, সেই কারণে কপির চারা গুলি অতি সুন্দর রূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ফুল ধরিবার সময় এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলু পোকার (রেশম কীট) ন্যায় ক্ষুদ্র কীটে সমস্ত গাছের পাতা ও ভিতরের কোমল ডগাগুলি খাইয়া ফেলিতেছে, ভিতরের কোমল ডগার পোকা গুলির রং দেখিতে সাদা এবং পাতার পোকা গুলির বর্ণ সবুজ। Sulphate of copper lotion, হুকার জল Phenoline lotion প্রভৃতি যত প্রকার Antiseptic step লওয়া পল্লীগ্রামে সম্ভব তাহা লইয়াও কোন ফল পাওয়া গেল না। অগত্যা অতিরিক্ত মজুর লাগাইয়া পোকাগুলি মারিয়া ফেলা হইতেছে, কিন্তু পর দিবসে আবার রক্ত বীজের ন্যায় কোথা হইতে অসংখ্য কীটমণ্ডলী আসিয়া কচি মলাএম পত্র গুলি অধিকার করিয়া বসিতেছে। ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে এরূপ অসংখ্য কীটের উৎপত্তি এক মাছিতা (মক্ষিকার ডিম্ব) ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাণী দেহের ক্ষত ও পুরীষ ভিন্ন সব্জী পত্রে মক্ষিকার ডিম্ব প্রসব করিবার কোন হেতু আছে বলিয়া অনুমান হয় না। ঘুষ্‌রার ডিম্ব হইতে ও মক্ষিকার ডিম্বের ন্যায় কীটের উৎপত্তি হয় শুনিতে পাওয়া যায়; এই সমস্ত কীট ঘুষ্‌রা পতঙ্গের কীট কি না তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে না। ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার সময় অনেক ঘুষ্‌রাও দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় অন্যান্য বাবুদের কপির ক্ষেত—যাহা পুকুর বা ডোবার ধারে নহে সেই সমস্ত কপিতে ও এবার এইরূপ পোকা ধরিয়াছে কিন্তু সংখ্যায় অনেক কম। একজন বহুদর্শী কৃষকের পরামর্শ মতন ঘোলের সহিত কিছু কেরোসিন তৈল মিশ্রিত করিয়া গাছে ছিটাইয়া দেওয়ায় কিছু ফল পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই lotion strong করিলে কপির গাছ মরিয়া যায়, আবার mild করিয়া করিয়া ছিটাইয়া দিলে কোন ফলই পাওয়া যায় না। বড় লোকে সখ করিয়া মজুর দিয়া পোকা মারিয়া হয় ত কিছু কপি রক্ষা করিতে পারে, তাহাকে আর কপির আবাদ করা বলে না সেটা কেবল সখের খেলা মাত্র। গৃহস্থলোক যাহারা ব্যবসার জন্য Extensive Cultivation আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে এরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইলে উপায় কি? সেই জন্য এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে কি প্রকারেই বা এই প্রকার কপি পোকার উৎপত্তি এবং কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা এই সমস্ত কীট সমষ্টি সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে? ইহার মূল কারণ কি? বাগানের এবং সার প্রয়োগের সমস্ত বিবরণ উপরে বিশদ ভাবে লিপি বদ্ধ করিয়াছি, তাহা হইতে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার কীটের এরূপ অত্যধিক উপদ্রবের কারণ নির্ণয় করিতে পারা যাইবে কি না? আশা করি আমার এই দীর্ঘ পত্র কৃষকে প্রকাশিত হইলে হয় ত কোনও না কোন Man of Practice ইহার প্রকৃত বিধান অনুমান করিতে সক্ষম হইবেন। আমাদের পুঁথি গত বিদ্যায় ইহার কোন কিনারা হইয়া উঠিল না।

ভবদীয়,

শ্রীজগৎ প্রসন্ন রায়।

জমিদার, চন্দনপুর,

জেলা খুলনা।

মান্যবর কৃষক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
মহোদয়,

আমার প্রায় ৫০০ শত দ্রোণ জমি জলাভাবে চাষের অনুপযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও জমিতে জল উত্তোলন করিতে পারিতেছি না। প্রায় ২০।২৫ হাত নিম্নে এক স্রোতস্বতী নদী আছে, তাহাতে অর্দ্ধ হাত জল প্রায় ৮ হাত বিস্তার হইয়া বহিয়া যায়; সেই স্রোতস্বতী জমিন হইতে জল চুষিয়া লইয়া যায়, বাঁধ দিয়া বদ্ধ করিয়া রাখাও সাধ্যাতীত। ঐ স্রোতস্বতী হইতে সিউনী দ্বারা জল উঠানও সম্ভবপর নহে। কোনক্রমে ঐ স্রোতস্বতীর জল উঠাইয়া জমিতে ঢালিতে পারিলে নানাশস্যে ক্ষেত্র পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। তাই বিশেষরূপে সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে, যদি আপনারা আমাকে একটী মেসিন অর্থাৎ ২০।২৫ হাত নিম্ন হইতে জল উত্তোলনের একটী যন্ত্র যোগাড় করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে বড়ই বাধিত হইব।

সঞ্জীবনী পত্রিকায় দেখিলাম বেহার প্রদেশে কূপ হইতে জল উত্তোলন করিবার উপায় নির্দ্ধারণে একটী ইংরাজি বহি ছাপা হইয়াছে, ঐ পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানার জন্য সঞ্জীবনী সম্পাদকের নিকট পুনঃ পুনঃ অনুরোধ-পত্রিকা লেখা স্বত্বেও এ সম্বন্ধে কিছুই উত্তর দিলেন না। আপনারা যদি ঐ গ্রন্থকারের নাম ও ঠিকানা জানেন আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। প্রায় ১২০/ বিঘা জমি খুব সুবিধা মতে বিলি করা হইবে বলিয়া মাঘ মাসের ৯ম খণ্ডের ১০ম সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া সেই ঠিকানা ও সেই সম্বন্ধে বিবরণ জানাইবেন। ইতি।

বশম্বদ, শ্রীমনোমোহন দাস,—জমিদার,
মির্জাপুর, চট্টগ্রাম।

[হ্যাণ্ডি অথবা সেমি-রোটারি উইং পম্প (Handy or Semi-Rotery Wing Pump) নামক এক প্রকার পম্প আছে। উহা চাকার উপর বসান এবং ঘণ্টায় ৩৭ হইতে ৬২ মণ জল উত্তোলন করে। মূল্য ১৩০৲ টাকার অধিক হইবে না।—বিহার প্রদেশে কূপ হইতে জল সিঞ্চন বিবরণ পুস্তকের নাম Report on the Possibility of well irrigation in Behar and Chhota Nagpur, by N. N. Banerjee, মূল্য ৷৷০ বার আনা। পুস্তক কৃষক আফিস হইতেই পাওয়া যাইতে পারে।—মাঘ মাসে প্রকাশিত জমির বিষয় আপনাকে পরে জানান হইবে। কৃঃ সঃ।]

পাট ও শণ চাষের আধিক্যই অন্নকষ্ট ও রোগের কারণ।

(কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।)

পাট ও শণ চাষের আধিক্যে দেশের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার কতিপয় আভাস পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, এক্ষণে ইহার অনুকূলে দেশের যিনি যাহাই বলুন বা লিখুন না কেন, আমরা কিন্তু ঠেকিয়া শিখিয়াছি, সুতরাং ইহার প্রতিকূল ভিন্ন অনুকূলে কখনই লিখিতে পারিব না॥ অদ্য আমাদের অবশিষ্ট যাহা কিছু বক্তব্য ছিল তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল। আমরা পাট ও শণের চাষ যে একেবারেই তুলিয়া দিতে বলিতেছি এরূপ কেহ মনে করিবেন না। সম্ভব মত উহার চাষ রাখিয়া বাকী অধিকাংশ জমিতে খাদ্য শস্যের বপনই বাঞ্ছনীয়। অগ্রে অন্নের সংস্থান করিয়া লইয়া পরে অর্থাগমের উপায়

দেখিলেই ভাল হয়। আরও দেখুন পাট ও শণের ক্রেতা বিদেশীয় বণিক, তাহারা যে হারে উহার মূল্য ধার্য্য করিয়া দিবেন, আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই সেই দরে বিক্রয় করিতে হইবে। আমাদের নিজের জিনিস নিজের ইচ্ছামত দরে বিক্রয় করিতে পারিব না, ইহা কি কম ক্ষোভের বিষয়? আর উৎপন্ন বেশী হইলেই দরেরও সুলভতা হইয়া থাকে, এ কথা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না, সুতরাং উৎপন্ন কম হইলে, অথবা জিনিসের অপ্রাপ্তি ঘটিলে স্বভাবতঃই দর চড়িয়া থাকে। অতএব এক্ষণে ১০ বিঘার উৎপন্নে আমাদের যে লাভ হইতেছে, কালে হয় ত ৪।৫ বিঘার উৎপন্নেই সম আয় বা তদূর্দ্ধও হইতে পারে। তবেই দেখুন এদিকে অর্থাগমের পথও রুদ্ধ হইল না, অথচ বেশী পরিমাণে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হওয়ায় ক্রমশঃ "হা অন্ন হা অন্ন" রবও প্রশমিত হইতে পারে। ইহা মনীষি ব্যক্তি মাত্রেরই বিবেচনাধীন।

পাট ও শণ চাষের আধিক্য হওয়াবধি বিস্তর মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ চাকরীর বাজার যেরূপ দুর্ম্মূল্য তাহাতে অল্প শিক্ষিত লোকের চাকরী মিলাই দুষ্কর। যদিও অদৃষ্ট ক্রমে পাওয়া যায় তাহাতে গুজরাণ চলে না।

চাষার ছেলের আর একটী সুযোগ হইয়াছে। দেশে নিম্ন শিক্ষার বিস্তার হইয়া কোনরূপ যোগে জাগে নিম্ন প্রাথমিক পাশ হইতে পারিলেই হইল, তাহা হইলেই তাহার ৪।৫৲ টাকা মাসিক বেতনের একটী চাকরী খাড়া হইল, সেও আর লাঙ্গলের মুটী ধরিয়া তাহার টকিং ও বিলাতী বিনামার অপমান করিতে ইচ্ছুক নহে। উক্ত বেতনে একজন ভদ্রলোকের ছেলের নিজেরই গুজরান চলে না; তদুপরি পরিবারবর্গ আছে, কাজেই ভদ্রলোক বিশ হাত পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতেছে। চাষার ছেলে তাহা বুঝিবার পাত্র নহে, কারণ তাহার "নাম কেনা" চাকরী, এবং চাকুরীয়া মাত্রেই "বাবু" উপাধিতে বিভূষিত, আজকাল কাহারও ভিন্নভেদ নাই, সুতরাং এই সুযোগ ছাড়িব কেন?

অনন্তর যে সকল পুকুরে ও ডোবায় পাট ও শণ পচান হয়, সেই সকল পুকুরের জল একেবারেই অব্যবহার্য্য হইয়া যায়, দুর্গন্ধে তাহার পাশ দিয়া যাওয়াও কষ্টকর বিবেচিত হয়। যদি এই সকল ডোবা গ্রামের মধ্যে কি পার্শ্বে থাকে, তাহা হইলে তো আরও সোণায় সোহাগা, যখন সেই দূষিত জল হইতে ভাদ্র আশ্বিন মাসে সূর্য্যোত্তাপে গ্যাস উঠিতে আরম্ভ করে, তখন সেই পল্লী ম্যালেরিয়া ও বিসূচিকার লীলাক্ষেত্র হইয়া শ্মশানভূমে পরিণত হইবার উপক্রম হয়। আবার ঐ দূষিত জল যে কেবল মনুষ্যের অনিষ্ট করে তাহা নহে, গবাদি পশু কোন প্রকারে পান করিলে তাহারও নিস্তার নাই। কেননা কোনরূপ একটী রোগাক্রান্ত হইয়া শমন সদনে প্রেরিত হইবেক, ইহা আমরা চাক্ষুষ দেখিতেছি। আরও দেখুন যে সকল ডোবা কি পুকুরে পাট বা শণ পচান হইতেছে, সেই সকল পুকুরের জল এতদূর দূষিত হইয়া পড়ে যে ঐ জলের কসে মৎস্যগণ পর্য্যন্ত তিষ্ঠিতে পারে না। বিস্তর মাছ মরিয়া ভাসিতে থাকে, জালিকগণ ঐ সকল মাছ ধরিয়া আনিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া হাট বাজারে বিক্রয় করে ও লোকে অজানিত ভাবে ক্রয় করিয়া শেষে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই রূপে ডোবা পুকুর ও খাল বিলাদির মৎস্যকুল দিন দিন নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে। আজকাল মৎস্য এতদূর দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে যে, পূর্ব্বের তুলনায় চতুর্গুণ

অপেক্ষাও বেশী বলিতে হইবেক। রুই, কাতলা ইত্যাদি ভাল ভাল বৃহৎ মৎস্য খুব সামান্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য ইহার প্রতিকার কল্পে স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব অধিকারস্থ প্রজাবর্গের মধ্যে বার আনা রকম ধান্যাদি খাদ্য শস্য ও বাকী চারি আনা পাট ও শণ বুনিবার জন্য আদেশ প্রচার করেন, তাহা হইলে আমরা আশা করি ২।৩ বৎসরের মধ্যেই এই মহার্ঘ্যতা প্রশমিত হইয়া দেশের প্রজা রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য হইতে পারে। নচেৎ অপরিণামদর্শি কৃষক শেষে নিজেও মারা যাইবে ও দেশের প্রজা বিধ্বংসেরও হেতু হইবে।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে যদিও জল হইয়াছে তথাপি তাহার পরিমাণ এত কম যে তাহাতে ক্ষেত্রস্থ ফসলের কোন উপকার হয় নাই। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনেক স্থানে বৃদ্ধি পাইয়াছে, রিলিফের কাজ অনেক স্থানে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সুচারুরূপে কার্য্য চলিতেছে না।

যুক্ত প্রদেশঃ—ইটাওয়া ভিন্ন সর্ব্বত্র বৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি অনেক স্থানে বৃষ্টির অভাব অনুভব হইতেছে। খেরীতে বৃষ্টি না হইলে শস্ত হানি হইবে। হরদয়, ভারাইচ, কানপুর ও সীতাপুরে শস্তের অবস্থা ভাল নহে। ভারাইচে ও বাস্তিতে পুর্ত্তকার্য্য খোলা হইয়াছে। উভয় স্থানে ক্রমান্বয়ে ৬,৪৬১ ও ২৮৮৪ জন লোকে খাটিতেছে। ১৩টী জেলায় শীলা বৃষ্টিতে এবং ২টীতে তুষার পাতে শস্তের অনিষ্ট হইয়াছে। ৩টী জেলায় খাদ্য শস্যের দর চড়িয়াছে, ৪৮টী জেলায় কম হইয়াছে, অপর গুলিতে সমভাব আছে।

পঞ্জাবে গমের আবাদ।—২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯০৯। গমের আবাদী জমির পরিমাণ উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত ৮,৩০৬,৯০০ একর। ইহার মধ্যে ৪,৭৮০,৯০০ একর জমিতে জল সেচনের বন্দোবস্ত আছে, ৩,৫২,৬০০ একরে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর। বিগত বর্ষের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে সুবৃষ্টি হওয়ায় কাঙ্গরা, শিয়ালকোট, সাপুর, রাওলপিণ্ডি এবং গুজরাটে অনেক অধিক জমিতে গমের আবাদ হইয়াছে। অনেক স্থানে ম্যালেরিয়ার অতিশয় প্রকোপ বশতঃ সময় মত গমের আবাদ হয় নাই। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে নাবী বুনানি হইয়াছে। ১৯০৬-০৭ সালে গমের আবাদীর জমির পরিমাণ ৯,১০০,১০০ একর ছিল সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান বর্ষে গমের চাষ তদপেক্ষা অনেক কম। জানুয়ারি মাসে বৃষ্টির মাত্রা অত্যন্ত কম হইয়াছে। চারিদিকে বৃষ্টির অভাব হইয়া পড়িয়াছে। নিম্ন জমির এবং যে সকল ক্ষেত্রে জল সেচনের সুবিধা আছে তথায় শস্যের অবস্থা ভাল কিন্তু হিসার, রোটক, গুরগাঁও, দিল্লি, কর্ণাল, মুলতান এবং দেরাগাজিখাঁতে সেচন জলের সুবিধা নাই সুতরাং ক্ষেত্রস্থ শস্যের অবস্থা ভাল নহে।

বঙ্গদেশে গমের আবাদ।—১৯০৮-০৯। গমের আবাদ যথা সময়ে আরম্ভ হইয়া ভাল রূপ চলিতে থাকে, কিন্তু বিগত আশ্বিন মাসের শেষ ভাগ হইতে আদৌ সুবৃষ্টি না হওয়ায় সকল জমিতে গম বোনা হইয়া উঠে না এবং জলদী বোনা গম ও নষ্ট প্রায় হইয়া আসিতেছে। মাঘ মাসের শেষে

কোথাও কোথাও বৃষ্টি হওয়ায় গমের অনেক উপকার দর্শিয়াছে বটে, কিন্তু বিহার অঞ্চলে এত সামান্য মাত্রায় বৃষ্টিপাত হইয়াছে যে তাহাতে গমের কোন উপকার দর্শিবে না। বঙ্গদেশের মধ্যে এই বিহার অঞ্চলেই গম সমধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

অন্য বৎসর অপেক্ষা কিন্তু এবৎসর গম চাষের জমির পরিমাণ অধিক। বিহারেই অধিক জমিতে গম চাষ হইয়াছে। উপযুক্ত রসাভাবে যে সকল জমিতে ধান উৎপাদন করা সহজ নহে তাহাতেই এখন গম চাষ হইতেছে।

পঞ্জাবে তৈল শস্য।—১৯০৮-০৯। বর্ত্তমান বর্ষে প্রায় ১,০৭২,৫০০ একর জমিতে তৈল শস্যের আবাদ হইয়াছে। বিগত পৌষ এবং মাঘ মাসে বৃষ্টি হওয়ায় আবাদী জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে, তথাপি দেখা যায় যে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা আবাদী জমির পরিমাণ কম। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এবৎসর এখনও তৈল শস্যে তেলা পোকার উপদ্রবের কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই; কিন্তু রোটকে ফড়িং লাগিয়া কিছু ক্ষতি হইয়াছে এবং দেরাগাজিখাঁতে তুষারপাতে অনিষ্ট হইয়াছে।

সার-সংগ্রহ।

সিন্ধুদেশে পশু রক্ষণ।

উক্ত প্রদেশের করাচি জেলায় চাষীগণ পশুকুলের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছে। মেজর ট্রাইডেল সাহেবের বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, তাহারা ভাল ভাল গাভী সংগ্রহ করিতেছে এবং তাহাদের বংশোন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট জাতীয় ষণ্ড নির্ব্বাচন করিয়া প্রতিপালন করিতেছে। ট্রাইডেল সাহেব বলেন যে, চাষীরা মনোযোগ করিলে সহজেই পশুবংশের উন্নতি সাধন করিতে পারে। সিন্ধুপ্রদেশের অন্যান্য জেলায়ও কর্ম্মপোযোগী হলবাহী বলদ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। উক্ত প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট পশু সংরক্ষণের জন্য একটি বিভাগ খুলিবার কল্পনা করিতেছেন। কেবল গভর্ণমেণ্ট ট্রাইডেল সাহেবের অভিমতের অপেক্ষা করিতেছেন। এক্ষণে সিন্ধুপ্রদেশে উক্ত কার্য্য তত্ত্বাবধারণ জন্য ছয় জন মাত্র কর্ম্মচারী আছেন।

যুক্তপ্রদেশে ইক্ষু চিনি।

ভারতীয় চিনির প্রধান উৎপত্তিস্থান যুক্তপ্রদেশ। সার জন হিউয়েট বলিয়াছিলেন যে, তিনি সেই দিন ধন্য মনে করিবেন, যে দিন ১ টনও বিদেশী চিনি যুক্তপ্রদেশে আমদানী হইবে না। তাঁহার কথা সামান্য মাত্রায়ও পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, বিদেশী চিনি রপ্তানির মাত্রা দিন দিন বাড়িতেছে। বিগত বর্ষের নভেম্বর মাসে যুক্তপ্রদেশে ১৫৫ লক্ষ টাকার চিনি আমদানী হইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসরের আমদানীর পরিমাণ ৯০॥০ লক্ষ টাকা। জাভা মরিসস্ হইতে প্রায় ⅘ অংশ চিনি আমদানী হয়। ১৮৯৫ সালে ভারতে ২৪৭টী চিনির কারখানা ছিল। ১৯০০ সালে ২০৩টী এবং ১৯০৮ সালে ঐ সংখ্যা কমিয়া ৩০টী দাঁড়াইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র ভারতে ৬০৩ লক্ষ মুদ্রার বিদেশী চিনি আসিয়াছে। গত বর্ষে আমদানীর মূল্য ১,০০৪ লক্ষ মুদ্রা। বিদেশী চিনির মূল্য প্রতি মণ ৯৲ টাকা মাত্র, দেশী চিনির মূল্য সেই স্থলে ১২৲ এবং খাঁটি কাশির চিনি ১৬৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না। নিঃস্ব ভারতবাসীর আর কত দিন ধর্ম্মের বন্ধন ঠিক থাকিবে?

তাহাদের মধ্যে অনেকেই সস্তার খাতিরে ধর্ম্মের বাঁধন কাটিয়া বিদেশী চিনি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে। দেশে সস্তায় চিনি উৎপন্নের কোন উপায় না হইলে বিষম ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

মাটবাদামের মাখম।

মাটবাদাম প্রধানতঃ ভারতে উৎপন্ন হয় এবং এখান হইতে তৈলের খাতিরে উহা আমেরিকা ও ইউরোপে প্রেরিত হয়। উহা হইতে প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ তৈল উৎপন্ন হয়। সম্প্রতি উহা হইতে মাখম প্রস্তুত হইতেছে--এখানে নহে—আমেরিকায়। অতি সহজেই মাখম প্রস্তুত হয়। খোসা ছাড়ান বাদাম গুলি রৌদ্রে বা অগ্নির তাপে ভালরূপ শুখাইয়া লইলে কোন একটা কাপড়ের উপর ঘসিলেই উহা হইতে লাল ত্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া হামানদিস্তায় গুঁড়াইলে ক্রমে উহা এক প্রকার খাসায় পরিণত হয়। ইহাই আমেরিকায় মাখমের মত অনেকে সাগ্রহে ব্যবহার করিতেছে। এই গেল সহজ উপায় কিন্তু আমেরিকাবাসীরা মাখম তৈয়ারির সহজতর উপায়ের জন্য ১৫ বৎসর কাল চেষ্টা করিতেছেন এবং নানা প্রকার কলকব্জার উদ্ভাবন করিয়াছেন। ফিলাডেলফিয়া নিবাসী মার্শাল, মিচিগান কোম্পানীর ল্যাম্বার্ট সাহেব অবশেষে যে কল নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাতে প্রতিদিন ২,০০০ পাউণ্ড মাখম তৈয়ারি হইতে পারিবে। কলের সাহায্যে মাটবাদাম শুখান (Rousting), পরিষ্কার করা ও গুঁড়া করিয়া খাসা করা চলিবে। এই কার্য্যের জন্য এক ঘোড়ার জোর ওয়ালা একটী বৈদ্যুতিক মোটরের আবশ্যক। সাজ সরঞ্জম সমেত কলটীর দাম ৬০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৬০০৲ টাকা। যখন এখান হইতে মাটবাদাম যাইয়া আমেরিকায় মাখম হইতেছে, তখন এখানে না হইবে কেন? কিন্তু এখানে চেষ্টা কই ?

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

আলু ও কপি চাষে লাভ।—এক একরে ৭৩৫৲ টাকা। আমাদের দেশে নহে—ইংলণ্ডের ওয়্যানিকেণ্ট নগরে। যাহা তথায় সম্ভব তাহা এই সুজলা সুফলা ভারত ভুমিতে কিছুতেই অসম্ভব নহে। পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট জমিতে ক্রমান্বয়ে আলু ও কপির চাষ করা হইয়াছিল। অপর্য্যাপ্ত সার প্রয়োগের গুণে এক্ষটা ফল প্রসব করিয়াছে। খুব জলদী জাতীয় আলুর চাষ করা হইয়াছিল। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সে আলু ফসল তৈয়ারি করিয়া বিক্রয় করা হয়। তারপরই কপি বসান হয় সে কপি অক্টোবর মাসেই তৈয়ারি হইয়া যায়। উক্ত মাসের ২৮শে তারিখের মধ্যে কপি বাজারে বিক্রীত হইয়াছিল। ভারতীয় মুদ্রায় হিসাব করিলে আলুর দাম ৫৫৫৲ টাকা। আলু চাষের খরচ বাদে খাঁটি লাভ ২৮৫৲ টাকা। কপি বিক্রয় করিয়া ৬০০৲ টাকা আয় হয়, খরচ বাদে লাভ ৪৫০৲ টাকা। দুইটী মিলাইয়া মোট লাভ ৭৩৫৲ টাকা। একর প্রতি ২৫ গাড়ী গোয়ালের সার প্রদান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ৮৴ মণ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হইয়াছিল। জমি চাষের খরচ যে পরিমাণে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা যেন কিছু অধিক মনে হয় কারণ সেই জমিতে এবৎসর বিনা সারে জৈ ভালরূপ জন্মিয়াছে।

ব্যবহারিক ও রাসায়নিক বিদ্যা শিক্ষার্থ বিজ্ঞানালয়।—বোম্বাই প্রদেশে অধ্যাপক গজ্জর ঐরূপ একটী বিজ্ঞানালয় স্থাপন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের গভর্ণর ঐ বিজ্ঞানালয়টী দেখিতে গিয়া বড় সহানু-

ভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে একটী অভিনন্দন প্রদান করে, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে অধুনা ভারতে কেবল মামুলি লেখা পড়া শিখিয়া কোন বিশেষ উপকার হয় না। ব্যবহারিক ও রাসায়নিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে না পারিলে আর কিছুতেই চলিবে না। বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এইরূপ শিক্ষা প্রদান করার কোন বন্দোবস্ত এতাবৎকাল ছিল না। সেই অভাব দূর করিবার মানসে সেন্ট্রাল ইনিষ্টিটিউসন স্থাপিত হইয়াছে। অধ্যাপক গজ্জরের বিজ্ঞানালয়টী আধুনিক শিক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায় হইলে দেশের অনেক হিতসাধন হইবে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

চৈত্র মাস।

সব্জী বাগান।—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসের জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সিঞ্চন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স ও ফোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টা দানা মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদী ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিয়া থাকে।

কৃষিক্ষেত্র। এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউস ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁকমাটী ও সার দিতে হয়। এখানে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য মনে পড়িয়া গেল। "ফাল্গুনে আগুন, চৈতে মাটী, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটী দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এই মাসেই ধঞ্চে, পাট, অরহর, আউস ধান বুনিতে হয়। চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে, কিন্তু নাবী ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—বিলাতী মরসুমী ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল। শীতেরও শেষ হইল, গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগোনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্‌ট, পপি, ষ্টাষ্টারসম, ফ্লক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদী লিচু যাহা এই সময় পাকিতে পারে, সেই লিচু গাছে জাল ঘিরিতে হইবে।

REGISTERED No C.192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



নবম খণ্ড,—১২শ সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,

সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

চৈত্র, ১৩১৫।

মিলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত :

১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।



কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

কৃষক।

৯ম খণ্ড। চৈত্র, ১৩১৫ সাল। ১২শ সংখ্যা।

গো-পালন।

(মাঘ মাসে প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে ঐরূপ অযত্নে ও অপালনে যে সকল দুর্ব্বল হ্রস্বকায় বৎস প্রস্তুত হয়, তাহারাই পরবর্ত্তী সময়ে চাষের একমাত্র অবলম্বন ও সহায় বলদে পরিণত হইয়া ভূমিকর্ষণ কার্য্যে নিয়োজিত হয় এবং গাভীরূপে দুগ্ধ প্রদান করিয়া আমাদিগকে এবং আমাদিগের সন্তান সন্ততিগণকে পোষণ করে। গো-কুল নির্ম্মূলের আর একটি বিশেষ কারণ এই যে, উপযুক্ত ষণ্ড এ প্রদেশে একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ ত্রিশ খানি গ্রাম অন্বেষণ করিলেও ষাঁড়ের মত ষাঁড় একটাও মিলিবে না। ঢাকা জেলা প্রভৃতির ন্যায় মুসলমানগণ দ্বারা খোদাই ষাঁড় ছাড়িয়া দেওয়ার পদ্ধতি এদেশে না থাকিলেও, একটু সঙ্গতিপন্ন হিন্দু মাত্রেই পূর্ব্বে পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে হৃষ্টপুষ্ট বৎস বাছিয়া লইয়া, তাহার পশ্চাৎপদের জানুর উপরিভাগে উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহ শলাকা দ্বারা বামে চক্র ও দক্ষিণে ত্রিশূল চিহ্নিত "দাগ" দ্বারা দাগাইয়া দিয়া, শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রথম বৎসর উহাকে অতি যত্নে লালন পালন ও ভক্ষ পানীয় প্রভৃতি দানে প্রতিপালন করিত। হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন এই যে, বর্ষকাল মধ্যে বৎসের মৃত্যু [illegible] শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে প্রথমবারের ন্যায় পুনরায় বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। নচেৎ তাঁহার সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ড হইয়া পিতামাতার সদ্গতির বাধা হইবে। বৎসর অতীত হইলে তাহাকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। পূর্ব্বে এক এক হিন্দুপল্লীতে পাঁচ সাত দশ বা ততোধিক বৃষকে স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ করিতে দেখা যাইত। কালক্রমে হিন্দুর ঐ মন্ত্রপূত, ত্রিশূল চিহ্নে চিহ্নিত, সাধারণ প্রজার অশেষ হিতকারী ষণ্ডসমূহ "কাহারও অনুমতি সাপেক্ষ না হইয়াই" কলিকাতা সহরের বহু দূরবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বের জেলা সমূহ হইতে, সহরের মিউনিসিপালিটির অনুচরগণ দ্বারা ধৃত করাইয়া, ময়লা পরিষ্কার করা গো-যান (Scavengers' cart) সমূহে যোজনা করিয়া, বলদ ক্রয়ের অর্থ অপচয়ের হস্ত হইতে মিউনিসিপাল তহবিলের খরচ হ্রাস করিয়া ফেলা হইল। কিন্তু ইহা লইয়া বহু বাদ প্রতিবাদ হইলেও ষণ্ড অপহরণ কার্য্য অবাধে চলিয়া আসিতেছে, এবং ষণ্ড রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে। অধিকন্তু আবার কালবশে স্বার্থ-

পরতার প্রবল স্রোতে গোবংশ বর্দ্ধনের একমাত্র উপায়, গৃহস্থ সাধারণের পরম হিতকারী একটী মাত্র বৃষভের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেও পল্লীবাসীগণ সম্মত নহে; বরং মুক্ত বৃষ পাইলে মুসলমানগণ পরম লাভ মনে করিয়া, উহাকে চুরি করিয়া একটু দূরদেশে লইয়া যাইয়া ক্লীবত্বে পরিণত করিয়া কৃষি-বলদরূপে ব্যবহার করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বৌদ্ধ-রাজ অশোকের রাজত্বকালে তিনি পশু ও পক্ষী ক্লীব করা রহিত করেন। কিন্তু রাজশাসন সত্ত্বেও ঐ কার্য্য অবাধে চলিয়া আসিতেছে। আবশ্যকানুরূপ ষণ্ড রক্ষা না করিয়া একার্য্য অবাধে চালান যে কতটা অনিষ্টকর, তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। এক্ষণে রাজশাসন ত নাই, গো-পালনে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কাহারও তাদৃশ আগ্রহ দেখা যায় না। পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সততঃ পরতঃ গো ও ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতেন। তাঁহাদের জ্ঞান ছিল যে ধরিত্রীকে রক্ষা করিতে গেলে এতদুভয়ের রক্ষা সর্ব্বাগে আবশ্যক। ব্রাহ্মণ-গণ শিক্ষা, দীক্ষা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের ভার লইতেন। তাঁহারা যাগযজ্ঞ করিতেন। যজ্ঞীয় ধূম হইতে মেঘ উৎপন্ন হইত। মেঘ (পর্জ্জণ্য) হইতে অন্ন উৎপাদনের সহায়তা হইত। এখন অনেকে কামান কিম্বা বোমা ছুড়িয়া কৃত্রিম উপায়ে আকাশে মেঘের সঞ্চার করিয়া বৃষ্টির কল্পনা করিতে পারেন, তথাপি যাগ যজ্ঞের দিকে কাহারও আর ততটা আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে কলের লাঙ্গলাদির দ্বারা ভূমি কর্ষণের চেষ্টা হইতেছে; বিলাতি দুগ্ধ আনাইয়া সন্তান পালনের ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু সহজ উপায়, নিঃস্ব ভারতের প্রকৃষ্ট উপায়, গাভী পরিচর্য্যা ও যজ্ঞীয় ষণ্ড রক্ষার স্পৃহা ক্রমে হিন্দু মাত্রের হৃদয় হইতে চলিয়া যাইতেছে। ধনী লোকের কথা দূরে থাকুক, এমন কি কৃষককুমারেরা যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংস্থান করিতে পারিলেই মেলার বাজার দেখিতে গিয়া, কলিকাতার বাজারের ৫৲ টাকা মূল্যের বিলাতী জুতা, জর্ম্মানির সাত সিকার ছাতি তিন টাকা মূল্যে ক্রয় করিবে, ও পান এবং সিগারেটে দুই টাকা ব্যয় করিয়া আসিবে, তথাপি গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য সামান্য ব্যয়, সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিবে না। ইহাই বোধ হয় ইংরাজের ভারতশাসনের নিজস্ব স্বাতন্ত্র বিধান ও পরিণামের ফল এবং বর্ত্তমান আদর্শ বিলাতী শিক্ষার কলঙ্ক; কিন্তু ইংরাজের আপন দেশে বোধ হয় এরূপ বিপর্য্যয় ঘটনা বিদ্যমান নাই।

সে কালে ষাঁড় যথেচ্ছা চরিয়া খাইয়া বেড়াইত; চাষীর কিম্বা গৃহস্থের সহস্র ক্ষতি করিলেও কেহ তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিত না। এখন তাহাদের পৃষ্ঠে লগুড় আঘাতের ত কথাই নাই, অধিকন্তু ধরিয়া বাঁধিয়া থানায় থানায় ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত খোঁয়াড়ে চালান দেওয়া হয়, এবং মালিক অভাবে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া সরকারি ভার বহন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে অকারণ গোহত্যা নিষিদ্ধ কিনা মুসলমান শাস্ত্রদর্শী মৌলবী-গণই বলিতে পারেন। কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে হিন্দুগণ প্রতি পল্লিতে পল্লিতে গবাদির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং চৈত্র সংক্রান্তি, অম্বুবাচী, গোষ্টাষ্টমী প্রভৃতি পালপার্ব্বণে গাভী ও বৃষগণকে ভাল করিয়া স্নান করান, হরিদ্রা চন্দনাদির লেপন করা ও নানা সাজ সজ্জায় ভূষিত করিয়া গবাদির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে দেখা যাইত। এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায় দুগ্ধাদি অভাবে Dairy Farm (গোশালা) স্থাপনের চেষ্টা করিতে-

ছেন। সে গুলি এক একটী বৃহৎ ব্যাপার ও বহু আয়াসসাধ্য। কিন্তু যখন সকলের প্রাণ গো-পালনে অনুপ্রাণিত ছিল, তখন তাহাদিগকে এই বহ্বারম্ভের কথা ভাবিতে হইত না।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পাট বা নালিতা।

(প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত।)

পাট বা নালিতা জিনিসটা আমাদের নূতন নয়। পুরাকাল হইতে শাকের জন্য আমরা নালিতা ব্যবহার করিয়া আসিতেছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দড়িদড়া এবং ছালার জন্য আমরা পাটের আঁসও কিছু কিছু ব্যবহার করিয়া আসিতেছি।

ঘিয়া বা মিঠা নালিতা।

(Corchorus olitorius.)

ঘিয়া বা মিঠা নালিতা বর্ষাকালে কলিকাতা অঞ্চলে অনেক স্থানে চাষ হয়। ইহার গাছ ৩।৪ হাত লম্বা হয়। গাছের গায়ে ক্ষুদ্র রোঁয়া থাকে না, কিন্তু পত্রের বোঁটার (Petiole) শেষার্দ্ধ এবং পত্রশিরাগুলি (Veins) কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রোঁয়াযুক্ত। পত্র সরল, লম্বা, গোল, তিতা পাট অপেক্ষা গোলই বেশি, লম্বা কম। পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়া থাকে। পত্রের কিনারাতে করাতের দাঁতের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। পুষ্প-কাণ্ডে (Peduncle) ২।১টি মাত্র ফুল জন্মে। পুষ্প ক্ষুদ্র, হরিদ্রাবর্ণ। পুষ্পের বহিরাবরণে (Calyx) পাঁচটি পৃথক অংশ (sepal)। ফল প্রায় নলাকার লম্বা ঈষদ্বক্র। ফলের অগ্রভাগ সরু (beaked)। ফলের গায়ে লম্বালম্বি ১০টি করিয়া গভীর রেখা। ফলের ভিতর পাঁচটি পরদা দ্বারা পাঁচটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে অনেকগুলি করিয়া বীজ থাকে। বীজগুলিও পরদা দ্বারা পরস্পর বিভক্ত। বীজ সবুজবর্ণ, প্রায় ত্রিকোণ। পত্রের আস্বাদন মিষ্ট না হইলেও তেমন তিক্ত নয়। এজন্য ইহার চারা গাছের পাতা শাকের জন্য কলিকাতায় বিশেষ প্রচলিত।

তিতা নালিতা।

(C. capsularis.)

তিতাপাট পূর্ব্ববঙ্গের বর্ষাকালীন প্রধান ফসল। ইহার গাছ ৫।৭ হাত লম্বা হয়। পত্র সরল, লম্বা, গোল, কিন্তু মিঠা পাট অপেক্ষা লম্বায় বেশি, এবং গোল কম। পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, এবং কিনারা করাতের দাঁতের মত কাটা; এবং তাহার নিম্নতমভাগে কেশের ন্যায় অংশ। মোটা-মুটি তিতাপাটের গাছও দেখিতে মিঠা পাটের গাছেরই মত। তবে ইহার পুষ্প কাণ্ডে (Peduncle) অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক ফুল থাকে। ফুলের বহিরাবরণে (calyx) পরস্পর সংযুক্ত পাঁচটি অংশ (sepals)। পুষ্পগুলি মিঠাপাট অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়, এবং হরিদ্রাবর্ণ হইলেও কিঞ্চিৎ সাদা। পাপড়ি পাঁচটি। ইহার ফল গোল, অগ্রভাগ যেন কাটা। ফলের উপরিভাগ অসমান কর্কশ এবং রেখাযুক্ত। ফলের ভিতরে পাঁচটি বীজকোষ

পরদা দ্বারা বিভক্ত। প্রত্যেক বীজকোষে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক বীজ পরদা দ্বারা অবিভক্ত। বীজকোষ পাঁচটির মাঝে মাঝে আরও পাঁচটি বীজশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ আছে। তিতাপাটের বীজও মিঠাপাটেরই ন্যায় ত্রিকোণ—কিন্তু ইহার বর্ণ লাল। এই লাল বর্ণ দৃষ্টেই তিতাপাটের বীজ সবুজ বর্ণ মিঠাপাটের বীজ হইতে বাছিয়া লওয়া যায়। আবার পত্রের তিক্ত আস্বাদন দ্বারা তিতাপাটের অতি ক্ষুদ্র চারাগাছ ও মিঠাপাটের চারাগাছ হইতে সহজেই বাছিয়া লওয়া যায়।

মিঠাপাট এবং তিতাপাট এই উভয়ই আমাদের কৃষির অন্তর্গত। আমাদের কৃষিবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই উভয় জাতীয় নালিতা গাছের তুলনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহারও সারমর্ম এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। তিতা-পাটের মূল শিকড় (Tap root) অপেক্ষাকৃত কম লম্বা। তাহার প্রধান শাখা শিকড় সকল মাটির উপরিভাগে অবস্থিত। এই কারণে এই জাতীয় গাছ অল্প পরিশ্রমেই টানিয়া উৎপাটিত করিতে পারা যায়। মিঠাপাটের মূল শিকড় অনেক বেশি লম্বা এবং প্রধান শাখা শিকড়গুলি মাটির অপেক্ষাকৃত অধিক নিম্নে অবস্থিত। এজন্য মিঠা-পাট টানিয়া সহজে উৎপাটিত করা যায় না। তিতাপাটের কাণ্ড অপেক্ষাকৃত কম সরল এবং প্র-কাণ্ড অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক ও অধিক লম্বা। মিঠাপাটের কাণ্ড খুব সরল, প্র-কাণ্ডের সংখ্যা কম এবং দৈর্ঘ্যে ছোট। তিতাপাটের পত্রাক্ষ (stipules) পৃথক, ও ঘনসন্নিবিষ্ট, মিঠা-পাটের পত্রাক্ষ (stipules) অল্প সংখ্যক ও সংযুক্ত। তিতাপাটের নিম্নের পত্রগুলি সহজে ঝরিয়া পড়ে না, কিন্তু মিঠাপাটের নীচের পাতাগুলি অতি সহজেই ঝরিয়া পড়ে। তিতাপাটের ফুল মিঠা-পাটের ফুল অপেক্ষা ছোট। তিতাপাটের ফল গোল এবং মিঠাপাটের ফল লম্বা। বীজ তিতা-পাটের লাল এবং মিঠাপাটের সবুজ। আস্বাদন তিতাপাটের খুব তিক্ত এবং মিঠাপাটের অতি সামান্য রকম তিক্ত।

নালিতার বংশভেদ।

(Racos.)

মিঠাপাট এবং তিতাপাট উভয়ই নানাপ্রকার দৃষ্ট হয়। অনেকে মনে করেন যে, এই সকল প্রকার ভেদকে উপশাখা (variety) নাম দেওয়া যায় না। কারণ তাহাদের প্রকার ভেদের (type) স্থায়িত্ব দৃষ্ট হয় না। উভয়বিধ পাটেরই পৃথকত্ব বংশভেদ জনিত (race) বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার পাটের যে সকল বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা মোটামুটী এই:—(ক) একই সময়ে বপন করিলেও কয়েক বংশীয় পাট অতি অল্প সময়েই বর্দ্ধিত হইয়া পুষ্প ধারণ করে; আর কতকগুলির পুষ্প ধারণ করিতে বিলম্ব হয়। (খ) একই প্রকার চাষ করিলেও পূর্ণ বিকাশ লাভ হইলে, কতকগুলি অত্যন্ত সতেজ এবং দীর্ঘ কাণ্ড যুক্ত, আর কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ এবং কম দীর্ঘ হয়। (গ) কাণ্ডের (stem) পত্রদণ্ডের (Petiole) রংএর মধ্যে বংশানুসারে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কতকগুলির বর্ণ সবুজ এবং কতকগুলির লাল। মোটামুটী দেখা যায় যে, যে সকল পাট পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে অধিক সময় লয়, সেই সকলই অধিক পরিমাণ পণ্য পাটের আঁস (Jute-fibre) উৎপন্ন করে। ইহাও দৃষ্ট হয় যে, গাছগুলি পুষ্ট হইলে পণ্য পাটও ভাল হয়। মিঠাপাটের বংশভেদ অপেক্ষকৃত অল্প। তন্মধ্যে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য। (১) তোষ—ইহা পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জেই বিশেষ প্রচলিত, দেশী লাল পাট

নামে ইহা হুগলি জেলায়, এবং হালবিলাতী নামে ত্রিপুরা জেলাতে প্রচলিত। ইহার কাণ্ড লালবর্ণের। পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে ইহার চাষ হয়। ক্ষেত্রে জল জমিলে তোষ জাতীয় গাছ যতই বড় হউক না কেন, ভাল হয় না। বেলে মাটিতে এই পাট অন্যান্য পাট অপেক্ষা ভাল হয়। তোষ গাছের কাণ্ডের নিম্নভাগে শিকড় গুচ্ছ বাহির হয় না। ইহার আঁস (fibre) শক্ত এবং ওজনে অধিক। কিন্তু এই পাটের বাজার দর তিতাপাট অপেক্ষা কম। (২) বাঙ্গি পাট—ইহা ঢাকা অঞ্চলে এবং (৩) সাতনলী ইহা ফরিদপুর অঞ্চলে প্রচলিত। ইহাদের উভয়েরই কাণ্ড সবুজ বর্ণ। এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ইহারা পূর্ণবিকাশ লাভ করে। (৪) দেওনাল্যা—ইহা ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত, কাণ্ডের বর্ণ সবুজ এবং ইহা পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে অত্যন্ত অধিক সময় লাগে।

তিতাপাটের বংশভেদ (Races) মিঠাপাট অপেক্ষা অনেক অধিক ; তন্মধ্যে এই কয়টী বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) দেশওয়াল পাট (C. Cap. Variety Ramosus) ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। ইহার কাণ্ড ৪।৫ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়, কিন্তু অধিক জল পাইলে ইহার কাণ্ডের নিম্নদেশে লোমের মত শিকড় গুচ্ছ দৃষ্ট হয়। তবে ইহার বৃদ্ধি এত তাড়াতাড়ি হয় যে, যদিও অন্যান্য জাতীয় নালিতার সঙ্গেই চৈত্র ও বৈশাখ মাসে (April, May) বপন করা যায় তথাপি শ্রাবণ মাস (June and July) মধ্যেই ইহার বিকাশ পূর্ণ হইয়া কাটিবার যোগ্য হয়। এজন্য ইহাকে আউসি পাটও বলে। ইহার দোষ এই যে, শাখা প্রশাখা কিছু বেশী বাহির হয়, এবং প্রধান কাণ্ডও তত সরল হয় না। (২) বোম্বাই বা বাওয়া পাট (C. Cap. Variety Erectum) ইহাও ময়মনসিংহ এবং ফরিদপুরে বিশেষ প্রচলিত। ইহার শাখা প্রশাখা অত্যন্ত কম হয়, এবং ফলও কম হয়। ইহার কাণ্ড ৬ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। গোড়ায় অধিক জল থাকিলে, ইহারও কাণ্ডের নিম্নভাগে অসংখ্য শিকড়গুচ্ছ দৃষ্ট হয়। এই পাটের আঁস অন্যান্য পাট অপেক্ষা ভাল। এই পাটের বিকাশে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। এবং চৈত্র বৈশাখ মাসে বপন করিলেও ইহা আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত কাটিবার যোগ্য হয়। বর্ষার জলে প্লাবিত হয়, এইরূপ স্থানেই এই পাটের চাষ হয়। (৩) বরপাট বা তল্লাপাট (C. Cap. Variety Longum)—ইহার কাণ্ডের বর্ণ সবুজ। পূর্ব্ববঙ্গে মেঘনার উভয় পার্শ্বস্থ চরসমূহে এবং অন্যান্য যে যে স্থান বর্ষার জলে প্লাবিত হয়, সেখানেই এই পাটের চাষ হয়। ইহার কাণ্ড ৭।৮ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। অন্য কোন শ্রেণীর পাট এত লম্বা হয় না। নিতান্ত চারা গাছ ভিন্ন বর্ষার জলে কিম্বা জমিতে জল দাঁড়াইলে এই পাটের কোন ক্ষতি হয় না। ইহার কাণ্ডের নিম্নভাগে শিকড়গুচ্ছ হয় না। (৪) আলতা পাট বা বিদ্যাসুন্দর—(C. Cap. Variety Rubra) ইহা রঙ্গপুর অঞ্চলেই বিশেষ প্রচলিত। ইহার কাণ্ড লাল বর্ণ। ইহার আঁসও

কিঞ্চিৎ লাল আভাযুক্ত। এই জন্য বাজারে এই পাটের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম।

যে সকল স্থানে বর্ষার জল না উঠে এবং জমিতে জল না দাঁড়ায় সে সকল স্থানে মিঠাপাট (C. Olitorius) এবং যে সকল স্থানে বর্ষার জল উঠে এবং জমিতে জল দাঁড়ায়, সে সকল স্থানে তিতাপাট (C. Capsularis) ভাল জন্মায়। মোটামুটি দেখা যায় পূর্ব্ববঙ্গে, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের চরে ও পার্শ্ববর্ত্তী বিলসমূহে তিতাপাট (C. Capsularis) অধিক প্রচলিত। আবার পশ্চিমবঙ্গে, কলিকাতা অঞ্চলে এবং হুগলি, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে মিঠাপাট (C. Olitorius) অধিক প্রচলিত। ধান্যের মত পাটেরও আউসি এবং আমনি এই দুই শ্রেণী আছে। মিঠা এবং তিতা উভয় পাটেরই এই দুই শ্রেণী দৃষ্ট হয় এবং যদিও সকল পাটই চৈত্র বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করা যায় তবুও কয়েক জাতীয় পাট শ্রাবণ মাসের মধ্যেই (July and August) পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া কাটিবার যোগ্য হয়। ইহাদিগকে আউসি পাট বলে। আবার কয়েক জাতীয় পাট আশ্বিন মাসে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া কাটিবার যোগ্য হয়। ইহাদিগকে আমনি পাট বলে। ইহাও দেখা যায় যে, যে সকল দেশে জল কম হয়, উত্তরবঙ্গে, সে সকল দেশে পাট অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পণ্য পাট তত ভাল হয় না, এবং পরিমাণেও কম হয়। আবার যে সকল দেশে প্রচুর জল হয়, যথা পূর্ব্ববঙ্গে, সেই সকল দেশে পাট পূর্ণ বিকাশ পাইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে, এবং পণ্য পাট অধিক মূল্যবান এবং পরিমাণেও অধিক হয়।

পাটের মাটি ও জল বায়ু।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে (অর্থাৎ যে সকল স্থানে উত্তাপ ৬০°ফ হইতে ১০০°ফ) উষ্ণ বায়ুতে এবং সিক্ত পলি ভূমিতে (alluvium) যে কোনরূপ মাটিতেই হউক অতি উত্তমরূপে নালিতার চাষ হইতে পারে। এই জন্যই বিষুব রেখার উত্তরে ২৩ ডিগ্রি (কর্কট ক্রান্তি) ও দক্ষিণে ২৩ ডিগ্রি (মকর ক্রান্তি) এই স্থান মধ্যে নদীর চরে এবং বিলের পার্শ্ববর্ত্তী জমিতে পাটের ভাল চাষ হয়। অধিকাংশ জাতীয় পাট গাছ চারা অবস্থা অতিক্রম করিলে অর্দ্ধ জলমগ্ন থাকিলেই ভাল ফসল পাওয়া যায়। এই সকল কারণে পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের চর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম্য বিল সমূহে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল পাট হয়। যে সকল জমি বর্ষাকালে জলমগ্ন হয় না, সে সকল জমির জন্য মিঠাপাট বিশেষ উপযোগী। সিরাজগঞ্জে দেখা যায়, এই জাতীয় পাট বর্ষাকালে অর্দ্ধ শুষ্ক জমি এবং বাস্ত ভূমিতে বর্দ্ধিত হইতেছে; কিন্তু তিতা-পাট ৩.৪, এবং বংশভেদে ৫।৮ ফুট জলমগ্ন থাকিলেও অতি সতেজে বর্দ্ধিত হয়। নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ভৈরব প্রভৃতি স্থানে অনেক সময় দেখা যায় কৃষকেরা ডুব দিয়া পাট কাটিতেছে। এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যদিও সিক্ত উষ্ণ বায়ু এবং আর্দ্র পলিভূমি পাটের বিশেষ উপযোগী —তথাপি পাট গাছ ছোট চারা অবস্থায় থাকা কালীন যদি অত্যন্ত বর্ষা হইয়া জমিতে জল দাঁড়ায়, তবে সকল জাতীয় পাট গাছই মরিয়া যায়। উপযুক্ত পরিমাণ জল পাইলে সকল মাটিতেই

ভাল পাট হয় বটে, তথাপি সাধারণ ভাবে এ কথা বলা যায় যে দোয়াঁস (Loam) এবং আটাল (clay-loam) মাটিতে যে পাট হয়, তাহার আঁস অতি উৎকৃষ্ট, এবং বেলে মাটিতে (sandy loam) যে পাট হয় তাহার আঁস নিকৃষ্ট। তবে আঁসের গুণের উপর মূল্যের তারতম্য। যতদিন উপযুক্ত মত না হয়—ততদিন কৃষকগণ পণ্য পাটের পরিমাণের উপরই দৃষ্টি রাখিবে। জলবায়ু যদি ঠিক থাকে, তবে মাটি বেলে কি আটাল, উৎপন্ন পণ্য পাটের পরিমাণ সম্বন্ধে বেশী কিছু আসে যায় না। তবে আটাল মাটির চাষে, বেলে এবং দোঁয়াস মাটী অপেক্ষা খরচ অধিক পড়ে।

পাটের চাষ।

পাট চাষের জন্য যতদুর সম্ভব গভীর চাষ করিয়া মাটি চূর্ণ করিয়া ধূলার মত করিতে হয়। অল্প খরচে চুক্তি করিয়া হল চালনা করাইলে পাটের উপযুক্ত চাষ হওয়া সম্ভব নয়। পুরোহিত যেমন চারি আনার চণ্ডীও জানে, এক আনার চণ্ডীও জানে—কৃষকও তেমনি আট আনার হল চালনাও জানে, বার আনার হল চালনাও জানে। নিজের হাল গরু দ্বারা নিজে লাঙ্গল করিলে যেরূপ ইচ্ছা-মত গভীর করিয়া চাষ করা যায়; ভাড়াটিয়া হাল গরু দ্বারা, এমন কি অসন্তুষ্ট কম বেতনের চাকর দ্বারাও সেইরূপ হইবে না। অসন্তুষ্ট চাকর লাঙ্গলের মুটি এমন করিয়া ধরিবে যে, ফাল ভাসিয়া ভাসিয়া জমির ২।৩ ইঞ্চি মাত্র খুঁড়িয়া চলিয়া যাইবে। তাহাতে গরুর বা মানুষের কিছুই পরিশ্রম হইবে না। আবার সন্তুষ্ট প্রভুর হিতৈষী চাকর লাঙ্গলের মুটি এমন করিয়া ধরিবে যে, আমাদের এই ক্ষীণজীবী গরুতেই ফাল ৬।৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত গভীর মাটি খুঁড়িয়া যাইবে, কিন্তু এরূপ করিলে গরু এবং মানুষ উভয়েরই পরিশ্রম হইবে। পাটের জমিতে চাষ উপযুক্ত মত গভীর হওয়া চাই। এজন্য অতি যত্নের সহিত এক লাঙ্গলের খনিত গর্ত্তের উপর দিয়া তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটী লাঙ্গল চালাইয়া জমি ১০।১২ ইঞ্চি গভীর করিয়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। নিজের ভাল চাকর ভিন্ন এরূপ পরিশ্রম কেহ করিবে না। নগদা মজুর ২।৩ ইঞ্চির বেশি গভীর করিয়া বড় চাষ করে না। সাধারণতঃ ক্ষেতের আউস ধান বা অন্য শস্য উঠিয়া গেলেই পাটের চাষ আরম্ভ হয়। যে সকল নীচু জমি কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসেও শুকায় না, তাহাতে কলাই সরিষা প্রভৃতি রবি শস্যের সুবিধা হয় না। এরূপ নীচু জমিতে আমন ধান্য উঠিয়া গেলেই পৌষ মাসে, অথবা জমি শুকাইবা মাত্র, অর্থাৎ অত্যন্ত শুকাইয়া শক্ত হইবার পুর্ব্বেই প্রথম চাষ দিতে হয়। চাষ দিতে বিলম্ব করিলে অধিকতর পরিশ্রম ও সময় লাগে। আটাল মাটির জমি হইলে, তাহা অতিরিক্ত শুকাইলে এত শক্ত হইয়া যায় যে, তাহার উপযুক্ত কর্ষণে ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যদি অনিবার্য্য কারণবশতঃ জমি অতিরিক্ত শুকাইয়া শক্ত হইয়া পড়ে, তবে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া প্রথম বৃষ্টি হইলে, অথবা জল সিঞ্চনের বিশেষ সুবিধা থাকিলে জল সেচন বা "বুর" দিয়া (flooding) মাটি যখনই একটু শুষ্ক অথচ নরম হইবে, তখনই চাষ দিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ দোফসলি জমিতে কলাই সরিষা প্রভৃতি রবি শস্য হয়। এরূপ জমিতে মাঘ কি ফাল্গুন মাসে রবি শস্য উঠিয়া গেলেই প্রথম চাষ দিতে হয়—এস্থলেও মাটি শুকাইয়া শক্ত হইয়া গেলে, জলের সুবিধা থাকিলে "বুর" দিয়া অথবা যেই প্রথম বৃষ্টি হইয়া মাটি চাষ দিবার উপযুক্ত হইবে, তখনই প্রথম চাষ দিতে হইবে।

অন্ততঃ চৈত্র মাসের মধ্যে প্রথম চাষ দিতেই হইবে। প্রথম চাষের অন্ততঃ ১০।১৫ দিন পর বৃষ্টির দিন দেখিয়া জমিতে ভাল, পচা গোবর সার ছড়াইয়া দিতে হয়, এবং বৃষ্টির জলটা কিঞ্চিৎ শুকাইলে দ্বিতীয় চাষ দিয়া মই দিতে হয়।

কৃষকের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, একটা চাষ দিয়া, দ্বিতীয় চাষ দিবার পূর্ব্বে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়া আবশ্যক। যেন অম্লজান বায়ু (Oxygen) সূর্য্যরশ্মি এবং মাটিস্থিত জীবাণু (Bacteria) মাটির স্তরে স্তরে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়া তাহাতে উদ্ভিদের সুহজপাচ্য খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সঞ্চয় করিতে পারে। দ্বিতীয় চাষ ফাল্গুন কি চৈত্রের মাঝামাঝি শেষ হওয়া উচিত। তৎপরে ৭ হইতে ১৫ দিন অথবা যতদূর সম্ভব ফাঁক রাখিয়া জমি অনুসারে যে কয়টা চাষ প্রয়োজন তাহা দিতে হইবে ; এবং প্রথম চাষের পর প্রত্যেক চাষের সঙ্গে সঙ্গে এক একবার মৈ দিতে হইবে। যদি মাটিতে ঢেলা বান্ধে, তবে দ্বিতীয় চাষের পরই মুগুরে পিটিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক। শেষ চাষ দিয়া বিদে বা আঁচড়া দ্বারা আবর্জ্জনা একত্র করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। অথবা তাহা গর্ত্তে পুতিয়া সার প্রস্তুত করিয়া জমিতে ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়। অন্ততঃ আবর্জ্জনা পোড়াইয়া সেই ছাই জমিতে ছিটাইয়া দেওয়া সঙ্গত। পাটের চাষ দেওয়া সম্বন্ধে সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, ফাল যেন মাটির খুব ভিতরে প্রবেশ করে। এক ফুট পর্য্যন্ত ভিতরে গেলেই খুব ভাল হয়। তবে কৃষকের দুর্ব্বল গরু দ্বারা তাহা চলে না। এজন্ত এক লাঙ্গলের খনিত গর্ত্তের ভিতরে পুনঃ লাঙ্গল চালাইয়া চাষ যত গভীর করা যায়, তাহাই করিতে হইবে। চাষ গভীর, মাটি আগাছা ও ঢেলাশূন্ত ধূলির ন্তায় চূর্ণীকৃত— এই সকলই পাটের জন্ত বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিলাতের পূর্ব্বকালের একজন বড় কৃষকের (Jethro Tull) একটী কথা আমাদের গরীব কৃষকের সর্ব্বদা মনে রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। তিনি তাঁহার জমিতে কখনও কোন সার ব্যবহার করিতেন না, এবং বলিতেন "চাষই চাঁস" (Tillage is manure)। আমাদের গরীব কৃষক অপরিমিত সুদ দিয়া টাকা ধার করিয়া, সার ক্রয় করিবে আশা করা যায় না। চাষ ভাল করিয়া করিলে বিনা সারেও ভাল শস্য পাওয়া যায়। চাষ শেষ হইলে পরে মৈ দিয়া জমি সমান করিয়া বীজ ছিটাইয়া (বীজের সঙ্গে ছাই ও শুক মাটী মাখিয়া লইলে, সমানভাবে ছিটাইবার সুবিধা হয়) সমানভাবে একবার লম্বালম্বি, আর একবার পাশাপাশি ফেলিতে হয়। বীজ ফেলিয়া একবার আচড়া দিয়া ঢাকিয়া দিয়া মৈ দিয়া সমান করিবে ও মাটিটা চাপিয়া দিবে। বিঘা প্রতি সওয়া সের হিসাবে বীজ ফেলাই ভাল। বেশী ফেলিলে গাছ দুর্ব্বল এবং পণ্যপাট নরম হয়। কম ফেলিলে গাছে ডাল পালা বেশী হয় এবং তাহাতে পণ্যপাট খারাপ হয়। চৈত্র, বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসই বীজ ফেলিবার সময়।

যে দেশে যখন বর্ষা আরম্ভ হয়, তখনই বীজ ফেলিতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে চৈত্র বৈশাখ এবং পশ্চিমবঙ্গে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেই পাট বুনিবার সময়। বীজ ভাল হইলে গাছ ভাল হয়, এজন্ত প্রত্যেক কৃষক আপনার ক্ষেত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিপক্ক গাছ বাছিয়া বীজের জন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করিবে। অনেকে বলেন যে, যে ক্ষেত্রের বীজ সেই ক্ষেত্রে না বুনিয়া অন্ত ক্ষেত্রে বুনিলে অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। এজন্ত পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কৃষকেরা যদি আপনাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গাছের বীজ পরস্পরের

সহিত বিনিময় করেন, তবে পাট গাছের আরো উন্নতি হইবে এরূপ আশা অনেকে করেন। "ফলেন পরিচীয়তে"। তবে এইরূপ বিনিময়ে প্রবঞ্চনারও আশঙ্কা আছে। বীজ বুনিবার ৫।৭ দিনের মধ্যেই চারা বাহির হয়।

পাট গাছের যত্ন।

বেলে এবং দোয়াস মাটিতে চারা সহজেই বাহির হইয়া বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু আটাল মাটির উপর অনেক সময় এমন শক্ত সরের মত বান্ধিয়া যায়, যে চারা বাহির হইয়াও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এরূপ স্থানে চারা গাছের শিকড় মাটিতে ভাল করিয়া ধরিলে পর—অনুমান বুনিবার ৮।১০ দিন পরে, একবার আচড়া বা বিদে দ্বারা মাটির উপরের সরটা ভাঙ্গিয়া দিবে। প্রাণিগণের মত গাছেরও শ্বাস প্রশ্বাস আছে এবং বাতাস বন্ধ হইলে যেমন প্রাণীরা শ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়, গাছ—বিশেষতঃ চারা গাছের শিকড় বাতাস বন্ধ হইলে মরিয়া যায়। বুদ্ধিমান কৃষক এজন্যই সময় মত নিড়াইয়া এবং আচড়া চালাইয়া এইরূপ সর ভাঙ্গিয়া গাছের শিকড়ে বাতাস প্রবেশের সুবিধা করিয়া দিবে। পাট গাছ ৮।৯ আঙ্গুল উচা হইলে আর একবার আচড়া বা বিদে চালাইয়া গাছ পাতলা করিয়া দিবে। সেই সঙ্গে গাছের চারিদিকের মাটিও কতক ঢিলা করা হইবে এবং আগাছাও উঠান হইবে। যাহা অপূর্ণ থাকে তাহা হাতে গাছ উপড়াইয়া, নিড়াইয়া এবং আগাছা উঠাইয়া দিবে। মোটামুটি দেখিবে যেন প্রত্যেক গাছের চারিদিকে ৪ হইতে ৬ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫ হইতে ৮ আঙ্গুল পরিমাণ স্থান খালি থাকে। গাছ ১ হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইলে আর আচড়া চালাইবে না। তখন হাতে নিড়াইয়া আগাছা তুলিবে এবং মাটি ঢিলা করিয়া দিবে। গাছ দুই কি আড়াই হাত উচ্চ হইলে শেষ নিড়ানি ও বাছাই দিবে। অতঃপর পাট গাছের আর কোন বিশেষ যত্নের আবশ্যক করে না।

পাটের শত্রু।

অনাবৃষ্টি পাটের প্রধান শত্রু। পাট বুনিবার পর যদি অনেক দিন বৃষ্টি না হয়, তবে পাট গাছের জোর অত্যন্ত কম হইয়া পড়ে এবং ফসল পরিমাণে অত্যন্ত কম হয়। অতি বৃষ্টিতে সময় ভেদে পাটের অনিষ্ট করিতে পারে। পাট গাছ যখন ছোট চারা অবস্থায় থাকে তখন যদি অত্যন্ত বৃষ্টি হয়, তবে অনেক সময় গাছগুলি জল জমাতে গোড়া পচিয়া মরিয়া যায়—অথবা চারা গাছ জলে ডুবিয়া গিয়া শ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়। অতি বৃষ্টিতে মিঠা জাতীয় পাট গাছের অধিকতর অনিষ্টের আশঙ্কা। তিতা জাতীয় পাট গাছ চারা অবস্থা অতিক্রম করিলে পর যত বেশী জল পায় ততই জোরের সহিত বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

অনাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টির পর সকল শস্যেরই প্রধান শত্রু নানাপ্রকার, ছাতাধরা রোগ (Fungoid disease) এবং নানাজাতীয় পোকা। কিন্তু পাট সম্বন্ধে এ সকল শত্রু বড় বেশী অনিষ্ট করে না। তবে দুই প্রকারের পোকা সময় সময়, বিশেষতঃ জলের অভাবে গাছগুলি দুর্ব্বল হইলে, নালিতা গাছকে আক্রমণ করিতে দেখা যায়। তাহার একটী প্রজাপতি বা আঁইসযুক্ত পক্ষবিশিষ্ট (Lepidoptera) জাতীয় এক শ্রেণীর (Arctiidæ) অন্তর্গত। বাঙ্গালা কোন নামকরণ ঠিক হয় নাই। (ইংরাজি নাম Spilosoma)। এই পোকা পাট

গাছ যখন কচি থাকে তখন তাহার পাতায় ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম ফুটিয়া তাহা হইতে এক প্রকার শুয়া পোকা (Larva) নির্গত হয়।

সেই সকল শুয়া পোকা পাট গাছের কচি কচি পাতাগুলি খাইয়া বর্দ্ধিত হয় এবং শেষে গুটি বা কোষ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিদ্রিত (Pupate) অবস্থায় থাকে এবং কিছুদিন অন্তে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত প্রজাপতি (Imago) হইয়া বাহির হইয়া উড়িয়া যায়। এই পোকাই কৃমি (Larva) অবস্থায় পাট গাছের পাতা খাইয়া ফেলে, এবং তাহাতে সেই পাটের গাছ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ও অনেক গাছ মরিয়া যায়। যে সকল আক্রান্ত গাছ বাঁচিয়া থাকে তাহা হইতেও ভাল ফসল উৎপন্ন হয় না। এই সকল কৃমি (Caterpillar) দেখিতে শাদা এবং গায়ে কিছু কিছু লোম থাকাতে শুয়া পোকা নাম দেওয়া যায়। বিনা ব্যয়ে সুধু গায় খাটিয়া এই পোকার প্রতিকার করিতে হইলে পোকাগুলি, হাতে ধরিয়া ধরিয়া একত্র করিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়াই ভাল। তদ্ভিন্ন যে জমিতে এই শুয়া পোকার উপদ্রব হয় তাহাতে বিঘা প্রতি ১০।১২ টা মুরগী ছাড়িয়া দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই পাট ক্ষেত এই শুয়া পোকার উপদ্রব হইতে মুক্ত হইবে। আমরা শিবপুর কৃষিক্ষেত্রে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া উপকার পাইয়াছি। পাটের চাষা অধিকাংশই মুসলমান। তাহাদের পক্ষে এই পোকার এবং এই জাতীয় অন্যান্য পোকার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার এ অতি সহজ উপায়। এ সকল উপায় যাহারা অবলম্বনে অশক্ত, তাহাদের পক্ষে কেরোসিন তেলের জল—দুই ছটাক কেরোসিনে একসের হিসাবে জল ঝাকরাইয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া, অথবা—তামাক পাতার জল অর্থাৎ একছটাক তামাকপাতা একসের জলে ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে সমান পরিমাণ চুণের জল মিশাইয়া, প্রত্যেক গাছের গায়ে বাগানে জল দিবার ঝাঁঝ্‌রি দ্বারা বা ছিটাইয়া দেওয়া ভিন্ন অল্প ব্যয়সাধ্য প্রতিকারের অন্য উপায় দেখিতেছি না। যাহারা পরের পয়সা খরচ করেন অথবা নিজের পয়সা খরচ করিতেও কুণ্ঠিত নন, তাহারা রীতিমত কেরোসিনের ঘি (Kerosine emulsion) প্রস্তুত করিয়া এবং এক্লেয়ার ভেপোরাইজর (Eclair vaporisor) ১৫।২০ টাকা দামে ক্রয় করিয়া তদ্দারা প্রয়োগ করিতে পারেন। নিম্নলিখিত প্রণালীতে কেরোসিনের ঘি (Kerosine emulsion) প্রস্তুত করিতে হয়। এক পোয়া সাবান পাঁচ সের জলে মিশাইয়া ফেল, এবং আগুনে সিদ্ধ করিয়া খুব গরম অবস্থাতে দশ সের কেরোসিন তেল ঢালিয়া দিয়া পিচকারি দিয়া দশ মিনিট কাল তাহা খুব আলোড়ন করিয়া দেও। যখন দেখিবে ভাল করিয়া মিশিয়া গলা ঘির মত হইয়াছে, তখন ঠাণ্ডা হইতে দেও। দেখিবে তখন বেশ গাঢ় হইয়াছে। ইহারই নাম কেরোসিনের ঘি (Kerosine emulsion)। ব্যবহার করিবার সময় এই ঘির একভাগ লইয়া তাহাতে নয় ভাগ জল যোগ করিয়া পিচকারী দ্বারা খুব ভাল করিয়া মিশাইয়া গাছের উপরে প্রয়োগ কর। পার ত এক্লেয়ার ভেপোরাইজর

(Eclair vaporisor) দ্বারা প্রয়োগ করিবে। আর তাহা না থাকিলে, বাগানে জল দিবার ঝাঁঝরি দ্বারা ঝারের মত করিয়া প্রয়োগ করিবে। এক্লেয়ার ভেপোরাইজর খরিদ করিতে ১৫.২০৲ টাকা লাগে। আবার তাহা একটু মাত্র খারাপ বা বিকল হইলেই একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া যাইবে। পাড়াগাঁয়ে ইহার কোন মেরামত হইবে না। এরূপ অবস্থায় আমরা কৃষককে ইহা কিনিবার পরামর্শ দিতে পারি না।

আর এক রকমের পোকা আছে তাহাতেও পাটের খুব অনিষ্ট হয়। তাহা কঠিন পাখা বিশিষ্ট জাতীয় (Coleoptera) পোকার এক শাখার (Curculionidæ) অন্তর্গত। ইহা দেখিতে কাল এবং অতি ক্ষুদ্র, কতকটা আমাদের পুরাতন চাউলের পোকার মত। এই পোকা দাঁত দিয়া (mandibles) পাট গাছের গাঁইটের (nodes) বাকল কাটিয়া সেই ছিদ্রের মধ্যে একটী একটী করিয়া ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটিয়া ছোট কৃমি (larva) জন্মে, এবং তাহা গাছ খাইতে খাইতে বর্দ্ধিত হইয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত অবস্থায় (pupa) কিছুকাল থাকিয়া, পরে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত পোকা (Imago) হইয়া বাহির হইয়া আবার গাছ খাইতে আরম্ভ করে, এবং শেষে ডিম পাড়িয়া বংশ বিস্তার করে। এই পোকার আক্রমণে পাট গাছ মরে না বটে; কিন্তু পাট মাঝে মাঝে কাটিয়া যায় এবং স্থানে স্থানে ময়লা দাগ পড়ে। আঁশ খারাপ এবং কম হয় এবং তাহার দরও কম হয়। এই পোকার প্রতিকার করা কঠিন। কারণ ইহা অধিকাংশ কাল গাছের ভিতরে থাকে এবং পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে এক গাছ হইতে নিকটে অন্য গাছে উড়িয়া যায়।

কেরোসিনের ঘি (Kerosine emulsion) বা বা তামাক পাতার জল ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু আশানুরূপ ফলের সম্ভাবনা কম। একটী কথা কৃষকের মনে রাখা কর্ত্তব্য—যেমন মানুষের রোগাদি দুর্ব্বল গরিবদিগকেই বেশী আক্রমণ করে, তেমনি পোকাগুলিও দুর্ব্বল গাছগুলিকেই আক্রমণ করে। গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হইলে তাহাতে এক প্রকার তিক্ত কটু রস জন্মে, যাহা পোকার পক্ষে অখাদ্য এবং কষ্টদায়ক। এজন্য সর্ব্বদা (১) উপযুক্ত ফাঁস ব্যবহার করিয়া, (২) কিম্বা নিড়াইয়া বা বিদে (আচড়া) চালাইয়া গাছের শিকড়ে হাওয়া প্রবেশের সুবিধা করিয়া, (৩) আগাছা উঠাইয়া গাছের খাদ্যের অপচয় বন্ধ করিয়া, এবং (৪) জলাভাব হইলে জলের বন্দোবস্ত করিয়া গাছকে সতেজে রক্ষা করিতে পারিলে, গাছের কোন প্রকার পোকার আক্রমণের ভয় থাকে না।

পাটের সম্বন্ধে ছাতা ধরা রোগের (Fungoid disease) কথা বড় শোনা যায় না। তবে একটী রোগের কথা এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। পাটের গাছ চারা থাকা কালীন এমন কি এক হাত দেড়হাত লম্বা হওয়া পর্য্যন্ত ২।৪ দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়া জল না দাঁড়াইয়াও যদি জমি অত্যন্ত ভিজা (বা সেঁতসেতে) হইয়া যায়—তখন দেখা যায় যে স্থানে স্থানে গাছগুলি ঢলিয়া পড়ে এবং মরিয়া যায়। মানুষকে সাপে কাটিলে যেরূপ হঠাৎ ঢলিয়া পড়ে, গাছেরও প্রায় সেইরূপ অবস্থা হয়। ইহাও একপ্রকার ছাতা ধরা রোগ Pythium de Baryanum)। ভিজা মাটিতে কচি কচি শালগম প্রভৃতি চারাও এই রোগে অনেক সময় মরিয়া যায়। ঠিক গাছের গোড়াতে এই রোগ প্রথম আক্রমণ করে। ক্রমে সমস্ত গাছের শরীরে বিস্তৃত হয়। অণুবীক্ষণের সাহায্যে এই রোগ বেশ প্রত্যক্ষ করা

যায় এবং বৈজ্ঞানিকেরা এই রোগ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা এ স্থলে উল্লেখ করা গেল না। চারা অত্যন্ত ঘন করিয়া বুনিলে এবং সেই সঙ্গে জমি খুব ভিজা হইলে রোগের আশঙ্কা বেশী। এই রোগের চিকিৎসা অতি সহজ এবং বিনা ব্যয়েই করা যায়। যে সকল গাছ ঢলিয়া পড়িয়াছে সেগুলিকে তৎ-ক্ষণাৎ উৎপাটিত করিয়া অনেক দুরে নিক্ষেপ করিবে। তারপর জমির জলপ্রণালীগুলি (Drain) কোদাল দিয়া ভাল করিয়া খুলিয়া দিবে। এবং জলপ্রণালীর সংখ্যা ও এই পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিবে, যেন অল্পকাল মধ্যে জমিটা শুকাইয়া বিদে বা আচড়া দিবার যোগ্য হয়। এবং বিলম্ব না করিয়া বিদে দিতে পারিলে দিবে, কিংবা হাতে নিড়াইয়া বাছাই দিবে। অন্ততঃ আক্রান্ত গাছের চতুঃপার্শ্বস্থ গাছগুলি হাতে নিড়াইয়া বাছাই দিবে। গাছের গোড়ায় এবং শিকড়ে বাতাস প্রবেশ করিতে পারিলে, এবং মাটী কিঞ্চিৎ শুকাইলেই এই রোগ নিবারণ হয়। সাধারণ কৃষকেরা এই রোগকে "হাজা" বা "পেকচিপা" লাগা বলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।



কৃষক। চৈত্র, ১৩১৫।

উদ্ভিদ্-প্রবর্ত্তন।

উদ্ভিদ্-শাস্ত্রের কয়েকটি শাখার মধ্যে ভৌগলিক উদ্ভিদ্-তত্ত্ব একটি। কোন উদ্ভিদের আদিম বাস-স্থান কোথায়, কোন্ কোন্ দেশে কতদুর স্থান ব্যাপিয়া জন্মিয়া থাকে ইত্যাদি বিষয় এই শাখায় আলোচিত হইয়া থাকে। ইহা অবশ্য কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে মানব ব্যতীত অপর সমস্ত জীব এবং উদ্ভিদের অবস্থান সীমাবদ্ধ। এক অঞ্চলে যে গাছ দেখিতে পাওয়া যায় অন্য অঞ্চলে সেই গাছ দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথমে যে স্থানে যে গাছ উদ্ভূত হইয়াছিল, যদি সেই স্থানেই সেই গাছ আবদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান জগতের ব্যবসায় বাণিজ্য অথবা সুখ সমৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যাইত না। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা হইতে পায় না। সামুদ্রিক স্রোত, নদী, বায়ুপ্রবাহ ও পখাদির দ্বারা সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদ সমূহের বীজ সর্ব্বদাই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিচালিত হইতেছে, এবং এই প্রকারে এক এক জাতীয় উদ্ভিদের অবস্থানের সীমা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

কিন্তু এই সমুদয় সাধারণ ও স্বাভাবিক কারণ সমুদয় দ্বারা উদ্ভিদের অবস্থানের পরিসর যতদুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়াছে, মানবের হস্তক্ষেপেই

ইহা ততোধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আদিম মানব যে আহার ও বাসস্থানের অন্বেষণে কত দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। এবং যখনই সে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গিয়াছে, তখন ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এক দেশীয় উদ্ভিদের বীজ অন্য দেশে লইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রধান খাদ্য ধান্য জাতীয় উদ্ভিদ্ সমূহের যে কোন্ দেশে প্রথম উৎপত্তি তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। যে দেশেই সুবিধা পাইয়াছে, সেই দেশে মানব উক্তজাতীয় উদ্ভিদ্ বীজ বপন করিয়াছে এবং এই রকমে ধান্য, গোধূম, যব, যই, ভুট্টা প্রভৃতি পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

যাহা হউক একদেশীয় উদ্ভিদের অন্য দেশে প্রবর্ত্তনে যে মানবের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের সাধারণ শাক, সব্জী, ফল, মুল প্রভৃতি কত যে বিদেশ হইতে আনীত তাহা অনেকেই জানেন না এবং ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার এত পরিচিত ও সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে যে, ঐ সমস্ত গাছ আমাদের দেশের আদিম অধিবাসী নয় বলিলে অনেকেই সন্দিহান হইবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর দুই চারিটির নাম করিলেই চলিবে। শাক সব্জীর মধ্যে আলু, কপি, বিলাতী কুমড়া ও বিলাতী বেগুন, ফলের মধ্যে পেঁপে, আনারস, লকেট, লিচু এবং ফুলের মধ্যে গোলাপ, ও নানাবিধ নর্সারি জাত গাছ। এতদ্দেশে কোন্ কোন্ গাছ কোন্ কোন্ সময় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা একটি বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়, এবং আমরা আশা করি যে ভবিষ্যতে কোন উদ্ভিদ্‌বেত্তা এই অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সমাধা করিয়া ভারতীয় কৃষি ও উদ্ভিদ্ তত্ত্বের অশেষ উপকার সাধন করিবেন।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে, যে স্থানে প্রায় সকল রকম জল বায়ু ও মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থানে যে কত প্রকার নূতন নূতন গাছ প্রবর্ত্তিত হইয়া কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত গাছ এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অবৈজ্ঞানিক লোক সমূহ কর্ত্তৃক হইয়াছে। এরূপ ভাবের প্রবর্ত্তনে একটা বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে। আবশ্যকীয় গাছের সহিত অজ্ঞতা অথবা অসাবধানতা প্রযুক্ত অনেক অনাবশ্যকীয় গাছ অথবা আগাছা চলিয়া আসে। প্রবর্ত্তন ব্যাপারে আরও একটু রহস্য জনক ব্যাপার এই যে, আমরা যে সমস্ত গাছ প্রবর্ত্তন করিতে বিশেষ প্রয়াস পাই, সে সমুদয় হয়ত সম্যক্‌রূপে প্রবর্ত্তিত হয় না, কিন্তু আগাছা গুলি এমন চাপিয়া বসে যে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে এরূপ আগাছার অভাব নাই। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বাগান প্রভৃতিতে একফুটের অনুচ্চ, ১ ইঞ্চি পরিমিত গভীর-মধ্য ডিম্বাকৃতি পত্র বিশিষ্ট এক প্রকার উদ্ভিদ্ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Peperomia pellucida প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল ইহা অন্য কয়েকটি গাছের সহিত অতর্কিত ভাবে এতদ্দেশে আসিয়াছিল। এক্ষণে ইহা স্থানে স্থানে এত অধিক মাত্রায় জন্মিয়া সাধারণ ফসলকে বিনাশ করিয়া ফেলে যে, উহার উচ্ছেদ সাধন কৃষকের অন্যতম কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদ্দেশে আগাছার প্রাদুর্ভাব ও তৎসমুদয়ের নিরাকরণের ব্যয় সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর পাওয়া যায় না; কিন্তু যদি তাহা পাওয়া যাইত তাহা হইলে ইহা স্থির নিশ্চয় যে আমরা উহার পরিমাণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতাম।

বিদেশ হইতে প্রবর্ত্তিত আগাছা সমূহ দ্বারা যে কৃষির কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার দুই চারিটি দৃষ্টান্ত এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সিংহলে কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে সাদা অথবা ছাগল আগাছা (*Ageratum Conyzoides*) নামক এক প্রকার আগাছা আসে। কথিত আছে যে কাফি চাষের প্রাধান্যের সময় কাফি চাষীগণকে উক্ত আগাছা দমন করিবার জন্য বৎসরে ৩৭॥০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইত। অন্য দেশে আগাছা কর্ত্তৃক আরও গুরুতর ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। এতদ্দেশে ফণী মনসা পতিত স্থানেই জন্মাইয়া থাকে, কিন্তু কুইন্সল্যাণ্ডে লক্ষ লক্ষ বিঘা উত্তম উর্ব্বর মৃত্তিকা ফণী মনসা দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ইহা সর্ব্ব প্রথমে টবে সক্ করিয়া জন্মাইবার জন্য আনয়ন করেন। এক্ষণে ইহার উপদ্রবে কৃষককুল এতই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার উচ্ছেদ সাধনের উপায়ের জন্য দেড়লক্ষ টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই প্রকারের অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারা যায়। কিন্তু এই দুই একটি দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, অসাবধান ও অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তির হস্তে বৃক্ষ প্রবর্ত্তনের ভার পড়িলে সময়ে সময়ে তাহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান সময়ে সকল শিক্ষিত দেশেই বৃক্ষ প্রবর্ত্তনের উপকারিতা অনুভূত হইয়াছে। কৃষি বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতিশালী আমেরিকা বৃক্ষ প্রবর্ত্তনের অন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগই স্থাপন করিয়াছে। এই বিভাগে নিযুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমেরিকায় প্রবর্ত্তন করিবার উপযুক্ত বৃক্ষাদির জন্য জগত আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছেন। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ কিউ উদ্যানেও প্রবর্ত্তন কার্য্য বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে অন্যান্য দেশ আমাদের দেশীয় বৃক্ষাদি লইয়া গিয়া উহাদের চাষে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছে আমরা সেরূপ হইতে পারি নাই। দক্ষিণ আমেরিকার নিকট সভ্য জগত অনেক খাদ্য ফসলের জন্য ঋণী। কিন্তু দেখিতে গেলে আমেরিকা এসিয়ার নিকট বোধ হয় তদপেক্ষা অধিক ঋণী। কারণ এক্ষণে আমেরিকা যে সকল দ্রব্যের চাষে অভাবনীয় রূপে ধনশালী হইয়া উঠিতেছে তৎসমুদয় প্রায়ই এসিয়া জাত উদ্ভিদ্। আমেরিকাকে অ্যাবিসিনিয়া কাফি দিয়াছে, চীন ইক্ষু দিয়াছে, ভারতবর্ষ আদ্রক, ধান্য, আম্র প্রভৃতি দিয়াছে। আমেরিকা বাসী গণ অধ্যবসায় ও উদ্যম প্রভাবে এই সমস্ত ফসলে এতদূর উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে যে, উহাদের আদিম বাসস্থান জাত ফসল সমূহকে উহাদের সহিত তুলনা করিতে পারা যায় না।

প্রবর্ত্তনের উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম, এক্ষণে প্রবর্ত্তন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা দেখা যাউক। বিজ্ঞানের হিসাবে প্রবর্ত্তন তিন প্রকারের হইতে পারে। যখন কতিপয় গাছ বিদেশ হইতে আনীত হয় এবং তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগের বংশ বৃদ্ধি করিতে হয় তখন তাহা আংশিক প্রবর্ত্তন (introduction) বলিয়া গণ্য। এই শ্রেণীর গাছের বংশ বৃদ্ধি করা অনেক সময় সুকঠিন ব্যাপার। গাছঘরের ফর্ণ-পাম্ ও নানা জাতীয় পাতা বাহার গাছ প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। পক্ষান্তরে কতক গুলি বিদেশীয় গাছ এত অল্প সময়ে ও এত সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে কোন বিশেষ দেশের জল হাওয়া ও মৃত্তিকার উপযোগী করিয়া লয় যে তাহারা বিনা আয়াসে

স্বভাবতই তদ্দেশীয় স্বভাবজ বৃক্ষের ন্যায় জন্মিয়া থাকে। এতদ্দেশে কাজলী বাদাম, ঝুমকো ফুল, শেয়াল কাঁটা প্রভৃতি এই শ্রেণীর উদাহারণ। এই প্রকার গাছকে naturalised plant অর্থাৎ পূর্ণ প্রবর্ত্তিত গাছ বলে। এই দুইটি সীমার মধ্যে আর এক প্রকারের প্রবর্ত্তন হয়। সময়ে প্রবর্ত্তিত গাছের নূতন দেশের জল হাওয়া এত দুর সহ্য হয়, যে বিশেষ কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন না করিয়া সাধারণ উপায়ে বীজ অথবা কলম দ্বারা উহাদিগকে উৎপাদিত করিতে পারা যায়। উক্ত প্রকারে গাছকে আবহাওয়া সহনক্ষম অর্থাৎ acclimatised plant বলে। প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য বিদেশীয় গাছ আনিয়া উহাদিগকে দেশের জল হাওয়া সহনক্ষম করা। এইরূপ করিতে পারিলেই তাহা হইতে ফল পাওয়া যায়। তাহার পর কাল ক্রমে উক্ত গাছ তৃতীয় শ্রেণীতে চলিয়া যায়।

প্রবর্ত্তন ব্যাপারে দুইটি নির্দ্ধারক ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। জল হাওয়া ও বৃক্ষের প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তনশীলতা। অবশ্য কর্ষণের দ্বারা গাছের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। অকর্ষিত গাছ অপেক্ষা কর্ষিত গাছকে কোন দেশে লইয়া গিয়া প্রবর্ত্তন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। চিরস্মরণীয় মহাত্মা ডারউইন্ বলেন যে অধিকাংশ কর্ষিত ফসলের গঠন প্রণালী এরূপ যে উহারা অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের জল হাওয়াও সহ্য করিতে পারে। তাহা হইলেও নির্দ্দিষ্ট জাতীয় উদ্ভিদের সহন ক্ষমতার একটা সীমা আছে। সেই সীমা বহির্ভূত তাপ অথবা শৈত্য সহ্য করাইতে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক চাষ প্রণালীও সক্ষম নহে। উদাহরণ স্বরূপ কপির বিষয় উল্লেখ করিতে পারা যায়। নিম্নবঙ্গে যতই কৌশলের সহিত কপির চাষ করা যাউক না কেন উহার বীজ জন্মাইতে পারা যায় না। ইহার কারণ এই যে উহাদের বীজ ধরিবার সময় এতদ্দেশে গ্রীষ্মকাল আসিয়া পড়ে, কিন্তু শীত না থাকিলে উহাদের বীজ পরিপক্ব হয় না।

মানবের ন্যায় উদ্ভিদ্‌কেও কোন নূতন স্থানে লইয়া গেলে উহা পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হয়। অনেক গাছ প্রথম পুরুষে তাহার নিজের দেহ নূতন জল বায়ু সহনক্ষম করিয়া তুলিতে পারে না। সে নিজেকে উক্ত অবস্থায় আনয়ন না করিতে পারিলেও, তাহার শরীর এত পরিবর্ত্তিত হয় যে, তাহার সন্তান সন্ততিগণ নূতন জল বায়ু সহনক্ষম হইয়া উঠে। এ স্থলে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের গাছ একেবারে বিপরীত ভাবাপন্ন জল বায়ুতে লইয়া গেলে তাহার মরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। পক্ষান্তরে যদি উহাকে একেবারে বিপরীত ভাবাপন্ন জল হাওয়াতে না লইয়া গিয়া, উহার আদিম বাসস্থান হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন জল হাওয়া যুক্ত স্থানে জন্মাইয়া, তাহার পর বিপরীত প্রকারের জল হাওয়ায় লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে উহার বাঁচিবার আশা অধিক। অর্থাৎ পরিবর্ত্তনটা ক্রমশঃ হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে গাছ নিজের গঠন পরিবর্ত্তন করিবার সময় পায়। কপি, বিলাতী মটর প্রভৃতি এতদ্দেশে এইরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ উহাদিগকে উত্তর ভারতের শীত প্রধান স্থানে জন্মান হয় এবং তৎপরে উপত্যকায় প্রবর্ত্তন করা হয়। কত দিনে যে এক শ্রেণীয় গাছ অন্য দেশের জল বায়ু সহনক্ষম হইতে পারে তাহা সঠিক বলা যায় না। ইহা অনেকটা গাছের স্বাভাবিক জীবনী শক্তি, বিশেষ গঠন প্রণালীও স্থানীয় অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। কোন

জাতীয় গাছ এক পুরুষেই জল হাওয়া সহনক্ষম হইতে পারে আবার কোন স্থানে হয়ত বহুপুরুষেও হইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া দেশীয় কয়েক জাতীয় গাছ প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহারা ফলনের সময় একবারেই পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বাসস্থানের উপযোগী হইয়াছে।

এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে বৃক্ষ প্রবর্ত্তন দ্বারা আমাদের সাধারণ কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা আছে কি না? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, অতীত কালে নূতন জাতীয় বৃক্ষ প্রবর্ত্তন দ্বারা যে অসীম উপকার সাধিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময় ততটা হইবার আশা নাই। কারণ উদ্ভিদ্ শাস্ত্রের আলোচনার বৃদ্ধির সহিত পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্ভিদ্ই প্রায় জানিত হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি কালের গতির সহিত সংসারে নূতন নূতন অভাব জন্মিতেছে, আজ যাহা সখের জিনিস কাল তাহা প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইতেছে এবং ইহার সহিত মানবের চিরজাগ্রত অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি উদ্ভিদ্ ও প্রাণীজগতে নিত্য নূতন দ্রব্যের আবিষ্কার করিতেছে। এরূপ অবস্থায় নূতন জাতীয় গাছ প্রবর্ত্তনে যে উপকার না হইবে তাহা কে বলিতে পারে? আর একবারে নূতন গাছ প্রবর্ত্তনের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমাদের দেশে যে সমস্ত কৃষি-জাত ফসল রহিয়াছে তাহারও যে কত প্রকার উৎকৃষ্ট জাতি বিদেশে জন্মিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের ধান্য, আমাদের গোধুম, আমাদের ইক্ষু অন্যান্য দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎপাদিত হইয়া এরূপ উৎকৃষ্ট জাতি সমূহ প্রসব করিয়াছে যে, তৎসমুদয়ের নিকট অনেক দেশীয় জাতিকেই আগাছা বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য আমাদের ফসল সমূহ সম্বন্ধে বিদেশীয়গণ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করা এবং বিদেশজাত উৎকৃষ্ট জাতি সমূহ এতদ্দেশে প্রবর্ত্তন করা। বৃক্ষ প্রবর্ত্তন ও বৃক্ষ উৎপাদন অন্যান্য সুসভ্য দেশের কৃষিবিভাগের অন্যতম অঙ্গ। দুঃখের বিষয় যে এতদ্দেশীয় কৃষি বিভাগ উক্ত বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। জনসাধারণের মধ্যেও এ বিষয়ে আগ্রহ দেখা যায় না। ইতিপূর্ব্বে অনেকেই ফুল ও পাতা বাহার গাছ বিদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা যদি কৃষিজাত বৃক্ষাদি আনয়নে সচেষ্ট হন তাহা হইলে দেশের অনেক উপকার হয়।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

বৃষ্টির অভাব।

কালীগঞ্জ,

খুলনা।

আমাদিগের এই কালীগঞ্জ অঞ্চলে বিগত আশ্বিন হইতে যে বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে অদ্য চৈত্র মাসের প্রথমার্দ্ধ অতীত হইল তথাপি বৃষ্টি হইল না। রাত্রে ঠাণ্ডা, প্রাতে এবং দিবাবসানে কুয়াশা এবং মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড অনলবর্ষী রৌদ্রের উত্তাপে আর কোন মতে গৃহের বাহির হইবার উপায় নাই। দুই প্রহরের সময় রৌদ্র এরূপ প্রখর হয় যে বোধ হয় ঘরের বাহির হইলে দেহের চর্ম্ম পুড়িয়া শরীরে ফোস্কা হইবে। মাঠ একবারে তৃণ সম্পর্ক শূন্য হইয়াছে। গৃহপালিত পশুকুল আহারাভাবে মৃতপ্রায় অস্থি চর্ম্ম সার। চৈত্র মাস শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু কৃষক অদ্যাপি ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিতে পারিল না, সুতরাং আগামী বর্ষের

আশুধান্য ও পাটের আশা দিন দিন লুপ্ত হইতেছে। প্রচুর বর্ষণাভাবে একেই হৈমন্তিক খন্দ ভাল জন্মে নাই, ধান্যেও চিটা ভুষি হইয়া অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে—কৃষকগণ দুই তিন মাসের আহারের উপযোগী ধান্যও গোলায় তুলিতে পারে নাই; ইহার উপর যদি আশু ধান্য ও পাটের ফসল অজন্ম হয়, তাহা হইলে কৃষককুল অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া খাদ্য ও বীজাদির অভাবে আগামী আমন ধান্যের ফসলেও সফল হইবে না। একেই বর্ত্তমান সময়ে বহুলোক অন্নাভাবে সবদিন একবেলায়ও আহার জুটাইতে পারিতেছে না, তাহার উপর সুদূর মফঃস্বলের পল্লিসমূহের কৃষকবৃন্দকে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর স্থান হইতে নৌকাযোগে, এবং দেড় ক্রোশ দুই ক্রোশ দূর হইতে গো শকট এবং ভারে করিয়া পানীয়জলের সংস্থান ও আহরণ করিতে হইতেছে। ইহার উপর আবার ওলাউঠা, জ্বরদোষ, আমাশয়, আমরক্ত ও সর্ব্বোপরি বসন্ত রোগের প্রকোপটা কিছু পূর্ণমাত্রায় প্রকট। আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি ফলকর বৃক্ষ সমূহ "পৃথ্বী রসশূন্যতা হেতুতে" ফল পুষ্প প্রসবে অসমর্থ হইয়াছে। তন্মধ্যে আম্র আদৌ দৃষ্টি গোচর হয় না। মৃত্তিকার কাঠিন্য জন্য আদৌ মুকুল উদগতই হইতে পারে নাই। এতদিন পরে এইক্ষণে মুকুলের পরিবর্ত্তে নবপত্র বিনির্গত হইতেছে; সুতরাং একটা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভোগে এদেশের লোক এ বৎসর বঞ্চিত হইল।

বর্ত্তমান বর্ষে আশ্বিন মাস হইতে আমাদিগের এই কালীগঞ্জ অঞ্চলে বৃষ্টির অভাবে মাঠ ঘাট এরূপ শুষ্ক ও মাটী প্রস্তর-কঠিন হইয়া উঠিয়াছে যে, কৃষিকার্য্য একেবারেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; পৃথিবী রসশূন্য হওয়ায় আম্রবৃক্ষ আদৌ মুকুল প্রসবে সমর্থ হইল না। কাঁঠাল, সুপারি ও নারিকেলের মুচি একেইত বাহির হইতে সমর্থ হইল না, যাহা দুই একটা গাছে কষ্টে সৃষ্টে যৎকিঞ্চিৎ বাহির হইয়াছিল তাহাও জলাভাবে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। তরকারি মধ্যে একটু সস্তা হইয়াছিল, পুনরায় দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। বেগুন ও লাউ কুমড়ার গাছ সকল মরিয়া যাইতেছে। পুষ্করিণীর জল বিবর্ণ, কীটপূর্ণ ও শুষ্ক প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এই স্থানের চতুস্পার্শ্বের দরিদ্র পল্লীতে অন্নের অভাব ত হইয়াছেই, ইতিমধ্যে জলের অভাবেও হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে। মাঠ তৃণ শূন্য ও ধূলিময় হইয়াছে। গবাদি পশু খাদ্যাভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। দুগ্ধের নাম দেশ হইতে লুপ্ত প্রায়। কদাচিত দুই এক সের বহুকষ্টে সংগ্রহ হইলেও এক টাকায় ছয় সেরের উপর কখনই পাওয়া যায় না। এ দিকে কিন্তু ইতিমধ্যেই নদীর উচ্ছসিত লবণাক্ত কষায় জলে বিল সকল ভাসিয়া যাইতেছে। কৃষক লাঙ্গল, বলদ গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া নিরানন্দ মনে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভগবান ও রাজার নিকট বারি ভিক্ষা চাহিতেছে। কিন্তু ভগবানের কর্ণ ত চিরকালই নাই, রাজাও বধীর। সুতরাং এদেশের আর কোন আশা নাই, প্রজা লবণ-জল-বিদূরিত সুমিষ্ট সুপেয় জল সঞ্চয়ের প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু ভগবান তাহাদিগকে অগাধ অপরিমেয় লবণ জলে নিমজ্জিত করিয়া সুপেয় মিষ্ট জলভাণ্ডার শুষ্ক করিয়া দিতেছেন। এখনও জেলার কালেক্টর সাহেব বাহাদুর কৃপাদৃষ্টি করিয়া ধান্য ক্ষেত্রগুলি যদি লবণ জলপ্লাবনের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেন তাহা হইলে দেশ রক্ষা হইত। তদ্ভিন্ন নিশ্চয়ই এদেশ পুনরায় সুন্দরবনের ন্যায় জঙ্গলে পরিণত হইয়া জন শূন্য ও ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাসভূমি হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পত্রাদি।

শ্রীসোণারাম কাকতী, পানেরিছাট, আসাম।

লাঙ্গল।—নিম্নলিখিত লাঙ্গলগুলির মধ্যে কোনটী ভাল—গোরু কিম্বা মহিষদ্বারা চাষ চলে, হাল্কা অথবা ভারি ও মূল্য জানিতে চান।

1. Bhagalpur Plough.
2. Lealy's Turnover.
3. Dinapur.
4. St. Joseph's
5. Hindustan.
6. Ranson's English.
7. Watts D. E.

[ইহাদের মধ্যে ভাগলপুর লাঙ্গল, হিন্দুস্থান ও শিবপুর লাঙ্গল গভীর চাষের উপযুক্ত এবং আটাল মাটিতে চলে। শিবপুর লাঙ্গলের দাম ১০৷৷৹ টাকা, হিন্দুস্থান লাঙ্গলের দাম ১৩৲ টাকা। হিন্দুস্থান লাঙ্গল সদাসর্ব্বদা বাজারে তৈয়ারি থাকে না। জোসেফ কোম্পানিকে অর্ডার দিলে তাঁহারা তৈয়ারি করিয়া দিতে পারেন। ভাগলপুর লাঙ্গলের দর জানা নাই এবং বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় না। র‍্যানসম্স বিলাতি লাঙ্গল—ইহা অত্যন্ত ভারি—এখানে গোরু কিম্বা মহিষে টানিতে পারিবে না। দানাপুর লাঙ্গল সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোন খবর জানি না। ওয়াটস্ লাঙ্গল হাল্কা মাটির উপযুক্ত—দাম ৫৲ টাকা। সেণ্ট জোসেফ্স্ লাঙ্গলও হাল্কা মাটিতে চলে—উহার দাম জানা নাই বা এখন কোথায় পাওয়া যায়, আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কৃঃ সঃ।]

শ্রীরমণচন্দ্র চৌধুরী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

[ধুতুরা।—ধুতুরা চাষ সম্বন্ধে আপনার চিঠি খানি শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর নিকট পাঠান গেল। তাঁহার ঠিকানা ২৩/৬ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।]

সার-সংগ্রহ।

তুলার বীজ ক্রোর টাকায়।

গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টেই প্রকাশ যে,—গত বৎসর ক্রোর টাকার তুলার বীজ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে! কাপাসের তুলার বীজগুলা এতদিন ফেলিয়া দেওয়া হইত। আবর্জ্জনা মনে করিয়া অনেকে পুড়াইয়া ফেলিতেন। কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নহে, মার্কিন যুক্তরাজ্যেও তুলার বীজের এতদিন ঐ পরিণামই বিহিত ছিল। তুলার বীজ এখন জমীর সার ও মানুষের খাদ্য সামগ্রী বলিয়া সমাদর লাভ করিতেছে। তুলার বীজ হইতে উৎকৃষ্ট তৈল বাহির হইতে পারে; সে তেলে রন্ধন ও জ্বালানী দুই-ই চলিতে পারে; অধিকন্তু, সেই তৈল—সুস্বাদু পুষ্টিকর,—এমন কি ঘৃত ও মাখমের ন্যায় গুণসম্পন্ন। প্রায় দশ পনের বৎসর হইল, এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। এখন ক্রমেই তাহার সাফল্য প্রতিপন্ন হইতেছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, সে বৎসর ৭৬ হাজার টাকার তুলার বীজ ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়াছিল; এবং দিন দিনই সেই রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া গত বৎসর সেই রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল,—প্রায় কোটী টাকায়। নানা কারণে এদেশে কাপাসের চাষ কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখন আবার যদি

কাপাসের চাষ এদেশে বৃদ্ধি পায়, বীজ-বিক্রয়ে কৃষকদের আর এক নূতন আয়ের পথ প্রশস্ত হইতে পারে।

ভাগলপুরে আম।

ভাগলপুরে প্রধানতঃ তিন জাতীয় আম্র দেখা যায়; (১) গোলফল অর্থাৎ লম্বা চওড়ায় সমান। অনেকটা আপেল কিম্বা হৃদ্‌যন্ত্রাকৃতি। (Apple-shaped or heart-shaped.)

(২) বোম্বাই আমের আকৃতি।

(৩) ডিম্বাকৃতি বা অর্দ্ধবর্ত্তুলাকৃতি।

হিল্‌সাপাতি ও লাথ্‌রা প্রথম জাতীয় গোল ফলের মধ্যে গণনা করা যায়। হিল্‌সাপাতি কতকটা ক্ষীরসাপাতির মত, ভিতরের শাঁস লাল বাহির দিকও আভাযুক্ত, খাইতে সুমিষ্ট, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। ফলের ওজন প্রায় ১৫।১৬ তোলা।

লাথরা গোলফল, নাক আছে, প্রায় ৩।০ ইঞ্চ লম্বা হয়, ওজন প্রতি আম ১৮ তোলা। হৃদ্‌যন্ত্রাকৃতি আমগুলির মধ্যে গঙ্গাসাগর, ক্ষীরসাপাতি ও মোহনভোগ, জানসেন ও সোয়ান ভাঙ্গাইয়া। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুইটী আমের ওজন ৫১ তোলা। শাঁস হল্‌দে, তত ভাল আম নহে, সেইজন্য নামজাদা নহে। গঙ্গাসাগর, ক্ষিরসাপাতি ও মোহনভোগের নাম কখন কখন শুনা যায়, তথাপি ইহারা বোম্বাই আমের সমতুল্য নহে এবং দামেও কম। এই জাতীয় আমের মধ্যে সোয়ান ভাঙ্গাইয়া সকলের অপেক্ষা ছোট। শ্রাবণ মাসে পাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পাদুকা, ভাগলপুরী বোম্বাই, কলিকাতা বোম্বাই, হানফাল্‌সো, কাঁচা মিঠা, হিমসাগর, গোপালভোগ, সুন্দরসা, বেদানা, কার্ত্তিকী প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভাগলপুরী বোম্বাই আম ভাল; ইহার দুই রকম আছে, এক রকম নিচের দিকে হল্‌দে; বোঁটার দিকে ঘোর সবুজ, শাঁস লাল। অপর রকম হল্‌দে ও ভিতরের শাঁসও হল্‌দে, উভয় রকম আমেই আঁশ নাই, কিন্তু প্রথম প্রকারই খাইতে অধিকতর সুমিষ্ট। এই আম ১।০ সিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৲ টাকা এবং কোন কোন বৎসর ১০৲ টাকা প্রতি শত বিক্রয় হইয়া থাকে।

কলিকাতা বোম্বাই আম ছোট, রঙ ফিকে সবুজ, পাকিলে ঈষৎ হল্‌দে হয়, আঁব ছোট, ভাগলপুরী বোম্বাই অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট, দুইটী আমের ওজন ২৬ তোলা মাত্র।

হানফাল্‌সো বোম্বাইয়ের আলফন্সো আমই বোধ হয় এইখানে এইপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ফল তদপেক্ষা অনেক ছোট হইয়াছে, এবং স্বাদেরও অনেক ইতর বিশেষ ঘটিয়াছে।

এতদকালের হিমসাগর আমটি ভাল; দরেও বিক্রয় হয়, আম মাঝারি সাটের, দুইটী আমের ওজন ৩৭ তোলা।

গোপালভোগ আম—ছোট, মিষ্ট, শাঁস লাল, রস অন্যান্য আমের রস অপেক্ষা গাঢ়। ছোট জাতীয় আমের মধ্যে সুন্দরসা বেশ ভাল আম। পাকিলে ঘোর হল্‌দে হয়, শাঁসও হল্‌দে।

উপরে লিখিত আমগুলি ব্যতীত ভরতভোগ, হিরাসোয়ানিয়া, মালদহ, ল্যাংড়া, রামদিলার, কয়েক জাতীয় বিজু, সুন্দরপ্রসাদ, কদুয়া, সাহাজাদ, কুমারপাহাড়, জরদালু, রামকিষণ, বিন্দ্রাবন গোলাপখাস, দুধিয়া, ফজলী, গোলভাদাইয়া, চীনাসাগর, সাগরগঙ্গা, আরহাজলী, রাজলাল, বারমেসিয়া এই কয়প্রকার আম ভাগলপুর অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যে চীনাসাগর ও সাগরগঙ্গা আদৌ নামজাদা বলিয়া বোধ হয় না।

সাগরগঙ্গা একপ্রকার জঙ্গলী আম বলিয়াই বোধ হয় এবং ইহার গঙ্গাসাগর আমের সহিত অনেক পার্থক্য আছে। ঐ সকল আমের মধ্যে বোম্বাই, মালদা, হিমসাগর, ভাদুরি, জরদালু, গোলাপখাস এবং ফজলী আমই অন্যগুলি অপেক্ষা ভাল এবং ঐ গুলিই বাজারে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়।

ব্রহ্মদেশে ধানের আবাদ।

ব্রহ্মদেশে ধানের আবাদ দিন দিন বাড়িতেছে। সেখানকার মাটী নিম্নস্তরে কঠিন কর্দ্দম, উপর স্তরে অপেক্ষাকৃত নরম কর্দ্দম এবং বৃষ্টিবারি ধানের পক্ষে আশানুরূপ পর্য্যাপ্ত। তথাকার মাটির একটী বিশেষ গুণ এই যে, প্রতি বৎসর একই জমিতে ধান উৎপন্ন হইতেছে তথাপি ফসল কমে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে বৃষ্টি পতনের সঙ্গে সঙ্গে ধান ক্ষেতে যে আগাছা জন্মে তাহাই জমিতে চষিয়া দিলে সারের কার্য্য করে। মে মাসের প্রথম হইতে জমিতে চাষ দেওয়া আরম্ভ হয়। সাধারণ দেশী লাঙ্গলেই চাষের কার্য্য সমাধা হয়। সেখানে স্ত্রীলোকেরা হাতে বীজ ধান উঠাইয়া লইয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করে। ৬।৮ ইঞ্চ ব্যবধানে, প্রতি গর্ত্তে ৩।৪টী হিসাবে বীজ বসায়। যতদিন পর্য্যন্ত ধান ফুলে ও পাকে ততদিন ক্ষেত্রে জল থাকিতে দেওয়া হয় পরে নালা কাটিয়া জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়। বঙ্গদেশের অনেক স্থলে জলাভাবে চাষ হয় না, সেখানে কিন্তু ধান খারাপ হইবার ভয়ে ক্ষেত্র হইতে জল বাহির করিবার ব্যবস্থা আছে।

আহরণ কার্য্য নভেম্বর মাস হইতে আরম্ভ হইয়া জানুয়ারির মধ্যে শেষ হয়। ব্রহ্মদেশে প্রায় ১২০ প্রকার ধানের চাষ হয়।

প্রতি একরের খাজনা ৬৲ টাকা এবং খাজনা সমেত প্রতি একরে ধান চাষের খরচ ২১৲ টাকা। একর প্রতি ৪০ ঝুড়ি ধান জন্মায়। ১০০৲ ঝুড়ি ধান তৈয়ারি করিতে হইলে ৫২॥ টাকা খরচ পড়ে। চাষীরা প্রতি ঝুড়ি ধান ১৲ টাকায় বিক্রয় করে। রেঙ্গুন কিংবা পেগু হইতে যে চাউল কলিকাতায় আসে তাহা দেশী চাউল অপেক্ষা প্রতি মণ ১৲।১॥০ টাকা সস্তায় বিক্রয় হয়।

হরিদ্রার চাষ।

হরিদ্রার চাষ বেশ একটী লাভ জনক কৃষি, ভারতবর্ষের সকল গৃহস্থেরই ইহার আবশ্যক এবং ইহা বিদেশে চালান হইয়া থাকে। হলুদ ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার ও কোন কোন ভেষজে ব্যবহার ভিন্ন আর কোন প্রয়োজনে লাগে তাহা জানা নাই। হলুদ চাষের জন্য দোঁয়াস মৃত্তিকাই প্রশস্ত এবং ২।৩ বৎসরের পতিত জমি হইলেও হয়। নদীর ধারে বন্যার জলে পলিপড়া মাটীতে হলুদের খুব ভাল চাষ হইতে পারে। আওতায় অর্থাৎ বৃক্ষের তলের জমিতে হলুদ আবাদ করিলে একরূপ হয় বটে কিন্তু ফলন ততদূর ভাল হয় না। হলুদ চাষ সম্বন্ধে একটী খনার বচন আছে যথা,—"বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে হলুদ রোও। দাবা পাশা ফেলিয়ে থোও॥ আষাঢ়ে শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি। ভাদরে নিড়ায়ে করিবে খাঁটী॥ অন্যথা নিয়মে পুঁতিলে হলদী। পৃথিবী বলেন তাতে কি ফলদি॥"

কার্ত্তিক মাসে জমিকে প্রায় ১ হাত গভীর করিয়া কোপাইয়া রাখিতে হয়। ফাল্গুন মাসে যখন বৃষ্টি হয়, তখন ঐ মাটীর বড় বড় ঢেলা গুলি গলিয়া চাপ হইয়া থাকে, তখন আবার কোদালি দ্বারা কোপাইয়া ছোট ছোট ঢিলের মত করিয়া ফেলিতে হয়, এবং জমিতে পচা গোবর, খৈল,

হাড়ের গুঁড়া ও ছাই সার দিতে হয়। বৈশাখ মাসে পুনরায় কোপাইয়া মাটী বেশ ধূলার মত করিতে পারিলেই চাষের উপযুক্ত হয়। অনন্তর পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে লম্বা এবং দুই হাত ব্যবধান এক এক সারি বড় ভেলি বান্ধিয়া দিতে হয়। ভেলিগুলি উচ্চতায় ১ হাত বা তিন পোয়া আন্দাজ হইবে এবং অর্দ্ধ হস্ত বা তিন পোয়া ব্যবধানে বীজ গুলি পুঁতিয়া দিতে হইবে।

হলুদের বীজ হয় না, হলুদকে দুইভাগে চিরিলে দুই দিকেই যেন চোক থাকিতে পারে এইরূপ, হিসাব করিয়া চিরিয়া পূর্ব্ব কথিত সারের মধ্যে আঙ্গুল বা কোন কাঠের কোঁড় দ্বারা খুঁড়িয়া চোক গুলি উপরদিকে রাখিয়া মাটী চাপা দিতে হয়। গর্ত্তগুলি ৩।৪ আঙ্গুলের যেন বেশী না হয়। আবার হলুদ তুলিবার সময় বড় বড় চাপড়া হলুদের গায়ে যে সকল ছোট ছোট পুড়ি জন্মে, সেই গুলি ভাঙ্গিয়া লইয়া উক্ত সারিতে দিয়া মাটী চাপা দিলেও হইতে পারে।

বর্ষার জল পাইলেই হলুদের অঙ্কুর বাহির হয়। অঙ্কুর বাহির হইলে নিড়াইতে আরম্ভ করিবে যেন ঘাস না জন্মে; তৎপরে মধ্যে মধ্যে নিড়াইতে হইবে। বৃষ্টি হইয়া গেলে কদাচ হলুদ বাড়িতে নামিবে না, নচেৎ পায়ের চাপে মাটি শক্ত হইয়া যাইবে ও হলুদ ভাল হইবে না। আশ্বিন পর্য্যন্ত জল সেচন করিলে আর কিছুই করিতে হয় না। বলা বাহুল্য যে জমি বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়, তাহাতে হলুদ হয় না, বরং গাছগুলি মরিয়া যায়। সুতরাং হলুদের জন্য উচ্চ ডাঙ্গা জমির আবশ্যক।

মাঘ মাসে হলুদ তুলিবার সময়, যখন ভিতরে হলুদ পাকিবে, তখন গাছগুলির পাতাও পাকিয়া শুকাইতে থাকিবে। তখন জমি হইতে তুলিয়া আনিয়া গরম জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, জাল দিলে শুক হইয়া ওজনে কম হয়। পরে দুই খণ্ড করিয়া চিরিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়, শুকাইবার সময় চটের উপর ফেলিয়া রগড়াইতে হয়, ইহাতে হলুদ সুশ্রী ও দানাদার হয়। পাতাগুলি পোড়াইয়া যে ক্ষার হয়, তাহাতে কাপড় কাচা যায়। প্রতি বিঘা হলুদের জমি আবাদ করিতে মোট ৩০৲।৪০৲ টাকার বেশী খরচ পড়ে না, উৎপন্ন বিঘা প্রতি ৩০৴ মণেরও বেশী হইতে পারে, এবং গড়ে ৩৲ টাকা মণ বিক্রয় করিলেও খরচাদি বাদে ৫০৲।৬০৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে, সুতরাং এরূপ লাভজনক কৃষিতে উপেক্ষা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত,—কুশীদা, মালদহ।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

'গোল্ডেন ক্রাউন' জাহাজ।—কৃষকের পাঠকবর্গ মাত্রেই অবগত আছেন যে, উক্ত জাহাজ খানি সমুদ্র হইতে, মৎস্য ধরিবার জন্য নিযুক্ত আছে। বিগত ১৯০৮ সালে শেষ তিন মাসে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ৩৫ দিন মৎস্য ধরা হইয়াছিল। প্রত্যেক দিন ১,১৮০ সের হিসাবে মাছ উঠিয়াছিল। ৩৫ দিনে মোট ৪১,৩০৭ সের মাছ ধরা পড়িয়াছিল। মাছ ধরিবার সময় জালে কচ্ছপ, করাত মাছ এবং হাঙ্গর পড়িয়া থাকে। প্রতিদিনই এই সকল জলজন্তু বাদ দিয়া মাছ ওজন করা হইয়াছে। কেবল এক দিন বাদ দেওয়া হয় নাই। করাত মৎস্যের ডানা ও ঐ সকল প্রকাণ্ড জীবের পিত্ত সংগ্রহ করিলে অনেক লাভ হইতে পারে।

একণে দেখা যাইতেছে যে, ঐ জাহাজদ্বারা যে পরিমাণ মাছ ধরা পড়িতেছে, তাহাতে মাছের ব্যবসা রীতিমত চলিতে পারে। ইউরোপের সাগর সমূহে প্রতিদিন এই পরিমাণেই মাছ ধরা পড়ে। কিন্তু ইউরোপে ও এখানে কিছু তফাৎ আছে। তথাকার বাজারে সামুদ্রিক মৎস্য বেশ দরে বিক্রয় হয়, এখানে কিন্তু সাধারণে সমুদ্রের মাছের তত্টা আদর করে না। ক্রমে অভ্যাস হইয়া গেলে ঐ সকল মাছের যে আদর বাড়িবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশের সমুদ্রোপকূলে অধুনা ভেটকী, বামলো, তপসে ও চাঁদা জাতীয় মাছই বেশীরভাগ পাওয়া যায়। ঐ সকল মাছ খাইতে মৎস্যাহারী ব্যক্তি মাত্রেরই বোধ হয় কাহারও কোন অনিচ্ছা দেখা যায় না।

অন্ন-তত্ত্ব।—চাউলের ন্যায় পুষ্টিকর অথচ সহজ-পাচ্য খাদ্যদ্রব্য সংসারে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্ন এক ঘণ্টার মধ্যেই পরিপাক হয়, কিন্তু অন্য খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করিতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা হইতে সাড়ে চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগিয়া থাকে। ইউরোপে তাই এখন চাউলের আদর দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। চাউলের কত প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, এবং তৎসমুদায় কিরূপ সুস্বাদু ও সহজপাচ্য,—এই বিষয় এখন পাশ্চাত্য দেশে নানারূপ আলোচনা চলিয়াছে। সেই আলোচনার ফলে প্রতিপন্ন হইতেছে,—চাউল উৎকৃষ্ট খাদ্য তো বটেই; বিশেষতঃ চাউল যদি অতিমাত্রায় ছাঁটাই করা না হয়, তাহা হইলে উহাতে অধিক মাত্রায় পুষ্টিকারিতা শক্তি বিদ্যমান থাকে। মিঃ আর্ণেষ্ট ক্লেসি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—চাউল যত পরিষ্কার ছাঁটা হয়, যত সাদা ধপধপে হইয়া পড়ে, ততই তাহার পুষ্টিকারিতা শক্তি হ্রাস পায়। এমন কি, অতিরিক্ত ছাঁটাইয়ের দোষে শতকরা নব্বই ভাগ পুষ্টিকারিতা-শক্তি কমিয়া যায়। দৃষ্টান্তচ্ছলে, জাপানী সৈন্যদিগের কথা কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। জাপানী সৈন্যগণ প্রধানতঃ অল্প ছাঁটাই চাউলের অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে; তাই তাহারা সমধিক বীর্য্যশালী। এসিয়া মহাদেশের অনেক প্রদেশে চাউল ভাল করিয়া ছাটাই করা হয় না। তাহাতে চাউলের মধ্যে অনেক পরিমাণে যবক্ষারজান বিদ্যমান থাকে। ফলে অন্নের পুষ্টিকারিতা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইংলণ্ডে চাউল বিশেষরূপ পরিষ্কার করা হয়। তজ্জন্য অন্নে সুগন্ধ এবং পুষ্টিকারিতা অনেকাংশেই লোপ পায়। পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারগণ এখন তাই অতিমাত্রায় চাউল পরিষ্কার করিতে নিষেধ করিতেছেন। জাপান, চীন এবং ভারতবর্ষে প্রধানতঃ যে ভাবে চাউল পরিষ্কার করা হয়; এমন কি, আমাদের দেশের চাষারা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারের জন্য অনেক সময় যে ভাবে চাউল প্রস্তুত করিয়া লয়, তাহাই শরীরের ও স্বাস্থ্যের উপযোগী। আমাদের দেশের চাষারা বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই যেরূপ প্রণালীতে অন্ন প্রস্তুত করিত, তাহাই এখন পাশ্চাত্য জাতির বিজ্ঞানবলে শ্রেয়ঃ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, তবুও পাশ্চাত্যের নিকট প্রাচ্য জাতিরা এখনও অসভ্য বলিয়া অভিহিত।

বসিরহাট কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী।—এই তৃতীয়বর্ষ এখানে শিল্প প্রদর্শনী হইল। এবৎসরের মেলা ভালরূপই হইয়াছিল। মিঃ আর, এন, মুখোপাধ্যায় উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। প্রেসি-

ডেপুটি কমিসনর বম্পাস সাহেব, কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর স্মিথ সাহেব ও রায় জ্যোতিন্দ্রনাথ চৌধুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই মেলাতে উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী ও বলদ প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু উৎকৃষ্ট গাভী প্রদর্শন জন্য রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছেন। জামালপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্র হইতে জ্যোতিন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক নানাপ্রকার সব্জী প্রদর্শিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের কৃষি পরিদর্শক শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে কৃষি যন্ত্রাদি প্রদর্শনার্থে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কৃষিজাত দ্রব্যের পুরস্কার জন্য জীতেন্দ্রনাথ বসুকে টাকী শ্রীপুরের জমিদার নামে তারণ স্বর্ণপদক প্রদত্ত হইয়াছে।

তুলা ও তুলার বীজ।—ইতিপূর্ব্বে কেবল তুলারই আদর ছিল এখন আমেরিকার তুলাগাছের কোন অংশই বৃথা নষ্ট হয় না। ভারতবর্ষে তুলার গাছ গুলি জ্বালানি কাষ্ঠ হিসাবে ব্যবহার হয়। আমেরিকায় তুলাগাছের তন্তু হইতে থলে তৈয়ারি হয় তাহাতে তুলা মোড়াই হয়। তুলাগাছের শিকড়ের ছাল হইতে একপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। তাহা আর্গট নামক ঔষধের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হইতেছে। গৃহস্থ মাত্রেই বোধ হয় জানেন যে প্রসবের পর প্রসূতির পেটের বেদনার উপশমের জন্য প্রায়ই আর্গট ব্যবহার হইয়া থাকে। এক তুলাবীজ হইতে দুই, তিন প্রকার তৈল উৎপন্ন হয় তুলাবীজ তৈল মাখাইয়া মাছ রক্ষা করা হয়; চাটনিতে এই তৈল মাখান হয়। কল কব্জার চাকার গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য তসলায়ও তুলাতৈল দেওয়া হয়, তুলাতৈল জমাইয়া লইয়া অনেকে চর্ব্বির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে পসন্দ করেন, আবার তৈলের যে কাট পড়ে তাহাতে সাবান হয় এবং বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া লইয়া যে খৈল বাহির হয় তাহা জমির সার ও পশুর খাদ্য। তুলা তুলিয়া লইবার পর তুলা বীজের গায়ে যে আঁশ থাকে তাহা কলে ছাড়াইয়া লইয়া সেই আঁশ ব্যবসায়ীরা সাদরে খরিদ বিক্রয় করে। আমরা প্রধানতঃ এই কয়টী দ্রব্যের কথা বলিলাম আমেরিকাবাসীরা তুলাগাছ ও বীজ লইয়া কত যে কি কাজে খাটায় তাহা আমাদের কল্পনায়ও আসে না। শুনিলে আশ্চর্য্য মানিতে হয় ১৮৯৭ সালে এক আমেরিকান তুলাতৈল কোম্পানি এক বৎসরে ৭ কোটী টাকার তৈলাদি বিক্রয় করিয়াছিল। ১৮৯৪ সালে ২৫০টী ঐরূপ কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে। এখন কত হইয়াছে কে তার গণনা করে! আর ভারতে এই সবে মাত্র অল্পে অল্পে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

তন্তুশিল্প।—'স্বদেশী' সাধনার শুভফলে ভারতবর্ষে তন্তুশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি-হেতু এদেশে সূতা ও কাপড় উৎপত্তির পরিমাণ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বিগত দুই বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলেও এতৎসম্বন্ধে বহু আশার সঞ্চার হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল,—৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮৭০ মণ ১১ সের কিন্তু ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সূতা উৎপন্ন হয়,—৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৮৫॥ মণ। এই যে বর্ত্তমান সরকারী বৎসর চলিতেছে, ইহারও প্রথম নয় মাসের হিসাবে দেখা যায়, ঐ সময়ে সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল ষাট লক্ষ ৯২ হাজার ৮১ মণ ২৭। সের; কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর ঠিক ঐ কয়মাসে সূতা উৎপন্ন হয়,—৫৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৫০৪ মণ ৫/ সের। সুতরাং সূতার উৎপত্তি এদেশে ক্রমেই যে বাড়িতেছে, সর্ব্বপ্রকারেই তাহা প্রতিপন্ন

হইয়া। সুতার ন্যায় বস্ত্রবয়নও যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ১৯০৭-খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এদেশে বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল,—৭ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৯০ গজ; কিন্তু ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে উৎপন্ন হইয়াছে,—৮ কোটী ৪৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯৫ গজ। সরকারী বৎসরের ৯ মাসের হিসাবেও এইরূপ দেখা যায়,—বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম নয় মাসে এদেশে বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল,—৬০ কোটি ২৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ২৪২ গজ; পূর্ব্ব বৎসর ঠিক ঐ সময়েই উৎপন্ন হয়, ৬২ কোটি ৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৪৪ গজ। বলা বাহুল্য, ঐ হিসাব সাদা-জমির কাপড় সম্বন্ধেই রঙিন বা ছিটের কাপড়ের হিসাব—ইহার বেশীর ভাগ। সে পক্ষেও নানাবিধ বস্ত্রাদি এদেশে প্রস্তুত হইতেছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

বৈশাখ মাস।

সব্জীবাগান।—মাখন শীম, বরবটি, লবিয়া প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত। টেপারি কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেপারি বীজ বসাইবার এখনও সময় যায় নাই। শসা, বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালা ঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাক বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজবপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আগুবেগুনের চারা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজ-ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া রোপণ করে।

কৃষিক্ষেত্র।—বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে আউসধান্য, ধনিচা, অরহর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময় রিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাস বীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত। যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

কিঞ্চিৎ অধিক বারি পতন হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈশাখের শেষ ভাগে গাছ গুলি বড় হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ-ইক্ষু বা আকের চাঁক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইক্ষু ক্ষেত্রে বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যকমত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আকের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আকের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ফুল বাগান।—বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারান্থাস্, দোপাটী, গ্লোব আমারান্থস্, কনভলভিউলাস, আইপোমিয়া, সনফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মাটিনিয়াডায়াণ্ড্রা, মেরীগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেল ও যুঁই ফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপরিয্যাপ্ত ফুল ফুটিবে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও বড় পাইলে ফলগুলি বড় হয়।

আদা, হলুদ, আর্টিচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে সেগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।